فقه البيوع على المذاهب الأربعة مع تطبيقاته المعاصرة مقارنا بالقوانين الوضعية

ইসলাম ও সমকালীন ব্যবসায় নীতি

চার মাযহাবের আলোকে ইসলামি ও প্রচলিত ব্যবসায় নীতির তুলনামূলক পর্যালোচনা

শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি

জন্ম : ৫ অক্টোবর ১৯৪৩, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ইউপি, ভারত।

পিতা : পাকিস্তানের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি আল্লামা মুহাম্মাদ শফি (রহ.)।

শিক্ষাজীবন : ১৯৫৯ সালে দারুল উলুম করাচি থেকে দাওরায়ে হাদীস। সেখান থেকেই ১৯৬১ সালে আত-তাখাস্সুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা। ১৯৬৪-তে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি. এ., ১৯৬৭-তে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল. বি. এবং ১৯৭০-এ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন।

উস্তাদগণ : মুফতি মুহাম্মাদ শফি, মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরিস কান্ধলবি, মাওলানা রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবি, মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকি, শাইখুল হাদিস যাকারিয়া কান্ধলবি, মাওলানা সালিমুল্লাহ খান (রহ.) প্রমুখ।

বর্তমানে দায়িত্বরত প্রতিষ্ঠান: জামেয়া দারুল উলুম করাচি'র শাইখুল হাদিস, নায়েবে মুহতামিম এবং তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা ও তাখাসসুস ফিদ দাওয়াহ-এর বিভাগীয় প্রধান (১৯৬২-বর্তমান); বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, পাকিস্তান-এর প্রেসিডেন্ট; চেয়ারম্যান, *(AAOIFI)* প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল শরিয়াহ স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল, বাহরাইন; স্থায়ী সদস্য, *(OIC)* পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফিকাহ একাডেমি জেদ্দা, সৌদি আরব; সদস্য, ইসলামিক ফিকাহ একাডেমি, রাবেতাতুল আলামিল ইসলামি, মক্কা মুকাররামা, সৌদি আরব; সদস্য, শরিয়াহ বোর্ড, গাইডেন্স ফিন্যান্সিয়্যাল গ্রুপ, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি।

সাবেক দায়িত্বরত প্রতিষ্ঠান : বিচারক, শরিয়াহ অ্যাপিলেট বেঞ্চ, সুপ্রিম কোর্ট অব পাকিস্তান (১৯৮২-২০০২); বিচারক, ফেডারেল শরিয়াহ কোর্ট অব পাকিস্তান (১৯৮০-১৯৮২); সদস্য, সিন্ডিকেট, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান (১৯৮৫-১৯৮৮); সদস্য, বোর্ড অব গর্ভনরস্, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান (১৯৮৫-১৯৮৯); চেয়ারম্যান, শরিয়াহ বোর্ড, ইউরোপিয়ান ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, যুক্তরাজ্য; চেয়ারম্যান, শরিয়াহ বোর্ড, রবার্ট ফ্লেমিং ওয়েসিস ফান্ড, ল্যুক্সেমবার্গ; চেয়ারম্যান, শরিয়াহ বোর্ড, দুবাই ব্যাংক, দুবাই; চেয়ারম্যান, শরিয়াহ বোর্ড, সুইস রে-তাকাফুল, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি।

রচনাবলি : [আরবি] তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম (ছয় খণ্ডে), বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ (দুই খণ্ডে), উসুলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু, মা হিয়া আন-নাসরানিয়্যাহ, ফিকহুল বুয়ু, মাকালাতুল উসমানি প্রভৃতি; [ইংরেজি] The Meanings of the Nobel Quran, An Introduction to Islamic Finance, Islam & Modernism, Present Financial Crisis : Causes and Remedies from Islamic Perspective, Quadianism on Trial, The Authority of Sunnah, The Historic Judgment on Interest etc; [উর্দু] আসান তরজমায়ে কুরআন, উলুমুল কুরআন, বাইবেল সে কুরআন তক, বাইবেল কিয়া হ্যায়, ইসলাম ঔর সিয়াসাতে হাযেরাহ, তারাশে, হযরত মুআবিয়া ঔর তারিখি হাকায়েক, যবতে বিলাদাত, ফাতাওয়ায়ে উসমানি (২ খণ্ডে), হামারা তালিমি নেযাম প্রভৃতি।

অ্যাওয়ার্ড ও সম্মাননা : প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন রাশিদ আল-মাকতুম অ্যাওয়ার্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত (২০০৪); কিং আবদুল্লাহ অ্যাওয়ার্ড, জর্ডান (২০১১); ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অ্যাওয়ার্ড (২০১৪); মাতৃভূমির সেবার জন্য পাকিস্তানের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' (২০১৯); যুক্তরাজ্যভিত্তিক The 500 Most Influential Muslims 2020-এ প্রথম স্থান; অ্যামেরিকান ইন্টারন্যাশনাল থিইস্টিক ইউনিভার্সিটি কর্তৃক ডি.লিট (D.Litt) ডিগ্রি (২০২২) প্রভৃতি।

আল্লাহ তাআলা উম্মাহর জন্য তাঁর যাবতীয় খেদমত কবুল করুন, তাঁকে সুস্থতা ও নেক আমলের সঙ্গে দীর্ঘায়ু দান করুন। আমিন।

فِقْهُ الْبُيُوْعِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ مَعَ تَطْبِيْقَاتِهِ الْمُعَاصِرَةِ مُقَارَنًا بِالْقَوَانِيْنِ الْوَضْعِيَّةِ

ইসলাম ও সমকালীন ব্যবসায় নীতি

[চার মাযহাবের আলোকে ইসলামি ও প্রচলিত ব্যবসায় নীতির তুলনামূলক পর্যালোচনা]

১ম খণ্ড

মূল

শাইখুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি (হাফিযাহুল্লাহ)

শাইখুল হাদিস ও নায়েবে মুহতামিম

জামেয়া দারুল উলুম করাচি, পাকিস্তান

অনুবাদ

মুফতি ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন

আত-তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা

জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম (মসজিদুল আকবার কমপ্লেক্স), ঢাকা

প্রথম প্রকাশ | নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ফিকহুল বুয়ু : ইসলাম ও সমকালীন ব্যবসায় নীতি (১ম খণ্ড)

রচনা | মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি (হাফি.)

অনুবাদ | মুফতি ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন

সম্পাদনা | আনোয়ার লাইব্রেরী সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশক | মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

আইএসবিএন | ৯৭৮-৯৮৪-৯৮০৭০-০-১

মূল্য | ১০০০.০০ টাকা মাত্র।

১ম খণ্ডের সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়
ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধি-বিধান
ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ চুক্তির যোগ্য হওয়া
উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিধান
উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির শর্ত বহির্ভূত বিধানসমূহ

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য পণ্য ও মূল্য সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং উভয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শর্তাবলি

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, যিনি এই দীনের সর্বকালীনতা ও সর্বজনীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন ইলমে ফিকহ শিক্ষা দানের মাধ্যমে, আরও বর্ষিত হোক তাঁর অনুচর-অনুসারীবৃন্দের উপর, যাঁরা নবিজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চূড়ান্ত সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইসলামি ফিকহের জ্ঞান-প্রস্রবণ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, প্রতিযুগের সমস্যাবলির যথার্থ সমাধান করে দিয়ে আমাদের রাহনুমায়ি করেছেন।

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম নেতৃবৃন্দের নাম-তালিকায় সবার উপরে যাঁর নাম, তিনি শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি (হাফিযাহুল্লাহ ওয়া মাদ্দা যিল্লাহুল আলি)। দীনি ও দুনিয়াবি উভয় জ্ঞানের আকর এই মনীষী সমগ্র বিশ্বে ইসলামি ফিকাহ ও অর্থনীতি শাস্ত্রে এক অনন্য অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বহুসংখ্যক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নীতিনির্ধারকের দায়িত্ব তিনি পালন করে যাচ্ছেন। একদিকে তিনি যেমন দরস-তাদরিসের ময়দানে শাহসওয়ার, অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বের নবউদ্ভাবিত হাজারো সমস্যা সমাধানে তাঁর কলম তেমনই ক্ষুরধার।

ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যবসায় নীতি সম্পর্কে তাঁর যত রচনা রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে পুরো বিশ্বে সমাদৃত একটি কিতাব হচ্ছে : ফিকহুল বুয়ু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ। এতে তিনি প্রথমে চার মাযহাবের আলোকে সমকালীন ব্যবসায় নীতির পর্যালোচনা করেছেন, এরপর প্রচলিত মানবরচিত ব্যবসায়

নীতির সঙ্গে তার তুলনা করে দেখিয়েছেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রচলিত ব্যবসায় নীতির চেয়ে ইসলামি ব্যবসায় নীতিরই শ্রেষ্ঠত্ব ও উপকারিতা শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

রুচিশীল এবং অভিজাত প্রকাশনা সংস্থা আনোয়ার লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে প্রায় তিন বছর আগে আমরা কিতাবটির অনুবাদ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বহু পর্যায় অতিক্রম করে কিতাবটি এখন পাঠকের হাতে। আল-হামদু লিল্লাহ! আমরা আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি এই কিতাবটিকে কবুল করেন, এর লেখক, অনুবাদক, সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উভয় জগতে তাঁদের প্রাপ্যের চেয়েও বেশি পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং আনোয়ার লাইব্রেরী পরিবারের সকল সদস্য ও পাঠকবর্গকে আল্লাহ তাআলা সিহহাত, আফিয়াত, ইজ্জত ও সালামতের নেয়ামতে পূর্ণ করুন। আমিন।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
স্বত্বাধিকারী,
আনোয়ার লাইব্রেরী
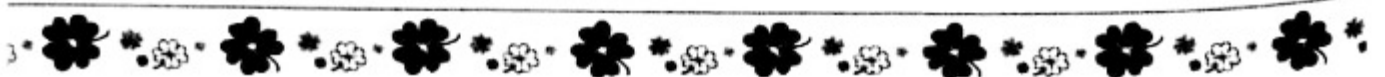
সম্পাদকের কথা

আল্লাহর অগণিত শুকরিয়া যে, এমন একটি মহান সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তিনি আমাদের সম্পৃক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আঁধার পৃথিবীর আলোকবর্তিকারূপে প্রেরিত মহামানব মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাশিমি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সহচর-অনুসারীবৃন্দের উপর, যাঁদের আদর্শ পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত মানবতাকে আলোর পথ দেখিয়ে যাবে, মুক্তির সন্ধান দেবে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা ও ব্যবসায় নীতির উপর এ যাবৎ যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলোর প্রথম সারিতে যে গ্রন্থটির নাম সসম্মানে বিরাজমান, তা হলো : *ফিকহুল বুয়ূ*। শুধু ভারতীয় উপমহাদেশ নয়; সমগ্র বিশ্বেই কিতাবটির যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা ও সমাদর রয়েছে। মাদরাসায়ে আলী (রাযি.), পাঠানটুলি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এ ফিকহ ও ইফতার উপর তাখাস্‌সুস করার সময়ে কিতাবটি আমার হাতে আসে। এরপর জামিয়া ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম, ঝিনাইদহে শিক্ষকতাকালে সহকর্মী মুফতি ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন (হাফি.) কথাপ্রসঙ্গে জানান, কিতাবটি তিনি তাখাস্‌সুসে অধ্যয়নকালেই অনুবাদ করেছেন। তাঁকে সার্বিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, সেখানকার স্বনামখ্যাত উস্তায মুফতি মাসুম বিল্লাহ (হাফি.)। লেখালেখির ময়দান থেকে প্রায় অবসর নিতে ইচ্ছুক এই কর্মবীর ব্যক্তিত্বের অনূদিত *ফিকহুল বুয়ূ* জাতির সামনে পেশ করার গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিই। এগিয়ে আসেন আনোয়ার লাইব্রেরীর দরাজদিল ব্যবস্থাপক জনাব মোস্তফা কামাল ভাইজান। এরপর দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে নানা ধাপে, বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, শত দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার ঝঞ্ঝাবায়ু উপেক্ষা করে চলতে থাকে এর ভাষা সম্পাদনা ও সংশোধনের কাজ। এ কাজে আমার সহযোগিতায় ছিলেন মাওলানা আনিসুর রহমান ও মাওলানা ইরফান ভূঁইয়া (প্রুফ সংশোধন ও মুরাজাআ), মাওলানা মারুফ বিল্লাহ, মাওলানা

যাকারিয়া শাহিন ও মাওলানা আবদুল্লাহ আল-মামুন (প্রুফ ও বানান সমন্বয়) এবং সবশেষে কিতাবটির ইনার ও পৃষ্ঠাসজ্জায় মুফতি ওমর ফারুক (হাফিযাহুমুল্লাহ)। কিতাবটির একটি চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে কৃতার্থ করেছেন মুহতারাম কাজি যুবাইর মাহমুদ। আল্লাহ তাআলা এঁদের সকলকে তাঁর শান মাফিক পুরস্কার দান করুন। আমিন।

নিচে সংক্ষিপ্তাকারে আমাদের কাজের কিছু বিবরণ পাঠক সমীপে পেশ করছি :

- কিতাবটির টীকায় আমরা যে কাজ করেছি, তার শেষে 'সম্পাদক' শব্দটি যুক্ত করে দিয়েছি, যাতে মূল কিতাবের টীকার সঙ্গে সম্পাদকের বক্তব্য মিশ্রিত হয়ে না-যায়। মূলপাঠের ভেতর বন্ধনী চিহ্ন সহকারে কোথাও আমাদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য যুক্ত করার ক্ষেত্রেও টীকায় 'সম্পাদক' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে।
- কিতাবটিতে বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসৃত হয়েছে।
- যেসব মনীষীর বক্তব্য লেখক উদ্ধৃত করেছেন, পাঠকদের উপকারার্থে টীকায় তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করার পাশাপাশি যেসব গুরুত্বপূর্ণ কিতাবকে তিনি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করেছেন, সেগুলোরও কতকের পরিচয় যুক্ত করা হয়েছে।
- মূল আরবি ফিকহুল বুয়ু কিতাবের একাধিক নোসখা সামনে রেখে কাজ করা হয়েছে। কিতাবটির একাধিক পুরাতন ও নতুন সংস্করণের মধ্যে সর্বশেষ দারুল কলম, দামেশক, সিরিয়া থেকে প্রকাশিত নোসখাকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করা হয়েছে, যাতে কোনো মাসআলায় মুফতি তাকি উসমানি (হাফি.) রুজু করে থাকলে পাঠক সে অনুযায়ীই আমল করতে পারেন। এর আরও একটি কারণ, ফিকহুল বুয়ু'র যে নোসখাটি মাকতাবায়ে মাআরিফুল কুরআন, করাচি, পাকিস্তান থেকে (২০১৫ সালে) প্রকাশিত হয়েছে, সেটির মাঝে বিদ্যমান কিছু ভুল-ভ্রান্তি এই নোসখায় লেখক সংশোধন করে দিয়েছেন। তাই আমরা সংশোধিত এবং পরিমার্জিত নোসখাটি সামনে রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছি।
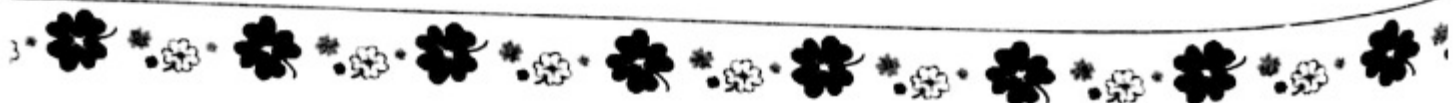
আমরা কিতাবটিকে নির্ভুল করতে সচেষ্ট ছিলাম। তবে আমাদের চেষ্টায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না, এমন অবাস্তব দাবি করার দুঃসাহস করি না। সম্মানিত পাঠক সমীপে আবেদন থাকবে, কোনো ভুল নজরে পড়লে আমাদের অবহিত করার। যাতে আগামী সংস্করণে আরও নির্ভুল ও নিখুঁত কাজ জাতির খেদমতে পেশ করতে পারি। সেই সঙ্গে এই কাজের সঙ্গে পরোক্ষভাবে আমার সদ্যপ্রয়াত আম্মু বিশিষ্ট লেখিকা মুহতারামা উম্মুল হাসানাইন (রহ.) জড়িত ছিলেন। তাঁর জন্য পাঠক সমীপে করজোড়ে দোয়া প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের ইজ্জতের জিন্দেগি ও ইজ্জতের মওতের ফয়সালা করুন। আমিন।

মাওলানা নুরুল হাসান ইবনে মুখতার
সম্পাদক, আনোয়ার লাইব্রেরী,
ঢাকা- ১১০০।
nurulhsn1990@gmail.com
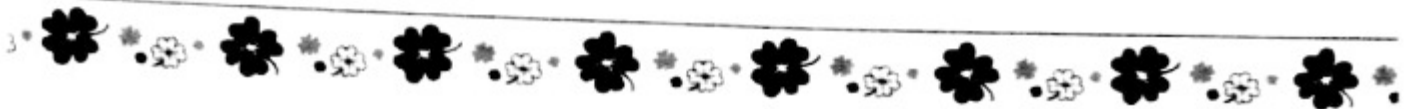
অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد!

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সুদকে হারাম করে ব্যবসাকে হালাল করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি, যিনি সুদের উপত্যকায় হালাল ব্যবসার মাধ্যমে আর্থিক জীবনে সাম্যের কেতন উড্ডীন করেছেন। রহমত বর্ষিত হোক সেসব পূতঃপবিত্র রাসুল পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি, যারা নিজেদের জীবন অপেক্ষা ইসলামি শরিয়তকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে সারা বিশ্বে তার রশ্মি ছড়িয়েছেন।

যেকোনো সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হওয়ার জন্য একটি সাম্যনির্ভর ও সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থব্যবস্থা থাকা জরুরি। মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না, তেমনিভাবে অর্থ ছাড়া মানবজীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবন অর্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জন্মের পরই একটি শিশুর খাবারের প্রয়োজন হয় এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর দাফন পর্যন্ত অর্থ ছাড়া চলতে পারে না। অর্থের উপমা হলো বৃক্ষ বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় পানির মতো। যেমনভাবে স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ পানি একটি বৃক্ষকে বলিষ্ঠ করে তোলে এবং বিষাক্ত পানি তার জীবন কেড়ে নেয়, তেমনিভাবে হালাল অর্থের মাধ্যমে গড়ে ওঠা মানবদেহ ইমানি বলে বলীয়ান হয় এবং হারাম অর্থের মাধ্যমে গড়ে ওঠা দেহ ইমানি বল হারিয়ে মৃতপ্রায় মুমিনে পরিণত হয়। যার প্রমাণস্বরূপ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হারাম সম্পদের মাধ্যমে গড়ে ওঠা দেহ কখনোই জান্নাতে যাবে না, জাহান্নামই তার জন্য উপযুক্ত।'[১]

---

১. আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানি : হাদিস-২৭৩০। হাদিসটির সকল রাবি নির্ভরযোগ্য —আল্লামা হাইসামি। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১০/২৩০)
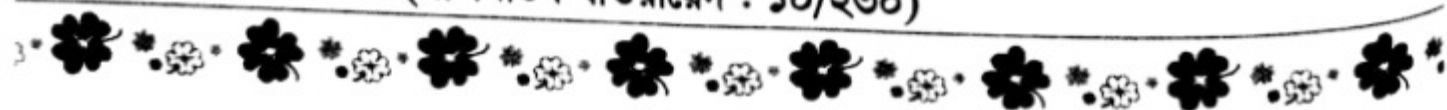
ইসলামি বিধি-বিধানের একটি বড় অংশ দখল করে রেখেছে মুআমালাত তথা লেনদেন। ইবাদতের মতো মুআমালাতকেও মানব জীবনের একটি দায়িত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে রাসুলে আরাবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হালাল রুজি উপার্জন করা সকল মুসলমানের জন্যে অবশ্য কর্তব্য।'[২]

ইসলামি শরিয়তের যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে পরবর্তী কয়েক যুগ পর্যন্ত মানুষের জীবিকা উপার্জনের পদ্ধতি ফিকহে ইসলামিই নির্ধারণ করে দিত। কিন্তু ইসলামি হুকুমতের অনুপস্থিতিতে এবং যুগের পরিবর্তনে এর গতি লোপ পায়, ইতিহাসের পাতাই হয় এর আশ্রয়। ইসলামি ব্যবসায় নীতি যে যুগে মানব জীবনে বাস্তবায়িত ছিল, সে যুগকে অর্থনীতির সোনালী যুগ মনে করা হয়। সম্পদের সাম্যভিত্তিক বণ্টননীতি ও সবার অধিকার রক্ষার ফলে ধনী-গরিবের মধ্যে অযাচিত কোনো পার্থক্য ছিল না। কিছু-কিছু শতাব্দীর ইতিহাস তো এমন বিরল ঘটনার জন্ম দিয়েছে যে, যাকাত নেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। রাষ্ট্রের একটি কুকুর অনাহারে মারা গেলে রাষ্ট্রপ্রধান তার দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভিক্ষুককে ডেকে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার জন্য বরাদ্দের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

কালচক্রের কোনো এক করুণ পরিণতির শিকার হয়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে এবং মানব জীবন থেকে ইসলামি ব্যবসায় নীতিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলা হয়। কারণ, যে কোনো ব্যবস্থা ও দর্শনকে বাস্তব ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখার অর্থ তার গতি রোধ করা এবং কোনো এক কালে তাকে বিদায় জানিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে ইতিহাসের পাতায় লিখে রাখা। বর্তমান যুগে মানব জীবন থেকে ইসলামি ব্যবসায় নীতি দূরে যাওয়ার কারণ এ নয় যে, তা সময়ের অনুপযোগী; বরং তার মূল কারণ হলো, মানব রচিত ব্যবসায় নীতি বাস্তবায়ন করে ইসলামি ব্যবসায় নীতিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। আধুনিক ব্যবসায় নীতি যেসব সমস্যায় জর্জরিত হয়ে সমাজে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করছে, ইসলামি ব্যবসায় নীতি অনেক আগেই সেগুলোর সমাধান দিয়েছে।

---

২. আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানি : হাদিস-৮৬১০; আল-মু'জামুল কাবির : হাদিস-৯৯৯৩। হাদিসটির সনদ হাসান –আল্লামা হাইসামি। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১০/২৯১)
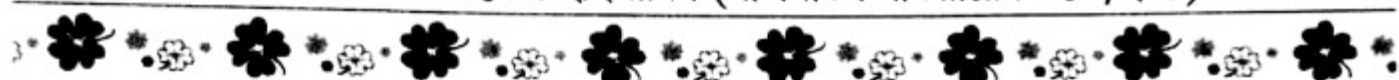
চলমান বিশ্বের অর্থসঙ্কট এবং প্রতিকার নিয়ে পর্যালোচনা করলে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয় যে, সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে বিদায় নিলেও পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থা গুটিকয়েক লোকের স্বার্থ রক্ষায় প্রণীত হয়েছিল। তাদেরই আশীর্বাদপুষ্ট ব্যবসায় নীতির কারণে সমাজ এ করুণ পরিণতির শিকার হয়েছে। এক পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অর্থ সূচকের নিচে থাকা মানুষদের পিষে তাদের শরীরের বিন্দু-বিন্দু রক্ত চুষে আর্থিকভাবে তাদেরকে কঙ্কালে পরিণত করা হচ্ছে। একদিকে পক্ষপাতপুষ্ট ব্যবসায় নীতির মাধ্যমে শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিক না-দিয়ে তার রক্ত নিংড়ানো শ্রম নেওয়া হচ্ছে, অন্য দিকে সুদনির্ভর পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকের পকেটে যাওয়া সামান্য কিছু পয়সাকে ফেরত নেওয়ার জাল বিস্তার করেছে। এসবের কারণে সমাজে নির্যাতিত মানুষের আর্তনাদ, উদ্বাস্তু লোকের কান্নার নোনা জলের বন্যা এবং বিশৃঙ্খলার অনল হাওয়া বইছে।

বর্তমানে ইসলামি ব্যবসায় নীতিকে এমনভাবে এড়িয়ে চলা হচ্ছে যে, পরবর্তী প্রজন্ম ইসলামি অর্থনীতিকে একটি ঐতিহাসিক বিষয় ছাড়া আর কিছুই মনে করার সুযোগ পাবে না। বিশেষ করে সুদি অর্থনীতির বিস্তার ঘটার কারণে অনেকে ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছে। তবে আশার কথা হলো, পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থার দাপটের শিকার সমাজ আজ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, তাদের অর্থনীতিতে সমস্যা রয়েছে এবং তা সংশোধন করা অতি জরুরি। এরচেয়ে বেশি খুশির কথা হলো, পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থার কর্ণধারগণ বলতে শুরু করেছেন যে, তাদের মূল সমস্যা হলো সুদ এবং সেটি দূর করা ছাড়া বিদ্যমান এ সমস্যা থেকে বের হওয়া অসম্ভব।

অর্থনীতির আঙিনায় যখন এমন ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়েছে যে, ইসলামি অর্থনীতি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বৈ কিছুই নয়, তখন ইসলামি অর্থনীতিকে সমকালের সঙ্গে সমন্বয় করে উম্মতের সামনে পেশ করার জন্য আল্লাহ তাআলা লেখককে যে যোগ্যতা ও প্রতিভা দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। ইসলামি অর্থনীতির এমন কোনো দিক নেই, যে বিষয়ে আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি (হাফিযাহুল্লাহ) কলম ধরেননি। আধুনিক পরিভাষার সঙ্গে নববি যুগের ইসলামি পরিভাষার সমন্বয় করে এমনভাবে ইসলামি অর্থনীতিকে পেশ করেছেন, যা অধ্যয়ন করামাত্র উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট যুগের জন্য আসেনি; বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের জীবন বিধান হিসাবেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। সেইসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের
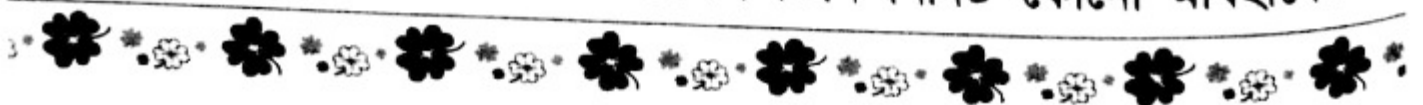
মধ্যে না-থেকে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের আলোকে আলোচনা সাজিয়েছেন। তার এ বিশেষত্বের কারণে রচনাটি নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা মহাদেশের সমাধান কেন্দ্রিক না-হয়ে সারা বিশ্বের ইসলামি অর্থনীতির জন্য পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনার সারনির্যাসে রূপ নিয়েছে।

ইসলামি ব্যবসায় নীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের অনেক রচনা থাকলেও, আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি (হাফি.)-এর কিতাবটি অন্যান্য কিতাবের চাহিদা মেটাতে সক্ষম বলে আমার বিশ্বাস। এতে অতীতের বিভিন্ন ফতোয়া ও মাসআলার মূল কারণ ও রহস্য আলোচনা করে তার আলোকে আধুনিক সমস্যার সমাধান করার জন্য তিনি যে প্রচেষ্টা করেছেন, তার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। আলোচনার ধারাকে তিনি এমন ভাষা ও পরিভাষার মাধ্যমে সাজিয়েছেন, যা একজন বিজ্ঞ আলেম ও সাধারণ পাঠক উভয়ের জন্য বুঝতে সহজ হবে। ইতঃপূর্বে ইসলামি অর্থনীতির অনেক আলোচনা চোখে পড়লেও এটির চেয়ে অন্য কোনো আলোচনাকে এতটা তৃপ্তিদায়ক ও সফল বলে আমি দেখতে পাইনি। যে কারণে কিতাবটির অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে বিজ্ঞ লেখকের ইলম পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে সাধ্যানুযায়ী লেখকের প্রতিটি আবেদন বহাল রাখার চেষ্টা করেছি। তারপরও মানুষমাত্রই ভুল হয়ে থাকে, তাই আমার অযাচিত ভুলের জন্য বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর ভুল সম্পর্কে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সুধরে নেওয়ারও অঙ্গীকার করছি।

রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুপরিচিত ***আনোয়ার লাইব্রেরী*** কর্তৃপক্ষ বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন–আমিন।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সবার শ্রমকে কবুল করেন এবং আমাদের আমলের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে পরকালে নাজাতের ফয়সালা করেন। আমিন।

বিনীত

মুহাম্মাদ ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন

২৭ ই রবিউস সানি ১৪৩৭ হিজরি

৭ ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

eliasbinalauddin@gmail.com

ভূমিকা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد!

ব্যাবসায়িক লেনদেনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলি সুচারুরূপে বর্ণনা করা, প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও ভারসাম্য বজায় রাখা এবং ব্যক্তি ও জাতীয় কল্যাণের মাঝে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে ফিকহে ইসলামি অন্যসব আইনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ। একইভাবে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সমস্যাবলির বিশ্লেষণ এবং এ-বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলির আধিক্যের বিবেচনায় ইসলামি ফিকহ অন্যসব আইনের তুলনায় উন্নততর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কারণ, ফিকহে ইসলামি পবিত্র কুরআনের 'মাতলু'[৩] ও সুন্নাহর 'গাইরে মাতলু'[৪] রূপে ইলমে ওহি থেকে উৎসারিত। এক দিক থেকে এটা আসমানি হেদায়াতের নুর, অপর দিক থেকে ফুকাহায়ে কেরামের সূক্ষ্ম দর্শনের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। সে নুর থেকেই আমাদের ব্যাবসায়িক জীবনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার দিক-নির্দেশনা গৃহীত হয়েছে।

---

৩. **মাতলু :** শাব্দিক অর্থ : তেলাওয়াতকৃত; পঠিত; পাঠ্য। পারিভাষিক অর্থ : এমন ওহি, যার শব্দ ও মর্ম উভয়ই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নাযিলকৃত ও নির্ধারিত এবং যা তেলাওয়াত করা ইবাদত হিসাবে গণ্য। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহ। কারণ, এর শব্দ ও মর্ম উভয়ই আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন এবং এটি তেলাওয়াত করাকে ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছেন। —সম্পাদক

৪. **গাইরে মাতলু :** শাব্দিক অর্থ : যা তেলাওয়াতকৃত বা পঠিত নয়। পারিভাষিক অর্থ : এমন ওহি, যার মর্ম আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নাযিলকৃত ও নির্ধারিত এবং যা তেলাওয়াত করা বা পাঠ করা স্বতন্ত্র ইবাদত হিসাবে গণ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদিসসমূহ। কারণ, এর শব্দ আল্লাহ তাআলা নাযিল করেননি। শব্দ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিজের পক্ষ থেকে প্রদত্ত। তবে এর মর্ম ও অর্থ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। পাশাপাশি হাদিসের শব্দ পাঠ করা, স্বতন্ত্র কোনো ইবাদত হিসাবে গণ্য নয়; যদিও ইলমে দীন শেখার জন্য হাদিস পাঠ করা ইবাদত। কিন্তু কুরআনের প্রতিটি অক্ষর পাঠে যেমন দশ-দশ করে নেকি পাওয়া যায়, হাদিসের বিষয়টি এমন নয়। —সম্পাদক

সমগ্র বিশ্বে পশ্চিমা দখলদারির প্রভাব সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে বহু শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামি ফিকহ-ই ছিল প্রচলিত আইন। পশ্চিমারা ফিকহে ইসলামিকে ব্যবহারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আদালতে বিচারের জন্য পশ্চিমা আইনকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছে– যাতে বিচারকগণ সে আইনে রায় দেন, শিক্ষার্থীরা সে আইনেরই শিক্ষা গ্রহণ করেন, লেখকগণ সে সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করে এবং গবেষকেরা তা নিয়েই গবেষণায় লিপ্ত থাকেন।

এই পরিস্থিতি ফিকহে ইসলামির উপর দুটি নেতিবাচক পরিণতি বয়ে এনেছে–

এক. ব্রিটিশ আইন ফিকহে ইসলামির ক্রমবিকাশকে পুরোপুরি থামিয়ে দিয়েছে অথবা কমপক্ষে পিছিয়ে দিয়েছে। এটা এভাবে– যে কোনো আইনের ক্রমবিকাশ ঘটে বাস্তবক্ষেত্রে তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে। জীবন চলার পথে মানুষকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, মানব জীবনের ক্রমবিকাশমান পদ্ধতিগুলো সেসবেরই সমাধান খোঁজ করে। সুতরাং প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র ও আইন প্রণেতাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতাপ্রাপ্তি অনুপাতে আইনের ক্রমবিকাশ ঘটে। যেসব যুগে ইসলামি রাষ্ট্রে ফিকহে ইসলামি প্রচলিত আইন হিসাবে বিদ্যমান ছিল, সে যুগে এর বাস্তবতা দেখা গেছে। তখন ফুকাহায়ে কেরাম যুগের প্রয়োজন পূরণে একদিকে যেমন কুরআন-হাদিসের সর্বজনস্বীকৃত চিরন্তন মূলনীতি সংরক্ষণ করেছেন, অন্যদিকে যুগ-চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে ফিকহে ইসলামির ক্রমবিকাশ ঘটাতেও কোনো ক্রটি তাঁরা করেননি।

কিন্তু যখন মানব জীবনের বাস্তবক্ষেত্র থেকে ফিকহে ইসলামিকে সরিয়ে দেওয়া হলো, তখন তার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির ধারাও থেমে গেল। অনেক ক্ষেত্রে ফিকহে ইসলামির কিতাবসমূহ মানব জীবনের নবসৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার স্পষ্ট সমাধান দিতে অক্ষম হয়ে পড়ল।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক যুগ ও এলাকায় সবসময় এমন কিছু লোক ছিল, যারা সাধ্যানুযায়ী শরিয়তকে তাদের জীবনে শতভাগ বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে। নিত্য-নতুন বিষয়ে তারা মুফতিদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। প্রত্যেক যুগ ও এলাকার ফুকাহায়ে কেরাম ও মুফতি সাহেবান সেসব প্রশ্নের উত্তর হিসাবে ফতোয়া দিয়েছেন। এরই মাধ্যমে ফিকহে ইসলামির ক্রমবিকাশ চলমান ছিল। কিন্তু এগুলো সবই ছিল একক প্রচেষ্টা। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সীমানার লোকেদের ভাগ্যেই শুধু এই সুযোগ

মিলত। এর বিপরীতে বিশাল জনগোষ্ঠী মানব-রচিত আইনের উপর নির্ভর করেই জীবন পরিচালনা করত।

দুই. ফিকহে ইসলামিকে বাস্তব জীবন থেকে দূরে রাখার দ্বিতীয় পরিণতি হলো, আইন প্রণেতাদের দৃষ্টি হতে এবং বাস্তবক্ষেত্রে ইসলামি ফিকহ প্রয়োগে আগ্রহীদের কাছে এ বিশাল সম্পদ অগোচরে রয়ে গিয়েছিল। ফলে, তাদের সামনে মানব রচিত পশ্চিমা আইন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফলে সেটিই তাদের পাঠ্যসূচি, গবেষণার ক্ষেত্র, মর্যাদার শীর্ষস্থান ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের একক পদ্ধতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অপরদিকে ফিকহে ইসলামি তো প্রথমত তারা জানতই না। দ্বিতীয়ত ফিকহে ইসলামির মূল্যবান কিতাবসমূহ তাদের দৃষ্টিগোচর হলেও এগুলোর বর্ণনাশৈলীর সঙ্গে পরিচিত ছিল না। বিধায়, তারা আধুনিক জীবনের সমস্যার কোনো সমাধান এতে খুঁজে পায়নি। অপরদিকে ফিকহের 'আম উসুল' (ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য মূলনীতিসমূহ) থেকে বিভিন্ন শাখাগত মাসআলার হুকুম বের করার সামর্থ্যও তাদের ছিল না। ফলে তারা বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, ফিকহে ইসলামি ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পাওয়া একটি অতীত কাহিনীমাত্র। কালের আবর্তনে আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, সেসবের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই।

সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্রগুলো যখন তাদের সীমানায় ইসলামি শরিয়ত বাস্তবায়নের জন্য মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানাল, তখন যারা মানব-রচিত আইনের দূর্গে লালিত-পালিত হয়েছে এবং উপর্যুক্ত কারণে ফিকহে ইসলামি যাদের অগোচরে রয়েছে, তারা অনেক ক্ষেত্রে এ কথা বলে বিপরীত পক্ষে অবস্থান নিল যে, শরিয়তে ইসলামির বিধান বাস্তবায়ন করলে তা মানবসমাজে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে। আধুনিক যুগে কীভাবে সেসব আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব, যা প্রণীত হয়েছে চৌদ্দশত বছর আগে? এটা কীভাবে কল্পনা করা যায় যে, কোনো আইন স্বস্থানে বহল থাকবে এবং যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে না?

বাস্তবতা হলো, ইসলামি শরিয়ত মানব জীবনকে কোনো যুগে কিংবা ভূখণ্ডে বিকাশিত হতে বাধা দেয় না; অথচ তা স্থিতি ও পরিবর্তনের মধ্যে সমন্বয় করে এমন একটি অবস্থান সৃষ্টি করে, যা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য বয়ে আনে প্রভূত কল্যাণ।

ফিকহে ইসলামিতে শরয়ি নসের (কুরআন-হাদিস) ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন মাসআলা বের করার ধারাবাহিকতাকে বহাল রাখা হয়েছে। বিশেষত চার মাযহাবের (হানাফি,
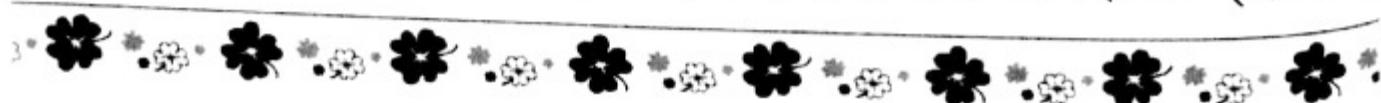
শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলি) প্রত্যেকটিরই বিশাল ও স্বতন্ত্র সংকলন রয়েছে, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফিকহের বিধি-বিধান উদ্ঘাটন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন ও তাঁদের পরবর্তীদের ফতোয়া ও বিভিন্ন বিচারিক সিদ্ধান্তকেও সামনে রাখা হয়েছে। উপর্যুক্ত মাযহাবগুলো ছাড়া অন্য কোনো মাযহাবে[৫] শাখাগত মাসআলার এত বিস্তারিত সংকলন পাওয়া যায় না।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব মাযহাবের পরস্পরের মধ্যে কখনো-কখনো এমন অনেক 'মুনাকাশা' (বিতর্ক) হয়েছে, যেগুলোকে সেসময় বাড়াবাড়ি বলে গণ্য করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন অনেক ইলমি 'মুনাযারা'ও হয়েছে, যা ক্ষেত্রবিশেষে সীমা অতিক্রমও করেছে। কিন্তু ফিকহের ক্রমোন্নতি ও গবেষণার অঙ্কুরোদ্গমকালে এগুলো ছিল স্বাভাবিক বিষয়, যাতে মাসআলা যাচাই ও পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রত্যেকে নিজ-নিজ মত প্রকাশের সুযোগ পায়। কিন্তু অনন্তকালের জন্য এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়নি যে, প্রত্যেকে অন্যকে ভ্রান্ত ও গোমরাহ বলে গালমন্দ করতে থাকবে। তবে কিছু গোঁয়ার টাইপের লোকেদের কথা ভিন্ন, যাদেরকে ইসলামি ইতিহাস এড়িয়ে চলেছে, নিন্দা করেছে এবং প্রত্যেক মাযহাবের উলামায়ে কেরাম তাদেরকে হিসাবের বাইরে রেখেছেন।

একটি সর্বজনস্বীকৃত কথা হলো, এসব ফিকহি মাযহাব এমন কোনো দীন বা ধর্মের নাম নয়, যারা প্রত্যেকে অন্যকে বাতিল ও ইসলামি শরিয়তবিরোধী

---

৫. এর অর্থ হলো, কালপরিক্রমায় যদিও আমরা এখন শুধু চার মাযহাবেরই অস্তিত্ব লক্ষ করছি, কিন্তু একসময় এগুলো ছাড়াও আরও অনেক মাযহাব মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। যেমন, মাগরিবে (মরক্কো, আন্দালুসিয়াসহ উত্তর আফ্রিকা) আবদুর রাহমান আল-আওযায়ি (রহ.)-এর মাযহাব, বাগদাদে দাউদ ইবনে আলি যাহেরি (রহ.)-এর মাযহাব, মদিনায় সায়িদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.)-এর মাযহাব প্রভৃতি। এ ছাড়াও যাঁদের স্বতন্ত্র মাযহাব ছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব, আলি ইবনে আবি তালিব, আবু মুসা আল-আশআরি, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, বারা ইবনে আযেব, আনাস ইবনে মালেক (রাদিআল্লাহু আনহুম), আবিদাহ আস-সালমানি, মুজাহিদ ইবনে জাব্‌র, সায়িদ ইবনে জুবায়ের, হাসান আল-বসরি, আমের আশ-শা'বি, আবদুর রাহমান ইবনে আবি লাইলা, লাইস ইবনে সা'দ, ইবনে হাযম যাহেরি, সুফিয়ান সাওরি, আবু সাওর, মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন, রাবিয়া ইবনে আবদুর রাহমান-যিনি রাবিয়াতুর রাই নামে মশহুর ছিলেন-, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ্ (রাহিমাহুমুল্লাহু তাআলা আজমায়িন) প্রমুখ। এজন্যই ফিকহ ও ফিকহভিত্তিক হাদিসের কিতাবসমূহে এইসব ইমামের মাযহাব অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হতো, যা আজও আমাদের সামনে বিদ্যমান। (দ্র. সুনানে তিরমিযি, নুখাবুল আফকার শারহু শারহি মাআনিল আছার প্রভৃতি) –সম্পাদক
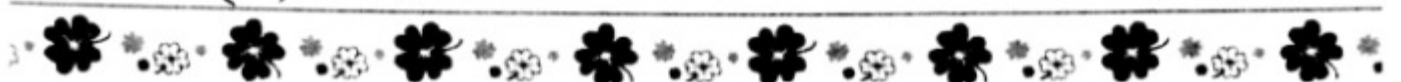
হওয়ার অভিযোগ করে; বরং এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে ইসলামি শরিয়তের একাধিক ব্যাখ্যা করা ও ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহে স্পষ্টভাবে যেসব বিধান ও মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে তারা এবং সর্বযুগের উম্মতে মুসলিমাও একমত। কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এসব নসের (দলিল) ব্যাখ্যায় তাদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে তার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন শাখাগত মাসআলার বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে মতদ্বৈততা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, অপর পক্ষের মতটিও সহিহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেটি নিরেট বাতিল নয়। এ স্বীকারোক্তির কারণেই অনেক সময় জনসাধারণ বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে বা তাঁদের দৃষ্টিতে যে ইল্লাতের (কার্যকারণ) ওপর হুকুম নির্ভরশীল ছিল, তা না থাকার কারণে অনেকে নিজের মত বাদ দিয়ে অন্য মাযহাবের মতও গ্রহণ করে থাকেন। এ কারণে শরয়ি 'মাসলাহাত' উদ্ঘাটন ও নতুন আইন প্রণয়নে বোঝাপড়া করার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে চূড়ান্ত নমনীয়তা দেখা যায়।[৬]

বিশেষত আর্থিক লেনদেনের মাসআলায় তাদের এ নমনীয়তা আরও বেশি স্পষ্ট। কেননা, এ সম্পর্কিত অপরিবর্তনীয় মৌলিক নসসমূহ প্রমাণিত হওয়ার পর বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য বিস্তৃত ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন বর্ণনাশৈলীর ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম নিজেদের মেধা কাজে লাগিয়েছেন। সেসব নসের আলোকে যতগুলো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে তার সবগুলোই ফুকাহায়ে কেরাম পেশ করেছেন।

এ কথা তো বলতেই হবে, নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ করা অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবনকে সুশৃঙ্খল করতে ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে দূরে রাখতে বড় ভূমিকা রাখে। কিন্তু এটিও স্বীকৃত যে, এসব মাযহাবের প্রত্যেকটি কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যায় এমন ব্যাপক অবস্থান সৃষ্টি করেছে, যা ক্রমপরিবর্তিত জীবন পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন বোঝাপড়া করার সুযোগ করে দেয়। কারণ, তাদের প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে একমত, ইজতিহাদি বিষয়ে বিচারকের প্রদত্ত রায় সে এলাকার ফিকহি মাযহাবের বিপরীত হলেও তা সবার জন্য সমভাবে কার্যকর।

---

৬. আমি আমার 'উসুলুল ইফতা ও আদাবুহু' কিতাবে বলেছি, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় নির্দিষ্ট মাযহাব গ্রহণ করা জরুরি। কিন্তু তার উদ্দেশ্য এ নয় যে, অন্যান্য ফিকহি মাযহাবকে বাতিল সাব্যস্ত করতে হবে। অন্যান্য মাযহাব গ্রহণ করার আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছি।

এ থেকে বোঝা যায়, যতদিন এসব মূলনীতি এবং চিরন্তন বিধি-বিধান বহল থাকবে, ততদিন জীবন পরিচালনার মূল নির্দেশক হিসাবে ফিকহে ইসলামিকে গ্রহণ করা এবং ব্যবসায় ও অর্থনীতির বাস্তবিক প্রয়োজনে একে মূলনীতি হিসাবে মেনে নেওয়ার পথে কোনো প্রতিবন্ধক থাকবে না। কারণ, এখানে পরিবর্তনশীল জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানপ্রাপ্তির জন্য মানব-মেধা প্রয়োগের বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রস্তুত রয়েছে।

তবে বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মৌলিক ফিকহ সংকলন করা, বিশেষত ব্যাবসায়িক ও আর্থিক লেনদেনের ফিকহ সংকলন করে সমকালীন পরিস্থিতি ও নবসৃষ্ট পরিবেশের সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটানো। যাতে মানুষের সামনে প্রমাণিত ও স্পষ্ট হয় যে, ফিকহে ইসলামি প্রথম শতাব্দীর মতোই পঞ্চদশ শতাব্দীরও উপযোগী। পাশাপাশি এগুলোকে এমন বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে বিন্যস্ত করা আবশ্যক, যা যুগ-চাহিদার সঙ্গে মিল রাখে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আয়ত্ব করা সহজ হয়।

সময়ের এই দাবির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার তৌফিকে এ গ্রন্থটি লিখতে শুরু করি। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি, যাতে এ কিতাবটি সে প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি এতে চার মাযহাবের ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ক অধ্যায়ের মৌলিক মাসআলাগুলোকে বর্তমান সময়ের আধুনিক সমস্যার সঙ্গে সমন্বয় করে এমনভাবে সংকলন করা হয়েছে, যাতে এটি এ বিষয়ের একটি মৌলিক কিতাবে পরিণত হয় এবং দৃষ্টান্ত প্রদান, শাখাগত মাসআলা উল্লেখ করা এবং মাসআলার বাস্তবায়ন ও বিন্যাস-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এটি আধুনিক পদ্ধতি সম্বলিত গ্রন্থে পরিণত হয়।

ইজতিহাদি বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের যুক্তি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরামের জ্ঞানগত গভীরতার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেই আমি ফিকহ অধ্যয়ন শুরু করেছি। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি শুরু করার পর আমার কাছে তাদের গবেষণার গভীরতা ও জ্ঞানের ব্যাপকতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। যা আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, আমি এক অকূল দরিয়ায় সাঁতার কাটছি। তা ছাড়া আমি যেহেতু দীর্ঘদিন যাবৎ মানব রচিত আইন অধ্যয়ন করেছি, উচ্চ আদালতের বিচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার পাশাপাশি ব্রিটিশ আইন ও তার ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করেছি, আইনজীবীদের জেরা শুনেছি, সেহেতু সেগুলোকে ফিকহে ইসলামির সঙ্গে সমন্বয় করা আমার জন্য খুবই সহজ হয়েছে। এ কারণে আমার কাছে এ কথাটি খুবই স্পষ্ট হয়েছে যে, বহুদিক বিবেচনায় ফুকাহায়ে কেরামের গবেষণা ও প্রচেষ্টা অনেক উর্ধ্বে।

মানব রচিত আইনের একটি বড় অংশই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আইনের মৌলিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ। আর তার অধীনে শাখাগত বিষয়গুলোর অবস্থা হলো, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে আদালতে উত্থাপিত মামলার ওপর নির্ভর করে ব্যাখ্যাকারগণ তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে থাকেন। আদালত উভয়পক্ষের আইনজীবীদের প্রমাণসমূহের কোনো একটির উপর রায় দেন, যা বিচারকদের সমন্বিত আইনে পরিণত হয়। আইনের ব্যাখ্যাকারগণ প্রত্যেকটি ধারার অধীনে সেসব বিচারের বর্ণনা দিয়ে থাকেন। তাতে তাদের পক্ষ থেকে শাখাগত কোনো উদাহরণের উল্লেখ থাকে না।

যারা ফিকহে ইসলামি সংকলন করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন এবং সে ব্যাপারে চূড়ান্ত আলোচনা করেছেন। এ কারণে তাদের যুগে এমন কোনো বিষয় ছিল না, যে সম্পর্কে তাদের আলোচনা নেই। বরং অনেক সময় তো মানুষ এই ভেবে পেরেশান হয় যে, ফুকাহায়ে কেরাম এমনসব শাখাগত মাসআলারও আলোচনা করেছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে যা একেবারে বিরল। অনেক সময় এসব শাখাগত মাসআলা কোনো কাজির সিদ্ধান্ত বা মুফতির ফতোয়া থেকেও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই তাঁদের নিজেদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরও অবাক-করা ব্যাপার হলো, এসব ফিকহ-বিশারদ এক এলাকায় বসবাস করতেন না। তাদের অনেকে আরববিশ্বে, অনেকে বহু দূরের আফ্রিকা মহাদেশের শেষ প্রান্তে, অনেকে ইরাক, মিশর বা পারস্যে আবার অনেকে বসবাস করতেন মধ্য এশিয়ায়। অথচ তাদের প্রত্যেকে একই মাসআলা নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং এমন যুগে অন্যদের মতামতও জেনেছেন, যখন ফোন, বেতার বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মতো যোগাযোগের কোনো আধুনিক মাধ্যমও ছিল না। তখনকার সময়ে কোনো কিতাবে বিস্তারিত কোনো বিষয়-সূচি (ইনডেক্স) পাওয়া যেত না, এমনকি মুদ্রিত কোনো কিতাবও ছিল না। তারা যেসব কিতাব অধ্যয়ন করেছেন, সেগুলো ছিল সূচিপত্র ও নম্বরহীন।

এ ধরনের পরিবেশে অবস্থান করে তাঁরা যা সংকলন করেছেন, বর্তমান সময়ের মতো দ্রুত যোগাযোগ মাধ্যম, উপকরণের আধিক্য, যথেষ্ট পরিমাণ মুদ্রিত কিতাব ও প্রতিটি কিতাবের সূচিপত্র থাকার পরও আমরা তার কাছেও ভিড়তে পারব না।

এর চেয়ে আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সেসব মতনের (মূল) কিতাবের প্রণেতাগণ। যাঁরা বিভিন্ন মাসআলার বিস্তারিত বিবরণকে এমন সংক্ষিপ্ত

ইবারতে (ভাষ্য) একত্রিত করেছেন, যার প্রতিটি শব্দই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মর্মবাহী ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

আমি সুপ্রিম কোর্টের শরয়ি বিভাগের একজন বিচারক ছিলাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাকে মানব রচিত আইনের ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হতে হয়েছে দুটি কারণে: এক. তার কোনো আইন শরিয়তের মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক না-হলে তা বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দেওয়া। দুই. আমাকে এই ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল যে, আমি সেই আইনের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত দিতে পারতাম যে, এটা ইসলামি শরিয়তের পক্ষে, না কি তার বিপক্ষে, যার ফলে সেটি বাতিল করার রায় দিতাম।

এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমি সেসব সহকর্মীদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি, যাদের মেধা-মনন মানব রচিত আইনের পরিবেশেই লালিত-পালিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এসব পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমি কিছু-কিছু আইনের এমন ব্যাখ্যা পেশ করতাম, বাহ্যদৃষ্টিতে যা মূল আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে হতো। কিন্তু আমার আলোচনা শোনার পর তারা আমার ব্যাখ্যা অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। যেমন, একবার তো প্রধান বিচারপতি বলেই ফেললেন, 'ইনি তো অনেক সময় আমাদের আগেই আইন বুঝে ফেলেন!' তাঁর এই মন্তব্যের উত্তরে তাদের একজন বলেছিলেন, 'কারণ, তিনি আইন নিয়ে পড়াশোনা করে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন।' তার এ কথার উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'কেবল আইনের ওপর ডিগ্রি অর্জন করার কারণেই আমার এ অভিজ্ঞান তৈরি হয়নি; বরং ফিকহে ইসলামি অধ্যয়নের ফলেই এটি হয়েছে।' আমার এ উত্তরটি ছিল খুবই বাস্তবসম্মত এবং আজও এর উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

যা হোক, ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য লেনদেন সম্পর্কিত মাসায়েলের দীর্ঘ অধ্যয়ন পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরাম সম্পর্কে আমার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে। এ কারণে তাঁদের উচ্চ মর্যাদা, পর্বতসম সাহসিকতা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির সামনে নিজেকে সমর্পণ করেছি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের ওপর নিজ রহমত বর্ষণ করুন, তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

বর্তমান সময়ে মানুষ ইজতিহাদের আবশ্যকতা উপলব্ধি করছে। কিছু লোক তো বলা শুরু করেছে যে, هم رجال ونحن رجال 'তারা মানুষ ছিলেন, আমরাও তাদের মতোই মানুষ'। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের মধ্যে এমন কেউ দাবি করতে পারেনি, যে পূর্ববর্তীদের ইজতিহাদের সহযোগিতা ছাড়া সম্পূর্ণ নতুন ইজতিহাদের মাধ্যমে পবিত্রতার অধ্যায় থেকে ফারায়েয পর্যন্ত বিস্তারিত ফিকহ সংকলন করতে সক্ষম।

আমার উদ্দেশ্য কখনোই এটা নয় যে, আমি আকাবির-আসলাফকে সব ধরনের ক্রটিমুক্ত বলে মনে করি।

فكل يؤخذ من رأيه ويترك، إلا صاحب هذا القبر.

'যে কারণে প্রত্যেকেরই কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, আর কিছু হয় বর্জিত। তবে এই কবরে শায়িত ব্যক্তির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সব কথাই অবশ্যগ্রাহ্য।'এটি ইমাম মালেক (রহ.)-এর উক্তি।[৭]

কিন্তু 'ইমামগণ তো মাসুম (ক্রটিমুক্ত) নন, অনেক সময় এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যারা এই দাবি করছে, তারা একেবারে মাসুম। তাদের নিজেদের কোনো ভুল হতে পারে না। নিঃসন্দেহে ইজতিহাদি বিষয়ে মতানৈক্য করার সুযোগ রয়েছে। তবে যারা এইসব মহামানবদের ইলম থেকে উপকৃত হয়েছেন, তাদের দায়িত্ব হলো, তাঁদের কোনো সিদ্ধান্তকে ভুল আখ্যা দেওয়ার আগে, এই সিদ্ধান্ত দিতে গিয়ে তাঁরা যে শ্রম-ঘাম ব্যয় করেছেন, সেটা ভুলে না যাওয়া। তাঁদের উচ্চ মর্যাদার স্বীকারোক্তি প্রদান করা এবং সেসব ফিকহ-বিশারদের মতামতকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে নিজের মতকে সকল দলিল-প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া।

এ কিতাবে আমি যা কিছু লিখেছি, তা একটি সমুদ্রের কয়েক ফোঁটা পানির মতো, যা নতুন বিন্যাসে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর সঙ্গে সামান্য এমন কিছু বিষয় সংযোজন করেছি, যা তাঁদের সেই সমুদ্রসম ইলমের কয়েকটি ফোঁটা থেকে জন্ম নিয়েছে এবং যা বর্তমান যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এসব আলোচনার ক্ষেত্রে আমি নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেছি–

১. কিতাবটিতে চার মাযহাবের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত মৌলিক মাসআলাসমূহ সংকলন করতে চেয়েছি। প্রথমত যার উদ্দেশ্য হলো, কিতাবটি যাতে সব মাযহাব অনুসরণ করার ব্যাপারে যথাসম্ভব সহযোগী হয়। দ্বিতীয়ত, যেন শরিয়তের আইন-কানুন বিশুদ্ধভাবে সবধরনের সম্ভাব্য ব্যাখ্যার সঙ্গে আলোচিত হয়, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন মাসআলায় দৃষ্টিভঙ্গিগত যে মতানৈক্য রয়েছে, সে সম্পর্কে অবগতি প্রদান করা যায় এবং আল্লাহ তাআলার তাওফিকে যদি কোনো দেশ ইসলামি শরিয়তের আদলে ব্যবসায় নীতি বাস্তবায়ন করতে চায়, সেক্ষেত্রে এ কিতাব যেন সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

---

৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৯৩; তা'বিলু মুখতালাফিল হাদিস, ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারি (মৃ. ২৭৬ হি.), পৃষ্ঠা-২১ –সম্পাদক
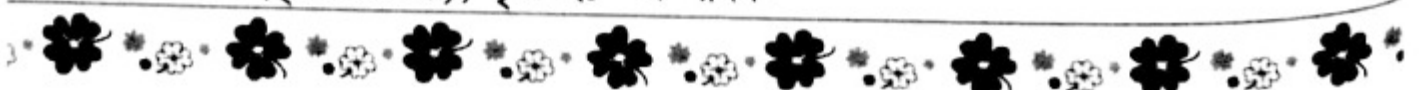
পূর্বেই আমি বলে এসেছি যে, ফিকহি মাযহাবগুলির সবগুলোই যেহেতু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তাই অধিকাংশ মাসআলায় তাঁদের দলিল বর্ণনা করেছি কিন্তু 'তারজিহ'[৮] দিইনি। তবে খুব অল্পসংখ্যক কিছু মাসআলা রয়েছে, যেগুলোকে কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে হওয়ায় সেগুলোর ক্ষেত্রে 'তারজিহ' উল্লেখ করেছি। কিংবা কখনো এমন হয়েছে যে, কোনো একটি মাযহাব বর্তমান যুগের সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হিসাবে পেয়েছি, তাই সেটিকে অন্য মাযহাবগুলোর (মত) ওপর প্রাধান্য দিয়েছি। তবে আহলে ইলমের জন্য কোনো একটি মতকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নমত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

২. অনুরূপভাবে অধিকাংশ জায়গায় ফিকহে ইসলামি-কে ব্রিটিশ আইনের সঙ্গে তুলনা করেছি। অনেক জায়গায় ফরাসি বা সুইস আইনের সঙ্গেও তুলনা করেছি। তুলনা করার প্রথম উদ্দেশ্য হলো, প্রচলিত নাগরিক আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক আইনের ব্যাপারে মুসলিমদের সতর্ক করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ইসলামি ও পুঁজিবাদি অর্থনীতির মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা এবং ইসলামি শরিয়তে আল্লাহ তাআলা যে অজস্র হেকমত ও কল্যাণ নিহিত রেখেছেন, তা স্পষ্ট করা।

৩. প্রত্যেক অধ্যায়ের আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত সমকালীন মাসআলাসমূহ সবিস্তারে আলোচনা করেছি। সেগুলো ইসলামি ফিকহের আলোকে বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য সব পদ্ধতি উল্লেখ করেছি। কখনো-কখনো এসব ক্ষেত্রে সমকালীন আলেমদের মতামতও উল্লেখ করেছি এবং আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, তাও উল্লেখ করেছি।

৪. কিতাবটি 'মানতেকি' বিন্যাসে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি, যেন সহজেই কাঙ্ক্ষিত বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়। ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে শুরু করে এর রুকন, ইজাব-কবুল, মৌখিক ইজাব-কবুল ব্যতীত হাতে-হাতে লেনদেনের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি আলোচনা করেছি। এরপর ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি প্রদান, ইজাব-কবুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত 'আরাবুন' ইত্যাদির আলোচনার মধ্যে নিলাম ও টেন্ডারের আলোচনাও করেছি।

এসব আলোচনার পর ক্রেতা-বিক্রেতার বিধান, তাদের সন্তুষ্টির

৮. গ্রহণযোগ্য দলিলকে প্রাধান্য দেওয়া।

আবশ্যকতা ও কী-কী কারণে সন্তুষ্টির অনুপস্থিতি গণ্য করা হয়, কোন ধরনের মাসআলা এই মৌলনীতি বহির্ভূত, তার আলোচনা করেছি। এরপর পণ্যসংক্রান্ত বিধি-বিধান ও তার শর্তসমূহ, মূল্যসংক্রান্ত বিধি-বিধান ও তার শর্তসমূহ, মূল্য পরিশোধের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করার পর বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য মূল চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ উল্লেখ করেছি। তারপর নগদ, বাকি, বাইয়ে সালাম, অর্ডার, মুরাবাহা, তাওলিয়্যাহ, মুকাইয়াযাহ, বিক্রয়ের সুদ, বাইয়ে সরফ, চূড়ান্ত সহিহ বিক্রয়, এখতিয়ারযুক্ত বিক্রয়, বাতিল, ফাসেদ, মওকুফ (মুলতবি) ও মাকরুহ বিক্রয়ের প্রকার উল্লেখ করে প্রত্যেকটির বিধি-বিধান আলোচনা করেছি। স্বাধীন বিক্রয়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের আলোচনায় বাজার দর নির্ধারণ করে দেওয়া, মজুতদারি ইত্যাদির হুকুম বর্ণনা করেছি এবং অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সর্বশেষ আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রচনা করে 'ইকালা'র (বিক্রয় উইদড্র করা) মাধ্যমে আলোচনা শেষ করেছি।

৫. অতিসংক্ষিপ্ততা বা বিরক্তিকর দীর্ঘতা পরিহার করে সহজভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। এ জন্য মাসাদির (রেফারেন্স) থেকে উদ্ধৃত ফিকহি আলোচনার সহজবোধ্য সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করেছি। তারপরও কিছু-কিছু জায়গায় আহলে ইলমের খেদমতে মূল তথ্যসূত্র থেকে হুবহু বক্তব্যও পেশ করেছি।

৬. কিতাবের শেষাংশে ইসলামি ব্যবসায় নীতির পরিভাষাসমূহ উল্লেখ করেছি। যার উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে যদি কোনো রাষ্ট্র ইসলামি ব্যবসায় নীতি বাস্তবায়ন করতে চায়, তারা যেন সেখান থেকে সহযোগিতা নিতে পারে।

এসব কিছুর পরও আমি স্বীকার করছি যে, আমার চেষ্টার পরিমাণ অনেক কম। সুতরাং এখানে উপকৃত হওয়ার মতো কিছু থাকলে তা কেবল আল্লাহ তাআলার তৌফিকের কারণে হয়েছে। কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা আমার পক্ষ থেকে ও শয়তানের প্ররোচনায় হয়েছে। এ কিতাবে যেহেতু এমন অনেক আধুনিক সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে, কুরআন-সুন্নাহ ও গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহে যার স্পষ্ট বর্ণনা নেই, তাই সেসব সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও স্পষ্টকরণে আমি আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। তারপরও সেসব গবেষণা একজন মানুষেরই কর্ম, যা ভুল ও সঠিক উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে। কাজেই এ আশায় সেগুলোকে আহলে ইলমের সামনে পেশ

করছি, যাতে তাঁদের নজরে কোনো স্পষ্ট ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা অবহিত করেন এবং আমি আল্লাহর কাছে পাকড়াও হওয়া থেকে চিন্তামুক্ত হতে পারি। আর দ্বিমত পোষণের ব্যাপারে বলব, সবসময়ই তার অবকাশ রয়েছে। আমি সর্বদা সহিহ ইলম এবং সত্যের অন্বেষী। সুতরাং আমার কাছে কোনো বিষয় হক হিসাবে প্রকাশিত হলে, আগের মত থেকে ফিরে আসতে আমার সামান্যতমও দ্বিধা থাকবে না– ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আমার দুজন দীনি ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে পারছি না, কিতাবটি রচনায় যারা আমাকে সাহায্য করেছেন। তাদের একজন, শাইখ শফিক জাখুরা (হাফিযাহুল্লাহ)। এ কাজের শুরুতে অল্প কিছুদিন তিনি আমাকে সহযোগিতা করেন। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। তিনি চলে যাওয়ার পর তারই সহোদর, তরুণ ও বিচক্ষণ আলেম উসতায শাকের জাখুরা (হাফিযাহুল্লাহ) এ রচনার অধিকাংশ কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন এবং বিভিন্ন মাসাআলা ও তথ্যসূত্র থেকে উদ্ধৃতি বের করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। আমার এই কাজটি সহজ করতে এবং এর পাশাপাশি আমার আরও কিছু ইলমি কাজে তিনি অকুণ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়কে উত্তম প্রতিদান দিন, তাদের হায়াত ও ইলমে বরকত দিন। আমিন।

আল্লাহ তাআলার কাছে আরজ, তিনি যেন এ আমলটিকে একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন, তালিবুল ইলম ও আসাতিযায়ে কেরামকে এ থেকে উপকৃত করেন এবং যেদিন সম্পদ ও সন্তান কারো কোনো উপকারে আসবে না, সেদিন যেন এ দুর্বল বান্দার জন্য এই খেদমতটুকু নাজাতের অসিলা হিসাবে গ্রহণ করেন।

وأنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

মুহাম্মাদ তাকি উসমানি
দারুল উলুম করাচি
১২ ই শাবান ১৪৩৫ হিজরি
১১ই জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيأت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا.

رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسرلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللّٰهُمَّ أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، اللّٰهُمَّ اهدني وسددني وقني شر نفسي، اللّٰهُمَّ ألهمني رشدي واعزم لي على رشد أمري، اللّٰهُمَّ خذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي. اللّٰهُمَّ إني أعوذبك من أن أَضل أو أُضل ومن أن أَزِلَّ أو أُزِلَّ وأعوذبك من شر الشيطان وشِركه، وأعوذبك من الفِتَن ما ظهر منها وما بطن. اللّٰهُمَّ إني أستغفرك لما تبت لك منه ثم عدت فيه، اللّٰهُمَّ إني أستغفرك لما أردت به وجهك ثم خالطني فيه ما ليس لك، اللّٰهُمَّ اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم، وسدد فيه فكري وقلمي وخطوتي، وأعذني من الزلل والخطل، واشرح صدري لما فيه رضاك يا أرحم الراحمين.

٢٢ محرم ١٤١٦ هـ
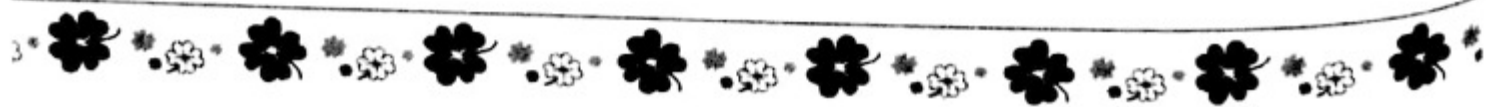
প্রথম অধ্যায়

ইসলামি ফিকহের আলোকে ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি

- বিক্রয়ের সংজ্ঞা এবং রুকন
- ইজাব-কবুলের বিধি-বিধান
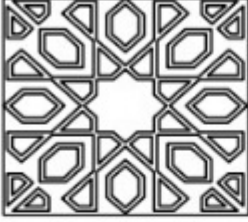
প্রথম পরিচ্ছেদ

বিক্রয়ের সংজ্ঞা এবং রুকন[৯]

১. বিক্রয়ের সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ

আভিধানিক অর্থে البيع ও الشراء শব্দদুটি সব ধরনের বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। সেটি মালের বিনিময়ে মাল বা অন্য কিছুর বিনিময়েও হতে পারে। আল্লামা আলি হায়দার (রহ.) এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, এর আভিধানিক অর্থ হলো, 'বস্তুর সঙ্গে বস্তু বিনিময় করা।'[১০] ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, আরবি 'البيع' (আল-বাইউ) শব্দটি 'الباع' (আল-বাউ) থেকে নির্গত।[১১] কেননা, বিক্রয়ের সময় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে দেওয়া-নেওয়ার জন্য তাদের বাহু প্রসারিত করে। বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবার সময় সাধারণত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে হাত মেলায়, তাই একে 'সাফকা'-ও বলা হয়।[১২]

পারিভাষিক অর্থ

তবে ইসলামি শরিয়তে বিক্রয়ের আভিধানিক ব্যাপক অর্থটিকে কিছুটা

---

৯. **রুকন :** শাব্দিক অর্থ– ভিত্তি; স্তম্ভ; মূল; শেকড়; বুনিয়াদ; কোনো বস্তুর ওই অংশ যার উপর ভিত্তি করে সেটি অস্তিত্ব লাভ করে। পরিভাষায় ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন হলো ওই বস্তু, যার উপর ক্রয়-বিক্রয়ের অস্তিত্ব নির্ভর করে। অন্যকথায়, যার অনুপস্থিতিতে শরিয়তের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়। (আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ : ২৩/১০৯; কাওয়ায়িদুল ফিকহ, মুফতি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী (রহ.), পৃষ্ঠা-৩০৯) –সম্পাদক

১০. দুরারুল হুক্কাম শরহে মাজাল্লাতুল আহকাম, শাইখ আলি হায়দার রহ.। খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৩, ধারা-১০৫।

১১. যার অর্থ : দুই বাহু প্রসারিত করার সমান জায়গা। –সম্পাদক

১২. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২।

শর্তযুক্ত করা হয়েছে। শরিয়তের পরিভাষায় বিক্রয় হচ্ছে–

مبادلة المال بالمال على الوجه الذي ينتقل به ملكية البدلين شرعًا.

> 'কোনো মালের সঙ্গে অন্য কোনো মালের এমন বিনিময়, যেখানে শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে উভয় বস্তুর মালিকানা পরিবর্তন হয়।'[১৩]

এখানে যে বিক্রয়ের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হলো, তা হচ্ছে 'বাইয়ে সহিহ' বা শুদ্ধ বিক্রয়। এর বিপরীতে যে 'বাইয়ে বাতিল' বা বাতিল বিক্রয় রয়েছে, তা শরয়ি পরিভাষায় কোনো বিক্রয় বলেই স্বীকৃত নয়; তবে আভিধানিক অর্থে এক্ষেত্রেও 'বিক্রয়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর 'বাইয়ে ফাসেদ' বলে যে প্রকারের বিক্রয়চুক্তিটি রয়েছে, সেটি শরয়ি পরিভাষায় ক্রয়-বিক্রয়ের আওতাভুক্ত। কারণ, অনেক ফকিহের মতে বাইয়ে ফাসেদ এর ক্ষেত্রে বিক্রয়ের কিছু বিধান প্রযোজ্য হয়। সেসব ফকিহদের মধ্যে হানাফি মাযহাবের ফকিহগণও রয়েছেন। যেমন, ফাসেদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কব্জা করার পর ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়, যদিও সেটি নিন্দনীয় মালিকানা। অনুরূপভাবে মালিকানার আরও কিছু বিধান প্রযোজ্য হয়। যেমন, ক্রেতা ওই পণ্যটি অন্যত্র বিক্রয় করলে তা কার্যকর হয়। সামনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ।

পক্ষান্তরে ঋণের বিষয়টি আলাদা। কারণ, এতে 'মুবাদালা' (বিনিময়) উদ্দেশ্য থাকে না; বরং প্রাথমিক অবস্থায় এটা 'তাবাররু' (স্বেচ্ছাকৃত বা অনাবশ্যক লেনদেন) এবং পরিণতির বিবেচনায় 'মুআওয়াযা'য় (এক বস্তুর বিনিময়ে অন্য বস্তু পরিশোধ করা) পরিণত হয়। সুতরাং সবদিক থেকে ঋণ বিনিময় না-হওয়ার কারণে বিক্রয়ের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়েছে।

২. মাল বলতে কী বোঝায়

মালের সংজ্ঞার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.)[১৪] বলেছেন–

---

১৩. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮৩।

১৪. **আল্লামা ইবনে আবেদিন :** মুহাম্মাদ আমিন ইবনে উমর ইবনে আবদুল আজিজ আবেদিন আদ-দিমাশকি (১১৯৮-১২৫২ হি.)। তিনি ছিলেন শামদেশের শ্রেষ্ঠ ফকিহ এবং তাঁর যুগে হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের ইমাম। রচনাবলী: রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার (ফাতাওয়ায়ে শামি বা হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদিন নামে পরিচিত), রাফউল আনযার, আল-উকুদুদ দাররিইয়্যাহ, নাসামাতুল আসহার আলা শারহিল মানার, আর-রাহিকুল মাখতুম

المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا.

'মাল বলতে উদ্দেশ্য হলো, যার প্রতি মন ধাবিত হয় এবং প্রয়োজনের জন্য যা জমা রাখা যায়।[১৫] সব বা কিছুসংখ্যক মানুষ কোনো বস্তুকে মাল হিসাবে গ্রহণ করলে তা-ও মালে পরিণত হয়। কোনো বস্তু 'মাল' হিসাবে পরিগণিত হওয়ার কারণে এবং শরিয়ত কোনো বস্তু থেকে ফায়দা হাসিলের অনুমতি প্রদান করার কারণে সেই বস্তুর মূল্যবিশিষ্ট হওয়া সাব্যস্ত হয়।'[১৬]

এরপর ইবনে আবেদিন 'আল-হাবি আল-কুদসি' কিতাবের উদ্ধৃতিতে বলেন–

المال اسم لغير الآدمي، خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار.

'মাল শব্দটি মানুষ ছাড়া এমন জিনিসকে বোঝায়, যাকে মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ইচ্ছেমতো জমা রাখা ও ব্যবহার করা যায়।'[১৭]

বর্ণিত সংজ্ঞা দুটিতে এমন কোনো শর্ত নেই, যার কারণে 'মাল' বলতে শুধু কোনো পদার্থ বোঝায়। বরং 'মাল' শব্দটি এখানে যে কোনো স্থায়ী উপকারিতাকেও অন্তর্ভুক্ত করছে। শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, বিক্রয়ের সংজ্ঞাটি কোনো বস্তুর স্থায়ী উপকারিতা বিক্রয় করাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লামা শাতেরি (রহ.)[১৮] বলেন–

(ইলমুল ফারায়েয বিষয়ে), হাওয়াশি আলা তাফসিরিল বায়যাবি প্রভৃতি। (আল-আ'লাম : ৬/৪২) –সম্পাদক

১৫. যদিও স্বল্প সময়ের জন্য জমা করা যায়। সুতরাং যেসব বস্তু অতিদ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, সেগুলো বিক্রয়ের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়বে না। যেমন, বিভিন্ন ফল ও শাক-সবজি ইত্যাদি।

১৬. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১০, ফিকরা-২২১৬৯। আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৫৮।

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. **আল্লামা শাতেরি :** সমগ্র বিশ্বে, বিশেষত ইয়েমেনে "সুলতানুল উলামা" খ্যাত শাফেয়ি মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা সালেম ইবনে আবদুল্লাহ আশ-শাতেরি (**الشاطري** : ১৩৫৯-১৪৩৯ হি.) –সম্পাদক

البيع لغة : مقابلة شيء بشيء، وشرعا : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد، كما في بيع حق الممر، ووضع الأخشاب على الجدار، وحق البناء على السطح.

'বিক্রয়ের আভিধানিক অর্থ : কোনো কিছু অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে বিনিময় করা। আর শরয়ি অর্থ হলো– মাল বা সম্পদ বিনিময়ের এমন একটি চুক্তি, যা কোনো বস্তু বা কোনো বস্তুর উপকারিতা লাভের স্থায়ী মালিকানা প্রদান করে। যেমন : চলাচলের স্বত্ব, দেয়ালের ওপর আড়কাঠ বা কড়িকাঠ রাখার অধিকার এবং বাড়ির ছাদের উপরে ঘর নির্মাণের স্বত্ব বিক্রয় করা।'[১৯]

অনুরূপভাবে হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বিক্রয়কে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা স্থায়ী উপকারিতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। বিক্রয়ের সংজ্ঞায় আল্লামা বুহুতি (রহ.)[২০] বলেন–

مبادلة عين مالية ... أو منفعة مباحة مطلقا، بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر ... بأحدهما، أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا ...

'মাল হিসাবে গণ্য হয়, এমন কোনো বস্তু বা বৈধ কোনো উপকারিতাকে এমনভাবে বিনিময় করা, যার বৈধতা নির্দিষ্ট কোনো অবস্থার সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়, এমন জিনিসের কোনো একটির সঙ্গে অন্যটি বিনিময় করা। অর্থাৎ, মাল হিসাবে গণ্য হয়, এমন কোনো বস্তু বা শর্তমুক্ত কোনো বৈধ উপকারিতার[২১] বিনিময় করা।'[২২]

অনুরূপভাবে আল্লামা মারদাবি (রহ.)[২৩] 'আল-ওয়াজিয' কিতাব থেকে বর্ণনা

---

১৯. আল-ইয়াকুতুন নাফিস ফি মাযহাবি ইবনে ইদরিস (রহ.), পৃষ্ঠা-৭৪। গায়াতুল কুসওয়া, আল্লামা বায়যাবি (রহ.) খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৬০। ফাতহুল জাওয়াদ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭৩। শিরওয়ানি আলা তুহফাতিল মুহতাজ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৫। নেহায়াতুল মুহতাজ, আল্লামা রমালি (রহ.) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬১।

২০. **আল্লামা বুহুতি :** মানসুর ইবনে ইউনুস আল-বুহুতি আল-হাম্বালি (১০০০-১০৫১ হি.)। তাঁকে মিশরের হাম্বলি মাযহাবের আলেমদের প্রধান হিসাবে গণ্য করা হতো। –সম্পাদক

২১. পারস্পরিক বিনিময়। –সম্পাদক

২২. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪০। অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে কাশশাফুল কিনা' তে : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৫।

২৩. **আল্লামা মারদাবি :** শাইখুল ইসলাম ওয়া শাইখুল হানাবিলা উপাধিতে খ্যাত আল্লামা

করেন–

هو عبارة عن تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي.

'বিক্রয় বলা হয় মাল হিসাবে গণ্য হয়, এমন কোনো বস্তু অথবা স্থায়ী কোনো বৈধ উপকারিতাকে অন্য কোনো মালের সঙ্গে বিনিময় করা।'[২৪]

এখান থেকে স্পষ্ট হলো যে, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবে স্থায়ী বৈধ উপকারিতা মাল হিসাবে স্বীকৃত। তার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। তবে উপকারিতাকে স্থায়িত্বের সঙ্গে শর্তযুক্ত করার কারণ হলো, উপকারিতা যদি স্থায়ীভাবে বৈধ না হয়, বরং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়, তা হলে তা ভাড়ার যোগ্য হবে, বিক্রয়যোগ্য হবে না।

কিন্তু হানাফি মাযহাবের অনেক ফকিহ 'মাল'কে শুধু পদার্থ হিসাবেই আখ্যা দিয়েছেন। আল্লামা হাসকাফি[২৫] (রহ.) 'শারহু মুলতাকাল আবহুর' কিতাবে বলেছেন–

المال عين يجري فيه التنافس والابتذال.

'মাল হলো এমন বস্তু বা পদার্থ, যার প্রতি মানুষের প্রতিযোগিতামূলক আগ্রহ থাকে এবং যা ব্যয়যোগ্য।'[২৬]

আলাউদ্দিন আলি ইবনে সুলাইমান ইবনে আহমাদ আল-মারদাবি আল-হাম্বলি (৮১৭-৮৮৫ হি.)। ফিলিস্তিনের নাবলুস এলাকার নিকটবর্তী মারদা নামক এলাকায় তাঁর জন্ম। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে: আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ (১২ খণ্ডে), আত-তানকিহ, তাহরিরুল মানকুল (উসুলে ফিকহ), আত-তাহবির প্রভৃতি। –সম্পাদক

২৪. আল-ইনসাফ, আল্লামা মারদাবি (রহ.) রচিত : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬০।

২৫. **আল্লামা হাসকাফি :** মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ আল-হিসনি (রহ.)। আলাউদ্দিন আল-হাসকাফি নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম : ১০২৫ হিজরি মোতাবেক ১৬১৬ খিস্টাব্দে সিরিয়ার রাজধানী দামেশকে। তিনি দামেশকে হানাফি মাযহাবপন্থী মুসলিমদের মুফতিয়ে আযম ছিলেন। অত্যন্ত উচ্চস্তরের বিদ্বান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলেমে দীন ছিলেন। সর্বদা দরস-তাদরিস ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে: আদ-দুররুল মুখতার ফি শারহি তানবিরুল আবসার, ইফাযাতুল আনওয়ার আলা উসুলিল মানার, আদ-দুররুল মুনতাকা শারহু মুলতাকাল আবহুর প্রভৃতি। ১০৮৮ হিজরি মোতাবেক ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে দামেশকেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। (আল-আ'লাম : ৬/২৯৪-২৯৫) –সম্পাদক

২৬. আদ-দুররুল মুনতাকা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪। (মাজমাউল আনহুর-এর সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ)

বিক্রয়ের সংজ্ঞায় মালকে পদার্থ বা বস্তু বলে নির্দিষ্টকরণের বিষয়ে এত স্পষ্ট বক্তব্য আর কোথাও পাওয়া যায় না। তবে হানাফি মাযহাবের মুতাআখখিরিন[২৭] ফকিহদের বক্তব্য হতে যে বিষয়টি বোঝা যায় তা হলো, মালের সংজ্ঞায় উক্ত শর্তটির প্রতি তারা বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। এ কারণে শাইখ মুস্তাফা আয-যারকা (রহ.)[২৮] উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর

---

২৭. **মুতাআখখিরিন :** পরবর্তীকালের ফকিহগণ, যারা পূর্ববর্তীদের তুলনায় পরে আবির্ভূত হয়েছেন। মুতাকাদ্দিম (পূর্ববর্তীকালের ফকিহ) এবং মুতাআখখির (পরবর্তীকালের ফকিহ) এই পরিভাষা দুটি মূলত আপেক্ষিক পরিভাষা। তাই একেকজন আলেম এর একেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন: আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী (রহ.) লিখেছেন: "হানাফি মাযহাবের মুতাকাদ্দিমিন বলতে সেসব ফুকাহায়ে কেরাম উদ্দেশ্য, যারা আয়িম্মায়ে সালাসা (আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.)-কে পেয়েছেন। আর যারা তাদেরকে পাননি (অর্থাৎ, আরও পরে আগমন করেছেন) তারা মুতাআখখিরিন ফুকাহা হিসাবে গণ্য।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন: "জামেউল উলুম কিতাবের বর্ণনানুযায়ী খালাফ (পরবর্তীকালীন ফুকাহা) বলতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানি থেকে ইমাম শামসুল আয়িম্মা হালওয়ানি (রহ.) পর্যন্ত ফুকাহায়ে কেরাম বুঝানো হয়ে থাকে। আর এর পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামকে বলা হয় সালাফ (বা মুতাকাদ্দিমিন ফুকাহা)। আর মুতাআখখিরিন ফুকাহা বলতে উদ্দেশ্য হলো ইমাম হালওয়ানি (রহ.) থেকে ইমাম হাফিজুদ্দিন বুখারি পর্যন্ত আগত ফুকাহায়ে কেরাম।" এরপর আল্লামা মুজাদ্দেদী (রহ.) বলেন: "তবে ইমাম যাহাবি (রহ.) এর মতে মুতাকাদ্দিমিন ও মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় তিনশত হিজরি সনের মাধ্যমে।" অর্থাৎ, তিনশত হিজরির আগে আগত ফকিহগণ মুতাকাদ্দিমিন আর এর পরে আগত ফকিহগণ মুতাআখখিরিন হিসাবে গণ্য হন। (কাওয়ায়িদুল ফিকহ, আল্লামা মুজাদ্দেদী, পৃষ্ঠা-৪৬৩) –সম্পাদক

২৮. **শাইখ মুস্তাফা আয-যারকা :** সিরিয়ার বিখ্যাত আলেম প্রফেসর ডক্টর মুস্তাফা আয-যারকা (১৯০৪-১৯৯৯ খ্রি.)। পিতা: আল্লামা আহমাদ আয-যারকা শারহুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যাহ-এর লেখক। আল্লামা মুস্তাফা ছিলেন একাধারে একজন খ্যাতনামা হানাফি ফিকহ বিশারদ, দামেশ্‌ক বিশ্ববিদ্যালয়ের *আশ-শারিয়াতিল ইসলামিয়া ওয়াল কানুন আল-মাদানি (ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স এন্ড সিভিল ল')*-এর প্রফেসর, চেয়ারম্যান–ফিকহ এনসাইক্লোপিডিয়া (দামেশকের শরিয়া কলেজ কর্তৃক প্রস্তাবিত), আল-মাউসুআতিল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ-এর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, জর্দানের রাজধানী আম্মানের শরিয়া কলেজের প্রফেসর, ওআইসি পরিচালিত ইসলামিক ফিকহ একাডেমি'র সদস্য এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন অধ্যাপক। তাঁর উস্তাদগণ: মুহাম্মাদ আল-হানিফি, মুহাম্মাদ রাগেব আত-তাব্বাখ, আহমাদ আল-কুরদি, আহমাদ আশ-শাম্মা, মুহাম্মাদ আন-নাশিদ (রহ.) প্রমুখ। তাঁর ছাত্রগণ: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, মুহাম্মাদ আল-মাল্লাহ, আবদুর রাহমান রাফাত পাশা, মুহাম্মাদ ফাওযি ফাইযুল্লাহ প্রমুখ। তাঁর লিখিত কালজয়ী গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: আল-ইস্তিস্‌লাহ ওয়াল মাসালিহিল মুরসালাহ ফিল ফিকহিল ইসলামি, আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া মাদারিসুহু, আল-ফিকহুল ইসলামি ফি সাওবিহিল জাদিদ (চার খণ্ডে সমাপ্ত, যার এক ও দুই নম্বর খণ্ডের শিরোনাম: আল-মাদখালুল ফিকহি আল-আম, তৃতীয় খণ্ডের শিরোনাম: আল-মাদখাল ইলা নাযারিয়্যাতিল ইলতিযাম আল-আম্মাহ ফিল ফিকহিল ইসলামি এবং চতুর্থ খণ্ডটির শিরোনাম : আল-উকুদ আল-মুসাম্মাত ফিল ফিকহিল ইসলামি :

সমালোচনা করে অন্য একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

المال : هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس.

> 'মাল হলো, এমন পদার্থ, মানুষের কাছে যার বস্তুগত মূল্য রয়েছে।'[২৯]

তবে হানাফি মাযহাবের কিছু শাখাগত মাসআলা থেকে বোঝা যায়, তারা এমন কিছু উপকারিতার বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন, যা পদার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন, চলাচলের স্বত্ব। এই ধরনের উপকারিতাকে মাল সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তারা সেগুলোকে কোনো একটি পদার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। বিক্রয়ের শর্তের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ।

মালেকি মাযহাব

আল্লামা ইবনে আরাফা (রহ.)[৩০] এর প্রদত্ত মালের সংজ্ঞাটিকেই মালেকি মাযহাবের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা বলে মনে করা হয়। তিনি বলেছেন–

عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة.

(বিক্রয় হলো) 'উপকারিতা ও দৈহিক তৃপ্তি ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে বিনিময়চুক্তি করা।'[৩১]

উল্লিখিত সংজ্ঞায় বর্ণিত 'দৈহিক তৃপ্তির' শর্তের কারণে বিক্রয়ের সংজ্ঞা হতে বিবাহ বাদ পড়ছে। কারণ, এটা দৈহিক তৃপ্তির চুক্তি। ইজারা ও ভাড়া

আকদুল বাই'। ইসলামি আইনশাস্ত্রে অসামান্য অবদানের কারণে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মাননা বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কারে ভূষিত হন। যার টপিক ছিল: জেনারেল থিওরি ইন ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স। –সম্পাদক

২৯. আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, শাইখ যুহাইলি : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪৫।

৩০. **আল্লামা ইবনে আরাফা** : শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আরাফাহ আদ-দুসুকি আল-মালেকি (মৃ. ১২৩০ হি.)। আরববিশ্বের খ্যাতনামা ফকিহ। ফিকহে মালেকি'র ওপর তাঁর বিস্তর দখল ছিল। মিশরের দুসুক নামক এলাকার অধিবাসী। ইন্তেকালও করেছেন মিশরের রাজধানী কায়রোয়। বিখ্যাত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় জামে আযহারের অধ্যাপক ছিলেন। রচনাবলি: আল-হুদুদুল ফিকহিয়্যাহ, হাশিয়াহ আলা মুগনি আল-লাবিব (দুই খণ্ড), হাশিয়াহ আলা আস-সা'দ তাফতাযানি (দুই খণ্ড), হাশিয়াহ আলা আশ-শারহুল কাবির আলা মুখতাসারি খলিল, হাশিয়াহ আলা শারহিস সানুসি প্রভৃতি। –সম্পাদক

৩১. হাশিয়াতুদ দুসুকি আলাশ শারহিল কাবির, আল্লামা দারদির (রহ.) রচিত : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২। শারহুয যুরকানি আলা মুখতাসারি খলিল : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩। খারাশি : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫ এবং অন্যান্য।
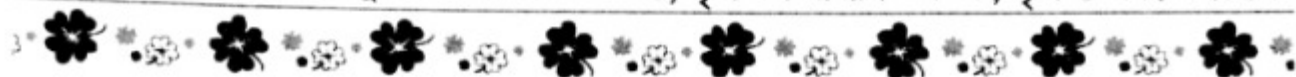
উপকারিতা-কেন্দ্রিক চুক্তি হওয়ার কারণে বিক্রয়ের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়েছে। এ সংজ্ঞাটি যদিও বিক্রয়ের ক্ষেত্র হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে উপকারিতাকে বাদ দিয়েছে, তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, উপকারিতা দ্বারা অস্থায়ী উপকারিতা বোঝানো হয়েছে; যেন ইজারা ও ভাড়া বিক্রয়ের সংজ্ঞা হতে বেরিয়ে যায়। আর স্থায়ী উপকারিতার বিষয়ে কথা হলো: মালেকি মাযহাবের ফকিহগণ অনেক স্থায়ী উপকারিতার বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন। যেমন : উপরের তলায় বাড়ি করার স্বত্ব, দেয়ালের ওপর কাঠ রাখার স্বত্ব, পানি প্রবাহিত করার স্বত্ব ও অন্যান্য স্বত্ব বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন।[৩২] এসব শাখাগত মাসাআলা হতে বোঝা যায়, কিছু-কিছু স্থায়ী উপকারিতা ও স্বত্বকে তারা 'মাল'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আখ্যা দিয়েছেন।

বাস্তবতা হলো, কুরআনুল কারিম ও সুন্নাহে এমন কোনো বক্তব্য আসেনি, যা মালকে নির্দিষ্ট বস্তু বা পদার্থে সীমাবদ্ধ করে বা সূক্ষ্মভাবে 'মাল'কে সংজ্ঞায়িত করে। মানুষের প্রচলিত পরিভাষার উপরই শরিয়ত এটিকে সোপর্দ করেছে। এ কারণে আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন–

والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم.

> 'সকল বা কিছু মানুষ কোনো বস্তুকে মূল্যবান হিসাবে সাব্যস্ত করলেই তা মাল হিসাবে গণ্য হবে।'[৩৩]

সুতরাং মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে যে জিনিসটি মাল হিসাবে পরিচিত হবে, শরিয়তে সেটি মাল হিসাবে স্বীকৃত হবে। তবে তার বিপরীতে শরয়ি কোনো বক্তব্য থাকলে তা মাল হিসাবে স্বীকৃত হবে না। যেমন, মদ ও শূকর। 'মাল'কে বস্তু বা পদার্থের সঙ্গে শর্তযুক্ত করার ব্যাপারে কুরআনে বা হাদিসে কোনো বক্তব্য আসেনি এবং অনেক মাসাআলার ক্ষেত্রেই এমন শর্ত আরোপ করা হয়নি, যা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

বর্তমান সময়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস এমন মূল্যবান 'মাল'-এ পরিণত হয়েছে, যার প্রতি সবচেয়ে বেশি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় এবং নির্দিষ্ট কোনো ধাতুর মধ্যে

---

৩২. আল-মুদাওওয়ানাতুল কুবরা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬৫,৩১২। মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.) রচিত : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭৬। দুসুকি : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪।

৩৩. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৯, ফিকরা নং ২২১৬৯।
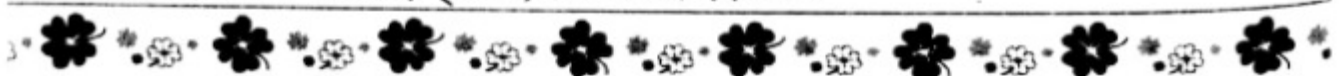
সেগুলোকে সরাসরি জামা রাখাও কষ্টসাধ্য। এতদসত্ত্বেও এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয এবং কোনো ধরনের আপত্তি ছাড়াই মানুষ এগুলোর লেনদেন করছে।[৩৪] সুতরাং মালের সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) থেকে 'সত্তাগতভাবে স্থিতিশীল কোনো পদার্থ হওয়ার' শর্তবিহীন যে সংজ্ঞাটি উল্লেখ করেছি, সেটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। অতএব, পদার্থ নয় এমন কোনো জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়কে শুধু পদার্থ না-হওয়ার কারণে না-জায়েয বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো সমস্যা দেখা না দেবে।

'মাল'-এর সংজ্ঞার মধ্যে, 'যার প্রতি মানব স্বভাব আকৃষ্ট হয়' অংশের উদ্দেশ্য হলো, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব। সুতরাং যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় না, তা মাল হিসাবে স্বীকৃত হবে না এবং ক্রয়-বিক্রয়যোগ্যও হবে না।

৩. উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি

বিক্রয় সহিহ হওয়ার একটি অন্যতম শর্ত হলো, উভয় পক্ষই চুক্তিতে সন্তুষ্ট থাকা। এ ব্যাপারে মূল দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

> 'হে ইমানদারগণ! অন্যায়ভাবে তোমরা পরস্পরের সম্পদ গ্রাস করো না। তবে যদি তা তোমাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টচিত্তে ব্যবসার মাধ্যমে হয়, তা হলে তা বৈধ।'[৩৫]

সুতরাং যেখানেই একপক্ষ বা উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি অনুপস্থিত থাকবে, সেখানে বিক্রয় সহিহ হবে না। এ কারণে অনেক ফকিহ বলেছেন, বিক্রয়ের সংজ্ঞায় উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির বিষয়টি একটি অপরিহার্য অংশ। তবে সংজ্ঞায় তা উল্লেখ না-করার কারণ হলো, কোনো এক পক্ষের সন্তুষ্টি না-থাকা সত্ত্বেও বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গেলে তার হুকুমের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। যেমন, বাধ্য হয়ে বিক্রয় করার বিষয়টি। অনেক ফকিহের মতে এই বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। আবার অনেকের মতে এই বিক্রয়

---

৩৪. হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি (রহ.) বলেছেন, বিদ্যুৎ মাল হিসাবে স্বীকৃত। ইমদাদুল ফাতাওয়া, অধ্যায়: শিরকাত : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯৮।

৩৫. সুরা নিসা : আয়াত-২৯।
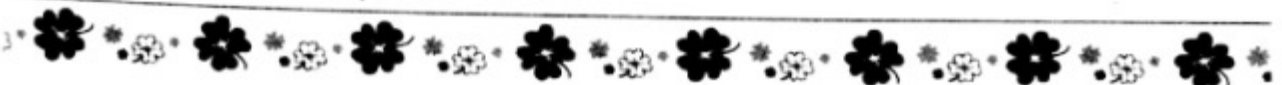
ফাসেদে মওকুফ[৩৬] হবে। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে– ইনশাআল্লাহ। তা ছাড়া ফাসেদ বিক্রয়ও বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এর সঙ্গে বিক্রয়ের কিছু বিধি-বিধানও সম্পৃক্ত। সুতরাং সাধারণ বিক্রয়ের সংজ্ঞা হতে সেটিকে বাদ দেয়া উচিত নয়। এ সম্পর্কে আলাদাভাবে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ।

৪. বিক্রয়ের রুকন

বিক্রয়ের রুকন নির্ধারণে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মতে বিক্রয়ের রুকন হলো, ইজাব ও কবুল[৩৭]। মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের ফকিহগণের মতে বিক্রয়ের রুকন হলো, ইজাব-কবুল, উভয় পক্ষ এবং চুক্তিকৃত জিনিসটি। কেননা, তাদের মতে রুকন হলো ওই জিনিস, যার ওপর কোনো কিছুর অস্তিত্ব এবং যৌক্তিকভাবে বাস্তবায়িত হওয়া নির্ভর করে–সেটি ওই জিনিসের মৌলিক অংশ হতে পারে অথবা নাও পারে। সুতরাং যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ের অস্তিত্ব ক্রেতা-বিক্রেতা এবং চুক্তিকৃত জিনিস এ তিনটি বস্তুর উপরই নির্ভরশীল, তাই এগুলোকে বিক্রয়চুক্তির রুকন হিসাবে গণ্য করা হয়েছে; যদিও এগুলো বিক্রয়চুক্তির মৌলিক কোনো অংশ নয়।[৩৮]

হানাফি মাযহাবের ফকিহগণ মনে করেন, বিক্রয় ও অন্যান্য চুক্তির রুকন হলো, কাঙ্ক্ষিত জিনিসকে কাঙ্ক্ষিত জিনিসের সঙ্গে বিনিময় করা।[৩৯] অন্যান্য ফকিহ এটিকে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[৪০] উভয় পক্ষ এবং "محل البيع" 'মাহাল্লুল বাই' বা চুক্তিকৃত জিনিসটি ইজাব-কবুল অস্তিত্বলাভ করার জন্য আবশ্যক, তবে এগুলো রুকন নয়। কেননা,

---

৩৬. **ফাসেদে মওকুফ** : যে বিক্রয়চুক্তি সহিহ হওয়া অন্য কোনো কাজের উপর নির্ভর করে। যেমন: কেউ কারোর কোনো মাল সেই মালিকের অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া বিক্রয় করে দিল। সেক্ষেত্রে মূল মালিক যদি এই বিক্রয়কে অনুমোদন দেয়, তা হলে তা সহিহ হয়ে যাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি সহিহ হওয়ার বিষয়টি মালিকের অনুমোদনের উপর নির্ভর করবে। যদি সে অনুমোদন না-দেয়, বিক্রয়চুক্তি ফাসেদ বলে গণ্য হবে। –সম্পাদক

৩৭. **ইজাব** : প্রস্তাব দান। **কবুল** : প্রস্তাব গ্রহণ। –সম্পাদক

৩৮. শারহুস সগির, আল্লামা দারদির (রহ.) রচিত : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩-১৪। শারহু মুনতাহাল ইরাদাত : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪০, মুগনিল মুহতাজ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩।

৩৯. বাদায়েউস সানায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১৮।

৪০. আল-ইখতিয়ার শারহুল মুখতার, আল্লামা মাওসিলি (রহ.) রচিত : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪।
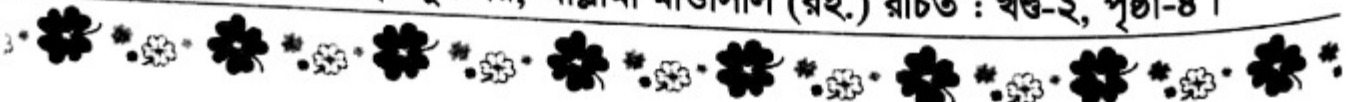
বিক্রয়চুক্তি শুধু ইজাব-কবুলেরই নাম; যদিও বিক্রয়চুক্তি অস্তিত্বলাভ করা এগুলোর উপরও নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কিন্তু হুকুমের ক্ষেত্রে এ মতানৈক্যের কোনো প্রভাব নেই। কেননা, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, বিক্রয়ের ক্ষেত্র বা বিক্রয়ের পণ্য, উভয় পক্ষ এবং তাদের মধ্যে ইজাব-কবুলের বিনিময় ছাড়া বিক্রয় সংঘটিত হয় না।

উভয় সিদ্ধান্তের ওপর শাইখ মুস্তাফা আয-যারকা (রহ.) সুন্দর ও চমৎকার একটি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

الركن في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو ما يكون به قوام الشيء أو وجوده، بحيث يعد جزء داخلا في ماهيته. (ر: المصباح المنير وتعريفات السيد الجرجاني) ... وركن العقد ما يعبر عن اتفاق الإرادتين من إيجاب وقبول، أو ما يقوم مقامهما كما سنرى، لأنهما هما العنصران الذاتيان في ماهية العقد ومعناه، فبارتباطهما الشرعي يقوم العقد ... وعلى هذا لا يعتبر الفاعل ركنا في فعله بالمعنى الاصطلاحي للركن، لأن الفاعل ليس جزءا ذاتيا في معنى الفعل وماهيته، وإن كان لا بد لكل فعل من فاعل، فالعاقدان إذن لا يسمي ركنا في العقد، لكن بعض الفقهاء كالإمام الغزالي يعد العاقد باعتبار أنه أحد جانبين أساسيين في تكوينه ... وهذا تساهل في التسمية، وإن التحقيق ما قد بيناه. فالعاقدان والمحل المعقود عليه تعتبر من مقومات العقد، ولكنها ليست أركانا بالمعنى الاصطلاحي للركن، فالمقومات أعم من الأركان، لأنها تشتمل كل مالا يمكن وجود العقد فعلا بدونه من ركن أو عاقد أو محل.

'ফুকাহায়ে কেরাম ও উসুলবিদদের পরিভাষায় রুকন হলো ওই জিনিস, যার মাধ্যমে বস্তুটি প্রতিষ্ঠিত হয় বা অস্তিত্বলাভ করে। সেটি এভাবে হবে যে, ওই জিনিসটিকে তার মৌলিক অংশ হিসাবে গণ্য করা হবে। (আল-মিসবাহুল মুনির ও সাইয়েদ জুরজানি (রহ.)-এর কিতাবুত তারিফাত) ...। চুক্তির রুকন বলতে বোঝায়, ইজাব-কবুল অথবা তার স্থলাভিষিক্ত কোনো কিছুর মাধ্যমে দুটি ইচ্ছার একাত্মতা (সামনে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব)।

কেননা, চুক্তির অস্তিত্ব ও মর্মার্থের ক্ষেত্রে এ দুটিই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপকরণ। তাই, শরয়ি পদ্ধতিতে এ দুটির সম্পৃক্তির দ্বারাই বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়। ...এ দৃষ্টিকোণ থেকে রুকনের পারিভাষিক অর্থ অনুযায়ী কোনো ক্রিয়ার কর্তাকে ওই ক্রিয়ার রুকন বলা যাবে না। কারণ, প্রত্যেক ক্রিয়ার জন্য কর্তা থাকা আবশ্যক হলেও ক্রিয়ার অস্তিত্ব ও মর্মার্থের ক্ষেত্রে কর্তা কোনো মৌলিক অংশ নয়। সুতরাং চুক্তিকারীকে চুক্তির রুকন বলা যাবে না। তবে ইমাম গাযালি[৪১] (রহ.)-এর মতো অনেক ফকিহ এ

---
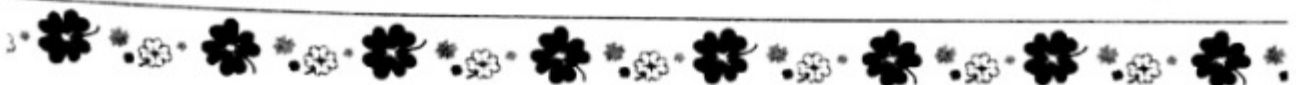
৪১. **ইমাম গাযালি :** মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-গাযালি আত-তুসি আবু হামেদ (রহ.)। জন্ম : ৪৫০ মোতাবেক ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইরানের খোরাসান প্রদেশের তাবারান নামক এলাকায়। তাঁরা উপাধি– গাযালি (তুসের একটি গ্রাম) ও গাযযালি (সুতা কাটার শিল্পকর্ম) উভয় উচ্চারণেই শুদ্ধ। তাঁকে বলা হয় 'হুজ্জাতুল ইসলাম'। ছিলেন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একজন শক্তিমান দার্শনিক, তাসাওউফ তত্ত্ববিদ এবং দুই শতের মতো কালোত্তীর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা। নিজ দেশে ইলম শেখার পর তিনি নিশাপুর, বাগদাদ, হেজায, শাম এরপর সবশেষে মিশরে ইলম শেখার জন্য সফর করেন। পরে স্বদেশে ফিরে এসে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দীনের খেদমতে নিরত হন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছেঃ ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দিন (চারখণ্ডে), তাহাফুতুল ফালসাফাহ, আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, মাকাসিদুল ফালসাফাহ, ফাইসালুত তাফরিকাহ বাইনাল ইসলাম ওয়ায যানদাকাহ, আল-বাসিত (ফিকহ বিষয়ক), বদায়াতুল হেদায়াহ, মিনহাজুল আবেদিন, আসরারুল হাজ্জ, শিফাউল আলিল (উসুলে ফিকহ), আল-মুস্তাসফা মিন ইলমিল উসুল (দুই খণ্ডে), আল-ইমলা আন ইশকালাতিল ইহ্ইয়া, আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ প্রভৃতি। ইমাম যাহাবি বলেন, 'তিনি ছিলেন ইমাম, বাহরুল উলুম, হুজ্জাতুল ইসলাম, উজুবাতুয যামান (যুগের অত্যাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব), শাফেয়ি মাযহাবের বরিত ফকিহ, বহুগ্রন্থ প্রণেতা এবং অসাধারণ ধী-শক্তির অধিকারী।' নিশাপুর সফরে গিয়ে তিনি ইমামুল হারামাইনের সাহচর্য অবলম্বন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ইলমে ফিকহে পরিপক্কতা লাভ করেন। যুক্তিবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রেও তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেন। সেলজুক সালতানাতের উযিরে আযম নেযামুল মুলক তুসি (রহ.)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। গাযালির যোগ্যতা দেখে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি তাঁকে বাগদাদের নেযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ। এরপর লেখালেখির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। যাহাবির মতে, ইলমে হাদিস ছাড়া আর সব শাস্ত্রেই তিনি ছিলেন সব্যসাচী। ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে এ শাস্ত্রেও তিনি পড়াশোনা ও মুহাদ্দিসিনের সোহবতে যাওয়া শুরু করেছিলেন। যাহাবি বলেন, "ولو عاش، لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام"–"বেঁচে থাকলে অল্প কদিনে তিনি এই শাস্ত্রেও সবাইকে ছাড়িয়ে যেতেন।" যে কারণে তাঁর 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন'সহ বিভিন্ন কিতাবে প্রচুরসংখ্যক জাল হাদিস পাওয়া যায়। হিজরি ৫০৫ মোতাবেক ১১১১ খ্রিস্টাব্দে এই মহীরুহ পরলোকগত হন। তিনি কয়েকজন কন্যাসন্তান রেখে গিয়েছিলেন। কোনোরকমে দিন চলে যায়-মতো উপার্জনেই তিনি দিন গুজরান করতেন। অথচ তাঁকে মোটা অঙ্কের অর্থ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা ফিরিয়ে

দৃষ্টিকোণ হতে কর্তাকে চুক্তির রুকন বলেছেন যে, চুক্তিটি অস্তিত্বলাভ করার জন্য কর্তা হলো মৌলিক দুই পক্ষের একপক্ষ। ... আর এ ধরনের সিদ্ধান্ত সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে মাত্রাধিক শিথিলতা বৈ নয়। এ ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত সেটিই, যা আমরা এইমাত্র ব্যক্ত করলাম। সুতরাং চুক্তির উভয় পক্ষ, চুক্তির ক্ষেত্র বা চুক্তিকৃত জিনিসকে চুক্তির মূল উপকরণ হিসাবে সাব্যস্ত করা যাবে, তবে রুকনের পারিভাষিক অর্থ অনুযায়ী সেগুলোকে রুকনের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। অতএব, কোনো বস্তুর মৌলিক উপকরণ সেই বস্তুর রুকনের তুলনায় ব্যাপকতর। কারণ, সেটি এমন সব জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেগুলো ছাড়া চুক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব। যেমন : রুকন, চুক্তিকারী ও যে বস্তু নিয়ে চুক্তি সম্পন্ন হচ্ছে।'[৪২]

৫. ইজাব ও কবুল : পরিভাষার ক্ষেত্রে মতানৈক্য

অনুরূপভাবে ইজাব ও কবুলের পরিভাষার ক্ষেত্রে ফিকহি মতানৈক্য রয়েছে। মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মতে, বিক্রেতার কথাকে বলে 'ইজাব' আর ক্রেতার কথাকে বলে 'কবুল'। হানাফি মাযহাব

দিয়েছিলেন। সারাটি জীবন তিনি ব্যয় করেছেন ইসলামের পতাকা বুলন্দ করতে গিয়ে, গ্রিক দর্শনের থাবা থেকে ইসলামকে বাঁচানোর মহাযুদ্ধে, তাসাওউফের মাধ্যমে আখেরাতবিমুখ মানুষকে আখেরাতমুখী করায়, ইসলামবিরোধী ও ইসলামের নামে ভণ্ডামিতে লিপ্ত বাতেনি শিয়াদের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে। এসব কাজ করতে গিয়ে কখনোবা তিনি সমকালীন আলেমদেরও সমালোচনার মুখে পড়েছেন। ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন–

قلت : ما زال العلماء يختلفون، ويتكلم العالم في العالم باجتهاده، وكل منهم معذور مأجور، ومن عاند أو خرق الإجماع، فهو مأزور. ... فرحم الله الإمام أبا حامد، فأين مثله في علومه وفضائله، ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ، ولا تقليد في الأصول.

"উলামায়ে কেরামের ইখতেলাফ তো চলতেই থাকবে। একেক জন আলেম নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী অন্য আলেমের সমালোচনা করবেন। এঁদের একপক্ষ 'মাযুর' (নিরুপায়) আর অপরপক্ষ 'মাজুর' (সওয়াবপ্রাপ্ত, যিনি সঠিক মতে আছেন)। কিন্তু যে হঠকারিতার পথ ধরবে, নিজের ভুল স্বীকার করবে না অথবা ইজমায়ে উম্মতের বিরুদ্ধে যাবে, সে আল্লাহর কাছে ধরা পড়ে যাবে। ...আল্লাহ আবু হামেদ গাযালিকে রহম করুন। ইলম ও আমলে তাঁর তুলনা কোথায়? কিন্তু যে ভুল-ভ্রান্তি তাঁর থেকে প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে আমরা তাঁকে ভুলমুক্ত মনে করতে পারি না। উসুলের (শরিয়তের মূলনীতি) ক্ষেত্রে তাকলিদের কোনো সুযোগ নেই।" (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৯/৩২২-৩৪৬; আল-আ'লাম : ৭/২২-২৩) –সম্পাদক

৪২. আল-মাদখালুল ফিকহিল আম, শাইখ মুস্তাফা আয-যারকা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮৯-৩৯০, অধ্যায়-৬, অনুচ্ছেদ-২৮।

মতে, প্রস্তাব হলো চুক্তি করার জন্য অন্যের প্রতি প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করার নাম, সেটি বিক্রেতার পক্ষ থেকে হোক বা ক্রেতার পক্ষ থেকে। ক্রেতা যদি আলোচনার শুরুতে বলে, 'তোমার থেকে এ জিনিসটি এই মূল্যে ক্রয় করছি', তা হলে এটি 'ইজাব' হিসাবে বিবেচিত হবে। এ কথার প্রেক্ষিতে বিক্রেতা যদি 'গ্রহণ করলাম' অথবা 'বিক্রয় করলাম' বলে, তা হলে সেটি 'কবুল' হিসাবে বিবেচিত হবে। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.)[৪৩] বলেছেন–

والإيجاب لغة الإثبات لأي شيء كان، والمراد هنا إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولا سواء وقع من البائع كبعت أو من المشتري كأن يبتدئ المشتري فيقول اشتريت هذا بألف والقبول الفعل الثاني، وإلا فكل منهما إيجاب، أي إثبات، فسمي الإثبات الثاني بالقبول تمييزا له عن الإثبات الأول، ولأنه يقع قبولا ورضا بفعل الأول.

'ইজাবের আভিধানিক অর্থ হলো, কোনো জিনিসকে সাব্যস্ত করা। আর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইজাব শব্দটি থেকে উদ্দেশ্য হলো, এমন কোনো নির্দিষ্ট ক্রিয়া, যা শুরুতেই ব্যক্তির সন্তুষ্টি বোঝায়। সেটি বিক্রেতার 'বিক্রয় করলাম' অথবা ক্রেতার 'ক্রয় করলাম' উভয় কথার যে কোনো একটি হতে পারে। যেমন, ক্রেতা এ কথা বলে শুরু করল যে, 'তোমার কাছ থেকে এ জিনিসটি এক হাজার টাকায় ক্রয় করছি।' আর 'কবুল' হচ্ছে দ্বিতীয় ক্রিয়াটি। অন্যথায়, বর্ণিত কথার প্রত্যেকটিই 'ইজাব' অর্থাৎ, সাব্যস্তকরণ। ফলে প্রথম সাব্যস্তকরণকে দ্বিতীয় সাব্যস্তকরণ হতে ভিন্ন করতে দ্বিতীয়টিকে

---

৪৩. **আল্লামা ইবনুল হুমাম** : মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম আল-ইসকান্দারি আল-মিশরি (৭৯০-৮৬১ হি.)। তিনি ছিলেন একাধারে একজন স্বীকৃত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ, উসুলবিদ, দার্শনিক আলেম। তাঁর উস্তাদ ছিলেন : বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু যুরআ আল-ইরাকি, জামালুদ্দিন হাম্বলি, শামসুদ্দিন শামি, ইবনে হাজার আসকালানি (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। তাঁর শাগরেদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আমিরুল হাজ আল-হালাবি, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুশ শিহনাহ, সাইফুদ্দিন ইবনে উমার ইবনে কুতলুবুগা (রাহিমাহুমুল্লাহ)। তিনি বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ফাতহুল কাদির শারহুল হিদায়াহ (আট খণ্ডে সমাপ্ত ফিকহে হানাফি'র জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ), আত-তাহরির ফি উসুলিল ফিকহ, আল-মুসাইয়ারাহ ফিল আকাইদিল মুনজিয়াহ ফিল আখিরাহ, যাদুল ফকির মুখতাসার ফি ফুরুয়িল হানাফিয়্যাহ ইত্যাদি। ইমাম সাখাবি (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: "তিনি ছিলেন তাঁর সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম এবং সবচেয়ে দক্ষ মুহাক্কিক।" (আল-আ'লাম : ৬/২৫৫; আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, পৃ. ১৮০) –সম্পাদক
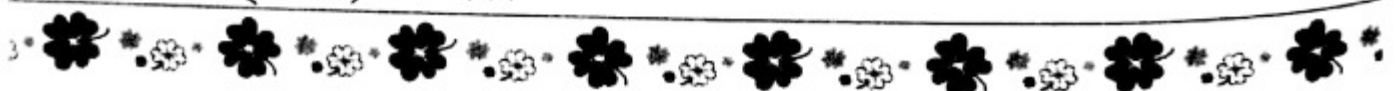
'কবুল' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা, দ্বিতীয় কর্ম 'কবুল' ও প্রথমজনের কর্মের প্রতি সন্তুষ্টি বুঝায়।'[৪৪]

তবে এ মতানৈক্যটিও শুধু পরিভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফয়সালার ক্ষেত্রে এর তেমন কোনো প্রভাব নেই। কারণ, তিন মাযহাবের মতে ইজাব যদিও বিক্রেতার কথাকেই বলে, কিন্তু তাদের মতে ইজাব কবুলের আগে হওয়া অথবা বিক্রেতার পক্ষ থেকে শুরু হওয়া আবশ্যক নয়; বরং ক্রেতা এ কথার মাধ্যমে চুক্তি শুরু করতে পারে যে, 'তোমার কাছ থেকে এ জিনিসটি এই মূল্যে ক্রয় করছি।' তখন বিক্রেতা বলল, 'আমি বিক্রয় করলাম।' এখানে ইজাবের আগে কবুল হচ্ছে এবং বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হচ্ছে। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.)[৪৫] বলেছেন–

---

৪৪. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৫৬।

৪৫. **ইমাম ইবনে কুদামা :** ইমাম শাইখুল ইসলাম মুওয়াফফাক উদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি আল-হাম্বলি (রহ.)। জন্ম : ৫৪১ হিজরিতে। জগদ্বিখ্যাত হাম্বলি আলেম এবং লেখক। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: শাইখে তরিকত আল্লামা আবদুল কাদের জিলানি, আবুল ফাতাহ ইবনুল বিত্তি, খাদিজা আন-নাহরাওয়ানিয়্যাহ, নাফিসা আল-বাযযাযাহ, শাহাদা আল-কাতিবাহ, ইয়াহইয়া ইবনে সাবেত (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। তাঁর শাগরেদদের মধ্যে রয়েছেন: জামালুদ্দিন ইবনুল হাফেজ, জিয়াউদ্দিন, ইবনে নুকতাহ, আবু শামাহ, ইবনুন নাজ্জার, ইবনে আবদুদ দায়েম, যাইনাব বিনতুল ওয়াসেতি, ইযযুদ্দিন আহমাদ ইবনুল ইমাদ (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। রচনাবলি: আল-মুগনি (দশখণ্ডে সমাপ্ত, যে কিতাবটিকে অনেকে ফিকহে ইসলামি এবং ফিকহে হাম্বলির বৃহত্তম কিতাব বলে আখ্যা দিয়েছেন), আল-কাফি (চারখণ্ডে সমাপ্ত), আল-মুকনি', মুখতাসারুল হিদায়াহ, আল-কাদর, আল-ই'তিকাদ, যাম্মুত তা'বিল, ফাযাইলুস সাহাবাহ প্রভৃতি। তিনি একাধারে তাফসির, হাদিস ও ফিকহ– সবশাস্ত্রেই বরিত ইমাম ছিলেন। তাঁর যুগে তিনি ছিলেন একজন অনুপম ব্যক্তিত্ব। তিনি উসুলে ফিকহ এবং ইলমে নাহুরও ইমাম ছিলেন। ইলমে ফিকহে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তিনি মুজতাহিদ পর্যায়ের ফকিহ ছিলেন। ৬২০ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবি, ২২/১৬৫-১৭৩, জীবনী নম্বর: ১১২; আল-আ'লাম, যিরিকলি, ৪/৬৭)

উল্লেখ্য, ইবনে কুদামা নামে কয়েকজন আলেম প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন পূর্বোক্ত মুওয়াফফাক উদ্দিন ইবনে কুদামা। আরেকজন হলেন, তাঁরই বড় ভাই ও উস্তাদ আবু উমর মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি (৫২৮-৬০৭ হি.)। তিনিও শাইখুল ইসলাম উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বহু বিস্ময়কর গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ২২/০৫) আরেকজন হচ্ছেন মুওয়াফফাক উদ্দিন ইবনে কুদামা'র ভাতিজা শামসুদ্দিন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আবি উমর মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি আল-হাম্বলি (৫৯৭-৬৮২ হি.)। হাম্বলি ফকিহদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে: তাঁর চাচা মুওয়াফফাক উদ্দিন ইবনে কুদামা'র আল-মুকনি'

فالإيجاب أن يقول : بعتك أو ملكتك أو لفظ يدل عليهما والقبول أن يقول : اشتريت أو قبلت ونحوهما فإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي فقال : ابتعت منك فقال : بعتك صح لأن لفظ الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما به فصح كما لو تقدم الإيجاب.

'ইজাব হলো, 'আমি বিক্রয় করলাম' অথবা 'তোমাকে মালিক বানালাম' অথবা অনুরূপ অর্থ বোঝায় এমন কোনো কথা। আর কবুল হলো, 'আমি ক্রয় করলাম' অথবা 'গ্রহণ করলাম' অথবা এর সমার্থক কোনো কথা। যদি অতীতকালসূচক বাক্যের মাধ্যমে ইজাবের আগে কবুলের বাক্য ব্যবহার করে বলা হয়, 'আমি তোমার থেকে ক্রয় করলাম' এবং প্রত্যুত্তরে বিক্রেতা বলে 'আচ্ছা, বিক্রয় করলাম', তা হলেও বিক্রয়চুক্তি সহিহ হয়ে যাবে। কেননা, ক্রেতা ও বিক্রেতা থেকে এমন প্রক্রিয়ায় ইজাব ও কবুল পাওয়া গেছে, যার মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং আগে ইজাব হলে যেমনভাবে চুক্তি সহিহ হবে, এই চুক্তিটিও তেমন সহিহ হবে।'[৪৬]

শব্দের মর্মার্থের প্রতি লক্ষ করলে হানাফি মাযহাবের পরিভাষাটিকেই প্রাধান্য দিতে হয়। কারণ, কবুল শব্দটি পূর্বের কোনো বিষয় গ্রহণ করা বোঝায়। সুতরাং গ্রহণের আগে যদি প্রস্তাব না থাকে, তা হলে কীভাবে তার উপর 'গ্রহণ' শব্দের প্রয়োগ হবে? এটি কীভাবে বোধগম্য হবে যে, কবুল এমন জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত যা এখনও পর্যন্ত অস্তিত্বই লাভ করেনি? এ কারণে বর্তমানে সর্বক্ষেত্রেই হানাফি মাযহাবের পরিভাষার প্রচলন ঘটছে। হানাফি মাযহাবের পরিভাষা অনুযায়ীই 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়া'[৪৭] কিতাবে

কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আশ-শারহুল কাবির আলাল মুকনি' যা 'আশ-শাফি' নামেও পরিচিত এবং মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন। তিনি ইমাম শারফুদ্দিন ইয়াহইয়া আন-নববি (৬৩১-৬৭৬ হি.)-এর উস্তাদ ছিলেন। (দ্র. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, আল-আ'লাম এবং কিছু ইসলামি ওয়েবসাইট) –সম্পাদক

৪৬. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩। মিনাহুল জালিল : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬৩, আল-মুহাযযাব, আল্লামা শিরবিনি (রহ.) : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৬২।

৪৭. **মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়া :** (Journal of Justice Judgements) উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রণীত উসমানি সাম্রাজ্যের নাগরিক

ইজাব-কবুলকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সে সংজ্ঞাটি এরূপ–

الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، والقبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل انشاء التصرف، وبه يتم العقد.

'ইজাব হলো, কোনো জিনিসের মধ্যে অধিকার সৃষ্টির জন্য উভয় পক্ষের যে কোনো একপক্ষ হতে বলা প্রথম কথা। আর কবুল হলো, কোনো জিনিসের মধ্যে অধিকার লাভের জন্য উভয় পক্ষের যে কোনো এক পক্ষ হতে বলা দ্বিতীয় কথা। এই দ্বিতীয় কথাটির মাধ্যমেই চুক্তি সম্পন্ন হয়।'[৪৮]

* * *

আইনগ্রন্থ। আধুনিক সংবিধানগ্রন্থের আদলে রচিত এই আইনগ্রন্থটি সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বিশেষত আরব দেশগুলোতে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা ও সমাদর লাভ করে। তুর্কি খেলাফতের কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমের মাধ্যমে গঠিত বোর্ড কর্তৃক এটি প্রণীত হয়। বোর্ডের সভাপতি ছিলেন তৎকালীন উসমানি সালতানাতের খ্যাতনামা আলেম ও বুদ্ধিজীবী আল্লামা আহমাদ জেভদেত পাশা (১২৩৭-১৩১২ হি.=১৮২২-১৮৯৫ খ্রি.)। গ্রন্থের নিবন্ধগুলো ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে বিন্যস্ত, যাতে রেফারেন্স বুক হিসাবে এটি ব্যবহার করা সহজতর হয়। (বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ : পৃষ্ঠা-১৭৩, শামেলা সংস্করণ) –সম্পাদক

৪৮. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়া : ধারা-১০১, ১০২।
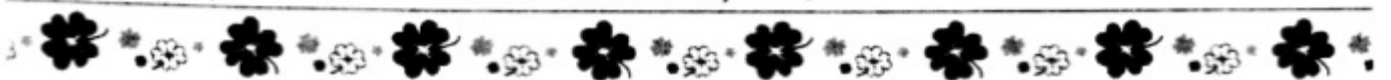
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইজাব-কবুলের বিধি-বিধান

ইজাব-কবুল সম্পর্কিত আলোচনাটি কয়েক ভাগে বিভক্ত– ইজাব-কবুলের শব্দবিশ্লেষণ, এ দুটির প্রয়োগবিধি, পারস্পরিক সামঞ্জস্য এবং সময় হিসাবে উভয়টির পারস্পরিক সম্পৃক্ততা। এখন আমরা এই ক্রমধারায় ইজাব-কবুলের বিধি-বিধানের সারকথা আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ।

৬. ইজাব-কবুলের শব্দ

ইজাব-কবুলের শব্দ এমন হতে হবে, যা বিনিময়ের ভিত্তিতে কোনো জিনিসের মালিক হওয়া ও বানানো বোঝায়। যেমন, বিক্রয় করলাম, ক্রয় করলাম, রাজি আছি, এই মূল্যে তোমাকে দিলাম, এই মূল্যে নাও, এই খাদ্যগুলো এত টাকায় খাও ইত্যাদি। সারকথা, 'বিক্রয় করলাম' তথা البيع শব্দে ইজাব-কবুল হওয়া শর্ত নয়; বরং এমন সব শব্দ দিয়েই বিক্রয় সংঘটিত হবে, পারিভাষিকভাবে যেগুলো মালিকানার অর্থ প্রকাশ করে। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন–

> وفي عرفنا يسمى بيع الثمار على الأشجار ضمانا فإذا قال : ضمنتك هذه الثمار بكذا، وقبل الآخر ينبغي أن يصح.
>
> 'আমাদের এলাকায় গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রয়কে "যামান" বলা হয়। সুতরাং কেউ যখন বলবে যে, 'এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এ ফলগুলো তোমাকে যামানত দিলাম', এরপর অন্যজন যদি সেটি কবুল করে, তা হলে এ ধরনের বিক্রয় সহিহ হওয়া উচিত।'[৪৯]

কেউ যদি অন্যকে বলে, 'এক হাজার টাকার বিনিময়ে এ জিনিসটি তোমাকে

৪৯. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৩৯, ফিকরা নং ২২২২১।

দান করলাম' এবং অপর পক্ষ বলল, 'আমি কবুল করলাম', তা হলে বিক্রয় সহিহ হয়ে যাবে। ক্রেতা যদি বলে, 'এত টাকায় এ জিনিসটি ক্রয় করলাম', আর বিক্রেতা বলল, 'আমি রাজি আছি', বা 'আমি কার্যকর করলাম, বা 'আমি অনুমতি দিলাম', তা হলে বিক্রয় সহিহ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, কেউ যদি অন্যকে বলে, 'আমার এ দাসটি তোমার ভালো লাগলে এক হাজার টাকায় তোমার কাছে বিক্রয় করলাম', উত্তরে অপর পক্ষ বলল, 'আমার ভালো লেগেছে', তা হলে সেটি বিক্রয় হয়ে যাবে। 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত আছে। একইভাবে কেউ যদি বলে, 'তোমার জন্য যদি ভালো হয়', উত্তরে অপর পক্ষ বলল, 'আমার জন্য ভালো হয়েছে'। কিংবা যদি বলে, 'তুমি যদি চাও' বা 'তুমি যদি আগ্রহী হও' উত্তরে অন্যজন বলল, 'আমি চাই' বা 'আমি আগ্রহী'– উত্তর হিসাবে এ ধরনের কথা বললে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। তবে প্রথমেই এ শব্দগুলো বললে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না।'[৫০]

৭. নীরব থাকা কবুল হিসাবে ধর্তব্য নয়

ইজাব-কবুলের বিষয়টি মৌখিক শব্দ বা কাজের মাধ্যমে হওয়া আবশ্যক। সেটি এভাবে যে, ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করবে, আর বিক্রেতা মূল্য নেবে। কিন্তু ইজাবের পর শুধু নীরব থাকা কবুল বলে সাব্যস্ত হবে না। কেননা, মূলনীতি হলো, নীরব-থাকা কারও সঙ্গে কোনো বক্তব্য সম্পৃক্ত করা যায় না। এ মূলনীতির ব্যাখ্যায় আল্লামা খালেদ আতাসি[৫১] (রহ.) বলেছেন–

---

৫০. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪। তবে ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন,

لو قال بعتك هذا بألف ان شئت فقال شئت لم يصح البيع بلا خلاف.

কেউ যদি অন্যকে বলে, 'তুমি যদি চাও তা হলে এক হাজার টাকায় তোমার কাছে এটি বিক্রয় করলাম।' উত্তরে সে বলল, 'আমি চাইলাম'। তা হলে বিক্রয়চুক্তি সহিহ হবে না–এ ব্যাপারে সকল ফকিহ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। (আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৭০) সারকথা হলো, কোনো শব্দের মাধ্যমে বিক্রয় হওয়ার বিষয়টি সামাজিক প্রচলনের ওপর নির্ভরশীল।

৫১. **আল্লামা খালেদ আতাসি :** মুহাম্মাদ খালেদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুস সাত্তার আল-আতাসি আল-হিমসি (রহ.)। জন্ম: ১২৫৩ হিজরি মোতাবেক ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে। সিরিয়ার হিমসের বংশোদ্ভূত খ্যাতনামা হানাফি ফকিহ। উসমানি সালতানাত কর্তৃক হিমসের প্রধান মুফতি হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁর পিতা মুহাম্মাদ আল-আতাসি এবং দাদা আবদুস সাত্তার আল-আতাসি (রহ.) উভয়েই হিমসের প্রধান মুফতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর ছেলে হাশেম আল-আতাসি ছিলেন সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী। তুর্কি সালতানাতের সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ (রহ.) তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। তিনি ১৩২৬ হিজরি মোতাবেক ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে

إن الشرع ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة على المقاصد، وما جعل للسكوت حكما يبنى عليه شيء، كما تبنى الأحكام على الألفاظ.

'শরিয়ত মানুষের লেনদেনকে এমন বক্তব্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে, যা তার মনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। নীরব থাকার ব্যাপারে এমন কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি যে, তার ওপর ভিত্তি করে শব্দের ওপর নির্ভরশীল ফয়সালার মতো কোনো জিনিসের স্পষ্ট ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত বোঝাবে।'[৫২]

তবে কিছু বিষয় এ মূলনীতির বাইরে রয়েছে। যেমন, বিয়ের ক্ষেত্রে কুমারী কন্যার নীরব থাকা তার সন্তুষ্টি বোঝায়। কিন্তু বিক্রয়চুক্তি সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, যেগুলো মূলনীতি বহির্ভূত। এ মূলনীতি অনুযায়ী বিক্রেতা যদি পত্রের মাধ্যমে ক্রেতার কাছে প্রস্তাব করে পত্রের শেষে লিখে দেয়: 'এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার থেকে যদি কোনো উত্তর না পাই, তা হলে তুমি কবুল করেছো বলে ধরে নেব এবং বিক্রয় চূড়ান্ত হবে।' কিন্তু পত্রে উল্লেখ-করা সময়ের মধ্যে প্রাপক তার কোনো উত্তর পাঠাল না, তা হলে এই বিক্রয়চুক্তি সহিহ হবে না। কারণ, শুধু নীরব থাকা কবুল প্রমাণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আর পত্র প্রেরকের জন্য প্রাপককে এমন বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করা জায়েয নেই, যে ব্যাপারে সে বাধ্য নয়।'

৮. অতীতকালসূচক শব্দের মাধ্যমে বিক্রয় হওয়া আবশ্যক কি না

এ ব্যাপারে সব ফিকহি মাযহাব একমত যে, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, ইজাব-কবুল উভয়টি অতীতকালসূচক শব্দে হতে হবে। উভয়টি ভবিষ্যৎকালসূচক বা একটি ভবিষ্যৎকাল ও অন্যটি অতীতকালসূচক হলে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে না।[৫৩] এ শর্তটি শুধু আরবি ভাষার সঙ্গে নির্দিষ্ট। কারণ, আরবি ভাষায় কোনো চুক্তি করার জন্য অতীতকালসূচক শব্দই ব্যবহার করা আবশ্যক। অন্যদিকে আরবি ভাষার 'মুযারের সিগাহ' (বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালসূচক শব্দ) শুধু বর্তমানের অর্থের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং তা

ইন্তেকাল করেন। তাঁর পর হিমসের প্রধান মুফতি হন তাঁর ছেলে শাইখ মুহাম্মাদ তাহের আফেন্দি। –সম্পাদক

৫২. শারহুল মাজাল্লা, আল্লামা খালেদ আতাসি (রহ.), ধারা নং ৬৭।

৫৩. আল-মুগনি, ইবনে কুদামা : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩, ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৫৬।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। আর ভবিষ্যৎকালসূচক শব্দের মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হয় না। কারণ, এ ধরনের শব্দের মাধ্যমে দরদাম অথবা ওয়াদা করা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আরবি ভাষায় বলবে, 'এ কাপড়টি আমার কাছে দশ টাকায় বিক্রয় করো,' এটি দরদাম করা হিসাবে গণ্য হবে। এরপর বিক্রেতা যখন বলবে, "أبيعك" (যার অর্থ : তোমার কাছে বিক্রয় করব), তখন সেটি বিক্রয় করার ব্যাপারে ওয়াদা হিসাবে ধর্তব্য হবে। সুতরাং আরবি ভাষার 'মুযারে ও আমরের' (বর্তমান-ভবিষ্যৎসূচক এবং নির্দেশসূচক) শব্দ কোনো চুক্তি সম্পন্ন হওয়া বোঝায় না। অতএব, আমরা বুঝতে পারলাম, শুধু অতীতকালসূচক শব্দই কোনো চুক্তি সম্পন্ন হওয়া বোঝায়।

এটা হলো আরবি ভাষার মূলনীতি। তবে যদি উভয়পক্ষ 'মুযারের' শব্দ ব্যবহার করে তারা দাবি করে যে, তাদের উদ্দেশ্য হলো বর্তমানকাল বোঝানো, ভবিষ্যৎকাল নয়, তা হলে সে ক্ষেত্রে বিক্রয় সহিহ হবে। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেছেন–

> واعلم أن عدم الانعقاد بالمستقبل هو إذا لم يتصادقا على نية الحال، أما إذا تصادقا على نية البيع في الحال فينعقد به في القضاء؛ لأن صيغة الاستقبال تحتمل الحال فيثبت بالنية.
>
> 'জেনে রাখা ভালো, "মুযারে"র শব্দের মাধ্যমে চুক্তি সম্পন্ন না-হওয়ার বিষয়টি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে উভয়পক্ষ বর্তমানকালের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ব্যাপারে একমত হবে না। উভয়পক্ষ যদি বর্তমানকালসূচক শব্দের মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন করার ব্যাপারে একমত হয়, তা হলে বিচারিক দৃষ্টিতে চুক্তি সম্পন্ন হবে। কারণ, "মুযারে"র শব্দ বর্তমানকালেরও সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং বক্তাদের নিয়তের মাধ্যমে বর্তমানকালের হুকুম সাব্যস্ত হবে।'[৫৪]

অন্যান্য ভাষায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের জন্য ভিন্ন শব্দ রয়েছে। চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়। যেমন, উর্দু, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় রয়েছে। এইসব ভাষায় ইজাব-কবুল অতীতকালসূচক শব্দের মাধ্যমে

---

৫৪. ফাতহুল কাদির ও রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৪০, ফিকরাহ-২২২২৪।

হওয়া আবশ্যক নয়; বরং বর্তমানকালসূচক শব্দের মাধ্যমেও চুক্তি করা জায়েয আছে। তবে এমন শব্দের মাধ্যমে চুক্তি সম্পন্ন হবে না, যেগুলো শুধু ভবিষ্যৎকাল বোঝানোর জন্য নির্দিষ্ট। কারণ, বর্তমানকালে চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য সেই শব্দের উৎপত্তি হয়নি; বরং সেক্ষেত্রে দরদাম ও ওয়াদা বোঝাবে। আবার এ ক্ষেত্রে এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যেগুলো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তি সম্পন্ন হওয়া বোঝায়। যেমন, ক্রেতা বলল, 'এক হাজার দেরহামের বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে এ পশুটি ক্রয় করছি।' উত্তরে বিক্রেতা বলল, 'নিয়ে নাও' অথবা 'মূল্য দাও', তা হলে এ ক্ষেত্রে বিক্রয় সহিহ হবে। কারণ, বিক্রেতার কথার মর্মার্থ হলো এমন– 'আমি কবুল করেছি, তাই তুমি সেটি নিয়ে নাও' বা 'আমি কবুল করেছি, সুতরাং মূল্য পরিশোধ করো'।

ভাষার ভিন্নতার কারণে যেহেতু চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার শব্দও ভিন্ন হয়ে থাকে, এ কারণে মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়া কিতাবে বিশেষ কোনো শব্দকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। কিতাবটির ১৬৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে–

الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد والقوم.

'বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইজাব-কবুল হলো এমন বিষয়, যা কোনো শহর বা এলাকার লোকদের প্রচলন অনুযায়ী চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য গঠিত দুটি শব্দের মাধ্যমে হয়ে থাকে।'

৯. ইজাব ও চুক্তির আহ্বানের মধ্যকার পার্থক্য

ইজাব-কবুলের ব্যাখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ যেসব শাখাগত মাসআলা আলোচনা করেছেন, সেখান থেকে বোঝা যায়, তাঁরা সেসব ক্ষেত্রকে 'ইজাব' হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন, যেখানে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা পক্ষকে উদ্দেশ্য করে প্রস্তাব দেওয়া হয়। যদিও অধিকাংশ ফিকহের কিতাবে এ শর্তটি এমন স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, তবে মালেকি মাযহাবে এমন একটি শাখাগত মাসাআলা পাওয়া যায়, যাতে অনির্দিষ্টভাবে সব মানুষের কাছেই প্রস্তাব দেওয়ার বৈধতা বোঝা যায়। আল্লামা দুসুকি (রহ.) বলেছেন–

وأما لو عرض رجل سلعته للبيع وقال: من أتاني بعشرة فهي له، فأتاه رجل بذلك، إن سمع كلامه أو بلغه، فالبيع لازم، وليس للبائع منعه،
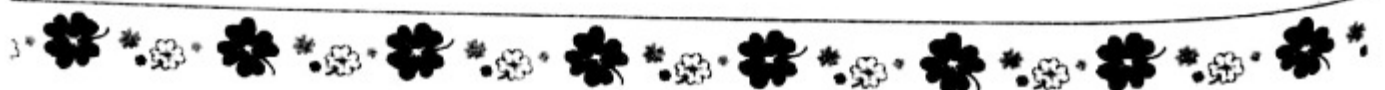
وإن لم يسمعه، ولا بلغه فلا شيء له، ذكره في نوازل البرزالي، ومثله في المعيار.

> 'কেউ যদি বিক্রয়ের জন্য তার পণ্য উপস্থিত করে বলে, 'যে ব্যক্তি দশ টাকা দেবে, সে এটি পাবে।' এরপর কেউ যদি তার কথা শুনে বা জানতে পেরে দশ টাকা নিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে বিক্রয়টি আবশ্যক হবে। বিক্রেতার জন্য বিক্রয় না-করার সুযোগ থাকবে না। আর আগন্তুক যদি বিক্রেতার কথা না-শোনে বা তার কাছে কথাটি না-পৌঁছায়, তা হলে (বিক্রেতা অস্বীকৃতি জানালে) সে ওই পণ্যটি নিতে পারবে না। "নাওয়াযিলুল বিরযালি" কিতাবে এটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং "মি'ইয়ার" এ-ও অনুরূপ রয়েছে।'[৫৫]

অন্য কোনো ফকিহ এ মাসআলার বিপরীত কোনো মাসআলা বর্ণনা না-করায় আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, অনির্দিষ্টভাবে সব মানুষের কাছেই প্রস্তাব পেশ করার সুযোগ আছে। তবে সে ক্ষেত্র শর্ত হলো, প্রস্তাবটি এমন স্পষ্ট হতে হবে, যা চুক্তির সংকল্প প্রমাণ করবে, শুধু ক্রয়ের প্রতি আহ্বান বোঝাবে না। উল্লিখিত মাসআলায় বিক্রেতার কথাটি ('যে ব্যক্তি দশ টাকা দেবে সে এটি পাবে') এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, সে তাৎক্ষণিকভাবে দশ টাকায় চুক্তি করার প্রতি আগ্রহী। এ মাসআলার ওপর ভিত্তি করে সমকালীন অনেক আলেম বলেছেন যে, কেউ যদি জনসম্মুখে তার পণ্য উপস্থিত করে তার সূচক দাঁড় করায়, তা হলে এটিকে প্রস্তাব হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে। চুক্তি করার যোগ্য কোনো ব্যক্তি সূচকের সঙ্গে একমত হলে সেক্ষেত্রে বিক্রয় আবশ্যক হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।

আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত অনেক আইনেই এ বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, সুইজারল্যান্ডের ফৌজদারি আইনের সাত নম্বর ধারা[৫৬] এবং ইরাকের বেসামরিক আইনের আশি নম্বর ধারা।[৫৭] তবে ব্রিটিশ আইন এর বিপরীত। নির্দিষ্ট মূল্য লিখে কোনো পণ্যকে জনসম্মুখে উপস্থাপনকে তারা আইনত

---

৫৫. হাশিয়াতুদ দুসুকি আলাশ শারহিল কাবির : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪, পরিচ্ছেদ: এমন জিনিসের মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে, যা সন্তুষ্টি বুঝায়।

৫৬. নযরিয়াতুল আকদ, প্রফেসর ডক্টর আবদুর রাযযাক সানহুরি, পৃষ্ঠা-২৫৬।

৫৭. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যা : ৬, পৃষ্ঠা-৯৮০. ড. কাফি-এর আলোচনা।
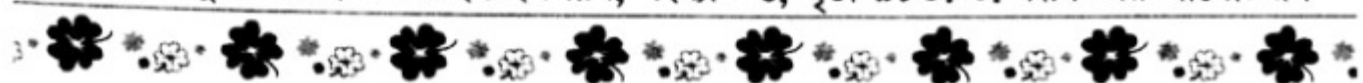
প্রস্তাব হিসাবে সাব্যস্ত করেনি, বরং ক্রয়ের আহ্বান হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে শুধু ক্রেতা কর্তৃক কবুল করার দ্বারা বিক্রয় সম্পন্ন হবে না; বরং ক্রয়ের ব্যাপারে ক্রেতার পক্ষ হতে প্রস্তাব আসা আবশ্যক এবং বিক্রেতা উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখবে। তবে বিক্রেতার পক্ষ থেকে যদি স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, প্রথমে যে ক্রেতা লিখিত মূল্য দেবে তার সঙ্গে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে, সেক্ষেত্রে বিক্রয় আবশ্যক হবে।[৫৮]

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, সর্বাবস্থায় পণ্য উপস্থিত করা প্রস্তাব হিসাবে সাব্যস্ত হবে না। তবে বিক্রেতার পক্ষ হতে যদি এমন কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যাতে পণ্য উপস্থিত করাকে প্রস্তাব বোঝায় (সেক্ষেত্রে বিক্রয় আবশ্যক হবে)। সেটি এভাবে যে, ক্রেতার পক্ষ থেকে কবুল করা ছাড়া সে বিক্রয় করতে চাচ্ছে না। পণ্য উপস্থিত করার অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেহেতু এ শর্তটি পাওয়া যায় না, সেহেতু সেগুলোকে প্রস্তাব হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে না; বরং ক্রয়ের আহ্বান হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি, রেডিও, টেলিফোনের মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলোও প্রস্তাব নয়। সেগুলো চুক্তির প্রতি আহ্বান। সুতরাং এসব বিজ্ঞপ্তি ও সূচকের ওপর আস্থা রেখে কেউ যদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে যায়, তা কবুল করার ব্যাপারে বিক্রেতার স্বাধীনতা থাকবে। বিক্রেতা কবুল করা ছাড়া বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে না। যে ব্যবসায়ী মূল্য ঘোষণার পর চুক্তির সময় তা রক্ষা করে না, তার ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং ব্যাবসায়িক নীতি ভঙ্গ করার হুকুম প্রযোজ্য হবে; কিন্তু সে কবুল করা ছাড়া চুক্তি সম্পন্ন হবে না।[৫৯]

---

৫৮. CHITTY: ON CONTRACTS V-1, P.48 ED. 1977

৫৯. United Nation's Convention on Contracts for the International Sale of Goods. এর ১4 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে–

১. A proposal for concluding a contract addressed to one or more specific persons constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of acceptance. A proposal is sufficiently definite if it indicates the goods and expressly or implicitly fixes or makes provision for determining the quantity and the price.

২. A proposal other then one addressed to one or more specific persons is to be considered merely as an invitation to make offers, unless the contrary is clearly indicated by the person making the proposa খণ্ড-(CISG Article 14).

তবে মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং হাউজের মাধ্যমে সবার জন্য উন্মুক্ত ঘোষণাকে প্রস্তাব হিসাবে সাব্যস্ত করা যেতে পারে। যেখানে কোনো ব্যক্তি কম্পিউটারের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে প্রস্তাব দেয়। যারাই এই প্রস্তাব পড়বে, তাদের প্রত্যেকের জন্য এটি উন্মুক্ত প্রস্তাব, ক্রয়ের জন্য শুধু আহ্বানপত্র নয়। আর এই পদ্ধতিকে কেবল সেখানকার নিয়ম অনুযায়ীই জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত প্রস্তাব হিসাবে গণ্য করা হবে। সুতরাং কম্পিউটারের মাধ্যমে যে ব্যক্তি তার কবুলকে রেজিস্ট্রেশন করবে, তার সঙ্গেই বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে।[৬০] এতে প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আর কোনো এখতিয়ার থাকবে না।

১০. ইজাব-কবুল সম্পন্ন করার পদ্ধতি

ইজাব-কবুল সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, সরাসরি তথা উভয় পক্ষ চুক্তি সম্পন্ন করার মতো কোনো শব্দ উচ্চারণ করা। কিন্তু উভয় পক্ষের কোনো একজন যদি বাকপ্রতিবন্ধী হয়, তা হলে তার পক্ষ হতে বোধগম্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট হবে। এ ক্ষেত্রে সে লিখতে সক্ষম হোক বা না হোক একই হুকুম হবে। কারণ, বাকপ্রতিবন্ধীর জন্য তার ইশারাই সর্বক্ষেত্রে সরাসরি কথার স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং ইজাব-কবুলের জন্য তাকে লিখতে বাধ্য করা আবশ্যক নয়।[৬১]

তবে যদি কথা বলতে সক্ষম হয়, সে ক্ষেত্রে শুধু ইশারার মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে না।[৬২] হাফিযুল হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেছেন–

أما القادر على النطق، فلا تقوم إشارته مقام النطق عند الأكثرين.

'অধিকাংশ আলেমের মতে কথা বলতে সক্ষম ব্যক্তির ইশারা তার কথার স্থলাভিষিক্ত হবে না।'[৬৩]

---

৬০. তবে সেক্ষেত্রে বিক্রয় সহিহ হওয়ার অন্যান্য শর্ত প্রযোজ্য হবে।

৬১. ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন–

يصح بيع الاخرس وشراؤه بالاشارة المفهومة وبالكتابة بلا خلاف للضرورة.

প্রয়োজনবশত বাকপ্রতবন্ধী ব্যক্তির পক্ষ থেকে বোধগম্য ইশারার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা সহিহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। (আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৭১) ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.)-এর 'আল-মুগনি' কিতাবেও অনুরূপ রয়েছে। খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৯।

৬২. দুরারুল হুক্কাম, আল্লামা আলি হায়দার (রহ.) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২২।

৬৩. ফাতহুল বারি, অধ্যায়: তালাক, লেয়ান অনুচ্ছেদের আগে : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৩৮।

আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) ইমাম যাহেদি'র 'আল-হাবি' কিতাব হতে বর্ণনা করেন, ক্রেতা-বিক্রেতা ছাড়া তৃতীয় কেউ যখন অন্যের মাল বিক্রয় করার পর মালিক তা জানতে পারে এবং চিন্তা করার জন্য নীরব থাকে, এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি বলল, 'আপনি কি আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন?' এ কথার উত্তরে মালিক বলল, 'হ্যাঁ,' তা হলে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর যদি মুখে হ্যাঁ বলার পরিবর্তে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ায়, তা হলে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। কেননা, কথা বলতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য মাথা নাড়ানো গ্রহণযোগ্য নয়। এরপর আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন, 'তবে এটাও বলা হয় যে, কেউ যখন বিক্রেতাকে বলবে, এই মূল্যে অমুক জিনিসটি আমার কাছে বিক্রয় করো, এ কথা শোনার পর বিক্রেতা মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ সূচক ইশারা করল। এরপর ক্রেতা বলল, আমি ক্রয় করলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে পণ্য হস্তান্তর সম্পন্ন হলো। তা হলে এক্ষেত্রে 'তাআতি' (মুখে শব্দ উচ্চারণ ছাড়া লেনদেন করা)-এর ভিত্তিতে বিক্রয় সহিহ হবে।'[৬৪] সুতরাং এ ক্ষেত্রে কেবল 'তাআতি'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় সম্পন্ন হলো, ইশারার মাধ্যমে নয়।

১১. চিঠিপত্র ও ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে বিক্রয় করা

পত্র ও দূতের মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন করা জায়েয। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন, পত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করার পদ্ধতি হবে এমন: বিক্রেতা লিখবে, 'পরকথা হলো, আমার অমুক দাসটি তোমার কাছে বিক্রয় করছি।' প্রাপকের কাছে পত্র পৌঁছানোর পর যে মজলিসে পত্র পাবে, সে মজলিসেই তাকে বলতে হবে যে, 'আমি ক্রয় করলাম'। তা হলে তাদের মধ্যকার বিক্রয়চুক্তিটি সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর দূত পাঠানোর নিয়ম হলো, বিক্রেতা কোনো একজন দূতকে এ কথা বলে পাঠাবে যে, 'আমি এ পণ্যটি অমুক (অনুপস্থিত) ব্যক্তির কাছে এক হাজার টাকায় বিক্রয় করছি। সুতরাং তুমি তার কাছে গিয়ে তাকে এটি জানিয়ে দাও।' এরপর দূত সে ব্যক্তির কাছে গিয়ে ওই কথাটি জানানোর পর ক্রেতা শোনার মজলিসেই প্রস্তাবটি কবুল করবে। (এভাবে দূতের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে)[৬৫] ... পত্রের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়টি উভয়পক্ষ থেকে হতে পারে।

---

৬৪. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৪০, ফিকরাহ নং ২২২২১।

৬৫. সম্পাদক

সুতরাং কোনো ক্রেতা যদি লিখে পাঠায় যে, 'এই মূল্যে তোমার অমুক দাসটি আমি ক্রয় করলাম।' এরপর বিক্রেতা পত্রের মাধ্যমে তাকে জানায় যে, 'আমি সেটি বিক্রয় করলাম,' তা হলে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। 'ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া'য় মাসআলাটি বর্ণিত আছে।'[৬৬]

এটির ওপর টেলিগ্রাম ও ফ্যাক্সের মাসআলাকে কিয়াস করতে হবে। এগুলোর মাধ্যমে ইজাব-কবুল সম্পন্ন করা জায়েয। তবে শর্ত হলো, সব ধরনের জালিয়াতি মুক্ত হতে হবে। মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি, জেদ্দা-এর ৬/৩/54 নম্বর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে–

> إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الأخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسوب الآلي (الكمبيوتر)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله ... وما يتعلق باحتمال التزييف، أو التزوير، أو الغلط، يُرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.
>
> 'যখন ভিন্ন জায়গায় থাকা দুই ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং তাদের কেউ সরাসরি অন্যকে দেখতে বা তার কথা শুনতে পায় না, আর তাদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হলো, চিঠি-পত্র বা দূত, বৈদ্যুতিক যোগাযোগ, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স ও কম্পিউটারের স্ক্রিনের ক্ষেত্রেও এই হুকুম প্রযোজ্য –এক্ষেত্রে যার কাছে ইজাব করা হচ্ছে, তার কাছে ইজাব পৌঁছানোর পর সে কবুল করলে চুক্তি সম্পন্ন হবে। ... আর বিকৃতি, জালিয়াতি ও ভুল ইত্যাদি সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের সাধারণ মূলনীতি অনুসৃত হবে।'[৬৭]

মোবাইল, টেলিফোন ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে চুক্তি করার বিষয়টি সরাসরি চুক্তি করার মতো। যদিও সেখানে একপক্ষ অন্য পক্ষকে দেখে না। কারণ,

---

৬৬. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৪৫, ফিকরাহ নং ২২২৪৪।

৬৭. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, ষষ্ঠ অধিবেশন, সংখ্যা : ৬, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১২৬৭-১২৬৮।

একপক্ষ অন্য পক্ষকে দেখা চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। ইমাম নববি (রহ.)[৬৮] বলেছেন–

ولو تناديا وهما متباعدان وتبايعا، صح البيع بلا خلاف.

'যদি দূরে থাকা দুইজন চিৎকার করে ক্রয়-বিক্রয় করে, তা হলে কোনো ধরনের মতানৈক্য ছাড়াই বিক্রয় সহিহ হবে।'[৬৯]

এ কারণে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি[৭০] তাদের পূর্বের সিদ্ধান্তের দুই নম্বর ধারায় এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছে। সেটি এরূপ–

إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين،

---

৬৮. **ইমাম নববি :** ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ ইবনে মুররি ইবনে হুসাইন আন-নাবাবি আশ-শাফেয়ি (৬৩১-৬৭৬ হি.)। উপাধি: মুহিউদ্দিন আবু যাকারিয়া। সিরিয়ার হাওরান নামক এলাকার নাওয়া নামক জায়গায় তাঁর জন্ম। এজন্যে তাঁকে বলা হয় নাওয়াওয়ি বা (সহজ বাংলা উচ্চারণে) নববি। একজন আলেম হিসাবে তাঁর মাঝে যত বিষয়ে পাণ্ডিত্যের সম্মিলন ঘটেছিল, তা সত্যিই বিরল। তিনি একাধারে ছিলেন ফকিহ, মুফতি, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ওয়ায়েজ, শাইখে তরিকত, ভাষাবিদ, আবেদ, যাহেদ, লেখক ও সাহিত্যিক। **রচনাবলি :** আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম (পাঁচখণ্ডে, যেটি আমাদের হিন্দুস্তানি সহিহ মুসলিমের নুসখার সঙ্গে ছাপা হয়), আত-তাকরিব ওয়াত তাইসির (মুসতালাহুল হাদিস), হিলইয়াতুল আবরার (যা আল-আযকার নামে প্রসিদ্ধ), রিয়াযুস সালিহিন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালিন, বুসতানুল আরিফিন, শারহুল মুহাযযাব লিশ শিরাযি (২৭ খণ্ডে সমাপ্ত), আল-আরবায়িন (নির্বাচিত চল্লিশ হাদিস), ইরশাদু তুল্লাবিল হাকায়েক লি মা'রিফাতি সুনানি খাইরিল খালায়েক (ইলমু মুসতালাহিল হাদিস) প্রভৃতি। ৬৭৬ হিজরিতে ৪৫ বছর বয়সে 'নাওয়া'তেই তিনি ইন্তেকাল করেন। (আল-ইমাম আন-নাবাবি, আবদুল গনি আদ-দাকার; কিমাতুয যামান ইনদাল উলামা, আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, পৃষ্ঠা-৭৩; তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান, যাহাবি: ১৫/৩২৪; আল-আ'লাম, যিরিক্‌লি: ৮/১৪৯) –সম্পাদক

৬৯. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, ইমাম নববি (রহ.), দারুত তবাআতিল মুনিরিয়্যাহ একাশনী থেকে প্রকাশিত : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৮১।

৭০. **মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি :** সমগ্র বিশ্বের খ্যাতনামা ও বরেণ্য উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে সমসাময়িক সমস্যার ইসলামি সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৭ খ্রি.=১৩৯৭ হি. সালে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক ফিকহ বোর্ড, যা রাবেতাতুল আলামিল ইসলামি কর্তৃক পরিচালিত। এর প্রধান: সৌদি আরবের প্রধান মুফতি ও হাইআতু কিবারিল উলামা বোর্ডের প্রধান শাইখ আবদুল আজিজ ইবনে আবদুল্লাহ আলে শাইখ, রাবেতাতুল আলামিল ইসলামি'র সেক্রেটারি জেনারেল: শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল কারিম আল ইসি, মাজমাউল ফিকহ এর সেক্রেটারি শাইখ ড. সালেহ ইবনে যাবিন আল-মারযুকি। উল্লেখ্য, গ্রন্থকার মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি (হাফিযাহুল্লাহ)-ও এই ফিকহ বোর্ডের একজন অন্যতম সদস্য। [মাজমা'র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট: عن المجمع الفقهي الإسلامي | المجمع الفقهي الإسلامي (themwl.org)] –সম্পাদক

وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء.

'যখন দূরবর্তী দুই জায়গায় থাকা দুই পক্ষের মধ্যে কোনো চুক্তি সম্পন্ন হবে–টেলিফোন ও বেতারযন্ত্রের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য–এরকম দুইজনের চুক্তিকে সামনাসামনি উপস্থিত দুইজনের চুক্তি হিসাবে গণ্য করা হবে এবং এক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের স্থিরীকৃত মৌলিক বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।'

কিন্তু দূরবর্তী দুইজনের চুক্তি–সেটি টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স অথবা টেলিফোন বা বেতার ডিভাইস–যার মাধ্যমেই হোক, এগুলো শুধু সেসব ক্ষেত্রে সহিহ হবে, যেখানে চুক্তির মজলিসে পণ্য কব্জা করা শর্ত নয়। যেসব ক্ষেত্রে চুক্তির মজলিসে উভয়টি (পণ্য ও মূল্য) কব্জা করা শর্ত, সেসব ক্ষেত্রে এসব যন্ত্রের মাধ্যমে চুক্তি সম্পন্ন হবে না। যেমন, বাইয়ে সরফের[৭১] বিষয়টি। তবে উভয়ের পক্ষ থেকে যদি অন্য পক্ষের কাছে হস্তান্তরের উকিল থাকে এবং প্রত্যেকের উকিল তার মুআক্কিলের পক্ষ থেকে অপর পক্ষের কাছে যোগাযোগের মজলিসেই হস্তান্তর করে অথবা যদি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যেকের দেশে চুক্তি সম্পন্ন হয়, যেখানে তাদের প্রত্যেকের কাছেই লেনদেনের রশিদ থাকে (তা হলে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরা হবে)। এ সম্পর্কিত আলোচনা সামনে আসবে– ইনশাআল্লাহ। যদি এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না-হয়, তা হলে এসব যান্ত্রিক যোগাযোগকে দরদাম করা অথবা বিক্রয়ের ওয়াদা বলে সাব্যস্ত করতে হবে এবং পরবর্তী কোনো সময়ে বিক্রয়ের শর্ত কব্জা (অর্থাৎ, মাল এবং মূল্য বুঝে পাওয়া)[৭২] পাওয়ার পর বিক্রয় সম্পন্ন হবে।

১২. ইজাব ও কবুলের মাঝে সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকা

চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য বিক্রীত পণ্য, তার পরিমাণ, গুণগতমান এবং মূল্যের

---

৭১. **বাইয়ে সরফ :** এমন বিক্রয়চুক্তি, যেখানে লেনদেনের উভয় বস্তুই এমন হয়, যা দ্বারা মূল্য পরিশোধ করা যায়। যেমন : কাগজের মুদ্রা, কয়েন, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির পারস্পরিক বিনিময়। আরবিতে যাকে বলা হয়: بيع النقد بالنقد । বাইয়ে সরফের ক্ষেত্রে বিক্রীত পণ্য এবং তার মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে হস্তগত করা শর্ত। (কাওয়ায়িদুল ফিকহ, আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী, পৃষ্ঠা-২১৪; মাউসুআতুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যাহ: ১/২/১৪৫) –সম্পাদক

৭২. সম্পাদক
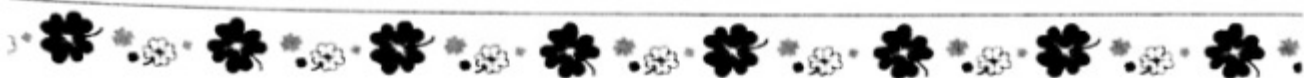
পরিমাণ, কী জাতীয় বস্তু দিয়ে মূল্য পরিশোধ করবে তা ও শর্তের ক্ষেত্রে ইজাবের সঙ্গে কবুলের মিল হওয়া ওয়াজিব। যখনই এগুলোর কোনো একটির ক্ষেত্রে ইজাবের সঙ্গে কবুলের মিল হবে না তখন চুক্তি সম্পন্ন হবে না। সুতরাং বিক্রেতা যদি বলে, 'দশ হাতের এই কাপড়টি দুইশত টাকায় তোমার কাছে বিক্রয় করছি,' তা হলে ক্রেতার পক্ষ থেকে সবগুলো বিষয়ের সঙ্গে একমত হয়ে কবুল করতে হবে। সেখান থেকে একশত টাকার বিনিময়ে পাঁচহাত কাপড় নিতে পারবে না, অথবা বর্ণিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বা ক্রেতা নিজের এখতিয়ার রেখেও কবুল করতে পারবে না। এ ধরনের কোনো একটি বিষয়ে ইজাবের সঙ্গে একমত না-হলে, বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে না। এমন করলে সেটিকে ক্রেতার পক্ষ থেকে নতুন ইজাব হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে এবং বিক্রেতার পক্ষ থেকে সেটি কবুলের অপেক্ষায় থাকবে। বিক্রেতা এই ইজাব কবুল করলে প্রথম ইজাব বাতিল বলে গণ্য হবে, আর ক্রেতার কথা নতুন ইজাব এবং বিক্রেতার সন্তুষ্টি কবুলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে চুক্তি সম্পন্ন হবে।[৭৩]

ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো একজন একসঙ্গে একাধিক পণ্যের ইজাব করে ভিন্নভাবে তার প্রত্যেকটির মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও এই মূলনীতিটি প্রযোজ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ : বিক্রেতা যদি বলে, 'এই তিনটি কাপড় বিক্রয় করছি, যার প্রত্যেকটির মূল্য একশত টাকা।' এ কথা শোনার পর ক্রেতা বলল, 'একশত টাকায় একটি কাপড় ক্রয় করলাম', তা হলে এ ক্ষেত্রে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না।[৭৪] কেননা, সমষ্টিগতভাবে তিনটি কাপড়ের ওপর ইজাব করা হয়েছে, সুতরাং কবুলটিও সমষ্টিগত হতে হবে। ক্রেতার পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাবে ভিন্নতা সৃষ্টি করা জায়েয নেই। এমন ভিন্নতা সৃষ্টি করাকে ফুকাহায়ে কেরাম تفريق الصفقة قبل التمام (বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার আগে প্রস্তাবে ভিন্নতা সৃষ্টি) নামে অভিহিত করেছেন। আল্লামা কাসানি (রহ.)[৭৫] বলেছেন—

---

৭৩. দুরারুল হুক্কাম, আল্লামা আলি হায়দার (রহ.) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৮।

৭৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪। মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ, ধারা নং ১৭৯।

৭৫. **আল্লামা কাসানি** : আবু বকর ইবনে মাসউদ ইবনে আহমাদ আল-কাসানি আল-হানাফি। উজবেকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কাযান নামক স্থানে তাঁর পিতৃপুরুষের আদি আবাসস্থল হওয়ায় তাঁকে "কাসানি" বা "কাশানি" বলা হয়। তাঁর উস্তাদগণ: আল্লামা আলাউদ্দিন সমরকন্দি, আবুল মুইন মাইমুন আল-মাকহুলি, মাজদুল আয়িম্মাহ সারখাকি (রাহিমাহুমুল্লাহ)

الصفقة إذا وقعت مجتمعة من البائع، لا يملك المشتري تفريقها قبل التمام؛ لأن من عادة التجار ضم الرديء إلى الجيد، ترويجا للرديء بواسطة الجيد، فلو ثبت للمشتري ولاية التفريق لقبل في الجيد دون الرديء فيتضرر به البائع، والضرر منفي؛ ولأن غرض الترويج لا يحصل إلا بالقبول فيهما جميعا فلا يكون راضيا بالقبول في أحدهما؛ ولأن القبول في أحدهما يكون إعراضا عن الجواب بمنزلة القيام عن المجلس.

'বিক্রেতার পক্ষ হতে যখন একসঙ্গে পুরো পণ্যটিই কেনার প্রস্তাব দেওয়া হবে, তখন চুক্তি সম্পন্ন করার আগে ক্রেতা প্রস্তাবে ভিন্নতা

প্রমুখ। তাঁর শিষ্যগণ: তাঁর পুত্র মাহমুদ ইবনে আবু বকর, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-গযনবি, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাওসিলি, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-ইয়ারসুখি (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। রচনাবলি: বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে (তাঁর উস্তাদ আল্লামা সামারকান্দি (রহ.) রচিত আত-তুহফা কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসাবে সাত খণ্ডের এই কিতাবটি তিনি রচনা করেন), আস-সুলতানুল মুবিন ফি উসুলিদ দীন প্রভৃতি। বাদায়েউস সানায়ে লেখার পর তাঁর উস্তাদ খুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে নিজ কন্যাকে বিয়ে দেন, যাঁর নাম ছিল ফাতেমা। তিনিও একজন বিদুষী নারী ছিলেন। এমনকি আল্লামা কাসানি (রহ.) তাঁর কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন। আল্লামা কাসানি (রহ.) তাঁর দেশে অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করেন। একসময় তিনি তাঁর সম্মানিতা স্ত্রীকে নিয়ে সেলজুকি সাম্রাজ্যে চলে যান। যে এলাকাটাকে আজ বলা হয় তুরস্ক। সেখানকার সেলজুকি বাদশাহ মাসউদ ইবনে কালাজ আরসালান সেলজুকি তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। তৎকালীন সিরিয়ার শাসক নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি (রহ.)-ও আল্লামা কাসানি (রহ.)-কে খুবই মর্যাদার চোখে দেখতেন। বিশেষ কারণে তিনি তুরস্ক থেকে আলেপ্পোতে চলে আসেন। সেখানকার ফুকাহায়ে কেরামের পরামর্শে নুরুদ্দিন জিনকি তাঁকে মাদরাসাতুল হালাবিয়্যাহতে অধ্যাপনার অনুরোধ জানান। তিনি তা গ্রহণ করেন। তিনি আলেপ্পো এবং রাক্কা'র বিভিন্ন দীনি প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন। সে সুবাদে তাঁর প্রচুর শিষ্য-শাগরেদ ও ভক্ত তৈরি হয়। আল্লামা বাসরাবি (রহ.) বলেন: "আল্লামা কাসানি (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত রুচিশীল ও লাজুক স্বভাবের ব্যক্তি। তিনি সবসময় উন্নত আরবি ঘোড়ায় সওয়ার হতেন। তিনি বলতেন : 'বীরের ওপর বীরই সওয়ার হয়।' অথচ তখনকার আলেমগণ বিনয়বশত কেবল খচ্চর বা গাধার ওপরই সওয়ার হতেন। তিনি বীরপুরুষ ছিলেন। সবসময় কাছে একটা বল্লম রাখতেন। তাঁর খাবারের মেন্যুতে সর্বদা ছোলা দিয়ে রান্না করা মাংস অবশ্যই থাকত।" আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা বলেন: "আল্লামা কাসানি (রহ.) প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাশীল, মানবিক এবং সুপুরুষ ছিলেন।" ইন্তেকাল : ৫৮৭ হিজরি মোতাবেক ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে। অসুস্থ অবস্থায় সুরা ইবরাহিম তেলাওয়াত করতে-করতে তিনি ইন্তেকাল করেন। (আল-আ'লাম: ২/৭০; আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৫৩; তাজুত তারাজিম, ইবনে কুতলুবুগা, পৃষ্ঠা-২০, ২৮; তবাকাতুল হানাফিয়্যাহ, আবদুল কাদের আল-কুরাশি : ২/২২, ২/৫১) –সম্পাদক
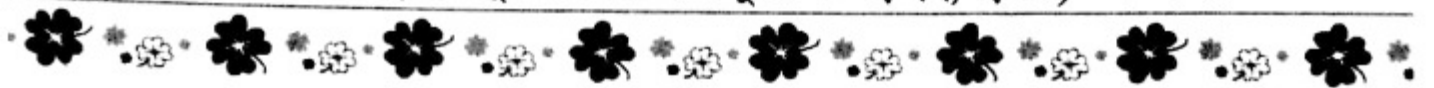
সৃষ্টি করতে পারবে না। কেননা, সাধারণত ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের পণ্যকে উৎকৃষ্টমানের পণ্যের সঙ্গে মিলিয়ে বিক্রি করে, যাতে নিম্নমানেরগুলোও বিক্রি হয়ে যায়। সুতরাং ক্রেতার জন্য যদি প্রস্তাবে ভিন্নতা সৃষ্টি করার অধিকার রাখা হয়, তা হলে খারাপটি রেখে সে ভালোটি গ্রহণ করবে, ফলে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর শরিয়তের নীতি হলো কাউকে ক্ষতির শিকার না-বানানো। কারণ, একসঙ্গে সবগুলো পণ্য গ্রহণ করা ছাড়া সব ধরনের পণ্য চালানোর উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। যার ফলে বিক্রেতা সবগুলো পণ্যের একটি অংশ ক্রেতার কবুল করার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে না। আর সামষ্টিকভাবে পণ্যের একাংশ কবুল করার অর্থ হলো, বিক্রেতার প্রস্তাবে রাজি না-হওয়া, যা চুক্তি সম্পন্ন করার আগেই মজলিস ত্যাগ করার অনুরূপ।'[৭৬]

তবে এমন ক্ষেত্রে ক্রেতার আংশিক গ্রহণকে তার পক্ষ হতে নতুন ইজাব হিসাবে সাব্যস্ত করা যাবে। তখন চুক্তি সম্পন্ন হওয়া বিক্রেতা কর্তৃক নতুনভাবে কবুল করার ওপর নির্ভর করবে।

১৩. অভ্যন্তরীণভাবেও ইজাব ও কবুলের সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকা

অনেক সময় অন্তর্গতভাবে ইজাব-কবুলের মিল হয়ে থাকে। বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার জন্য এমন সাদৃশ্য যথেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রেতার পক্ষ থেকে ইজাব দেওয়া হলো এবং ক্রেতার পক্ষ থেকে সে মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে কবুল করা হলো। বিক্রেতা যদি বলে, 'একশত টাকায় এই কাপড়টি তোমার কাছে বিক্রয় করছি', উত্তরে ক্রেতা বলল, 'একশত দশ টাকায় কবুল করলাম।' এ ক্ষেত্রে একশত টাকায় বিক্রয় সম্পন্ন হবে।[৭৭] কেননা, ক্রেতার পক্ষ থেকে একশত দশ টাকায় কবুল করার মধ্যে একশত টাকায় কবুল করার বিষয়টিও রয়েছে। ক্রেতা কবুল করার সময় যে পরিমাণ মূল্য বাড়িয়েছে সেটি পরিশোধ করা আবশ্যক নয়। তবে বিক্রেতা যদি ক্রেতার কবুল করার মজলিসে সেটি মেনে নেয়, তা হলে ক্রেতার পক্ষ হতে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক।

অনুরূপভাবে ক্রেতা যদি একটি নির্দিষ্ট মূল্যে ইজাব করার পর বিক্রেতা তার

---

৭৬. বাদায়েউস সানায়ে, পরিচ্ছেদ : চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২৩।
৭৭. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ, ধারা নং ১৭৮।

চেয়ে কম মূল্যে কবুল করে, তা হলে সে ক্ষেত্রে কম মূল্যে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। কারণ, অভ্যন্তরীণভাবে ইজাব-কবুলের মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া গেছে।

বিক্রেতার পক্ষ থেকে যে জাতীয় মূল্য প্রস্তাব করা হয়েছে, ক্রেতার পক্ষ থেকে সেটি ছাড়া অন্য কিছু বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য হবে। সুতরাং বিক্রেতা যদি বলে, 'একশত টাকায় এই কাপড়টি তোমার কাছে বিক্রয় করছি।' উত্তরে ক্রেতা বলল, 'একশত টাকা ও পাঁচটি সৌদি রিয়ালের বিনিময়ে তা ক্রয় করলাম।' এ ক্ষেত্রে একশত টাকার ওপর বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। ক্রেতার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পাঁচ রিয়াল পরিশোধ করা আবশ্যক হবে না। তবে বিক্রেতা যদি চুক্তির মজলিসে তার কথা কবুল করে নেয়, তা হলে তাও পরিশোধ করতে হবে। অনুরূপভাবে ক্রেতা যদি বলে, 'তোমার থেকে একশত টাকা ও পাঁচটি সৌদি রিয়ালের বিনিময়ে এই কাপড়টি ক্রয় করলাম,' উত্তরে বিক্রেতা বলে, শুধু একশত টাকায় তোমার কাছে বিক্রয় করলাম', এ ক্ষেত্রেও শুধু একশত টাকায় বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে।

তবে যদি ইজাব ও কবুলে উল্লিখিত মূল্যে কোনো ধরনের বৈপরীত্য থাকে, তা হলে সেটিকে অন্তর্গত সাদৃশ্য হিসাবে সাব্যস্ত করা যাবে না এবং বিক্রয়ও সম্পন্ন হবে না। এর উদাহরণ হলো, বিক্রেতা বলল, 'একশত টাকায় এই কাপড়টি তোমার কাছে বিক্রয় করলাম।' উত্তরে ক্রেতা বলল, 'পনেরোটি সৌদি রিয়ালের বিনিময়ে আমি কবুল করলাম।' এক্ষেত্রে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। পনেরোটি সৌদি রিয়ালের মূল্য একশত টাকা অপেক্ষা কম বা বেশি হোক। কেননা, টাকা ও রিয়ালের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, আর বিক্রেতা টাকা চেয়েছে, রিয়াল চায়নি। সুতরাং ইজাব-কবুলের মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়নি।[৭৮]

১৪. ইজাব ও কবুলের মধ্যকার সম্পর্ক

বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য ইজাব-কবুলের মধ্যে সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। এই সম্পর্কের জন্য দুটি বিষয় সংঘটিত হওয়া জরুরি :

১. কবুল হতে হবে ইজাবের উত্তরে। উত্তর ছাড়া যদি ভবিষ্যৎ কোনো সময়ে কবুল করা হয়, তা হলে সেটিকে কবুল হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে না, বরং সেটি নতুন একটি ইজাবে পরিণত হবে। এ মূলনীতি অনুযায়ী যায়েদ যদি আমরের কাছে লিখে পাঠায়, 'এক লক্ষ টাকায় আমার

৭৮. বিস্তারিত : দুরারুল হুক্কাম, আল্লামা আলি হায়দার (রহ.) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৯।

গাড়িটি তোমার কাছে বিক্রয় করলাম।' আমরের কাছে এই পত্র পৌঁছানোর আগে সে যায়েদের কাছে লিখে পাঠাল, 'এক লক্ষ টাকায় তোমার গাড়িটি ক্রয় করলাম।' প্রত্যেকে তার পত্র পাঠানোর পর অন্যের পত্র সম্পর্কে জানতে পারে। এমন ক্ষেত্রে যায়েদ ও আমরের কাছে উভয় পত্র পৌঁছানোকে বিক্রয় হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে না। তাদের প্রত্যেকের পত্র ইজাব হিসাবে থাকায় অপর পক্ষ সেটি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। তাদের কোনো একজন কবুল করা ছাড়া বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। কেননা, উভয় পত্র ইজাব হিসাবে পাঠানো হয়েছে এবং তারা উভয়ে জানে যে, সে অন্যের কবুলের মুখাপেক্ষী। আর অপর পক্ষ কবুল করার আগে ইজাব প্রত্যাহার করার সুযোগ রয়েছে। অপর পক্ষ তার অনুরূপ ইজাব দেওয়ার কারণে কারো থেকে প্রত্যাহারের অধিকার রহিত হবে না।

২. যৌক্তিক কোনো পদ্ধতিতে ইজাবের সঙ্গে কবুলকে সম্পৃক্ত করা সহিহ হতে হবে এবং সামাজিক রীতি অনুযায়ী এই সম্পৃক্ততার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, এমন কোনো কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটবে না। অবস্থার ভিন্নতার কারণে এই সম্পৃক্তিও ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং উপস্থিত দুইজনের মধ্যে চুক্তি হলে সেখানে সম্পর্কের বিষয় হলো চুক্তির মজলিস। বিক্রেতা ইজাব করলে ক্রেতার পক্ষ থেকে ওই মজলিসে কবুল করতে হবে। কবুল করার আগে মজলিস ভেঙে গেলে ইজাব বাতিল হয়ে যাবে। তখন ক্রেতার পক্ষ থেকে আগের ইজাবের ভিত্তিতে কবুল করা জায়েয হবে না। অতএব মজলিস ভেঙে যাওয়ার পর কবুল করলে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। মজলিস ভেঙে যাওয়ার পর কবুল করলে, সেটিকে নতুন ইজাব হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে, ফলে বিক্রেতার পক্ষ থেকে পুনরায় কবুল-সূচক কোনো কথা বলার ওপর সেটি নির্ভর করবে। অনুরূপভাবে যদি ক্রেতার কবুল ও বিক্রেতার প্রত্যাহার এক সঙ্গে হয়, তা হলে ইজাব বাতিল হয়ে যাবে এবং ওই কবুলের মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না।[৭৯]

---

৭৯. শায়েখ খালেদ আতাসি (রহ.)-এর শারহুল মাজাল্লাহ, ধারা নং ১৮৪, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া'র সূত্রে।
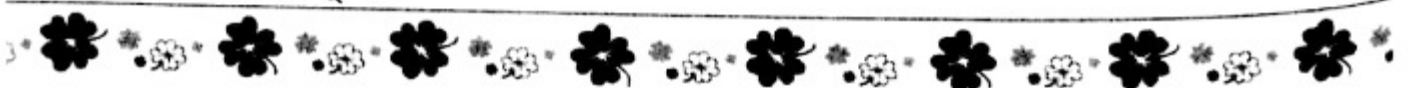
১৫. চিঠিপত্র, ইমেইল, টেক্সট মেসেজ ও প্রতিনিধির মারফত বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন

যদি দুজন অনুপস্থিত (দূরবর্তী) ব্যক্তির মধ্যে পত্রের মাধ্যমে চুক্তি হয়, তা হলে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে পত্র বা দূত পৌঁছানোর মজলিসটি বিবেচ্য হবে। আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন–

أما الرسالة فهي أن يرسل رسولا إلى رجل، ويقول للرسول : إني بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا، فاذهب إليه، وقل له : إن فلانا أرسلني إليك، وقال لي : قل له : إني قد بعت عبدي هذا من فلان بكذا فذهب الرسول، وبلغ الرسالة فقال المشتري في مجلسه ذلك : قبلت انعقد البيع؛ لأن الرسول سفير، ومعبر عن كلام المرسل ناقل كلامه إلى المرسل إليه فكأنه حضر بنفسه فأوجب البيع، وقبل الآخر في المجلس.

وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل أما بعد فقد بعت عبدي فلانا منك بكذا فبلغه الكتاب فقال في مجلسه : اشتريت؛ لأن خطاب الغائب كتابه فكأنه حضر بنفسه، وخاطب بالإيجاب، وقبل الآخر في المجلس.

'দূত পাঠিয়ে বিক্রয়চুক্তি : কেউ এ কথা বলে কারো কাছে দূত পাঠাল যে, 'এত মূল্যে আমার এই দাসকে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করছি,' তুমি তার কাছে গিয়ে বলো, 'এ কথা বলে অমুক আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে যে, 'তুমি তাকে বলবে, 'এই মূল্যে আমার এই দাসকে অমুক ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করছি, যে অনুপস্থিত।' এ কথা শোনার পর দূত তার কাছে গিয়ে সংবাদ দিলে ক্রেতা শোনার মজলিসে বলল, 'আমি কবুল করলাম', এর দ্বারা বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা, দূত শুধু সংবাদ পৌঁছে দেয় এবং তার প্রেরকের কথা উপস্থাপন করে। প্রেরকের কথাকে প্রাপকের কাছে উদ্ধৃত করে। সুতরাং যেন প্রেরক নিজেই উপস্থিত হয়ে বিক্রয়ের ইজাব করছে এবং অন্য পক্ষ একই মজলিসে তা কবুল করছে।
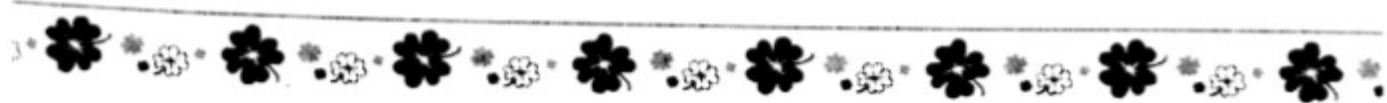
'পত্র পাঠিয়ে বিক্রয়চুক্তি : কেউ অন্যের কাছে এভাবে পত্র লিখল যে, 'পরকথা, আমার অমুক দাসকে এই মূল্যে তোমার কাছে বিক্রয় করছি,' তা হলে পত্র পৌঁছানোর পর ক্রেতা সেই মজলিসেই বলবে, 'আমি ক্রয় করলাম'। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্বোধন হলো পত্র। সুতরাং যেন সে নিজেই উপস্থিত হয়ে ইজাব করছে এবং অপর পক্ষ সেই মজলিসে কবুল করছে।'[৮০]

ইমাম গাযালি (রহ.) তাঁর 'ফাতাওয়া'য় বলেছেন–

إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه فقبل المكتوب إليه، ثبت له خيار المجلس مادام في مجلس القبول ... ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه، حتى لو علم أنه رجع عن الايجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه، صح رجوعه ولم ينعقد البيع والله أعلم.

'আমরা যখন পত্রের মাধ্যমে বিক্রয় করাকে সহিহ বললাম, তখন কোনো বিক্রেতা ক্রেতার কাছে পত্র লিখলে ক্রেতা কবুলের মজলিসে থাকাকালীন তার কবুল করার অধিকার থাকবে।' ... 'পত্র লেখকের 'খিয়ার'[৮১] প্রাপকের 'খিয়ার' শেষ হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে। এমনকি প্রাপক তার মজলিস ত্যাগের আগে যদি জানতে পারে যে, প্রেরক তার ইজাব প্রত্যাহার করেছে, তা হলেও এই প্রত্যাহার সহিহ হবে এবং বিক্রয় সংঘটিত হবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।'[৮২]

এসব ফিকহি বক্তব্যের স্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো, পত্র পৌঁছানোর মজলিস শেষ হওয়া পর্যন্ত ইজাব বহাল থাকবে। প্রাপক পত্র পাবার মজলিসে যদি কবুল

---

৮০. বাদায়েউস সানায়ে : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৩৮।

৮১. **খিয়ার** : এখতিয়ার; অধিকার; স্বাধীনতা। ক্রেতা বা বিক্রেতা বিক্রয়চুক্তি কার্যকর করার বা বাতিল করার যে এখতিয়ার প্রাপ্ত হয়, তাকে বলে খিয়ার। আর 'খিয়ারে শর্ত' অর্থ হচ্ছে, কেউ কারো থেকে এ কথা বলে বিক্রয়চুক্তি করল যে, এখন আমি মালটি ক্রয় করছি, কিন্তু পরে যদি আমি চাই তা হলে চুক্তি রহিত করে মালটি তোমাকে ফেরত দিতে পারব এবং তুমিও আমাকে তার বিক্রয়মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। অন্য কথায়, বিক্রয়চুক্তি বাতিলের যে এখতিয়ারের শর্ত করা হয় তা-ই খিয়ারে শর্ত। –সম্পাদক

৮২. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, ইমাম নববি (রহ.) : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৬৮। আরও দেখুন: কাশশাফুল কিনা, আল্লামা বুহুতি (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৭।
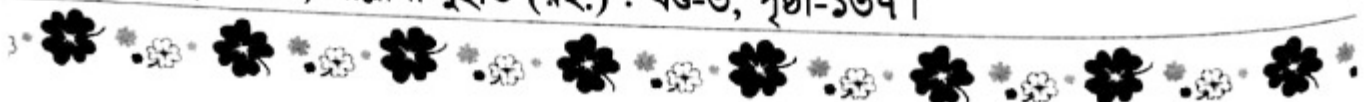
না-করে, তা হলে ইজাব বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং পরবর্তী সময়ে ওই ইজাবের ভিত্তিতে কবুল করা জায়েয হবে না। মজলিস ভিন্ন হওয়ার পর প্রাপক যদি চুক্তিতে সম্মতি জানিয়ে পত্র লেখে, তা হলে সেটিকে নতুন ইজাব হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে, যা বিক্রেতার পক্ষ থেকে কবুলের মুখাপেক্ষী থাকবে। তবে এ পদ্ধতিতে এমন কিছু সমস্যা রয়েছে, যা খুবই স্পষ্ট। কেননা, ইজাবকে চুক্তির মজলিস শেষ হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা হয়েছে, যাতে প্রতিপক্ষ চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। যেমনটি আল্লামা কাসানি (রহ.) তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করেছেন। আর চিন্তা-ভাবনার জন্য উপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে চুক্তির মজলিসই যথেষ্ট। কেননা, সাধারণত এমন মজলিস উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝে হয়ে থাকে এবং সে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। আর যদি মজলিস ভেঙে যায়, তা হলেও দুজন উপস্থিত মানুষের মধ্যে নতুন করে ইজাব করা সহজ। তবে পত্র পৌছানোর মজলিসের ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন। কারণ, অনেক সময় এমন ব্যস্ততার মধ্যে পত্র পৌছে যায়, পরিস্থিতিটি চিন্তা-ভাবনা করার জন্য যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে যদি মজলিস ভেঙে যায়, তা হলে তার পক্ষ থেকে নতুনভাবে ইজাব করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়।

তা ছাড়া উভয় পক্ষের উপস্থিতির ক্ষেত্রে মজলিসে কবুল করার বিষয়টি সহজ, তবে অনুপস্থিত পক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়টি এতটা সহজ নয়। কারণ, সেখানে এ বিষয়টি প্রমাণ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য যে, প্রাপক পত্র পৌছানোর মজলিসে কবুল করেছে, না কি পরে করেছে? ফলে এ ক্ষেত্রে সরাসরি চুক্তি ও পত্রের মাধ্যমে সংঘটিত চুক্তির মধ্যে পার্থক্য হওয়া উচিত।

সম্ভবত হানাফি মাযহাবের কোনো-কোনো ফকিহ পত্র-মারফত চুক্তি ও সরাসরি চুক্তির মধ্যে এই পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এ সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। শাইখুল ইসলাম খাহার যাদাহ (রহ.)[৮৩]

---

৮৩. **খাহার যাদাহ :** ইমাম শাইখুল ইসলাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আল-বুখারি (মৃ. ৪৮৩ বা ৪৩৩ হি.)। তিনি খাহার যাদাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। "খাহার যাদাহ" শব্দটি ফারসি। "খাহার" মানেঃ বোন। আর "যাদাহ" মানেঃ পুত্র। অর্থাৎ, খাহার যাদাহ মানেঃ ভাগ্নে। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত আলেম কাজি আবু সাবেত মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-বুখারি (রহ.) এর ভাগ্নে ছিলেন। তাই তাঁকে সেখানকার ভাষায় "খাহার যাদাহ" বা কাজি সাহেবের ভাগ্নে বলা হতো। তিনি মা ওয়ারা উন নাহ্‌র (Transoxiana বা মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তান ও কাজাখস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল) এর শাইখুল আহনাফ (হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের প্রধান) ছিলেন। তাঁকে বলা হতো জামানার "আবু হানিফা"।

তার 'আল-মাবসুত' কিতাবে লিখেছেন–

الكتاب والخطاب سواء إلا في فصل واحد، وهو أنه لو كان حاضرا فخاطبها بالنكاح، فلم تجب في مجلس الخطاب، ثم أجابت في مجلس أخر، فإن النكاح لا يصح، وفي الكتاب إذا بلغها وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذى قرأت الكتاب فيه، ثم زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدي الشهود، وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب، يصح النكاح، فصار بقاء الكتاب في مجلسه وقد سمع الشهود ما فيه في المجلس الثاني، لأن الغائب إنما صار خاطبا لها بالكتاب، والكتاب باق في المجلس الثاني، فصار بقاء الكتاب في مجلسه، وقد سمع الشهود ما فيه في المجلس الثاني، بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في مجلس أخر، فأما إذا كان حاضرا، فإنما صار خاطبا لها بالكلام، وما وجد من الكلام لا يبقي إلى المجلس الثاني، وإنما سمع الشهود في المجلس الثاني احد شطري العقد.

'একটি ক্ষেত্র ছাড়া সব জায়গায় সরাসরি সম্বোধন করে বিক্রয়চুক্তি

তাঁর জন্ম ও মৃত্যু ইমাম বুখারি (রহ.) এর শহর বুখারায়। তাঁর উস্তাদগণ: তাঁর পিতা, আবুল ফযল মানসুর ইবনে নসর আল-কাগাযি, আবু নসর আহমাদ ইবনে আলি আল-হাযেমি, হাকেম আবু উমর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আজিজ আল কানতারি, আবু সা'দ সায়িদ ইবনে আহমাদ আল-আসবাহানি (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। তাঁর শাগরেদগণ: তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ, উসমান ইবনে আলি আল-বাইকান্দি, উমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে লুকমান আন-নাসাফি (রাহিমাহুমাল্লাহ) প্রমুখ। রচনাবলি: আল-মাবসুত (১৫ খণ্ডে সমাপ্ত), আল-মুখতাসার, আত-তাজনিস প্রভৃতি। তাঁর সম্পর্কে আলেমদের মত: ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন: "তিনি ছিলেন সেই যুগের আবু হানিফা। (হাদিসশাস্ত্রে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার কারণে) উলামায়ে কেরাম ও ইমামগণ তাঁর থেকে হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি ইলমের সমুদ্র ছিলেন। তিনি ছিলেন মা ওয়ারা উন নাহ্‌রের সবচেয়ে বড় ফকিহ এবং শাইখুল আহনাফ।" ইমাম সামআনি (মৃ. ৫৬২ হি.) বলেছেন: "তিনি ছিলেন ইমাম, ইলমে নাহু বিশারদ, হানাফি মাযহাবের ইলমের সমুদ্র। তিনি বুখারায় হাদিস লেখাতেন। তাঁর সনদে আমার দুইজন উস্তাদ আমাকে হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন।" (আল-আ'লাম: ৬/১০০; আল-আনসাব লিস সামআনি: ২/৪১২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ১৯/১৪; আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, আল্লামা লাখনৌবি, পৃষ্ঠা-১৬৩; শাযারাতুয যাহাব: ৩/৩৬৬) –সম্পাদক

সম্পাদন ও পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করার বিধান একই রকম। সে ক্ষেত্রটি হলো, উপস্থিত থেকে যদি কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর সেই মজলিসে উত্তর না-দিয়ে অন্য কোনো মজলিসে উত্তর দেয়, তা হলে বিয়ে সহিহ হবে না। আর পত্রের ক্ষেত্রে তা পৌঁছানোর পর যদি পড়ে এবং পড়ার মজলিসে পত্রে লেখা ব্যক্তির সঙ্গে নিজেকে বিয়ে না-দিয়ে অন্য এক মজলিসে সাক্ষীদের সামনে নিজেকে তার সঙ্গে বিয়ে দেয় এবং সাক্ষীরা তার ও পত্রের কথা শোনে, তা হলে বিয়ে সহিহ হবে। সুতরাং পত্রটি উক্ত মজলিসে বহাল আছে এবং সাক্ষীগণ দ্বিতীয় মজলিসে পত্রের বিষয়বস্তু শুনছে। কারণ, অনুপস্থিত ব্যক্তি পত্রের মাধ্যমে তাকে প্রস্তাব দিয়েছে এবং দ্বিতীয় মজলিস পর্যন্ত পত্রটি বহাল রয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় মজলিস পর্যন্ত পত্রটি অবশিষ্ট থাকা এবং সাক্ষীগণ তার বিষয়বস্তু শ্রবণ করা ভিন্ন মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তি হতে বারবার প্রস্তাব আসার মতো হলো। এই সময় সে যদি উপস্থিত থাকত, তা হলে কথা বলে সরাসরিই প্রস্তাব দিত এবং তার কথাটি দ্বিতীয় মজলিস পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকত না, ফলে সাক্ষীরা দ্বিতীয় মজলিসে কেবল চুক্তির একটি অংশ শুনত।'[৮৪]

আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলেছেন–

وحاصله : أن قوله تزوجتك بكذا إذا لم يوجد قبول يكون مجرد خطبة منه لها، فإذا قبلت في مجلس آخر لا يصح بخلاف ما لو كتب ذلك إليها؛ لأنها لما قرأت الكتاب ثانيا وفيه قوله تزوجتك بكذا، وقبلت عند الشهود صح العقد كما لو خاطبها به ثانيا: وظاهره أن البيع كذلك وهو خلاف ظاهر الهداية فتأمل.

'সারকথা হলো: 'এই পরিমাণ মহরে তোমাকে বিয়ে করছি' এ কথাটির সঙ্গে কোনো কবুল না-পাওয়া গেলে, তা একপক্ষ থেকে শুধু বিয়ের প্রস্তাব হবে। মহিলা যদি ভিন্ন মজলিসে কবুল করে, তা হলে বিয়ে সহিহ হবে না। তবে কেউ যদি তার কাছে লিখে

৮৪. আল-বাহরুর রায়েক, আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯১।
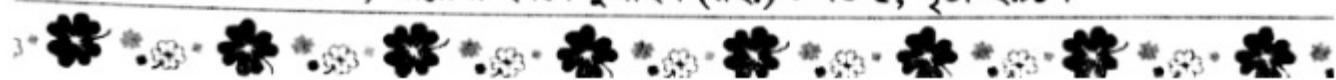
পাঠায়, তা হলে সে বিষয়টি এ হুকুমের বিপরীত হবে। কারণ, দ্বিতীয়বার 'এই পরিমাণ মহরে তোমাকে বিয়ে করছি' কথাটি পড়ে সাক্ষীদের সামনে কবুল করলে বিয়ে সহিহ হবে, যেমনিভাবে দ্বিতীয়বার প্রস্তাব দেওয়ার পর কবুল করলে সহিহ হতো। বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, বিক্রয়ের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তবে এ কথাটি 'হেদায়া' কিতাবের বক্তব্যের বাহ্যিক উদ্দেশ্যের বিপরীত। সুতরাং বিষয়টি চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে।'[৮৫]

আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) মাসআলাটিকে 'আল-মুহিত' এর সূত্রে বিবাহ অধ্যায়েও উল্লেখ করেছেন। 'আল-মুহিত' কিতাবে এই বক্তব্যের কারণ দর্শানো হয়েছে যে, পত্রটি দ্বিতীয় মজলিসে বিদ্যমান। সেটি পড়া উপস্থিত ব্যক্তির প্রস্তাবের মতো। তাই সেখানে ইজাব-কবুলের মধ্যে সাদৃশ্য হয়েছে। এরপর আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) এ ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে কিছু শাখাগত মাসআলা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এ কথার দাবি হলো, ইজাব-কবুলের মধ্যে সাদৃশ্য হওয়ার জন্য অবশ্যই দ্বিতীয় মজলিসে পত্রটি পড়তে হবে।'[৮৬] তবে আসল কথা হলো, এভাবে শাখা-প্রশাখা বের করা স্থানোপযোগী হয়নি। আমি লক্ষ করেছি, শাইখুল ইসলাম খাহার যাদাহ (রহ.) কবুল সহিহ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় বার পত্র পড়ার শর্তারোপ করেননি; বরং পত্রটি বাকি থাকার বিষয়টিকেই তিনি কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর সঠিক কথা হলো, ইজাব-কবুলের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য দ্বিতীয়বার পত্র পড়া আবশ্যক নয়। কেননা, ইজাব করা পত্রের প্রেরকের কাজ। প্রাপকের পড়ার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। শাইখুল ইসলাম (রহ.) যে কারণ দর্শিয়েছেন তার অর্থ হলো, প্রেরক তার ইজাবকে যখন পত্রে লিখেছে, এর অর্থ হচ্ছে, প্রাপক সেটি কবুল বা প্রত্যাখ্যান করা পর্যন্ত তার ইজাবকে বহাল রেখেছে। তাই প্রাপকের কাছে পত্র থাকার অর্থই হলো, তার কাছে ইজাব বহাল আছে। সুতরাং শুধু পত্র পৌছানোর মজলিস শেষ হওয়ার কারণে ইজাব বাতিল হবে না।

এই ব্যাখ্যাটি সবচেয়ে নিরাপদ। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে মানুষের লেনদেনের প্রতি লক্ষ করে বেশি নিরাপদ। কেননা, পূর্বের যুগে কোনো ব্যক্তি

---

৮৫. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৪৬, ফিকরাহ নং ২২২৪৫।

৮৬. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫১, ফিকরাহ নং ১১১৭৪।
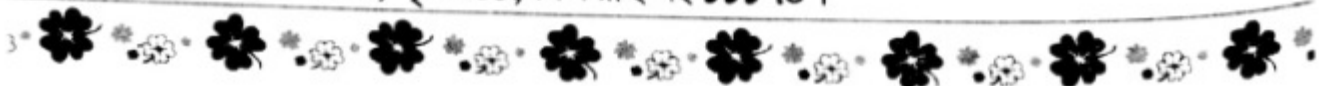
পত্র নিয়ে প্রাপকের কাছে আসত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই বাহককে প্রাপকের কাছ থেকে হ্যাঁ-সূচক বা না-সূচক উত্তর নেওয়ারও দায়িত্ব দেওয়া হতো এবং প্রেরককে সে উত্তরটি পৌঁছে দিত। বর্তমান যুগের অবস্থা হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাকপিয়ন, টেলিগ্রাম ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে পত্র পাঠানো হয়। এসব ক্ষেত্রে কোনো বহনকারীও থাকে না এবং পৌঁছানোর মজলিস হতে উত্তর নেওয়ার জন্যেও কেউ অপেক্ষায় থাকে না। এ কারণে শাইখুল ইসলাম খাহার যাদাহ (রহ.)-এর ব্যাখ্যাটি বর্তমান যুগের জন্য অধিকতর বাস্তবসম্মত। যতটুকু মনে হয়, এ বিষয়টি কুরআন-হাদিসের কোনো বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, তাই বর্তমান সময়ে এটি গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই। যদিও 'হেদায়া' ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত মাসআলার বাহ্যিক ব্যাখ্যার সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক। যেমনটি আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) স্পষ্ট করেছেন। এ কারণে সমকালীন অনেক ফকিহ এটিকে গ্রহণ করেছেন। যেমন, শাইখ আলি আল-খাফিফ (রহ.)।[৮৭]

১৬. ইজাব রহিত হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ

যখন এ বিষয়টি স্থির হলো যে, ডাকপিয়ন, টেলিগ্রাম ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রেরিত ইজাব পৌঁছানোর মজলিস শেষ হওয়ার সঙ্গে রহিত হবে না, তখন প্রশ্ন থাকে যে, কখন রহিত হবে? বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় যে, এ ক্ষেত্রে চারটি অবস্থার কোনো একটির মাধ্যমে ইজাব রহিত হবে। সেগুলো হলো:

১. প্রাপক সরাসরি বা পত্রের মাধ্যমে ইজাব প্রত্যাখ্যান করলে।

২. ইজাবকারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের শর্তারোপ করে, তা হলে ওই সময় শেষ হয়ে গেলে।

৩. প্রাপক কবুল করার আগে ইজাবকারী তার ইজাব প্রত্যাহার করলে।

৪. প্রাপক এত দীর্ঘসময় উত্তর না-দেওয়ার কারণে ইজাব রহিত হবে, সাধারণত যাতে ইজাব প্রত্যাখ্যান বোঝায়।

১৭. প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে ইজাব রহিত হওয়া

প্রথম ক্ষেত্র : প্রাপকের পক্ষ থেকে ইজাব প্রত্যাখ্যান করা। এ ক্ষেত্রে ইজাব

---

৮৭. আহকামুল মুআমালাতিশ শারইয়্যাহ, দারুল ফিকরিল আরাবি, পৃষ্ঠা-১৭৮, টীকা নং ২, ও পৃষ্ঠা-১৭৯, মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যা: ষষ্ঠ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ১০০৬, ১৪১০ হি.।
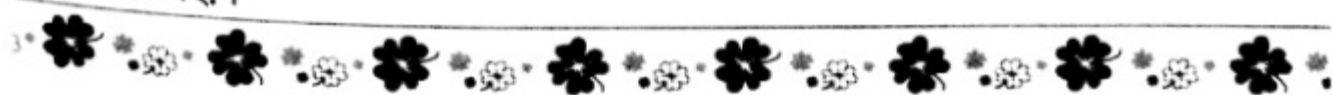
রহিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, তার উপকারার্থে ইজাব বহাল রাখা হয়েছিল। সুতরাং সে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হলো, তার অধিকার রহিত করল, ফলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। উপস্থিত দুইজনের চুক্তি সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, একজন ইজাব করার পর অন্য পক্ষ সেটি প্রত্যাখ্যান করলে মজলিস বাকি থাকা সত্ত্বেও ইজাব বাতিল হবে। 'ফাতাওয়ায়ে খানিয়া'য় বলা হয়েছে–

رجل قال لغيره : بعتك هذا بألف درهم، فقال لا أقبل بل أعطيته بخمسمائة، ثم قال قد أخذته بألف درهم، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إن دفعه إليه فهو رضا وإلا فلا.

'জনৈক ব্যক্তি অন্যকে বলল, 'এ জিনিসটি এক হাজার দিরহামে তোমার কাছে বিক্রয় করছি।' উত্তরে সে বলল, 'আমি কবুল করলাম না; বরং পাঁচশত দিরহামে দাও।' এরপর সে আবারও বলল, 'এক হাজার দিরহামে গ্রহণ করলাম।' এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, পণ্যটি যদি তার কাছে হস্তান্তর করে, তা হলে সেটি সন্তুষ্টি বলে গণ্য হবে, অন্যথায় সন্তুষ্টি মনে করা হবে না।'[৮৮]

মাসআলাটি এরকম হওয়ার কারণ হলো, ক্রেতার পক্ষ থেকে 'আমি কবুল করলাম না' বলে প্রথম ইজাবকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, ফলে তা রহিত হয়ে গেছে। এরপর ক্রেতার পক্ষ থেকে পাঁচশত দিরহামে ক্রয়ের নতুন ইজাব করা হয়েছে। তারপর আবারো প্রথম ইজাবে ফিরে যাওয়া হয়েছে। তাই ফুকাহায়ে কেরাম এটিকে তৃতীয় ইজাব হিসাবে সাব্যস্ত করে প্রথম ইজাবকারীর সন্তুষ্টি ছাড়া বিক্রয় আবশ্যক করেননি। আর প্রত্যাখ্যানের পর প্রথম ইজাব রহিত

---

৮৮. ফাতাওয়ায়ে খানিয়া, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-এর টীকা : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩১। ইমাম তাহতাবি (রহ.) বলেছেন–

إذا أوجب أحد المبايعين البيع فرد الثاني إيجابه يبطل الإيجاب فلو حصل القبول بعدئذ فلا ينعقد البيع.

কোনো বিক্রেতা বিক্রয়ের ইজাব করার পর অপরপক্ষ তা প্রত্যাখান করলে তার ইজাব বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং প্রত্যাখ্যানের পর কবুল পাওয়া গেলে বিক্রয় সংঘটিত হবে না।' শাইখ আলি হায়দার (রহ.) 'দুরারুল হুক্কাম' খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৪, কিতাবে এটি বর্ণনা করেছেন। দৃশ্যত, এই হুকুমটি নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য নেই বলেই অনুমিত হয়; যদিও হানাফি মাযহাবের কিতাব ছাড়া অন্যান্য কিতাবে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য আমি খুঁজে পাইনি।
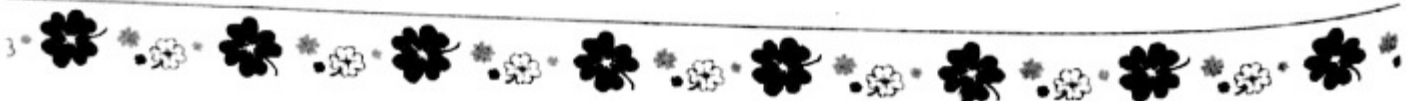
হওয়ার কারণে পরবর্তী কথাকে প্রথম ইজাবের কবুল হিসাবে সাব্যস্ত করেননি। যদিও এখানে মজলিস ভিন্ন হয়নি। অতএব এটি প্রমাণ করে যে, অপর পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যানের কারণে ইজাব রহিত হয়ে যায়।

১৮. মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে মেয়াদযুক্ত ইজাব রহিত হওয়া

দ্বিতীয় ক্ষেত্র : ইজাবকারী কবুলের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করে দিল। অর্থাৎ, সে ওই মেয়াদের মধ্যেই অপর পক্ষের কবুলের অধিকার সীমিত করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: সে পত্রে লিখল 'এই শর্তে তোমার কাছে এ জিনিসটি বিক্রয় করছি যে, শুক্রবারের মধ্যে সেটি কবুল করবে।' এ পদ্ধতিকে মেয়াদযুক্ত ইজাব নামে অভিহিত করা যায়। এ সম্পর্কে ফিকহের সাধারণ কিতাবে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাইনি। তবে হানাফি মাযহাবের ফকিহদের থেকে মোটামুটি স্পষ্ট কিছু বক্তব্য পেয়েছি, যা এ পদ্ধতির বৈধতা বোঝায়। আল্লামা ইবনে নুজাইম[৮৯] (রহ.) 'আল-বাহরুর রায়েক' কিতাবে বলেছেন–

ولو قال: "بعت منك بألف إن شئت يوما إلى الليل" كان تنجيزا لا تعليقا.

'কেউ যদি বলে, 'আজ রাতের মধ্যে যদি কবুল করো, তা হলে এক হাজার টাকায় এ পণ্যটি তোমার কাছে বিক্রয় করছি,' এমন বললে, সেটি বিক্রয়ের সম্মতি হবে, বিক্রয়কে শর্তযুক্ত করা হবে না।'[৯০]

---

৮৯. **আল্লামা ইবনে নুজাইম :** যাইনুদ্দিন ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ আল-হানাফি (রহ.)। ইবনে নুজাইম নামে খ্যাত। তিনি ছিলেন মিশরের খ্যাতনামা হানাফি ফকিহদের অন্যতম। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন: কাসেম ইবনে কুতলুবুগা, বুরহানুদ্দিন আল-কারকি প্রমুখ। প্রচুর কিতাবাদি রচনা করেছেন তিনি। বিশ্বব্যাপী মশহুর সেসব কিতাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আল-বাহরুর রায়েক ফি শারহি কানযুদ দাকায়েক, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, শারহুল মানার, আত-তা'লিক আলাল হিদায়াহ, আল-ফাতাওয়া আয-যাইনিয়্যাহ, আল-ফাওয়ায়িদুয যাইনিয়্যাহ প্রভৃতি। ৯৭০ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। (আল-আ'লাম : ৩/৬৪; শাযারাতুয যাহাব : ১/৫২২)

উল্লেখ্য, ইবনে নুজাইম নামে আরেকজন হানাফি ফকিহ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি হচ্ছেন, পূর্বোক্ত যাইনুদ্দিন ইবনে নুজাইম-এর আপন ভাই এবং ছাত্র সিরাজুদ্দিন উমর ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে নুজাইম (রহ.)। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে: আন-নাহরুল ফায়েক (কানযুদ দাকায়েক-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ), ইজাবাতুস সায়েল বি ইখতিসারি আনফায়িল ওয়াসায়েল প্রভৃতি। তিনি ১০০৫ হিজরি মোতাবেক ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল। (আল-আ'লাম : ৫/৩৯) –সম্পাদক

৯০. আল-বাহরুর রায়েক, আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৫।
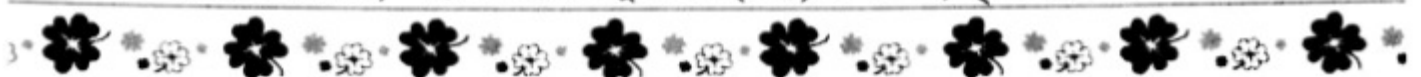
'ফাতাওয়ায়ে কাজিখান'-এ উল্লেখ আছে–

رجل قال لآخر : اذهب بهذه السلعة وانظر إليها اليوم فإن رضيتها فهي لك بألف درهم، فذهب بها جاز، وكذا لو قال : إن رضيتها اليوم فهي لك بألف درهم جاز، وهو بمنزلة قوله : بعت منك هذا العبد بألف درهم على أنك بالخيار اليوم.

'জনৈক ব্যক্তি অন্য একজনকে বলল, 'এ পণ্যটি নিয়ে যাও এবং একদিন সেটি দেখো। তুমি যদি সেটি নিতে আগ্রহী হও, তা হলে এক হাজার দিরহামে নিতে পারবে।' এরপর সে ওই পণ্যটি নিয়ে গেল। এ পদ্ধতিতে বিক্রয় করা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে যদি বলে, 'তুমি যদি আজকের মধ্যে গ্রহণ করো, তা হলে এক হাজার দিরহামে নিতে পারবে।' এটাও জায়েয। এ মাসআলাটি ওই মাসআলার মতো, যেখানে কেউ অপরকে বলে 'এক হাজার টাকায় এ দাসটি তোমার কাছে বিক্রয় করছি, তবে আজকের মধ্যে তা নেওয়ার ব্যাপারে তোমার এখতিয়ার থাকবে।'[৯১]

এ মাসআলা দুটি উল্লেখ করার পর 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া'তে বলা হয়েছে–

وهذا استحسان أخذ به علمائنا الثلاثة كذا في الذخيرة.

'এটি ইস্তিহসান।[৯২] আমাদের তিন ইমাম[৯৩] এই মত গ্রহণ করেছেন। 'যাখিরা' কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত আছে।'[৯৪]

---

৯১. ফাতাওয়ায়ে খানিয়া, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-এর সঙ্গে প্রকাশিত : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১২৮।

৯২. **ইস্তিহসান** : কিয়াসে শরয়ি ত্যাগ করে জনগণের জন্যে অধিকতর উপকারী কোনো পন্থা অবলম্বনের নাম হচ্ছে ইস্তিহসান। আবার কোনো-কোনো উসুলবিদের মতে: "ইস্তিহসান হচ্ছে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দলিলের কিয়াস।" এই সংজ্ঞানুযায়ী এর নাম ইস্তিহসান রাখার কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি কিয়াসে জলি (স্পষ্ট কিয়াসি বিধান)-এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। সুতরাং এটি যেন কিয়াসে মুস্তাহ্সান (উত্তম কিয়াস)। এই কথাটিই কেউ-কেউ এই ভাষায় ব্যক্ত করেছেন: "ইস্তিহসান হলো একটি কিয়াস ত্যাগ করে তার চেয়ে শক্তিশালী কিয়াস গ্রহণ করা।" আল্লামা বাযদাবি (রহ.) এর মতে ইস্তিহসান হলো কোনো বিষয়ের দুইটি কিয়াসভিত্তিক সিদ্ধান্তের একটি। (কাওয়ায়েদুল ফিকহ, আল্লামা আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী, পৃষ্ঠা-১৭১; ইরশাদুল ফুহুল, আল্লামা শাওকানী, ২/১৮১) –সম্পাদক

৯৩. **তিন ইমাম** : হানাফি মাযহাবের সর্বোচ্চ পর্যায়ের তিন ইমাম– ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রাহিমাহুমুল্লাহ)। –সম্পাদক

৯৪. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫।

অনুরূপভাবে ফিকহি মূলনীতির দাবি হলো, ইজাবকে মেয়াদযুক্ত করা সহিহ। কারণ, কবুলের সময় সীমিত বা দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে মেয়াদযুক্ত করা হয়। এখন সেটি যদি সীমিত করার জন্য করা হয়ে থাকে– যেমন, বিক্রেতা বলল, 'এ শর্তে তোমার কাছে বিক্রয় করছি যে, দুই মিনিটে সেটি কবুল করবে', এমন ইজাব করার উদ্দেশ্য হলো, দুই মিনিটের মধ্যে অপর পক্ষ থেকে কবুল না-পাওয়া গেলে বিক্রেতা তার ইজাব প্রত্যাহার করছে এবং সে তার ইজাব প্রত্যাহার করার ক্ষমতা রাখে। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে– ইনশাআল্লাহ। আর যদি কবুলের সময় দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে মেয়াদযুক্ত করা হয়। যেমন, তিন দিন বা এক সপ্তাহের জন্য মেয়াদযুক্ত করল, তা হলে এ ক্ষেত্রেও স্পষ্ট কথা হলো, তার জন্য মজলিস শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ইজাব প্রত্যাহারের অধিকার ছিল।[৯৫] সুতরাং সময় দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে সে নিজের অধিকার রহিত করার ক্ষমতা রাখে, অথবা বলা যায় যে, মেয়াদের মাধ্যমে ইজাবকে দীর্ঘায়িত করার অর্থ হলো, যেন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে বার-বার ইজাব করছে। আর তার জন্য এমনটি করার অধিকার আছে এবং এ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। অতএব, এটি স্পষ্ট হলো যে, ইজাবকে মেয়াদযুক্ত করার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই।

ইজাবকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মেয়াদযুক্ত করার অর্থ হলো, ইজাবের শুরু হতে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অপর পক্ষ ওই ইজাবের ভিত্তিতে কবুল করতে পারবে। ইজাবকারীর পক্ষ থেকে মেয়াদযুক্ত করার বিষয়টি হলো, নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তার ইজাব বহাল রাখার ওয়াদা। যুক্তিসঙ্গত কারণ না-থাকলে, ওই মেয়াদ পর্যন্ত তার ওয়াদা রক্ষা করা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে জরুরি। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ইজাব প্রত্যাহার করার ব্যাপারে বিচারিক দিক থেকে কোনো বাধা নেই। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মতানুযায়ী কবুল করার আগে ইজাব প্রত্যাহার করা জায়েয আছে। সুতরাং সে যদি মেয়াদযুক্ত করার মাধ্যমে চুক্তির মজলিসের পরও ইজাব বাকি রাখে, তা হলে এটি তার প্রত্যাহারের অধিকার রহিত করবে না।[৯৬]

---

৯৫. আল্লামা বাবারতি (রহ.) বলেছেন, মজলিস শেষ হওয়ার আগে সেটি (ইজাব) বাতিল করলে ক্রেতার জন্য তা কঠিন এবং মজলিসের পরবর্তী সময়ের জন্য দীর্ঘায়িত করলে বিক্রেতার জন্য তা কঠিন হয়ে যায়। আর শুধু মজলিসের ওপর মওকুফ করলে উভয়ের জন্য সহজ হয়। বিস্তারিত দেখুন: আল-ইনায়াহ, ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬০।

৯৬. প্রচলিত ব্রিটিশ আইন এ বিষয়টি গ্রহণ করে বলেছে, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইজাব দীর্ঘায়িত করা ইজাবকারীর ইজাব প্রত্যাহারের প্রতিবন্ধক নয়। যদিও সেই সময় শেষ হওয়ার আগে প্রত্যাহার করে, তা হলেও তা বৈধ। দেখুন: Chitty On Contracts, para-84.
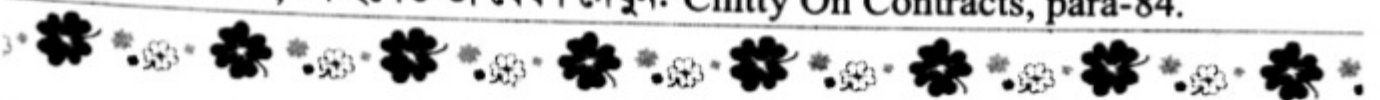
১৯. ইজাবকারী কর্তৃক ইজাব প্রত্যাহার করা

ইজাব রহিত করার তৃতীয় পদ্ধতি হলো, প্রাপক কবুল করার আগে প্রেরক ইজাব প্রত্যাহার করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের মতে এটি জায়েয। আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন–

إذا وجد أحد الشطرين من أحد المتبايعين، فللآخر خيار القبول، وله خيار الرجوع قبل قبول الآخر؛ لما روي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا عن بيعهما، والخيار الثابت لهما قبل التفرق عن بيعهما هو خيار القبول، وخيار الرجوع؛ ولأن أحد الشطرين لو لزم قبل وجود الآخر لكان صاحبه مجبورا على ذلك الشطر، وهذا لا يجوز.

'ক্রেতা বা বিক্রেতার কোনো একপক্ষ থেকে যদি একটি অংশ পাওয়া যায়, তা হলে অপর পক্ষের জন্য কবুল করার খিয়ার থাকবে। দ্বিতীয় পক্ষ কবুল করার আগে প্রথম পক্ষের জন্য প্রত্যাহারের অধিকার থাকবে। কারণ, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)-এর সূত্রে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'ক্রেতা-বিক্রেতা তাদের মজলিস হতে ভিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বাধীন।' মজলিস হতে ভিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত যে খিয়ার রয়েছে, তা হলো কবুল ও প্রত্যাহারের খিয়ার। কেননা, অপর পক্ষের মতামত পাওয়ার আগে যদি প্রথম পক্ষের জন্য চুক্তি আবশ্যক করে দেওয়া হয়, তা হলে প্রথম পক্ষ তার অধিকারের ব্যাপারে বাধ্য হয়ে পড়বে। আর এমনটি করা জায়েয নেই।'[৯৭]

ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন–

إذا وجد أحد شقي العقد من أحدهما اشترط إصراره عليه حتى يوجد الشق الآخر واشترط أيضا بقاؤهما على أهلية العقد، فلو رجع عنه قبل وجود الشق الآخر أو مات أو جن أو أغمي عليه بطل الإيجاب فلو قبل الآخر بعده لم يصح.

---

৯৭. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১৯।
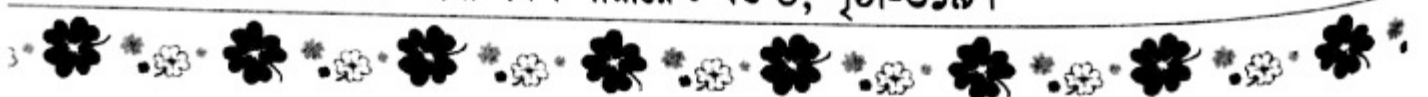
'ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো এক পক্ষ থেকে যখন বিক্রয়ের একটি অংশ পাওয়া যাবে, তখন দ্বিতীয় অংশ পাওয়া পর্যন্ত সেটি বহাল থাকার শর্তারোপ করা হবে। সেইসঙ্গে উভয়পক্ষ চুক্তিকারী হওয়ার যোগ্য থাকার বিষয়টিও শর্ত করা হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় অংশ পাওয়ার আগে যদি প্রত্যাহার করে, মারা যায়, পাগল বা বেহুঁশ হয়ে যায়, তা হলে ইজাব বাতিল হয়ে যাবে। এমনটি হওয়ার পর অপর পক্ষ কবুল করলে চুক্তি সহিহ হবে না।'[৯৮]

আল্লামা বুহুতি (রহ.) বলেছেন–

وصح تراخي أحدهما أي الإيجاب والقبول عن الآخر والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه أي البيع عرفا لأن حالة المجلس كحالة العقد لأنه يكتفي بالقبض فيه لما يعتبر فيه القبض فإن تفرقا عن المجلس قبل إتمامه أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل لأنهما أعرضا عنه فأشبه ما لو صرحا بالرد.

'কোনো একটিকে বিলম্বিত করা সহিহ আছে। অর্থাৎ, ইজাব-কবুলের কোনো একটিকে অন্যটি থেকে বিলম্বিত করা জায়েয আছে। তবে সেটি এমন অবস্থায় হতে হবে, যেখানে তারা উভয়ে এক মজলিসে থাকবে এবং এমন কোনো কাজে লিপ্ত হবে না, যেটিকে সামাজিক প্রচলন অনুযায়ী মজলিসের ভিন্নতা বলে মনে করা হয়। মজলিসের অবস্থা চুক্তির অবস্থা হিসাবে ধর্তব্য। কারণ, যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে কব্জা করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, সেসব ক্ষেত্রে মজলিসে কব্জা করলেই যথেষ্ট হবে। সুতরাং চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগে যদি তারা মজলিস ত্যাগ করে অথবা এমন কোনো কাজে লিপ্ত হয়, যেটিকে সামাজিক দৃষ্টিতে মজলিসের ভিন্নতা বলে বোঝায়, তা হলে সেটি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, তারা সেটি হতে বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যানের সদৃশ বলে গণ্য হবে।'[৯৯]

মালেকি মাযহাবের উলামায়ে কেরাম এ মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে

৯৮. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, ইমাম নববি (রহ.) : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৬৯।

৯৯. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত (দাকায়েকু উলিন নুহা লি শারহিল মুনতাহা) খণ্ড-২, পৃ.৬।

বলেছেন, ইজাব করার যোগ্য ব্যক্তি হতে ইজাব সম্পন্ন হওয়ার পর চুক্তি করার ব্যাপারে সে বাধ্য থাকবে এবং ইজাব প্রত্যাহার করা সহিহ হবে না। আল্লামা হাত্তাব[১০০] (রহ.) ইমাম ইবনে রুশদ[১০১] (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন–

لو رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر، لم يفده رجوعه، إذا أجابه صاحبه بعد بالقبول.

'যদি ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো একজন অপর পক্ষ কবুল করার আগে তার ইজাব প্রত্যাহার করে, তা হলে পরবর্তীতে অপর পক্ষ কবুল করলে তার প্রত্যাহার কোনো ফায়দা দেবে না।'

এরপর আল্লামা হাত্তাব (রহ.) বলেছেন–

وحكى القرطبي في تفسير قوله تعالى: -وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ- في ذلك خلافا،

---

১০০. **আল্লামা হাত্তাব :** মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রাহমান আর-রুআইনি আল-মালেকি আল-হাত্তাব (রহ.)। জন্ম : ৯০২ হিজরিতে মক্কায়। মাগরিবের মশহুর মালেকি ফকিহ ছিলেন। মালেকি মাযহাব অনুসারে বহু কিতাব রচনা করেছেন। যেমন, তাহরিরুল কালাম, মাওয়াহিবুল জালিল ফি শারহি মুখতাসারি খলিল, ইস্তিখরাজু আওকাতিস সালাহ বিল আ'মালিল ফালাকিয়্যাহ বিলা আ-লাহ প্রভৃতি। তিনি ৯৫৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। (আল-আ'লাম, যিরিকলি : ৭/৫৮) –সম্পাদক

১০১. **ইমাম ইবনে রুশদ :** মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশ্‌দ আবুল ওয়ালিদ আল-মালেকি আল-কুরতুবি (রহ.)। জন্ম : ৪৫০ হিজরিতে মুসলিম স্পেনের কর্ডোভায়। মালেকি মাযহাবের বরিত ফকিহ ও মুফতি ছিলেন। কর্ডোভায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বহুগ্রন্থ প্রণেতা। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি: আল-মুকাদ্দামাত আল-মুমাহ্‌হাদাত, আল-বায়ান ওয়াত তাহসিল, মুখতাসারু শারহু মাআনিল আছার লিত তাহাবি, আল-ফাতাওয়া, ইখতিসারুল মাবসুত, আল-মাসায়েল প্রভৃতি। ৫২০ হিজরি মোতাবেক ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভায় তিনি ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৯/৫০১-৫০২; আল-আ'লাম : ৫/৩১৬)

উল্লেখ্য, ইবনে রুশদ নামে দুজন ব্যক্তি প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। একজন হচ্ছেন উপর্যুক্ত ইবনে রুশদ, অন্যজন তাঁরই পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি আল-ফাইলাসুফ (রহ.)। তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ফকিহ ছিলেন। জন্ম : তাঁর পিতামহের ইন্তেকালের একমাস আগে ৫২০ হিজরিতে। ইন্তেকাল : ৫৯৫ হিজরিতে। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে: বিদায়াতুল মুজতাহিদ, আত-তাহসিল (ফি ইখতিলাফি মাযাহিবিল উলামা), মিনহাজুল আদিল্লাহ, জাওয়ামিউ কিতাবি আরাসতাতালিস (এরিস্টটলের রচনাসমগ্র), তালখিসু কিতাবি আরাসতু (এরিস্টটলের কিতাবের সারকথা), শারহু আরজুযাতি ইবনে সিনা, আল-কুল্লিয়্যাত (এটি লাতিন ও স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত) প্রভৃতি। এই দুই ইবনে রুশদ-এর মধ্যে পার্থক্য করণার্থে বলা হয় : 'ইবনে রুশদ আল-জাদ্দ' (পিতামহ) এবং 'ইবনে রুশদ আল-হাফিদ' (পৌত্র)। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২১/৩০৭-৩১০; আল-আ'লাম : ৫/৩১৭-৩১৮) –সম্পাদক

وظاهر كلامه أنه في المذهب رواية عن مالك، ولكن الجاري على المذهب ما ذكره ابن رشد.

> 'আল্লাহ তাআলার বাণী 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন'[১০২]-এর তাফসিরে ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, আলোচ্য ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তার কথা থেকে বোঝা যায়, এ সম্পর্কে মালেকি মাযহাবে ইমাম মালেক (রহ.) থেকে মত রয়েছে। তবে মালেকি মাযহাবে ইবনে রুশদ (রহ.)-এর মতের উপর আমল রয়েছে।'[১০৩]

তবে তাদের এ অবস্থানটি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিসের সঙ্গে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক মনে হয়। হাদিসটি হলো, 'ক্রেতা-বিক্রেতা তাদের মজলিস হতে ভিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বাধীন।' কিন্তু এখতিয়ারযুক্ত বিক্রয়টি এ বিধানের বিপরীত[১০৪]– চাই ভিন্ন হওয়া থেকে শারীরিক ভিন্ন হওয়া উদ্দেশ্য নেওয়া হোক (যেটা শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের মত) অথবা কথার ভিন্নতা উদ্দেশ্য নেওয়া হোক (যেটা হানাফি ও মালেকি মাযহাবের মত)। এ ব্যাপারে হাদিসটির বক্তব্য একেবারে স্পষ্ট যে, ইজাব-কবুল সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতার প্রত্যেকে প্রত্যাহার বা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে স্বাধীন। সুতরাং কীভাবে এ কথা বলা যায় যে, চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগে ইজাবকারী তার ইজাব প্রত্যাহার করতে পারবে না? তা ছাড়া ইজাবকারীর জন্য ইজাবকে আবশ্যক করে দিলে, সে যে সমস্যায় পতিত হয়, তা স্পষ্ট। অতএব, এ ব্যাপারে মালেকি মাযহাব অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের মতটি প্রাধান্য পাবে।

ফুকাহায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে, ইজাব প্রত্যাহারের জন্য অপরপক্ষ সেটি জানতে হবে। সুতরাং বিক্রেতা যদি বলে 'আমি প্রত্যাহার করলাম' আর ক্রেতা বিক্রেতার প্রত্যাহারের কথা না-শুনে সে বলে 'আমি ক্রয় করলাম', তা হলে বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। কিন্তু এ মাসআলাটি তখন প্রযোজ্য হবে,

---

১০২. সুরা বাকারা : আয়াত-২৭৫।

১০৩. মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪১।

১০৪. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২৮ (ফাতহুল বারির সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ)। অন্যান্য পাঁচ ইমামও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

যখন ইজাব সম্পর্কে অপর পক্ষ জানতে পারবে। অতএব, পত্র বা দূত প্রেরক পত্র বা দূত অন্য পক্ষের কাছে পৌঁছানোর আগে যদি তার ইজাব প্রত্যাহার করে, তা হলে তার প্রত্যাহার সহিহ হবে। অপর পক্ষ সে সম্পর্কে অবগত হোক বা না-হোক। এমনকি এভাবে প্রত্যাহারের পর অপর পক্ষ কবুল করলেও চুক্তি সম্পন্ন হবে না।[১০৫]

২০. দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পত্রপ্রাপকের নীরব থাকা

ইতঃপূর্বে আমরা এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছি যে, পত্রের ক্ষেত্রে কবুলের এখতিয়ার পত্র পৌঁছানোর মজলিসের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মজলিস শেষ হওয়ার পরও সেটি অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং ইজাব যদি নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে মেয়াদযুক্ত হয়ে থাকে, তা হলে ওই মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ইজাব রহিত হয়ে যাবে (বর্তমান সময়ের ইজাবকারীদের উচিত, ইজাবকে নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে মেয়াদযুক্ত করে দেওয়া)। অনুরূপভাবে কোনো এক পক্ষের প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে ইজাব রহিত হয়ে যাবে। তবে যদি এগুলোর কোনো একটি না-হয়, তা হলে কি অনন্তকালের জন্য ইজাব বহাল থাকবে? এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর হলো, ইজাবকে এভাবে রেখে দেওয়ার মধ্যে ইজাবকারীর ক্ষতির বিষয়টি স্পষ্ট। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী মহলে এ ধরনের ইজাবের জন্য যে পরিমাণ মেয়াদের প্রচলন রয়েছে, তার মধ্যেই কবুল করা আবশ্যক। এমন মেয়াদের পরও যদি অপর পক্ষ কবুল বা প্রত্যাখ্যান না-করে নীরব থাকে, তা হলে দীর্ঘ সময় নীরব থাকার কারণে ইজাব বাতিল হয়ে যাবে। ওই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তার ওপর নির্ভর করে অপর পক্ষের কবুল করার সুযোগ থাকবে না। আল্লামা কারাফি[১০৬] (রহ.)-এর বক্তব্য এ মতকে সমর্থন

---

১০৫. আল্লামা খালেদ আতাসি (রহ.), শারহুল মাজাল্লাহ, ধারা নং ১৮৪। খুলাসাতুল ফাতাওয়া ও ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়ার সূত্রে। আন্তর্জাতিক বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (CISG) এটি গ্রহণ করেছে। তার ১৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে-

১. An offer becomes effective when it reaches the offeree.

২. An offer, even if it is irrevocable, may be withdrawn if the withdrawal reaches the offeree before or at the same time as the offer.(CISG Article 15)

১০৬. **আল্লামা কারাফি :** আহমাদ ইবনে (আহমাদ ইবনে) আবুল আলা ইদরিস ইবনে আবদুর রাহমান আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দিন আল-কারাফি আল-মালেকি (রহ.)। মিশরের কারাফা–যেখানে ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মাজার রয়েছে–নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ
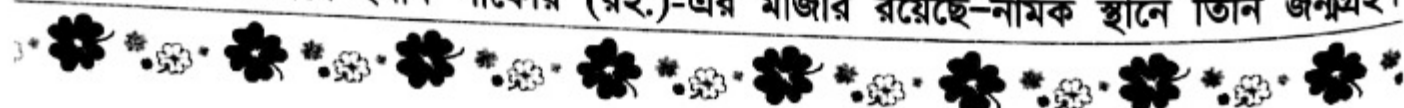
করে। তিনি বলেছেন–

وأما القسم الثاني الذي هو جزء السبب، فهذا لا يجوز تأخيره كالقبول بعد الإيجاب في البيع والهبة والإجارة، فلا يجوز تأخير هذا القسم إلى ما يدل على الإعراض منهما عن العقد، لئلا يؤدي إلى التشاجر والخصومات بإنشاء عقد آخر مع شخص آخر.

'দ্বিতীয় প্রকার–যেটি কারণের অংশবিশেষ, এমন বিষয়কে বিলম্বিত করা জায়েয নেই। যেমন : বিক্রয়, দান ও ভাড়ার ক্ষেত্রে ইজাব করার পর কবুল করা। এ ধরনের বিষয়ে এই পরিমাণ বিলম্ব করা জায়েয নেই, যেটি চুক্তি হতে বিমুখ হওয়া বোঝায়। যাতে করে অন্যের সঙ্গে নতুন চুক্তি করার কারণে সেখানে মনোমালিন্য ও বিবাদ না-হয়।'[১০৭]

অনুরূপভাবে ইমাম নববি (রহ.)-এর বক্তব্যও উপর্যুক্ত মতকে সমর্থন করে। তিনি বলেছেন–

قال أصحابنا : يشترط لصحة البيع ونحوه، أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول، وأن لا يتخللهما أجنبي عن العقد، فان طال أو تخلل، لم ينعقد، سواء تفرقا من المجلس أم لا، قال أصحابنا : ولا يضر الفصل اليسير، ويضر الطويل، وهو ما أشعر باعراضه عن القبول.

করেন। মিশরে মালেকি মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ফকিহ ছিলেন। তাঁর উস্তাদগণ: ইমাম ইযযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম (উস্তাযে খাস), কাজিউল কুযাত ইমাম শামসুদ্দিন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আল-মাকদিসি, ইমাম শারাফুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে ইমরান (রহ.) প্রমুখ। তাঁর ছাত্রগণ: আহমাদ ইবনে আবদুর রাহমান আত-তাদালি, কাসেম ইবনুশ শাত আল-আনসারি প্রমুখ। বহু কিতাব তিনি রচনা করেছেন। যেমন, আনওয়ারুল বুরুক ফি আনওয়ায়িল ফুরুক (চারখণ্ডে), আল-ইহকাম ফি তাময়িযিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম ওয়া তাসাররুফিল কাজি ওয়াল ইমাম, আয-যাখিরাহ, আল-ইয়াওয়াকিত ফি আহকামিল মাওয়াকিত প্রভৃতি। ইলমে ফিকহের পাশাপাশি জ্যোতির্বিদ্যাসহ বহুবিধ শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। ৬৮৪ হিজরি মোতাবেক ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে মিশরের দিরুত তিন নামক এলাকায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে কারাফায় দাফন করা হয়। (আল-মাউসুআতুল মুয়াসসারাহ ফি তারাজিমি আয়িম্মাতিত তাফসির : ১/১৩৮; আদ-দিবাজুল মুযাহ্হাব, পৃষ্ঠা-৩৮; আল-আ'লাম : ১/৯৪-৯৫; মু'জামুল মুফাসসিরিন : ১/২৮; সুল্লামুল উসুল : ১/১২৪) –সম্পাদক

১০৭. আল-ফুরুক লিল কারাফি : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭২-১৭৩, ১৬৬ নম্বর ফরক।
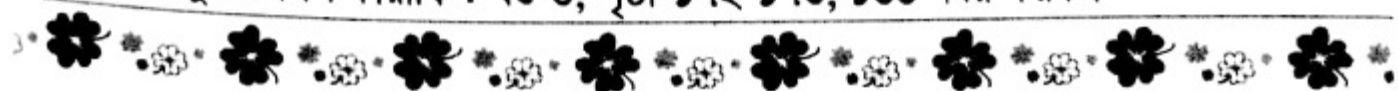
'আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেন, বিক্রয় ও অনুরূপ চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, ইজাব-কবুলের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান না হওয়া এবং চুক্তির মধ্যে ভিন্ন কারো অনুপ্রবেশ না-ঘটা। যদি দীর্ঘ ব্যবধান হয় অথবা ভিন্ন লোকের অনুপ্রবেশ ঘটে, তা হলে চুক্তি সম্পন্ন হবে না। চাই উভয়পক্ষ মজলিস ত্যাগ করুক বা না-করুক। আমাদের মাযহাবের উলামায়ে কেরাম আরও বলেন, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কোনো সমস্যা নেই। তবে দীর্ঘ ব্যবধান সমস্যা সৃষ্টি করবে। দীর্ঘ সময় বলতে সেটিকে বোঝাবে, যাতে কবুল হতে বিমুখ হওয়া বোঝা যায়।'[১০৮]

প্রচলিত এ মেয়াদের পরিমাণটি পণ্যভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেসব পণ্য দ্রুত নষ্ট হয়, যেমন, তাজা ফল, শাক-সবজি ইত্যাদি-এ ধরনের পণ্যের মেয়াদ সেসব পণ্য অপেক্ষা কম হবে, যেগুলো দ্রুত নষ্ট হয় না। সাধারণ পণ্য অপেক্ষা পরিমাণে বেশি ও বড় ধরনের পণ্য কবুলের মেয়াদও বেশি হবে। এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো সেই সামাজিক প্রচলন, যা বিচারিক ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয়।[১০৯]

২১. কখন ইজাব-কবুল সম্পন্ন হবে

ইজাব-কবুল সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিক্রয়চুক্তিও সম্পন্ন হবে। এটি এমন একটি সিদ্ধান্ত, যার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি। সরাসরি চুক্তির ক্ষেত্রে কবুল সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় না। যখনই ইজাবের মজলিসে সরাসরি দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের ইজাব কবুল করবে, তখনই কবুল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে। ফোনালাপের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

তবে ডাকপিয়ন, টেলিগ্রাম ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রেরিত পত্রের ক্ষেত্রে কবুল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য কতটুকু সময় নির্ধারিত হবে, এ বিষয়টি একাধিক সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং প্রাপক কর্তৃক 'গ্রহণ করলাম' শুধু এই কথা দ্বারাই কি কবুল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে? না কি কাগজে কবুল লেখার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে?

---

১০৮. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, ইমাম নববি (রহ.) : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৬৯।

১০৯. এরপর প্রচলিত ব্রিটিশ আইনে দেখেছি যে, পত্রের মাধ্যমে চুক্তি করার ক্ষেত্রে খিয়ারে কবুল দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে তারাও এ পথে চলেছে, তথা 'যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে এবং তার পরে রহিত হবে।' বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ Chitty On Contracts V. I. P. 91, London 1977, এটি প্রমাণ করে যে, এটি সমকালীন ব্যবসার প্রচলিত নিয়ম।

না কি কবুল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রাপক কর্তৃক ইজাবকারীর কাছে পত্র লিখতে হবে? অথবা তার উত্তরটি ইজাবকারীর কাছে পৌঁছতে হবে এবং সে উত্তরপত্র সম্পর্কে জানা শর্ত কি না? এসব সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ করে প্রচলিত আইনে প্রসিদ্ধ চারটি দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়েছে—

২২. কবুল করার ঘোষণা করা

এর উদ্দেশ্য হলো, প্রাপকের পক্ষ থেকে চুক্তিটি কবুল করার ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে কবুল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। উদাহরণস্বরূপ, ডাকপিয়নের মাধ্যমে যায়েদ যদি তার গাড়ি বিক্রয়ের ইজাব করে আমরের কাছে পত্র পাঠায় এবং আমরের কাছে পত্র পৌঁছানোর পর সে যদি সরাসরি ঘোষণা করে যে, সে উক্ত ইজাব কবুল করেছে, তা হলে কবুল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে তখনই বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে যায়েদকে অবহিত করতে সে কোনো পত্র না-পাঠালেও, চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

২৩. কবুল করার ব্যাপারে পত্র পাঠানো

এর উদ্দেশ্য হলো, কবুলকারীর পক্ষ থেকে কবুল করা সম্পর্কে এমন একটি পত্র পাঠানো ছাড়া তা পরিপূর্ণ হবে না, যার পরে কবুল প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে না। এই মতানুযায়ী শুধু কবুলের ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে চুক্তি সম্পন্ন হবে না; বরং কবুল সম্পর্কে ইজাবকারীর জন্য পত্র লেখা এবং এমনভাবে ডাকপিয়নের কাছে হস্তান্তর ছাড়া চুক্তি সম্পন্ন হবে না, যার পর পত্র ফেরত নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। যদি (সরাসরি বা লিখিতভাবে) কবুলের কথা জানিয়ে দূত পাঠায়, তা হলে কবুলকারীর কাছ থেকে দূত এমন দূরত্বে যাওয়ার পর চুক্তি সম্পন্ন হবে, যার পর তাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।

২৪. কবুল গ্রহণ করে নেওয়া

এর উদ্দেশ্য হলো, ইজাবকারীর কাছে কবুল সম্পর্কে পত্র লিখে ডাকপিয়ন বা দূতের কাছে দিলেই চুক্তি সম্পন্ন হবে না; বরং ইজাবকারী সে কবুলপত্র মেনে নিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শুধু মেনে নেওয়া যথেষ্ট। তার মধ্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়া জরুরি নয়।

২৫. কবুল সম্পর্কে অবগতি লাভ

এর উদ্দেশ্য হলো, ইজাবকারী কবুলকারীর পত্র গ্রহণ করলেই চুক্তি সম্পন্ন
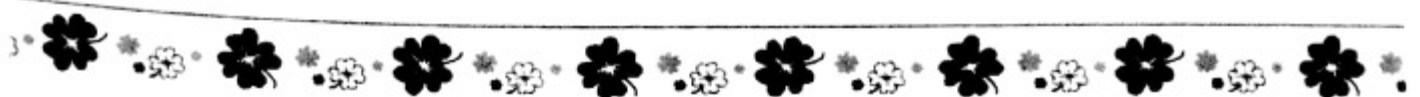
হবে না; বরং সে যখন পত্র পড়বে এবং তার মধ্যের বিষয় সম্পর্কে জানবে, তখনই চুক্তি সম্পন্ন হবে।[১১০]

এক্ষেত্রে আরও একটি মত রয়েছে, যেটিকে কবুলপত্র পাঠানো ও কবুলপত্রের বিষয় সম্পর্কে জানতে পারার মতের সংমিশ্রণ বলতে পারি। ব্রিটিশ আইনে এটি গ্রহণ করা হয়েছে। এর সারকথা হলো, কবুলকারীর ক্ষেত্রে কবুল সম্পর্কে পত্র পাঠানোর পর চুক্তি সম্পন্ন হবে। আর ইজাবকারীর ক্ষেত্রে কবুলকারীর কবুল সম্পর্কে জানতে পারার পর চুক্তি সম্পন্ন হবে।[১১১] সুতরাং যায়েদ যদি ইজাব সম্পর্কে আমরের কাছে পত্র পাঠানোর পর আমর কবুল সম্পর্কিত একটি পত্র ডাকপিয়নের কাছে হস্তান্তর করে, এক্ষেত্রে আমর কবুলপত্র পাঠানোর পর তার পক্ষ থেকে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে। উক্ত পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানার আগে যায়েদের পক্ষ থেকে চুক্তি সম্পন্ন হবে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যায়েদের কাছে কবুলপত্র পৌঁছানো ও তার বিষয়বস্তু জানার আগে সে ইজাব প্রত্যাহার করতে পারবে।

ইসলামি শরিয়ার ফুকাহায়ে কেরামের অবস্থান হলো, কিছু ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য থেকে কবুল করার ঘোষণার বিষয়টি পছন্দনীয় বলে অনুমিত হয়। নিচে ফুকাহায়ে কেরামের যে বক্তব্যটি উল্লেখ করা হচ্ছে, তা থেকে এটি বোঝা যায়:

আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন—

> وأما الكتابة : فهي أن يكتب الرجل إلى رجل، أما بعد! فقد بعت عبدي فلانا منك بكذا، فبلغه الكتاب، فقال في مجلسه : اشتريت؛ لأن خطاب الغائب كتابه فكأنه حضر بنفسه، وخاطب بالإيجاب، وقبل الآخر في المجلس.
>
> 'পত্র পাঠিয়ে বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের পদ্ধতি: কেউ অন্যের কাছে লিখল, 'পরকথা, আমার অমুক দাসকে এই মূল্যে তোমার কাছে বিক্রয় করছি।' পত্র পৌঁছানোর পর প্রাপক পত্র পৌঁছানোর মজলিসে বলল, 'আমি ক্রয় করলাম'। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির

---

১১০. এ চারটি দর্শনের বিস্তারিত জানতে দেখুন: নাযরিয়্যাতুল আকদ, ড. আবদুর রাযযাক সানহুরি, পৃষ্ঠা-২৯৩, ফিকরা নং ২৯৬-৩০২।

১১১. বিস্তারিত জানতে দেখুন: পাকিস্তান আইন, ধারা নং ৪, এটি ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে।
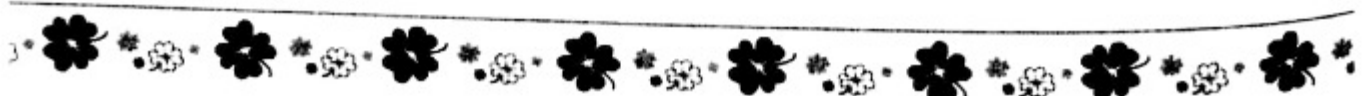
পত্রই হলো তার প্রস্তাব। সুতরাং যেন সে নিজেই উপস্থিত হয়ে ইজাব করছে এবং অপর পক্ষ ইজাবের মজলিসেই সেটি কবুল করছে।'[১১২]

'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া'য় উল্লেখ আছে–

والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال، حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة، كذا في الهداية، قال تاج الشريعة: وصورة الكتابة أن يكتب إلى رجل... فلما بلغه الكتاب وقرأه وفهم ما فيه قبل في المجلس صح البيع.

'পত্রলিখন, অনুরূপভাবে দূত প্রেরণও সরাসরি সম্বোধনের মতো। তাই পত্র পৌঁছানো ও দূতের সংবাদ দেওয়ার মজলিসেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে।[১১৩] হেদায়া কিতাবে এটিই বলা হয়েছে। ইমাম তাজুশ শরিয়াহ[১১৪] (রহ.) বলেন, পত্রের পদ্ধতি হবে এরূপ: কেউ অন্যের কাছে লিখবে...। পত্র পৌঁছানোর পর যখন সেটি পড়বে এবং তার বিষয় বুঝে ওই মজলিসে কবুল করবে, তখন চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।'[১১৫]

এই বক্তব্যগুলো থেকে বোঝা যায়, প্রাপক পত্র পাওয়ার পর মজলিসে কবুলের ঘোষণা দিলে হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম সেটিকে চূড়ান্ত চুক্তি হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। এক্ষেত্রে ইজাবকারীর জন্য কবুলের বিষয়ে জানাকে শর্ত করেননি। শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের অনেক ফকিহ থেকে অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন–

---

১১২. বাদায়েউস সানায়ে : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৩৮।

১১৩. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯।

১১৪. **ইমাম তাজুশ শরিয়াহ :** আলি ইবনে ইবরাহিম ইবনে ইসমাইল আল-গযনবি (রহ.)। তাজুশ শরিয়াহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হানাফি ফকিহ ও মুফাসসিরে কুরআন ছিলেন। তিনি আলেপ্পোর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে: তাফসিরুত তাফসির (বৃহৎ দুই খণ্ডে), মাশারিউশ শারায়িই' এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল-মানাবিই' ফি শারহিল মাশারিই' প্রভৃতি। তিনি ৫৮২ হিজরি মোতাবেক ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। (আল-আ'লাম : ৩/২৪৯) –সম্পাদক

১১৫. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯।
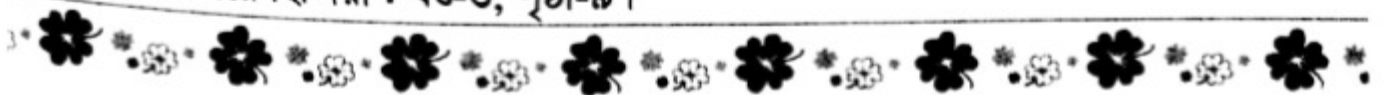
قال الغزالي في الفتاوى : إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه، فقبل المكتوب إليه، ثبت له خيار المجلس مادام في مجلس القبول، قال: ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه، حتى لو علم أنه رجع عن الايجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه، صح رجوعه ولم ينعقد البيع.

'ইমাম গাযালি (রহ.) তার ফাতাওয়ায় বলেছেন, আমরা যখন পত্রের মাধ্যমে বিক্রয় করাকে সহিহ বললাম, তখন কোনো বিক্রেতা ক্রেতার কাছে পত্র লিখলে ক্রেতা কবুলের মজলিসে থাকাকালীন তার জন্য কবুল করার এখতিয়ার থাকবে। তিনি বলেন, পত্র লেখকের এখতিয়ার প্রাপকের এখতিয়ার শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। এমনকি প্রাপক তার মজলিস ত্যাগের আগে যদি জানতে পারে যে, প্রেরক তার ইজাব প্রত্যাহার করেছে, তা হলেও এই প্রত্যাহার সহিহ হবে এবং বিক্রয় সম্পন্ন হবে না।'[১১৬]

আল্লামা বুহুতি (রহ.) বলেছেন–

(وإن كان) المشتري (غائبا عن المجلس فكاتبه) البائع (أو راسله : إني بعتك) داري بكذا (أو) إني (بعت فلانا) ونسبه بما يميزه (داري بكذا فلما بلغه) أي : المشتري (الخبر) قبل البيع (صح) العقد.

'ক্রেতা যদি বিক্রেতার মজলিস থেকে দূরে থাকে, ফলে বিক্রেতা তার কাছে পত্র লেখে বা দূত পাঠায় যে, 'এই মূল্যে আমার বাড়িটি বা অমুক দাসকে তোমার কাছে বিক্রয় করছি। দাসের ক্ষেত্রে তার এমন বংশসূত্র উল্লেখ করে, যার মাধ্যমে তাকে চেনা যায়, এরপর ক্রেতার কাছে সংবাদ পৌঁছানোর পর সে যদি কবুল করে, তা হলে চুক্তি সহিহ হবে।'[১১৭]

উদ্ধৃতিটি এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, প্রাপক কবুল করার মাধ্যমেই চুক্তি সম্পন্ন হবে। ইজাবকারী কবুলের সংবাদ জানার বিষয়টিকে শর্ত করা হয়নি। তবে শাফেয়ি

---

১১৬. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, ইমাম নববি (রহ.) : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৬৭-১৬৮।
১১৭. কাশশাফুল কিনা' আন মাতনিল ইকনা' : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৭।
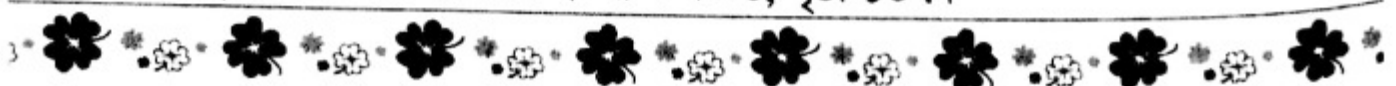
ও হাম্বলি মাযহাবে চুক্তির মজলিসের এখতিয়ার থাকার পক্ষে মত প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ। চুক্তির মজলিসের এখতিয়ার থাকার ভিত্তিতে কবুলের মজলিস শেষ হওয়ার আগে উভয় পক্ষের জন্য চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে। ঘোষণার মাধ্যমে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে এখতিয়ারের বিষয়টি তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না। তারপরও ইজাবকারীর জন্য কবুলের সংবাদ জানা শর্ত নয়।

ইতঃপূর্বে মালেকি মাযহাবের মত উল্লেখ করেছি যে, তাদের মাযহাবে শর্তসাপেক্ষে ইজাবকারীর জন্য ইজাব রক্ষা করা আবশ্যক এবং অপর পক্ষ কবুল বা প্রত্যাখ্যানের আগে ইজাবকারী তার ইজাব প্রত্যাহারের অধিকার রাখবে না। তাদের এ নীতি অনুযায়ী অপর পক্ষ কবুল করলেই চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। ইজাবকারী সে সম্পর্কে অবগত হোক বা না-হোক। এ কারণে তাদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তারা কবুল করার ঘোষণার মতটিকে গ্রহণ করেছেন।[১১৮]

এসব ফিকহি বক্তব্য ছাড়াও সমকালীন অনেক আলেম মনে করেন, শরিয়তে ইসলামির ফকিহগণ শুধু কবুলের ঘোষণার ওপর নির্ভর না-করে ইজাবকারী কবুল সম্পর্কে জানার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আস্থা রেখেছেন। তারা 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া'র একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাদের পক্ষে দলিল দিয়ে থাকেন। উদ্ধৃতিটি এরূপ–

> ومنها (أي من شرائط صحة البيع) سماع المتعاقدين كلامهما وهو شرط انعقاد البيع بالإجماع فإذا قال المشتري اشتريت ولم يسمع البائع كلام المشتري لم ينعقد البيع.
>
> 'বিক্রয় সহিহ হওয়ার শর্তগুলোর মধ্য থেকে একটি শর্ত হলো, উভয় চুক্তিকারী অপর পক্ষের কথা শোনা। সর্বসম্মতিক্রমে এটি বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার শর্ত। সুতরাং ক্রেতা যদি বলে 'আমি ক্রয় করলাম', আর বিক্রেতা তার এ কথা না-শোনে, তা হলে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে না।'[১১৯]

---

১১৮. আদ-দুসুকি : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩ ও খারশি : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫।

১১৯. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩।

অনুরূপভাবে ইতঃপূর্বে শারহুল মাজাল্লাহ কিতাব থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইজাব প্রত্যাহারের জন্য অপর পক্ষের প্রত্যাহারের কথা শুনতে পারা ওয়াজিব।[১২০] এ সম্পর্কে ড. আবদুর রাযযাক সানহুরি (রহ.) বলেছেন–

إن منطق القاعدة التي تقول بوجوب سماع الموجب القبول في التعاقد بين الحاضرين، تقتضي القول بوجوب علم الموجب بالقبول في التعاقد بين غائبين، والسماع في حالة حضور الموجب يقابله العلم حالة غيابه.

'উপস্থিত দুইজন চুক্তিকারীর ক্ষেত্রে ইজাবকারী কবুলকারীর কথা শোনার মূলনীতিটির দাবি হলো, অনুপস্থিত দুইজনের চুক্তির ক্ষেত্রে ইজাবকারী কবুল সম্পর্কে জানতে হবে। আর ইজাবকারীর উপস্থিতিতে শোনার হুকুমের থেকে ভিন্ন হুকুম হবে অনুপস্থিত ব্যক্তির জানার বিষয়টি।'[১২১]

বাস্তবতা হলো, কুরআনুল কারিম ও হাদিসের কোথাও কবুল সম্পন্ন হওয়ার সময় বর্ণিত হয়নি। এক্ষেত্রে কুরআন যে মূলনীতি বর্ণনা করেছে তা হলো, উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

'হে ইমানদারগণ! অন্যায়ভাবে তোমরা অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না। তবে তোমাদের সন্তুষ্টিনির্ভর ব্যবসার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ গ্রহণ করতে পারবে।'[১২২]

ইজাব-কবুল সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম যেসব আলোচনা করেছেন, সেগুলো এ মূলনীতি অনুসরণ করেই করেছেন। সুতরাং চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সময় হলো, যখন প্রথম আগ্রহকে বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করে এমন কিছু অনুপ্রবেশের আগে উভয় আগ্রহের সম্মিলিত সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। প্রথম আগ্রহটি হলো ইজাব। এ অবস্থা তখনই পাওয়া যায়, যখন ইজাব বহাল থাকতে অপর পক্ষ

---

১২০. আল্লামা খালেদ আতাসি (রহ.), শারহুল মাজাল্লাহ, ধারা নং ১৮৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ও ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

১২১. মাসাদিরুল হক, ড. আবদুর রাযযাক সানহুরি , খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৬।

১২২. সুরা নিসা : আয়াত-২৯।
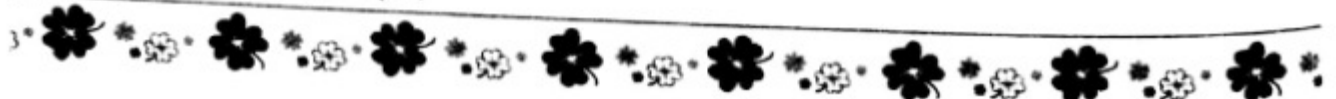
কবুলের ঘোষণা দেবে। সুতরাং ইজাব হলো প্রথম পক্ষ থেকে চুক্তি করার আগ্রহের ঘোষণা। অতএব, অপর পক্ষের ঘোষণার মাধ্যমে চুক্তির আগ্রহটি যখন প্রথম আগ্রহের সঙ্গে মিলে যাবে, তখন উভয় আগ্রহের সমন্বয় ঘটবে এবং সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে আর এটির মাধ্যমেই চুক্তি সম্পন্ন হবে।

এ হলো সন্তুষ্টি ও উভয় আগ্রহের সমন্বয় সংঘটনের মূলনীতির দাবি। এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, পত্র বা দূত পৌঁছানোর মজলিসে অপর পক্ষ কবুল করার মাধ্যমে চুক্তি সম্পন্ন হবে। তবে আমার মনে হয়–আল্লাহই ভালো জানেন– এটি একটি ধর্মীয় চেতনানির্ভর বিধান।[১২৩] সুতরাং যে ব্যক্তি মুখে কবুল বলবে অথবা চুক্তি করার নিয়তে পত্রে কবুলের কথা লিখবে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার পক্ষে তখনই চুক্তি সম্পন্ন হবে।

আর ইজাবকারীর দিক বিবেচনায় কবুলের পত্র গ্রহণ করা ছাড়া বিচারিক দৃষ্টিকোণে তার ক্ষেত্রে চুক্তিটি চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে না। কেননা, সরাসরি বা পত্রের মাধ্যমে কবুলের সময় নির্ধারণ করে দেওয়া একটি কঠিন বিষয়। তা ছাড়া এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, কবুলকারী মুখে কবুল করার পর ইজাবকারীকে জানাতে দেরি করবে অথবা কবুলকারী পত্র পাঠানোর পর পথিমধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে, যে ইজাবকারী এ ব্যাপারগুলো জানবে না, সে তার ইজাবকে বাতিল বলে সাব্যস্ত করে এ ধারণায় অন্যের সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে পারে যে, প্রাপক তার ইজাব কবুল করেনি। এ জটিল সমস্যার সমাধান করতে ইজাবকারীর জন্য কবুলের সংবাদ জানার পর চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার হুকুম দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইজাবকারী যদি কবুলের ঘোষণা জানতে না-পারে, সেক্ষেত্রে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে সে সন্তুষ্ট থাকবে না, ফলে সেখানে সন্তুষ্টির অনুপস্থিতি ঘটবে। যেসব ফকিহ ইজাবকারীর জন্য কবুলের সংবাদ জানার শর্তারোপ করেছেন, তাদের বক্তব্যকে এ মতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। এর মাধ্যমে হানাফি মাযহাবের সেসব ফকিহদের বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব হবে, যারা বলেছেন পত্রের মাধ্যমে কবুলের ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

---

১২৩. ধর্মীয় চেতনার ওপর নির্ভর করে বা (دِيَانَةً) কোনো কিছুর ফয়সালা দেওয়ার অর্থ হলো, যখন কোনো কিছুর ফয়সালা কোনো ব্যক্তির নিয়তের উপর নির্ভর করে। কারণ, সেক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো দলিল-প্রমাণ (Avidance) পাওয়া যায় না। তাই ব্যক্তির বা বিবাদির দীনদারি বা ধর্মীয় চেতনার ওপর নির্ভর করেই সেখানে বিচার করতে হয়। যেমন, তালাকের মাসআলায় যেখানে 'বাইন' তালাক হওয়াটা স্বামীর নিয়তের ওপর নির্ভর করে। –সম্পাদক
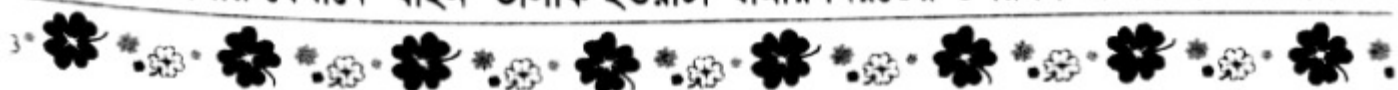
তাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হবে, ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে কবুলকারীর ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পন্ন হবে। আর উপস্থিত চুক্তির ক্ষেত্রে যারা উভয় পক্ষের জন্য অপর পক্ষের কথা শোনার শর্তারোপ করেছেন, তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, ইজাবকারী কবুলকারীর কথা শোনা ছাড়া তার ক্ষেত্রে চুক্তি আবশ্যক হবে না।

তা ছাড়া ইজাবকারীর জানতে পারার ব্যাপারটি একটি অদৃশ্য বিষয়। সুতরাং বিচারের ক্ষেত্রে তা প্রমাণে প্রচলিত পদ্ধতির সাহায্যে দলিল দিতে হবে। ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন–

فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري والبائع يقول لم أسمع ولا وقر في أذني لم يصدق قضاء.

'চুক্তির মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিরা যদি ক্রেতার কথা শুনতে পারে, আর বিক্রেতা দাবি করে যে, 'আমি শুনিনি এবং আমার কানে এ কথা আসেনি', তা হলে বিচারের ক্ষেত্রে তার কথা মানা হবে না।'[১২৪]

এটি একটি স্পষ্ট বিষয় যে, ইজাবকারী কবুলের কথা শোনা এমন একটি বিষয়, যেখানে বিভিন্ন মাধ্যমে দলিল দিতে হবে। তা এভাবে যে, ইজাবকারী এমন সাধারণ আওয়াজে কথা বলবে, যা চুক্তির মজলিসে উপস্থিত লোকজন শুনতে পারবে। পত্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম। এমনভাবে পত্র গ্রহণের দ্বারা ইজাবকারী কর্তৃক উক্ত বিষয় জানার ব্যাপারে দলিল দেওয়া হবে, সাধারণত যে সময়ের মধ্যে সে পত্র পড়তে ও তার বিষয়বস্তু বুঝতে সক্ষম।

এ আলোচনার সারকথা হলো, কবুলের ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কবুলকারীর ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পন্ন হবে। আর কবুলের পত্র গ্রহণ করার পর ইজাবকারীর ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পন্ন হবে। ফুকাহায়ে কেরামের মতামত অধ্যয়নের পর আমাকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে। তবে এটি ইজতিহাদি মাসআলা, যার ভিত্তি হলো, চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য কুরআনুল কারিমের শর্তকৃত 'সন্তুষ্টি'। যে চারটি মত আমরা আলোচনা করলাম, তার প্রত্যেকটিরই সম্ভাবনা রয়েছে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে ব্যক্তি এ চারটি দর্শনের কোনো একটি গ্রহণ করবে, সে কুরআন-হাদিসের বক্তব্যের বিপক্ষে অবস্থানকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে না। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

---

১২৪. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩। আল-বাহরুর রায়েক এর সূত্রে।
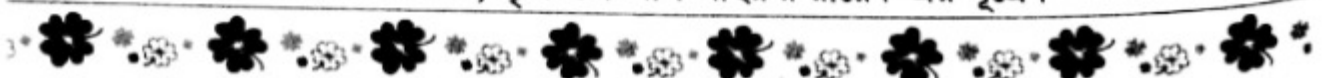
২৬. খিয়ারে মাজলিস

হানাফি ও মালেকি মাযহাবের ফকিহগণ এ মত গ্রহণ করেছেন যে, শুধু ইজাব-কবুল সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই চুক্তি চূড়ান্ত হবে। খিয়ারে শর্ত, খিয়ারে রুইয়াহ[১২৫], খিয়ারে আয়েব[১২৬] বা খিয়ারে নক্দ[১২৭] এবং অন্যান্য অধিকার ছাড়া কোনো পক্ষের জন্যেই ওই চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব অনুযায়ী উভয় পক্ষ চুক্তির মজলিসে থাকাকালীন চুক্তি সম্পন্ন হবে না। কেবলমাত্র দুটি কারণেই চুক্তি সম্পন্ন হবেঃ

ক. চুক্তির মজলিস শেষ হলে।

খ. একপক্ষ অপর পক্ষকে এ কথা বললে, 'চূড়ান্ত করো,' তখন অপর পক্ষ যদি উত্তরে বলে, 'চূড়ান্ত করলাম।'

এ দুটি পদ্ধতির কোনো একটি না-পাওয়া গেলে, উভয় পক্ষের জন্য অপর পক্ষের সন্তুষ্টি ছাড়াই চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে। উক্ত দুই মাযহাবে এই এখতিয়ারকে 'খিয়ারে মাজলিস' নামে অভিহিত করা হয়।[১২৮]

এ ক্ষেত্রে তাদের দলিল একটি প্রসিদ্ধ হাদিস। হাদিসটি এরূপ– 'البيعان بالخيار ما لم يفترقا' 'ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপর থেকে আলাদা হওয়ার আগ পর্যন্ত এখতিয়ারপ্রাপ্ত।' হাদিসটি বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত আছে। উল্লিখিত হাদিসটি হযরত হাকিম বিন হিযাম (রাযি.) থেকে বর্ণিত সূত্রে ইমাম বুখারি (রহ.) বর্ণনা করেছেন।[১২৯] হাদিসে বর্ণিত আলাদা হওয়া বলতে তারা শারীরিক দিক থেকে আলাদা হওয়া বুঝিয়েছেন। হানাফি ও মালেকি মাযহাবের অনেক ফকিহ ইজাব-কবুলের মাধ্যমে কথার ক্ষেত্রে

---

১২৫. **খিয়ারে রুইয়াহ :** কেউ যদি কারো কাছ থেকে কোনো পণ্য না-দেখে ক্রয় করে, সেটি যখন সে দেখবে, সেসময় তার খিয়ার থাকবে– পছন্দ হলে সেটি সে রাখতে পারে, অন্যথায় ফেরতও দিতে পারে। এই খিয়ার-কে বলা হয় খিয়ারে রুইয়াহ। –সম্পাদক

১২৬. **খিয়ারে আয়েব :** পণ্য কিংবা মূল্যে কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে ক্রেতা বা বিক্রেতা পণ্য বা মূল্য ফেরত দেওয়ার যে অধিকার লাভ করে, তাকে খিয়ারে আয়েব বলে। –সম্পাদক

১২৭. **খিয়ারে নক্দ :** খিয়ারে নক্দ বলা হয়, চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রেতা মূল্য পরিশোধ না-করলে বিক্রেতাকে চুক্তি বাতিল করার এখতিয়ার দেওয়াকে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রেতা বলল, 'আমি যদি এ সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না-করি, তা হলে আমাদের বিক্রয় বাতিল হবে।' অথবা বিক্রেতা বলল, 'তুমি যদি তিনদিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না-করো, তা হলে বিক্রয় বাতিল হবে।' (দ্র. ৪২৪ নং অনুচ্ছেদ) –সম্পাদক

১২৮. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬।

১২৯. সহিহ বুখারি, অধ্যায় : বিক্রয়, হাদিস নং ২১০৭।

আলাদা হয়ে যাওয়া বুঝিয়েছেন। আবার অনেকে শারীরিকভাবে আলাদা হয়ে যাওয়াও বুঝিয়েছেন। তবে এখতিয়ার বলতে তারা 'খিয়ারে কবুল' উদ্দেশ্য করেছেন, 'খিয়ারে মাজলিস' বলেননি। যেমনটি ইমাম আবু ইউসুফ ও কাজি ইসা ইবনে আবান (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে।

এখতিয়ার প্রমাণ করা আর না-করার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের আলোচনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করলাম। তবে এখন সে দুইটির কোনোটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দেবো না।[১৩০] সেখান থেকে যে বিষয়টি বোঝা যায় তা হলো, এক মজলিসে উপস্থিত দুই পক্ষের চুক্তির ক্ষেত্রে 'খিয়ারে মাজলিসের' বিষয়টি সামনে আনা সম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যকার ব্যবসার ক্ষেত্রে 'খিয়ারে মাজলিস' প্রমাণ করার ক্ষেত্রে সেটি অনেক সমস্যার জন্ম দেবে। যেগুলোর অধিকাংশ ইলেক্ট্রনিক উপকরণ ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। 'খিয়ারে মাজলিসের' বিধান রাখলে এই চুক্তিগুলো এমন অনেক বিবাদ জন্ম দেবে শরিয়ত কর্তৃক যেসব বিবাদ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমান সময়ের সুন্দর ও নিরাপদ পদ্ধতি হলো, বিক্রয় চুক্তিগুলো 'খিয়ারে মাজলিস' ছাড়া সম্পন্ন করা। এ পদ্ধতিটি সম্ভব। এমনকি যে হাদিসের দ্বারা 'খিয়ারে মাজলিসের' পক্ষে দলিল দেওয়া হয়, তার বাহ্যিক উদ্দেশ্যও এটি। শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব অনুযায়ীও এটি সম্ভব। কেননা, হযরত ইবনে উমর (রাযি.) থেকে সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

'যখন এক জায়গায় থাকা অবস্থায় দুই ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করবে, তারা আলাদা হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার থাকবে, অথবা তাদের কেউ অন্যকে এখতিয়ার দিয়ে আলাদা হওয়ার পরও পূর্বের শর্ত অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় করলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।'[১৩১]

---

১৩০. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম কিতাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬৮। আরও বিস্তারিত জানতে ইমাম কারাফি (রহ.)-এর 'আয-যাখিরাহ' কিতাব দেখুন, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০-২৩।

১৩১. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ : একপক্ষ অপর পক্ষকে এখতিয়ার দেওয়া সম্পর্কে, হাদিস নং ২১১২।

হাদিসটি সামনে বর্ণিত হাদিসটির ব্যাখ্যাস্বরূপ। যাতে বলা হয়েছে–

الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

'ক্রেতা-বিক্রেতা ভিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেকে অন্যের ব্যাপারে এখতিয়ারপ্রাপ্ত, তবে খিয়ারে শর্তের সঙ্গে বিক্রয়ের হুকুম ভিন্ন।'[১৩২]

হাফিযুল হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله في حديث مالك إلا بيع الخيار، فقال الجمهور وبه جزم الشافعي، هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد إنهما أن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق، فالتقدير إلا البيع الذي جرى فيه التخاير، قال النووي : اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل، وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله.

'ইমাম মালেক (রহ.) থেকে বর্ণিত হাদিস: 'তবে এখতিয়ারের শর্তযুক্ত বিক্রয়ের হুকুম ভিন্ন'-এর উদ্দেশ্য নির্ধারণে ফুকাহা কেরাম মতানৈক্য করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ বলেন–এবং ইমাম শাফেয়িও তাদের মতের প্রতি দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন– আলাদা হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রলম্বিত এখতিয়ার থেকে এ পদ্ধতিকে ভিন্ন হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। হাদিসটির উদ্দেশ্য হলো, তারা যদি মজলিস থেকে আলাদা হওয়ার আগে বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত করে, তা হলে তখনই চুক্তি চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে এবং আলাদা হওয়ার বিষয়টি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং উহ্য বক্তব্যটি এমন হবে 'তবে সেসব বিক্রয়ের হুকুম ভিন্ন, যার মধ্যে কারোর এখতিয়ার থাকে।' ইমাম নববি (রহ.) বলেন, আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ ছাড়া অন্যসব ব্যাখ্যাকে বাতিল আখ্যা দিয়ে তার প্রবক্তাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন।'[১৩৩]

---

১৩২. সহিহ বুখারি, পরিচ্ছেদ : ক্রেতা-বিক্রেতার এখতিয়ার সম্পর্কে, হাদিস নং ২১১১।
১৩৩. ফাতহুল বারি : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৩।

এ হাদিসের ভিত্তিতে শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের ফকিহগণ বলেছেন, এমন শর্তে চুক্তি করা জায়েয আছে যে, তাদের কোনো পক্ষের জন্য খিয়ারে মাজলিস থাকবে না। সুতরাং শুধু ইজাব-কবুল করলেই চুক্তি চূড়ান্ত হবে এবং এখতিয়ার থাকবে না। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) 'আল-মুগনি' কিতাবে 'তবে এখতিয়ারের শর্তে বিক্রয়ের হুকুম ভিন্ন' হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন–

> ويحتمل أنه أراد البيع الذي شرطا فيه أن لا يكون بينهما فيه خيار، فيلزم بمجرد العقد من غير تفرق.
>
> 'এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে, হাদিসে এমন বিক্রয়কে বোঝানো হয়েছে, যেখানে উভয় পক্ষ শর্ত করে যে, তাদের কারো জন্য এখতিয়ার থাকবে না। সুতরাং যদি উভয়ে আলাদা না-হয়, তা হলে শুধু চুক্তি করার দ্বারাই তা রক্ষা করা আবশ্যক হবে।'[১৩৪]

এ আলোচনার কয়েক লাইন পর বলেছেন–

> والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد، فالتخاير في ابتدائه أن يقول : بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر على ذلك، فلا يكون لهما خيار.
>
> 'মজলিসের এখতিয়ার রহিত করার বিষয়টি চুক্তির শুরু-শেষে একই ধরনের। শুরুতে এখতিয়ার রহিত করার ক্ষেত্রে বলবে, 'এই শর্তে তোমার কাছে বিক্রয় করছি যে, আমাদের কারো জন্য কোনো এখতিয়ার থাকবে না।' অপর পক্ষ এ শর্তে সেটি কবুল করবে। ফলে কারো জন্য কোনো এখতিয়ার থাকবে না।'[১৩৫]

এখান থেকে স্পষ্ট হলো যে, মূল চুক্তিতে এখতিয়ার রহিত করার শর্ত করে উভয়ে তাদের এখতিয়ার রহিত করার ক্ষমতা রাখে। চুক্তিতে উভয় পক্ষ যেসব শর্ত করতে পারে, অনেক সময় সামাজিক প্রচলনের মাধ্যমে সেগুলো নির্ধারিত হয়ে যায়। কেননা, সামাজিক প্রচলন শর্তের মতো হয়ে থাকে। এ বিষয়টির ওপর নির্ভর করে মজলিসের এখতিয়ার রহিত বা বাতিল করার

---

১৩৪. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৯।

১৩৫. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৯।

ব্যাপারে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যদি কখনো কোনো আইন জারি করা হয়, তা হলে সেটিকে সামাজিক প্রচলনের চেয়ে কম মনে করা যাবে না। সুতরাং শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব অনুযায়ী সে আইনের কারণে খিয়ারে মাজলিস বাতিল করা যাবে। তা ছাড়া কাজির সিদ্ধান্ত মতানৈক্য দূর করে দেয়। বিধায় সমকালীন ব্যবসার পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে মিল রেখে এমন আইন জারি করা বেশি উপকারী– আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, সমকালীন উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত বড়-বড় ব্যবসায় আইন প্রণেতা ও মানদণ্ড নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ খিয়ারে মাজলিসের বিধান রাখেননি; শুধু ইজাব-কবুলের মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তনের হুকুম দিয়েছেন।[১৩৬]

২৭. পণ্য ও মূল্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি বোঝানোর জন্য ইজাব-কবুল যেহেতু দুটি শব্দমাত্র, তাই কখনো-কখনো কথার মতো কাজের মাধ্যমেও সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহগণ পণ্য ও মূল্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। পদ্ধতিটি এরূপঃ ইজাব-কবুল সম্পর্কিত কোনো কথা বলা ছাড়াই বিক্রেতা পণ্য দেবে আর ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করবে। ফিকহি পরিভাষায় এ পদ্ধতির বিক্রয়কে 'البيع بالتعاطي' (আল-বাই বিত-তাআতি), 'البيع بالمعاطاة' (আল-বাই বিল-মুআতাত) ও 'بيع المراوضة' (বাইউল মুরাওয়াযাহ) নামে অভিহিত করা হয়। ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো পক্ষ থেকেই যখন বিক্রয়চুক্তি সম্পর্কে কোনো শব্দ বলা হয় না, ফিকহি পরিভাষায় তখন সে বিক্রয়কে 'তাআতি' বলা হয়। একপক্ষ যদি শব্দের মাধ্যমে ইজাব করার পর অপর পক্ষ দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তা হলে ফুকাহায়ে কেরাম সেটিকেও 'তাআতি' নামে নামকরণ করে থাকেন।[১৩৭] তবে অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেন, এগুলোর কোনোটি 'তাআতি' নয়; বরং এগুলো হলো একপক্ষ হতে শব্দের মাধ্যমে ইজাব করা

---

১৩৬. বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ আল-মুযাক্কিরাতুল ইযাহিয়্যাত লিল কানুনিল উরদুনি, ধারা নং ৪৮৫, পৃষ্ঠা-৫০০, আল-মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, মুরাবাহা ও পণ্যের ব্যবসার আলোচনা। সেখানে খিয়ারে মজলিসের ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১৩৭. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃ.৪।
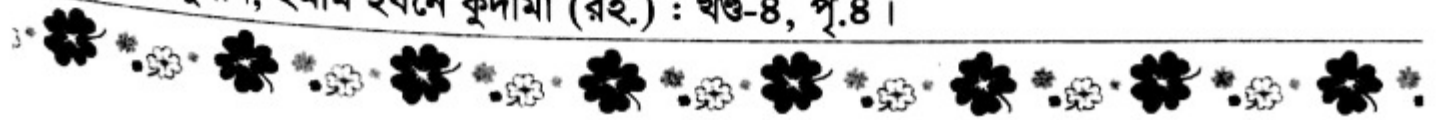
ও অপর পক্ষ থেকে কর্মের মাধ্যমে কবুল করা।[১৩৮] সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের মতে উভয় পদ্ধতির বিক্রয় সহিহ হবে।

কিন্তু শাফেয়ি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হলো, শব্দের মাধ্যমে ইজাব-কবুল করা শর্ত। সুতরাং শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া বিক্রয় করলে শাফেয়ি মাযহাব অনুযায়ী সেটি সহিহ হবে না। আল্লামা জালালুদ্দিন মাহাল্লি (রহ.) বলেছেন–

فلا بيع بالمعاطاة، ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف.

> 'মুআতাত' পদ্ধতিতে বিক্রয় সহিহ হবে না। এ পদ্ধতিতে বিক্রয় করলে যা নিয়েছে তা যথাবস্থায় থাকলে ফেরত দেবে, আর যদি নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে তার বিনিময় ফেরত দেবে।'[১৩৯]

তবে অপেক্ষাকৃত কমমূল্যের কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে শাফেয়ি মাযহাবের অনেক ফকিহ 'তাআতি' পদ্ধতিতে বিক্রয় করাকে জায়েয বলেছেন। যেমন, এক রিতিল রুটি ও এক আঁটি শাক ইত্যাদি। আর মূল্যবান পণ্যের ক্ষেত্রে না-জায়েয বলেছেন।[১৪০] হানাফি মাযহাবের ইমাম কারখি[১৪১] (রহ.)-এরও একই মত।[১৪২]

---

১৩৮. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৪৮, ফিকরাহ নং ২২২৪৯।

১৩৯. শারহুল মুহাল্লা আলা মিনহাজুত তালেবিন, আল্লামা কালয়ুবি ও উমাইরাহ (রহ.)-এর টীকাসহ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৩।

১৪০. শারহুল মুহাল্লা আলা মিনহাজুত তালেবিন, আল্লামা কালয়ুবি ও উমাইরাহ (রহ.)-এর টীকাসহ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৩।

১৪১. **ইমাম কারখি :** উবাইদুল্লাহ ইবনে হুসাইন ইবনে দাল্লাল আবুল হাসান আল-কারখি আল-বাগদাদি (রহ.)। জন্ম : ২৬০ হিজরি। তাঁর সম্পর্কে ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন, 'তিনি ছিলেন ইমাম, যাহেদ, ইরাকের মুফতিয়ে আযম এবং শাইখুল হানাফিয়্যাহ। পুরো জগদ্ব্যাপী তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে আছে। হাজারো-লাখো শিষ্য-শাগরেদের উস্তাদ ছিলেন তিনি। তাঁর সময়ে তিনিই ছিলেন হানাফি মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ফকিহ। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস ও আবুল হাসান আল-কুদুরি (রাহিমাহুমাল্লাহ)।' তিনি মুজতাহিদ পর্যায়ের ফকিহ ছিলেন। অত্যন্ত দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার ভার বহন করার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাঁর ছিল না। তাই তাঁর শাগরেদগণ পরামর্শ করে তাঁর অগোচরে তৎকালীন সরকার প্রধানের কাছে অনুদান প্রার্থনা করে চিঠি লেখেন। কিন্তু কোনোভাবে ইমাম কারখি (রহ.) তা বুঝে ফেলেন। নিদারুণ দুঃখে তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন: "আল্লাহ! এর মধ্যে যেন আমার রিযিক না থাকে!" আমির সাইফুদ্দৌলা তাঁর জন্য দশ হাজার দিরহাম হাদিয়া পাঠান। সেই অর্থ ইমাম কারখি (রহ.)-এর কাছে পৌঁছার আগেই তিনি পরম অমুখাপেক্ষী সত্তা রাব্বুল আলামিনের কাছে পৌঁছে যান। তিনি ইন্তেকাল করেন হিজরি ৩৪০ সালে, আশি বছর বয়সে। (রাহিমাহুল্লাহু ওয়া নাফাআনা বিউলুমিহি) (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৫/৪২৬-৪২৭; আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-১০৮-১০৯) –সম্পাদক

১৪২. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৫৯।

হানাফি, মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ কম-বেশি সব ধরনের মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে 'তাআতি' পদ্ধতিতে বিক্রয় জায়েয হওয়ার ব্যাপারে একমত।[১৪৩] শাফেয়ি মাযহাবের ইমাম নববি (রহ.)-ও এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৪৪] আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন–

وذكر القدوري أن التعاطي يجوز في الأشياء الخسيسة، ولا يجوز في الأشياء النفيسة، ورواية الجواز في الأصل مطلق من هذا التفصيل وهي الصحيحة؛ لأن البيع في اللغة والشرع اسم للمبادلة، وهي مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وحقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الأخذ والإعطاء، وإنما قول البيع والشراء دليل عليهما، والدليل عليه قوله عز وجل "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ"، والتجارة عبارة عن جعل الشيء للغير ببدل وهو تفسير التعاطي وقال سبحانه وتعالى "أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ"، أطلق سبحانه وتعالى اسم التجارة على تبادل ليس فيه قول البيع وقال الله عز وجل "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ" سمى سبحانه وتعالى مبادلة الجنة بالقتال في سبيل الله تعالى اشتراء وبيعا لقوله تعالى في آخر الآية "فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ"، وإن لم يوجد لفظ البيع، وإذا ثبت أن حقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الأخذ والإعطاء، فهذا يوجد في الأشياء الخسيسة والنفيسة جميعا، فكان التعاطي في كل ذلك بيعا، فكان جائزا.

'ইমাম কুদুরি[১৪৫] (রহ.) বর্ণনা করেছেন, কমমূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে

---

১৪৩. হেদায়া, ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৫৯। হাশিয়াতুদ দুসুকি আলাশ শারহিল কাবির : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩। আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪

১৪৪. রাওযাতুত তালিবিন : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭

১৪৫. **ইমাম কুদুরি** : আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আবুল হুসাইন আল-কুদুরি আল-বাগদাদি (রহ.)। জন্ম : ৩৬২ হিজরি সালে ইরাকের বাগদাদ শহরে। তৎকালীন হানাফি মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ফকিহ ছিলেন। খতিব বাগদাদি বলেন, 'তিনি অত্যন্ত সত্যবাদি একজন ব্যক্তি ছিলেন। ইরাকে হানাফি উলামায়ে কেরামের শীর্ষে ছিল তাঁর অবস্থান।

'তাআতি' পদ্ধতি জায়েয আছে, বেশি মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে জায়েয নেই। আসলে জায়েয হওয়ার বর্ণনাটি এই ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত এবং সেটিই সহিহ। কারণ, আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে বিক্রয় হলো বিনিময়ের নাম। সে বিনিময়ের উদ্দেশ্য হলো, কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর সঙ্গে বিনিময় করা। আর বাস্তবিক অর্থে বিনিময় হয় 'তাআতি'র পদ্ধতিতে। কারণ, তা হলো নেওয়া-দেওয়ার নাম। বিক্রেতা ও ক্রেতার কথাটি সেই মূল কার্যক্রমের দলিল। এ কথার পক্ষে দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী, 'তবে তোমরা সন্তুষ্টির সঙ্গে ব্যবসার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ নেবে।' ব্যবসা বলা হয়, বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যকে কোনো জিনিস দেওয়া। এটিই হলো 'তাআতি'র ব্যাখ্যা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা হলো সেসব ব্যক্তি, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভবান হয়নি এবং তারা হেদায়াত পায়নি।' আল্লাহ তাআলা এমন বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যবসা শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেখানে বিক্রেতার কথা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করেছেন।' আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদের সঙ্গে জান্নাতের বিনিময়কে ক্রয়-বিক্রয় বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা সে বিক্রয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যা তোমরা সম্পন্ন করেছো।' যদিও এ ক্ষেত্রে বিক্রয় শব্দ পাওয়া যায়নি। সুতরাং যখন প্রমাণিত হলো যে, বিনিময়ের বাস্তবতা হলো 'তাআতি'র পদ্ধতিতে বিনিময় করা, যার বাস্তবতা হলো দেওয়া-নেওয়া—যা কম-বেশি মূল্যের সব ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়—সুতরাং সব ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে 'তাআতি'র পদ্ধতিতে বিক্রয় করলে তা জায়েয হবে।'[১৪৬]

জগৎজোড়া খ্যাতি ছিল তাঁর। তিনি অত্যন্ত সুমিষ্টভাষী ও অসম সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। হক কথা বলতে গিয়ে কাউকে ভয় করতেন না। দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই তাঁর কেটে যেত কুরআনের তেলাওয়াতে।' বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তিনি। যেমন, আল-মুখতাসার (মুখতাসারুল কুদুরি নামে যা প্রসিদ্ধ), আত-তাজরিদ (সাতখণ্ডে), কিতাবুন নিকাহ প্রভৃতি। তিনি ৪২৮ হিজরিতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৭/৫৭৪-৫৭৫; আল-আ'লাম, যিরিকলি : ১/২১১-২১২) —সম্পাদক

১৪৬. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৩৪।
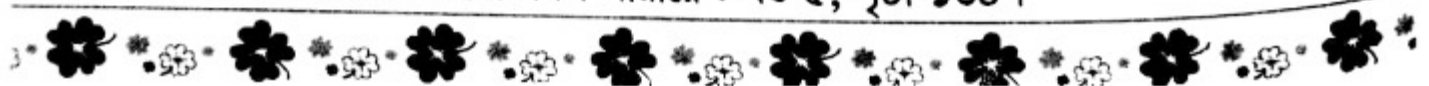
আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেছেন–

وعامتهم على أنه ينعقد في جميع الأشياء الخسيسة والنفيسة في ذلك سواء،لأنه وجد التراضي، وهو المعتبر في الباب، إلا أنه لما كان باطنا، أقيم الإيجاب والقبول مقامه لدلالتهما على التراضي، والتعاطي أدل على الرضا منهما.

'অধিকাংশ ফকিহ এ মতের পক্ষে যে, কম-বেশি মূল্যের সব ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে 'তাআতি'র পদ্ধতিতে বিক্রয় সংঘটিত হবে। কারণ, এখানে সন্তুষ্টি পাওয়া গেছে এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এটিই মূল বিষয়। কিন্তু সন্তুষ্টি যেহেতু অভ্যন্তরীণ বিষয়, তাই সন্তুষ্টি বোঝানোর জন্য ইজাব-কবুলকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। ইজাব-কবুল অপেক্ষা 'তাআতি' সন্তুষ্টিকে বেশি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।'[১৪৭]

ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন–

ولنا أن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كما رجع إليه في القبض والإحراز والتصرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجودا بينهم معلوما عنهم، وإنما علق الشرع عليه أحكاما وبقاه على ما كان، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم، ولم ينقل عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه، مع كثرة وقوع البيع بينهم، استعمال الإيجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم، لنقل نقلا شائعا، ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله، ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله، ولأن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه - صلى الله عليه وسلم- بيانا عاما، ولم يخف حكمه، لأنه يفضي إلى

---

১৪৭. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬০।
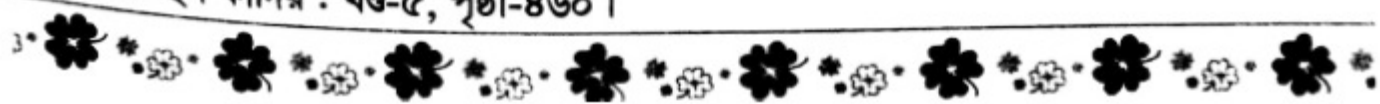
وقوع العقود الفاسدة كثيرا، وأكلهم المال الباطل، ولم ينقل ذلك عن النبي-صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه فيما علمناه، ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا، فكان ذلك إجماعا.

‘আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তাআলা বিক্রয়কে জায়েয করেছেন, তবে তার পদ্ধতি বর্ণনা করেননি। তাই এ ব্যাপারে সামাজিক প্রচলনের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি। যেমনভাবে কব্জা, হস্তগত ও হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রচলনের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। আর মুসলমানরা তাদের বাজার ও বিক্রয়ে এভাবে (তাআতির পদ্ধতিতে) লেনদেন করে থাকে। তা ছাড়া পণ্যটি তাদের কাছে রয়েছে এবং সেটি সম্পর্কে তারা জানে। শরিয়তের পক্ষ থেকে শুধু হুকুম সম্পৃক্ত করে সেটিকে আগের অবস্থায় রাখা হয়েছে। বিধায় যুক্তি ও আদেশের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করা জায়েয নেই। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে অধিক লেনদেন হওয়ার পরও কারো থেকে ইজাব-কবুল ব্যবহারের বিষয়টি বর্ণিত হয়নি। তাঁদের লেনদেনে তাঁরা যদি ইজাব-কবুল ব্যবহার করতেন, তা হলে ব্যাপকভাবে তা বর্ণিত হতো। এটিকে যদি শর্ত করা হতো, তা হলে সেটি বর্ণনা করাও ওয়াজিব হতো। সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে এমন ধারণা করা যায় না যে, তারা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করেছেন বা ভুলে গেছেন। তা ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি বিষয়। সুতরাং বিক্রয়ের জন্য ইজাব-কবুল শর্ত করা হলে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই স্পষ্টভাষায় তা বলে দিতেন এবং এর হুকুম অস্পষ্ট থাকত না। কারণ, শর্ত অস্পষ্ট থাকলে তা অনেক চুক্তিকে ফাসেদ ও অন্যায়ভাবে সম্পদ লুফে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। অথচ আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কেরামের কারো থেকে ইজাব-কবুলের বিষয়টি বর্ণিত হয়নি। এ ছাড়া সবযুগের মানুষ ‘তাআতি’র পদ্ধতিতে লেনদেন করেছে এবং এই মাসআলায় আমাদের
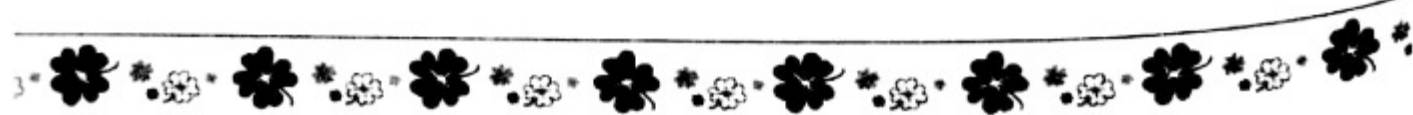
বিরোধীপক্ষের ব্যক্তিদের পূর্বের কারো থেকে এ সম্পর্কে কোনো নিষেধাজ্ঞাও বর্ণিত হয়নি। সুতরাং বিষয়টি ইজমা হিসাবে সাব্যস্ত হলো।'[১৪৮]

২৮. শুধু এক পক্ষ থেকে প্রদান

'তাআতি'র পদ্ধতিতে লেনদেন সহিহ হওয়ার জন্য অনেক ফকিহ শর্তারোপ করেছেন যে, উভয় পক্ষ থেকে দেওয়া-নেওয়া হতে হবে। শুধু এক পক্ষ থেকে দেওয়া যথেষ্ট হবে না। এটি হানাফি মাযহাবের আল্লামা তারসুসি ও হালওয়ানি[১৪৯] (রহ.)-এর মত। কিন্তু হানাফি, মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের মুহাক্কিক ফকিহগণ বলেছেন, এটি কোনো শর্ত নয়; বরং শুধু এক পক্ষ থেকে দেওয়ার মাধ্যমেও বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব। আল্লামা দারদির (রহ.) বলেছেন–

وإن كان الدال على الرضا إعطاء ولو من أحد الجانبين

'যদি এক পক্ষ থেকে দেওয়ার মাধ্যমে সন্তুষ্টি প্রমাণিত হয়, তা হলেও বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে।'[১৫০]

---

১৪৮. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪-৫।

১৪৯. **আল্লামা হালওয়ানি** : আবদুল আজিজ ইবনে আহমাদ ইবনে নসর ইবনে সালেহ আবু মুহাম্মাদ আল-হালওয়ানি আল-বুখারি (রহ.)। শামসুল আয়িম্মা লকবে প্রসিদ্ধ। সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হানাফি ফকিহ। 'হালওয়া' বা মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরণের প্রতি সম্বন্ধ করে তাঁকে হালওয়ানি বলা হয়। আবার কখনো 'হালওয়ায়ি'-ও বলা হয়। তাঁর উস্তাদগণ: কাজি আবু আলি আল-হুসাইন ইবনুল খাযির আন-নাসাফি, আবদুর রাহমান ইবনে হুসাইন আল-কাতেব, আবু সাহল আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাক্কি আল-আনমাতি, হাফিযুল হাদিস মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ গুনজার (রহ.) প্রমুখ। তাঁর ছাত্রগণ ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ আলেমদের অন্তর্ভুক্ত। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: শামসুল আয়িম্মা মুহাম্মাদ ইবনে আবি সাহল আস-সারাখসি, ফাখরুল ইসলাম আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-বাযদাবি, তাঁর ভাই সাদরুল ইসলাম আবুল ইউস্‌র মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ, কাজি জামালুদ্দিন আবু নসর আহমাদ ইবনে আবদুর রাহমান, শামসুল আয়িম্মা আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আলি আয-যারানজারি (রহ.) প্রমুখ। বুখারায় তিনি ছিলেন হানাফি উলামায়ে কেরামের শীর্ষে। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে: আল-মাবসুত, আন-নাওয়াদির, আল-ফাতাওয়া, শারহু আদাবিল কাজি লি আবি ইউসুফ প্রভৃতি। কাশ্ নামক এলাকায় ৪৪৮/৪৫২/৪৫৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সেখান থেকে তাঁর লাশ বুখারায় আনা হয় এবং কালাবায নামক এলাকায় দাফন করা হয়। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৮/১৭৭-১৭৮; আল-আ'লাম : ৪/১৩; আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৯৫-৯৬) –সম্পাদক

১৫০. আশ-শারহুল কাবির, আল্লামা দারদির (রহ.), আল্লামা দুসুকি (রহ.)-এর টীকাসহ প্রকাশিত সংস্করণ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩।
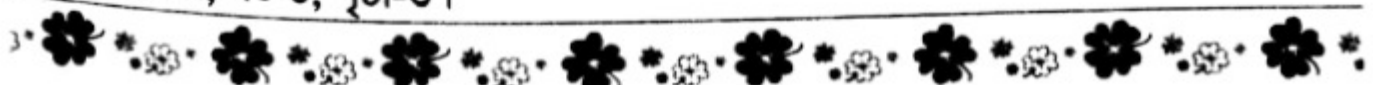
আল্লামা বুহুতি (রহ.) বলেছেন–

(ومنها) أي المعاطاة لو سلمه سلعة بثمن فيقول البائع (خذها) فأخذه المشتري وهو ساكت، أو يقول البائع (هي لك) أو يقول (أعطيتكها) فيأخذها.

'মুআতাতের' একটি পদ্ধতি হলো, যদি কোনো মূল্যে পণ্য দেওয়ার পর বিক্রেতা বলে, 'এটি নাও।' এ কথা শুনে ক্রেতা চুপ থেকে সেটি গ্রহণ করে, অথবা বিক্রেতা যদি বলে, 'এটি তোমার' বা 'এটি তোমাকে দিলাম' এরপর ক্রেতা সেটি গ্রহণ করে (তা হলে বিক্রয় হয়ে যাবে)।'[১৫১]

আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন–

صورته (يعني: التعاطي من جانب واحد) أن يتفقا على الثمن ثم يأخذ المشتري المتاع، ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الثمن، أو يدفع المشتري الثمن للبائع ثم يذهب من غير تسليم المبيع، فإن البيع لازم على الصحيح، حتى لو امتنع أحدهما بعده أجبره القاضي.

'তাআতি'র পদ্ধতি হলো, উভয় পক্ষ একটি মূল্যে একমত হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ না-করে বিক্রেতার সন্তুষ্টিতে ক্রেতা পণ্য নিয়ে যাবে, অথবা ক্রেতা পণ্য না-নিয়ে শুধু মূল্য পরিশোধ করে চলে যাবে। সহিহ মতানুযায়ী এ পদ্ধতিতে বিক্রয় চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এমনকি এরপরও যদি কোনো পক্ষ অস্বীকার করে, তা হলে কাজি তাকে বাধ্য করবেন।'[১৫২]

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেন, 'আল-কামুস' অভিধানে 'তাআতি'র অর্থ করা হয়েছে 'নেওয়া'। সিহাহ ও মেসবাহ নামক অভিধানেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। এ অর্থটি এক পক্ষ থেকে দেওয়া বোঝায়, উভয় পক্ষ থেকে দেওয়া-নেওয়াকে আবশ্যক করে না। যেমনটি আল্লামা তারসুসি (রহ.) বুঝেছেন।' এ আলোচনার কিছু পূর্বে আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেন, 'একপক্ষ থেকে দেওয়ার পদ্ধতিকে ফাতহুল কাদির কিতাবে সহিহ সাব্যস্ত

---

১৫১. কাশশাফুল কিনা, আল্লামা বুহুতি (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৮।
১৫২. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৪৯, ফিকরাহ নং ২২২৫২।

করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) স্পষ্টভাষায় বলেছেন, যেকোনো একটি কব্জা করার মাধ্যমে তাআতি পদ্ধতির বিক্রয় হয়ে যাবে। এ বিষয়টি পণ্য ও মূল্যের মধ্যে সমন্বয় করে।'

এরপর 'কুনইয়া' কিতাব হতে বর্ণনা করেছেন–

دفع إلى بائع حنطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة، وقال له بكم تبيعها، فقال مائة بدينار، فسكت المشتري، ثم طلب منه الحنطة ليأخذها،فقال البائع: غدا أدفع إليك، ولم يجر بينهما بيع، وذهب المشتري، فجاء غدا ليأخذ الحنطة، وقد تغير السعر، فليس للبائع أن يمنعها منه، بل عليه أن يدفعها بالسعر الأول.

'গম নেওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ কোনো গম বিক্রেতার কাছে পাঁচ দিনার দিয়ে বলল, কত টাকায় বিক্রয় করবে? উত্তরে সে বলল, একশত (কফিয) এক দিনারে বিক্রয় করব। এরপর ক্রেতা চুপ থাকার পর গম নেওয়ার জন্য বিক্রেতার কাছে গম চাইলে বিক্রেতা বলল, তোমাকে আগামীকাল গম দেবো, এভাবে তাদের মধ্যে মৌখিক কোনো বিক্রয় হলো না।[১৫৩] তাদের মধ্যে ইজাব-কবুলের কোনো শব্দ ব্যবহার না করে ক্রেতা চলে গেল এবং পরের দিন গম নেওয়ার উদ্দেশ্যে এলো, অথচ তখন বাজারদরের পরিবর্তন ঘটেছে। এমন ক্ষেত্রে বিক্রেতা গম দিতে অস্বীকার করতে পারবে না; পূর্বের মূল্যেই ক্রেতাকে গম দিতে হবে।'[১৫৪]

এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এক পক্ষ থেকে দেওয়ার মাধ্যমে তখনই বিক্রয় সম্পন্ন

---

১৫৩. তাদের মধ্যে ইজাব-কবুলের শব্দ ব্যবহার করা হয় না। অন্যথায় বিক্রেতা মূল্য গ্রহণের মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন হিসাবে বিবেচনা করা হতো।

১৫৪. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮১। এ মাসআলাটিকে দুটি পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব : এক. একপক্ষ থেকে দেওয়ার মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। সেটি হলো পাঁচ দিরহাম দেওয়া এবং বিক্রেতার উল্লিখিত মূল্যের প্রতি ক্রেতা রাজি থাকা। সুতরাং তখনই বিক্রয়টি সংঘটিত হবে। কিন্তু আগামীকাল পণ্য গ্রহণের মাধ্যমে ক্রেতা বিক্রেতাকে সুযোগ দিয়েছে। তাই যে মূল্যে বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে সেই মূল্যে আগামীকাল ক্রেতাকে পণ্য দেওয়া আবশ্যক। দুই. প্রথম দিন বিক্রয় সংঘটিত হবে না; বরং বিক্রেতা ক্রেতাকে এ ওয়াদা দিল যে, উল্লিখিত মূল্যে তার কাছে পণ্য বিক্রয় করবে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব। এ আলোচনা অনুযায়ী ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ওই মূল্যে গম দেওয়া ওয়াজিব। এটি বিচারিক দৃষ্টিকোণের হুকুম নয়। والله تعالى أعلم

হবে, যখন পূর্বাপর অবস্থা ও বিভিন্ন মাধ্যমে বোঝা যাবে যে, উভয় পক্ষ চুক্তি করার ইচ্ছে করেছে। অন্যথায় এক পক্ষ থেকে দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টি যদি দরদাম করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তা হলে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না।

২৯. ফাসেদ চুক্তির পর 'তাআতি' পদ্ধতিতে বিক্রয় করা

তাআতি পদ্ধতিতে তখনই বিক্রয় সম্পন্ন হবে, সেটি যখন কোনো ফাসেদ চুক্তির সঙ্গে হবে না। সুতরাং কেউ যদি ফাসেদ পদ্ধতিতে কোনো বিক্রয়চুক্তির পর তার ওপর নির্ভর করে তাআতি পদ্ধতিতে লেনদেন করে, তা হলে বিক্রয় সহিহ হবে না। উভয় পক্ষের জন্য ফাসেদ চুক্তি বাতিল করা ওয়াজিব। এরপর নতুন করে শব্দের মাধ্যমে ইজাব-কবুল করে বা তাআতির মাধ্যমে লেনদেনের চুক্তি করতে পারবে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেন–

وقدمنا في الإيجاب والقبول أنهما بعد عقد فاسد لا ينعقد بهما البيع قبل متاركة الفاسد، ففي بيع التعاطي بالأولى، وهو صريح الخلاصة والبزازية : أن التعاطي بعد عقد فاسد أو باطل لا ينعقد به البيع لأنه بناء على السابق.

'ইতঃপূর্বে ইজাব-কবুলের আলোচনায় আমরা বলেছি, ফাসেদ চুক্তির পর ফাসেদ হওয়ার কারণটি বাদ দেওয়ার আগে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে চুক্তি সম্পন্ন হবে না। সুতরাং তাআতি পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পন্ন না-হওয়ার বিষয়টি আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত। এটি হলো 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' ও 'ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়া'র স্পষ্ট বক্তব্য যে, ফাসেদ বা বাতিল চুক্তির পর তাআতির পদ্ধতিতে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। কারণ, এগুলো পূর্বের উপর নির্ভরশীল।'[১৫৫]

আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেন–

في المسألة روايتين للحنفية، فينعقد العقد على إحداهما بدون المتاركة، ولا ينعقد على الأخرى إلا بالمتاركة.

'এ মাসআলায় হানাফি মাযহাবের ফকিহদের থেকে দুটি বর্ণনা

---

১৫৫. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮১।

> রয়েছে। একটি বর্ণনা অনুযায়ী ফাসেদ চুক্তি বাদ দেওয়া ছাড়াই তাআতির মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন হবে। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ফাসেদ চুক্তি বাদ দেওয়া ছাড়া বিক্রয় সম্পন্ন হবে না।'[১৫৬]

তবে অধমের (আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন) মতে, উভয় বর্ণনার মাঝে এভাবে সমন্বয় করা সম্ভব যে, কোনো ফাসেদ চুক্তির উপরে ভিত্তি করে তাআতির পদ্ধতিতে বিক্রয় করলে সেটি সম্পন্ন হবে না, তবে বিভিন্ন লক্ষণ ও প্রমাণের মাধ্যমে যখন বোঝা যাবে যে, ফাসেদ চুক্তির ওপর নির্ভর করে তাআতি করা হয়নি; বরং নতুনভাবে চুক্তি করার উদ্দেশ্যে তাআতি করা হয়েছে, এমন ক্ষেত্রে 'তাআতি' পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পন্ন হবে। সুতরাং যেন পরিস্থিতির কারণেই ফাসেদ চুক্তিটি বাদ দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

৩০. 'ইস্তিজরার' পদ্ধতিতে বিক্রয় করা

তাআতি'র সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি বিক্রয় হলো 'ইস্তিজরার' (পর্যায়ক্রম) পদ্ধতিতে বিক্রয় করা। মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরামদের পরিভাষায় ইস্তিজরার বলা হয়, বিক্রেতা থেকে পর্যায়ক্রমে ক্রেতা তার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য নেবে, তবে প্রতিবার তাদের মধ্যে কোনো দরদাম বা ইজাব-কবুল হবে না। এমন লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম হলো, নির্দিষ্ট সময় পর বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতা হিসাব করে থাকে। যেমন, অনেকে একমাস পরে হিসাব করে। মানুষের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি ব্যাপক পরিচিত। শাফেয়ি মাযহাবের যেসব ফকিহ তাআতি পদ্ধতিকে না-জায়েয বলেছেন, তাদের মতে এ পদ্ধতিটিও জায়েয নেই। তবে এর বিপরীতে ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম নববি (রহ.) তাআতি পদ্ধতি জায়েয হওয়ার মতকে প্রধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ইস্তিজরারের পদ্ধতিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে তিনি কঠোরতা দেখিয়েছেন। তিনি বলেন–

> ولا تغتر بكثرة من يفعله، فان كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة، ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض، وهذا باطل بلا خلاف.

---

১৫৬. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৫১, ফিকরাহ নং ২২২৫৫।
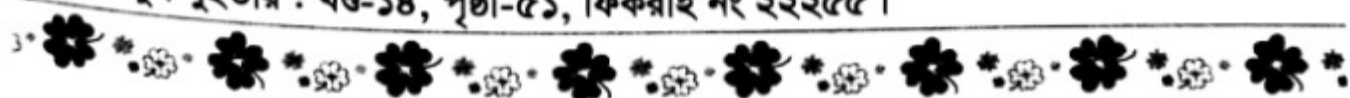
'মানুষ যেসব লেনদেন অনেক বেশি পরিমাণে করে, সেসব লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনি ধোঁকায় পড়বেন না। কেননা, অনেকে কোনো ধরনের ইজাব-কবুল ও তাআতি করা ছাড়া বিক্রেতা থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে থাকে। এরপর নির্দিষ্ট সময়ে হিসাব করে মূল্য পরিশোধ করে। কোনো ধরনের মতানৈক্য ছাড়াই এ পদ্ধতিটি বাতিল।'[১৫৭]

তবে শাফেয়ি মাযহাবের কতক ফকিহ এ পদ্ধতির বিক্রয় জায়েয হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমাম গাযালি (রহ.)।[১৫৮]

উভয় পক্ষই মূল্য জানবে, এই শর্তে ইমাম মালেক (রহ.) এ পদ্ধতিকে জায়েয বলেছেন। পণ্য নেওয়ার সময় যদি মূল্য নির্দিষ্ট না থাকে কিংবা না-জানে, তা হলে ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে সে লেনদেন জায়েয হবে না। 'মুয়াত্তা' কিতাবে তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।[১৫৯]

হাম্বলি মাযহাবের মত হলো, তাদের কাছে বাজারমূল্যে ইস্তিজরারের পদ্ধতিতে লেনদেন করা জায়েয।[১৬০] হানাফি মাযহাবের মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরামগণ ইস্তিহসানের ভিত্তিতে এ পদ্ধতির বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন।[১৬১] তবে ইস্তিহসানের পদ্ধতি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। 'البيع بالتعاطي والاستجرار' নামক আমার একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১৬২] সে আলোচনায় আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তার সারকথা হলো, ইস্তিজরার দুই প্রকার :

১. পরে মূল্য পরিশোধের পদ্ধতিতে ইস্তিজরার করা। এ প্রকারের প্রচলিত রীতি হলো, মাস শেষে হিসাব করে ক্রেতা বিক্রেতার মূল্য পরিশোধ করে থাকে।

---

১৫৭. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, ইমাম নববি (রহ.) : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৭৩।

১৫৮. নেহায়াতুল মুহতাজ, আল্লামা রমালি (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬৪।

১৫৯. আল-মুয়াত্তা, ইমাম মালেক (রহ.), জামে বাইয়িত তাআম। আরও দেখুন: আল-মুনতাকা, আল্লামা বাজি (রহ.) : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৫।

১৬০. মাওসুআতুল ফিকহিল ইসলামি (মিশর) : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩০৫, আল্লামা ইবনে মুফলিহ (রহ.)-এর 'আন-নুকাত ওয়াল ফাওয়াইদুস সানিয়্যাহ'-এর সূত্রে।

১৬১. আদ-দুররুল মুখতার, রাদ্দুল মুহতারের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৫৫-৫৭, ফিকরাহ নং ২২২৬১, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৫৯, বিক্রয়ের সংজ্ঞার ব্যাখ্যা।

১৬২. বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ, মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (হাফিযাহুল্লাহ) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯
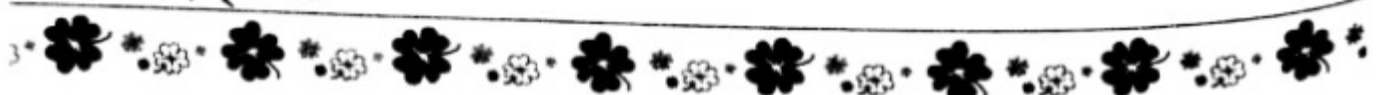
২. আগে মূল্য দেওয়ার পদ্ধতিতে ইস্তিজরার করা। এ প্রকারের প্রক্রিয়া হলো, ক্রেতা বিক্রেতার কাছে টাকা জমা রাখবে। এরপর কিছু পণ্য নেওয়ার পর মাস শেষে চূড়ান্ত হিসাব করে সমন্বয় করে নেয়।

❐ পরে মূল্য পরিশোধের পদ্ধতির হুকুম

এক. প্রতিবার পণ্য নেওয়ার সময় বিক্রেতা যদি প্রতিটি পণ্যের মূল্য বলে দেয়, তা হলে সকল ফকিহের মতে এ পদ্ধতি জায়েয। যারা তাআতির পদ্ধতিকে জায়েয বলেছেন, তাদের সবার কাছেই এ পদ্ধতিটি জায়েয। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তাআতির জন্য উভয় পক্ষ থেকে দেওয়া-নেওয়া শর্ত নয়; বরং এক পক্ষ থেকে দেওয়াই যথেষ্ট।

দুই. প্রতিটি পণ্য নেওয়ার সময় বিক্রেতা সেটির মূল্য বলবে না, তবে উভয় পক্ষ চুক্তি করে রাখবে যে, পণ্যটির বাজারমূল্যে ক্রেতা পণ্য নেবে এবং এমন নির্দিষ্ট মানদণ্ডে বাজারমূল্যটি নির্ধারিত থাকবে, যেটি নির্ধারণে কোনো মতানৈক্য হয় না। এমন ক্ষেত্রে সহিহ মত হলো, প্রতিবার পণ্য নেওয়ার সময় সহিহ বিক্রয় হিসাবেই চুক্তি সম্পন্ন হবে।

তিন. পণ্য নেওয়ার সময় যদি তার মূল্য অস্পষ্ট থাকে, অথবা উভয় পক্ষ এ ব্যাপারে চুক্তি করে যে, তারা বাজার দরে লেনদেন করবে। কিন্তু বাজার দরের মধ্যে এমন কম-বেশি হয়ে থাকে, যেখানে নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণে মতানৈক্য হয়। এমন ক্ষেত্রে পণ্য নেওয়ার সময় বিক্রয় সম্পন্ন হবে না; বরং চূড়ান্ত হিসাবের সময় বিক্রয় সম্পন্ন হবে। কিন্তু চূড়ান্ত হিসাবের সময় সম্পন্ন হওয়া বিক্রয়কে পণ্য নেওয়ার সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে পণ্য গ্রহণের সময় থেকেই ক্রেতার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত করা হবে। তখন থেকেই ওই পণ্যে সব ধরনের হস্তক্ষেপ বৈধ বলে বিবেচিত হবে।[১৬৩]

❐ আগে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ইস্তিজরার করা

মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে এ পদ্ধতির আলোচনাটি প্রথম পদ্ধতির আলোচনার

---

১৬৩. এ পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে বিক্রয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম মতানৈক্য করেছেন। অনেকে নষ্ট হওয়া জিনিসের জরিমানা আরোপ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, বিক্রয় সংঘটিত হিসাবে না। আর অনেকে চূড়ান্ত হিসাবের সময় বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় মতকে সে সম্পর্কে আমার বিশেষ প্রবন্ধে প্রাধান্য দিয়েছি এবং তার পক্ষে দলিল দিয়েছি। বিস্তারিত জানতে দেখুন: বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪, দারুল উলুম করাচি থেকে প্রকাশিত।
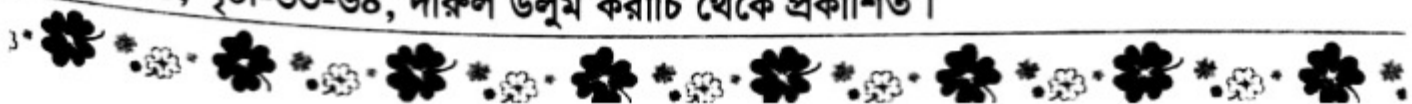
মতো। এরপর আগে পরিশোধ করা মূল্যটিকে বিক্রেতার কাছে আমানত হিসাবে সাব্যস্ত করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিবার নেওয়া পণ্যের মূল্য ছাড়া অতিরিক্ত মূল্যকে বিক্রেতা নিজের অর্থের সঙ্গে মিলাতে বা তার প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে না। বিক্রেতা যদি নিজের অর্থের সঙ্গে ওই অর্থ মিলায়, তা হলে শরয়ি দৃষ্টিতে তা দায়বদ্ধ ঋণে পরিণত হবে[১৬৪] এবং ক্রেতা প্রতিবার পণ্য নেওয়ার সময় বিক্রেতার ওপর থাকা ঋণ হতে মূল্যের সমন্বয় হবে।

এ মাসআলা থেকে বিভিন্ন পুস্তিকা ও দৈনিক পত্রিকার হুকুম জানা যায়। কেননা, বর্তমান সময়ের একটি সাধারণ নিয়ম হলো, পত্রিকা প্রকাশককে বছরের শুরুতে একসঙ্গে পূর্ণ এক বছরের মূল্য প্রদান করতে হয়, তখন কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকাটি ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এটি হলো আগে মূল্য দেওয়ার ইস্তিজরার এবং এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কাছে পত্রিকা পৌঁছানোর সঙ্গে-সঙ্গে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং যদি কোনো কারণে বছরের মাঝে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে প্রকাশক ক্রেতাকে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

প্রচলিত নিয়ম রয়েছে যে, অনেক ক্ষেত্রে পণ্যের বাজারমূল্য অপেক্ষা আগে দেওয়া অর্থের পরিমাণ কম হয়ে থাকে। এমন ক্ষেত্রে বাইয়ে সালামের[১৬৫]

---

১৬৪. অর্থাৎ, মালিকের অনুমতি ছাড়া মিশ্রণ করলে। আর এমন করলে ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতানুযায়ী তার জন্য লভ্যাংশ বৈধ হবে না, আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে সমন্বয় করার পর বৈধ হবে। সামনে এ ব্যাপারে আলোচনা আসবে। (হেদায়া, ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ ও ইনায়াহ : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১৯-৩২১) আর যদি ক্রেতার স্পষ্ট অনুমতিক্রমে মিশ্রণ করে, তা হলে মালিকানার দিক থেকে ক্রেতা তার শরীক হয়ে যাবে। রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: আমানত : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৬৯,-এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর চূড়ান্ত হিসাবের সময় সমন্বয় করা হবে।

১৬৫. **বাইয়ে সালাম :** বাইয়ে সালামের সংজ্ঞা একেক ফকিহ একেকভাবে দিয়েছেন। কেউ বলেছেন: বাইয়ে সালাম হচ্ছে নগদ বস্তুর বিনিময়ে বাকি বস্তু বিক্রয় করা (بيع الآجل بالعاجل أو بيع الدين بالعين)। সহজভাষায় বলা যায়: আগে মূল্য পরিশোধ করে পরবর্তী সময়ে পণ্য গ্রহণ করা অথবা মূল্য নগদে পরিশোধ করে পণ্য বাকিতে ক্রয় করা। যেমন: হাসান মুবিনকে বলল: "আমি তোমাকে এখন পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি। তুমি আমাকে একমাস পরে পাঁচ মণ ধান দেবে।" মুবিন বলল: "আমি কবুল করলাম" বা "আমি রাজি"। এ ধরনের ইজাব-কবুলের মাধ্যমে সংঘটিত বিক্রয়চুক্তিকে বাইয়ে সালামের চুক্তি বলে।

এক্ষেত্রে কিছু আবশ্যক পরিভাষা রয়েছে: যে মূল্য পরিশোধ করে তাকে বলে "রাব্বুস সালাম" বা "মুসাল্লিম"। যে পণ্য সরবরাহ করে তাকে বলে "মুসলাম ইলাইহি"। পণ্যের মূল্যকে বলে "রা'সু মালিস সালাম"। পণ্যটিকে বলা হয় "মুসলাম ফিহ"।

বাইয়ে সালাম সহিহ হওয়ার জন্যে ফিকহে হানাফি অনুযায়ী সাতটি শর্ত রয়েছে, যেগুলো
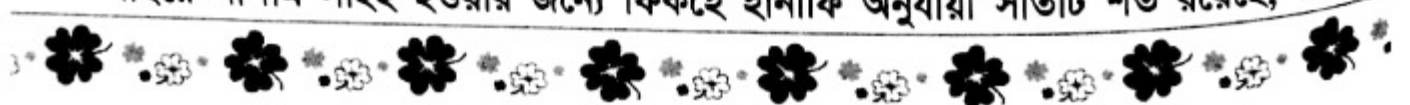
শর্ত অনুযায়ী সেটিকে বাইয়ে সালাম সাব্যস্ত করা গেলে সালাম হিসাবে বিবেচিত হবে। আর যদি বাইয়ে সালামের শর্ত না-পাওয়া যায়, তা হলে সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে, আগে মূল্য দেওয়ার কারণে পণ্যের মূল্য কমে গেছে। যেমনটি দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখানে প্রতিদিনের পত্রিকার মূল্য অপেক্ষা একসঙ্গে বার্ষিক মূল্যের পরিমাণ কম হয়। মূল্য কম হওয়ার বিষয়টিকে এমনভাবে ব্যক্ত করা যায় যে, সাধারণত একক পণ্যের দামের চেয়ে সামষ্টিক সবগুলো পণ্যের মোট দাম কম হয়। সুতরাং ইস্তিজরারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হবে। ক্রেতা এ কারণে আগে মূল্য দেয় যে, সে একসঙ্গে অনেকগুলো পণ্য ক্রয় করবে। তাই, ধরা যায়, সে যেন একসঙ্গে অনেক পণ্য ক্রয় করছে, ফলে তার মূল্য কম হয়েছে, ঋণের কারণে মূল্য কমেনি। তা ছাড়া চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। এমন মূল্য পরিশোধকে ফিকহি পরিভাষায় যদিও ঋণ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে; কিন্তু ইস্তিজরারের ক্ষেত্রে মূলত ঋণ দেওয়াও উদ্দেশ্য থাকে না; বরং ক্রেতার উদ্দেশ্য থাকে দায়মুক্ত হওয়া, যেন প্রতিবার পণ্য নেওয়ার সময় মূল্য পরিশোধের ঝামেলায় না-পড়তে হয়।

৩১. অটোমেটিক সিস্টেমে বিক্রয় করা

বর্তমানে অটোমেটিক সিস্টেমে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপকতা ঘটেছে। বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় এজন্য মেশিন স্থাপন করে সেখানে বিভিন্ন পণ্য রেখে পাশে তার মূল্য দেওয়া থাকে। যে ব্যক্তি এসব পণ্যের কোনো একটি ক্রয় করতে চাইবে, সে নির্দিষ্ট জায়গায় মূল্য প্রবেশ করালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্যটি বেরিয়ে আসবে এবং ক্রেতা সেটি নিয়ে নেবে। এসব মেশিনের কাছে মূল্য নেওয়া ও পণ্য দেওয়ার দায়িত্ব পালনের মতো কেউ থাকে না।

এ পদ্ধতির বিক্রয় জায়েয হওয়ার ব্যাপারে একমত হওয়ার পর এর

বাইয়ে সালামের চুক্তি করার সময়ই উল্লেখ করতে হবে। এক. পণ্যটি কী জাতীয়? দুই. পণ্যটি কোন প্রকারের? তিন. পণ্যের দোষ-গুণ, চার. কখন পণ্যটি হস্তান্তর করা হবে? পাঁচ. মূল্য বা রা'সুল মালের পরিমাণ–যখন মূল্য হিসেবে এমন কোনো বস্তু দেওয়া হয়, যার পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। যেমন: দুই কেজি গম বা পাঁচ লিটার তেল কিংবা এক ডজন ডিম, ছয়. যে স্থানে বিক্রেতা পণ্যটি হস্তান্তর করবে তা নির্দিষ্ট করা–যখন পণ্যটি পরিবহন করতে ভাড়া ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, সাত. চুক্তির স্থান থেকে ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হওয়ার আগেই বিক্রেতা পণ্যের মূল্য হস্তগত করতে হবে। (মুখতাসারুল কুদুরি, পৃষ্ঠা-৮৮; কাওয়ায়েদুল ফিক্হ, পৃষ্ঠা-২১৩; দুরারুল হুককাম শারহু মাজাল্লাতুল আহকাম : ১/৯৯; শারহু মানযুমাতিল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যাহ লিস সা'দি, পৃষ্ঠা-৫৪) –সম্পাদক
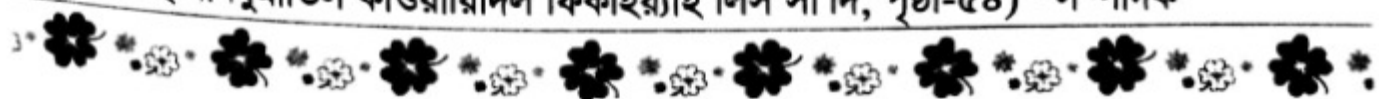
বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমকালীন ফকিহদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।[১৬৬] সমকালীন অনেক আলেমের মত হলো, ইজাবকারী উপস্থিত না-হয়ে তার পক্ষ থেকে মেশিন স্থাপন বা তার প্রতিনিধি দাঁড় করানোর মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন হবে। যেমন, মেশিন স্থাপন ও মূল্যের ঘোষণা প্রকাশ করা মালেকি মাযহাব অনুযায়ী সকল গ্রাহকের কাছে ইজাব পেশ করা বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মেশিনটি বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হবে।

আমরা এ মত গ্রহণ করছি না। এই চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এটি তাআতি'র একটি প্রকারমাত্র। মেশিনটি মূল্য গ্রহণ ও পণ্য হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিক্রেতার ভূমিকা পালন করবে। সুতরাং ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য প্রবেশ করানো একপক্ষ থেকে দেওয়া এবং মেশিন থেকে পণ্য বের করা অন্য পক্ষের নেওয়া হিসাবে সাব্যস্ত হবে, ফলে তাআতি'র পদ্ধতিতেই বিক্রয় সম্পন্ন হচ্ছে। মেশিনে মূল্য দেওয়া কোনো ইজাব নয়; বরং এটা ইজাবের প্রতি আহ্বান করা। যেমনটি বিক্রয়ের রুকনের শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মেশিন স্থাপন করা ও সেখানে মূল্য উল্লেখ করাকে যদি ইজাব হিসাবে সাব্যস্ত করি, তা হলে মেশিনে মূল্য দেওয়া কবুল হিসাবে বিবেচিত হবে এবং মূল্য প্রবেশের মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন হবে। অথচ অনেক সময় মেশিন কাজ করে না বা তার পণ্য শেষ হয়ে যায়। এমন ক্ষেত্রে বিক্রয় সম্পন্নের সিদ্ধান্ত দিলে তা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করবে। এ কারণে ফুকাহায়ে কেরামকে দেখতে পাই যে, অনুরূপ ক্ষেত্রসমূহকে তারা তাআতি সাব্যস্ত করেছেন, কৃত্রিম ইজাব-কবুল সাব্যস্ত করেননি। আল্লামা বুহুতি (রহ.) তাআতির পদ্ধতি বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেছেন—

> أو وضع مشتر ثمنه المعلوم لمثله عادة وأخذه، أي : الموضوع ثمنه عقبه أي عقب وضع ثمنه من غير لفظ لواحد منهما، وظاهره: ولو لم يكن المالك حاضرا للعرف.
>
> 'ক্রেতা প্রচলিত নির্ধারিত মূল্য রেখে দেবে এবং বিক্রেতা সেই রেখে দেওয়া মূল্য গ্রহণ করবে, তবে তাদের কেউ মৌখিকভাবে ইজাব-কবুল করবে না। এ কথা থেকে বোঝা যায়, প্রচলন

---

১৬৬. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যাঃ ষষ্ঠ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৮১। ড. ইবরাহিম কাফি (রহ.)-এর আলোচনা।

থাকার কারণে তা জায়েয হবে, যদিও সেখানে মালিক উপস্থিত থাকে না।'[১৬৭]

৩২. বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক পক্ষ বা উভয় পক্ষের অঙ্গীকার

এ ব্যাপারে আমাদের আলোচনা হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে 'চুক্তি করা' বোঝায় এমন শব্দের মাধ্যমেই বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়। এ কারণে এমন শব্দের মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না, যেগুলোকে ভবিষ্যতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 'অচিরেই তোমার কাছে এ পণ্যটি বিক্রয় করব', 'শীঘ্রই তোমার থেকে এ পণ্যটি ক্রয় করব'। এ ধরনের শব্দগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রয় সম্পন্ন না-করে ভবিষ্যতে বিক্রয়ের ওয়াদা করা বোঝায়।

সুতরাং যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে বিক্রয়ের ব্যাপারে কারো সঙ্গে ওয়াদা করল, তার জন্যে সে ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব কি না–এ প্রশ্নটি এক পক্ষ বা উভয় পক্ষের ওয়াদা রক্ষা আবশ্যক হওয়া বিষয়ক আলোচনার দাবি রাখে। ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম মত : এ সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত মত হলো, ওয়াদা রক্ষা করা মুস্তাহাব, যাকে গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ধর্মীয় ও বিচারিক দিক থেকে এটা করতে কেউ বাধ্য নয়। ওয়াদাকারী তার ওয়াদা রক্ষা না-করলে, সে একটি ভালো কাজ ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত গর্হিত একটি মাকরুহে তানযিহির[১৬৮] কাজ করল। তবে এ কারণে তার গোনাহ হবে

---

১৬৭. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, আল্লামা বুহুতি (রহ.) : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪১। বিক্রয়ের শর্তসমূহের আলোচনা।

১৬৮. অর্থাৎ, তার বিক্রয়চুক্তির দিকে লক্ষ করে এ কাজটি মাকরুহে তানযিহি হবে। তবে মৌলিকভাবে ওয়াদা ভঙ্গ করা তো কবিরা গুনাহ ও হারাম–এতে কারোরই দ্বিমত নেই। দৃষ্টিভঙ্গিটি হলো: আমার মাল আমি প্রথমে আবদুল্লাহর কাছে বিক্রি করতে চেয়ে ওয়াদা দিয়ে ফেলেছিলাম। পরে দেখা গেল যে, আসলে তার কাছে বিক্রি করা আমার জন্যে কম লাভজনক বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই আমি আবদুল্লাহর কাছে সেটি বিক্রি না-করে অন্য কারো কাছে বিক্রি করলাম। যেহেতু জিনিস আমার, তাই এর উপর সার্বিক অধিকারও আমার–এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হচ্ছে– "মাকরুহে তানযিহি" হবে। তবে যেহেতু ওয়াদা ভঙ্গ করা খুব খারাপ কাজ, তাই বলা হচ্ছে "অত্যন্ত গর্হিত"। অথচ আমরা জানি, মাকরুহে তানযিহির কারণে কবিরা গুনাহ হয় না। সগিরা গুনাহ হয়। আর সগিরা গুনাহের ব্যাপারে "অত্যন্ত গর্হিত" বা এ জাতীয় শব্দের প্রয়োগ হয় না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। –সম্পাদক
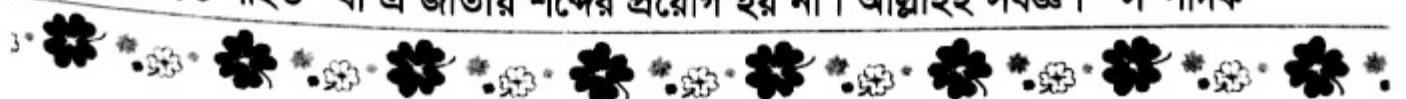
না। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ি, আহমাদ ও মালেকি মাযহাবের কিছু উলামায়ে কেরামের প্রতি এ মত সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে।[১৬৯]

দ্বিতীয় মত : ধর্মীয় ও বিচারিক দৃষ্টিকোণে ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব। ওয়াদা রক্ষা করা যায় না, এমন কারণ ছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রে ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে বিচারক রায় দেবেন। এটি হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাযি.), উমর বিন আবদুল আজিজ, হাসান বসরি, কাজি সায়িদ বিন আশওয়া, ইসহাক বিন রাহাওয়াইহ্[১৭০], ইমাম বুখারি (রহ.)[১৭১] ও

---

১৬৯. উমদাতুল কারি : খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-১২১। মেরকাতুল মাফাতিহ : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১১৪। আল-আযকার, ইমাম নববি (রহ.), পৃষ্ঠা-৩১৭। ফাতহুল আলিয়্যিল মালেক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৪। হানাফি মাযহাবের সব ইমামের প্রতি এ মত সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে আমার প্রশ্ন রয়েছে। সামনে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে– ইনশাআল্লাহ।

১৭০. **ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ্ :** ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইবনে মাখলাদ আবু ইয়াকুব আল-হানযালি আল-মারওয়াযি (রহ.)। ইবনে রাহাওয়াইহ্ নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম: ১৬১ হিজরি মোতাবেক ৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইরানের খোরসান প্রদেশের মার্ভে। খোরাসানের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও হাফিযুল হাদিস ছিলেন। তাঁর উস্তাদগণ: আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, ফুযাইল ইবনে ইয়ায, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না, মুহাম্মাদ ইবনে জাফর–যিনি গুনদার নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, ওয়াকি ইবনুল জাররাহ, ইয়াযিদ ইবনে হারুন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান, আবদুর রাহমান ইবনে মাহদি (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। তাঁর ছাত্রগণ: আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মায়িন–এই দুইজন তাঁর সহপাঠীও ছিলেন, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ি, ইমাম তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনে নসর আল-মারওয়াযি, দাউদ ইবনে আলি আয-যাহেরি (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। হাকেম নাইসাপুরি বলেছেন, 'তিনি ছিলেন ইলমে হাদিস ও ফিকহ-ফতোয়ায় তাঁর যুগের ইমাম।' ইমাম আহমাদ বলেছেন, 'খুরাসানে ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ-এর কোনো তুলনা নেই। যদিও আমাদের সঙ্গে কিছু মাসআলায় তাঁর মতবিরোধ রয়েছে। আর আলেমদের (দলিলভিত্তিক) মতবিরোধ তো খুবই স্বাভাবিক।' তিনি আরও বলেছেন, 'পুরো দুনিয়ায় তাঁর কোনো তুলনা নেই!' ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ (রহ.) বলেন, 'এমন কোনো হাদিস নেই, যা আমি শুনেছি কিন্তু মুখস্থ করিনি। আর এমন কোনো হাদিসও নেই, যা আমি মুখস্থ করে ভুলে গিয়েছি!' তাঁর ছাত্র আবু দাউদ আল-খাফফাফ বলেন, 'ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ্ (রহ.) আমাদেরকে এগারো হাজার হাদিস মুখস্থ লিখিয়েছেন। এরপর সেগুলো কিতাব থেকে দেখে-দেখে শুনিয়েছেন। কিন্তু যা মুখস্থ লিখিয়েছিলেন, তাতে একটি অক্ষরও কম-বেশি হয়নি!' তিনি ছাড়াও কয়েকজন মুহাদ্দিস এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর আরেক ছাত্র আবু ইয়াযিদ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেছেন, আমি ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ-কে বলতে শুনেছি, আমার সত্তর হাজার হাদিস মুখস্থ রয়েছে।' ইবনে রাহাওয়াইহ বলেছেন, 'চার হাজার জাল হাদিসও আমার মুখস্থ রয়েছে!' ইমাম আবু যুরআ রাযি বলেছেন, 'ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ-এর মতো হাফিযুল হাদিস আর দেখা যায়নি।' তাঁর রচনাবলির মধ্যে "মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ্" প্রসিদ্ধ। ইন্তেকাল: তিনি ২৩৮ হিজরি মোতাবেক ৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের নাইসাপুরে ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১১/৩৫৮-৩৮৩; আল-আনসাব, সামআনি : ৪/৩১৪; আল-আ'লাম : ১/২৯২) –সম্পাদক
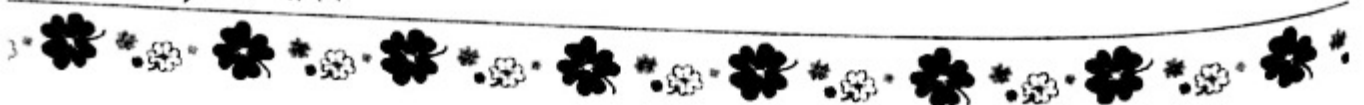
মালেকি মাযহাবের মত। কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি[১৭২] ও ইবনুশ শাত (রহ.) এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন[১৭৩] এবং শাফেয়ি মাযহাবের ইমাম গাযালি (রহ.) এটা গ্রহণ করেছেন। তবে ওয়াদাটি এমনভাবে হতে হবে, যাতে দৃঢ়তা বোঝা যায়।[১৭৪] ইমাম ইবনে হাযম[১৭৫] (রহ.)-এর বর্ণনা

---

১৭১. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: শাহাদাহ, পরিচ্ছেদ: ওয়াদা রক্ষা করা।

১৭২. **কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি** : মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাআফিরি আল-ইশবিলি আল-মালেকি (রহ.)। আবু বকর ইবনুল আরাবি নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম : মুসলিম স্পেনের ইশবিলিয়ায় (বর্তমান নাম : সেভিলা) ৪৬৮ হিজরিতে। তাঁর বাবা ছিলেন ইমাম ইবনে হাযমের একনিষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু তিনি যাহেরিদের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন ইমাম গাযালি (রহ.), আবু বকর আশ-শাশি, আবু যাকারিয়া আত-তাবরিযি প্রমুখ। আবদুর রাহমান ইবনে সাবের, তাঁর ভাই, আহমাদ ইবনে সালামাহ প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি সেভিলার কাজি ছিলেন। তাফসির, হাদিস, ফিকহ, উসুলে ফিকহ ও ইতিহাস বিষয়ে বহু মূল্যবান রচনা তিনি উম্মাহকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: আরিযাতুল আহওয়াযি ফি শারহি জামিয়ি আবু ইসা আত-তিরমিযি, উম্মাহাতুল মাসায়িল, নুযহাতুন নাযির, আল-মাহসুল (উসুলে ফিকহ), আহকামুল কুরআন, আল-কাবাস ফি শারহি মুয়াত্তা ইবনে আনাস, আন-নাসেখ ওয়াল মানসুখ, আল-মাসালেক আলা মুয়াত্তা মালেক, আল-ইনসাফ ফি মাসায়িলিল খেলাফ, কানুনুত তাবিল (উসুলে তাফসির) প্রভৃতি। ৫৪৩ হিজরিতে মরক্কোর ফাস (বর্তমান : ফেজ) নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২০/১৯৯-২০৩; আল-আ'লাম : ৬/২৩০) –সম্পাদক

১৭৩. আল-জামে লি আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবি (রহ.) : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৮ : ৭২, ইমাম কারাফি (রহ.)-এর আল-ফুরুক-এর টীকায় আল্লামা ইবনুশ শাত (রহ.)-এর টীকা, ৪ : ২৪।

১৭৪. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ইমাম গাযালি (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৩।

১৭৫. **ইমাম ইবনে হাযম** : আলি ইবনে আহমাদ ইবনে সায়িদ ইবনে হায্ম আবু মুহাম্মাদ আয-যাহেরি (রহ.)। মুসলিম স্পেনের কর্ডোভায় ৩৮৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এবং তাঁর পিতা আন্দালুসের সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। পরে তিনি তা পরিত্যাগ করে ইলমে দীনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি কাসেম ইবনে আসবাগের ছাত্র ইয়াহইয়া ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে রাবি তামিমি, আবু উমর ইবনে আবদুল বার (যদিও তিনি তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন) প্রমুখ ইমামদের থেকে ইলম অর্জন করেন। তাঁর ছাত্র ছিলেন: তাঁর ছেলে আবু রাফে আল-ফযল ইবনে আলি, আবু আবদুল্লাহ আল-হুমাইদি, কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবির পিতা প্রমুখ খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণ। প্রচণ্ড ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। সমকালীন সব জ্ঞানে তাঁর কোনো জবাব ছিল না। ইমাম যাহাবি বলেন, 'তিনি ছিলেন ইমাম, বাহরুল উলুম, বহুশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং সেকালের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব।' ইমাম ইযযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম (রহ.) বলেছেন, 'ইবনে হাযম (রহ.) ছিলেন মুজতাহিদ ইমামদের অন্যতম। তাঁর লিখিত আল-মুহাল্লার মতো কোনো কিতাব ইসলামে লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।' ইমাম যাহাবিও তাঁর এই কথা সমর্থন করেছেন। যাহাবি আরও বলেন, 'তিনি প্রথমে শাফেয়ি ফিকহ শিক্ষা করেন। পরে তাঁর ইজতিহাদ তাঁকে সর্বোতভাবে কিয়াস ও মাযহাব অনুসরণ পরিত্যাগ করে কুরআন-সুন্নাহর যাহেরি 'নস'-এর উপর আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে। ... এ বিষয়ে তিনি প্রচুর লিখেছেন। মুনাযারা করেছেন। কলম ও যবান
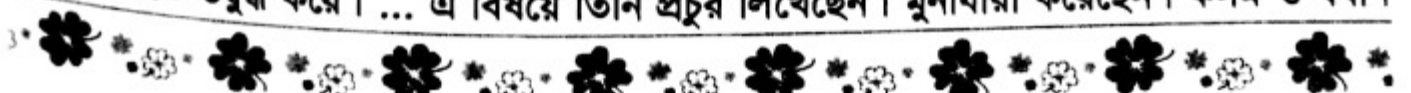
অনুযায়ী ইবনে শুবরুমা (রহ.)-এরও এ মত।[১৭৬]

তৃতীয় মত : মালেকি মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের মত। এ মতে ওয়াদা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে এবং সে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আবার দুটি পক্ষ হয়ে গেছে।

প্রথম পক্ষ : যখন কোনো কারণে ওয়াদা করা হবে এবং যার সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছে, সে উক্ত ওয়াদার উপর নির্ভর করে কোনো বিষয়ে অনুপ্রবেশ করেছে, এমন ক্ষেত্রে ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব। ওয়াদাকারীর ওয়াদা রক্ষা আবশ্যক হওয়ার পক্ষে কাজি রায় দেবেন। আরও স্পষ্টভাষায় এভাবে বলা যায়, যদি কোনো কারণের ওপর নির্ভর করে ওয়াদা করা হয় এবং যার সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছে, ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে সে যদি ওই কাজ করে, তা হলে এ ক্ষেত্রে ওয়াদাকারীর জন্য ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াাজিব এবং এ ব্যাপারে এটিই হবে বিচারকের সিদ্ধান্ত।

উদাহরণ: কেউ কাউকে বলল, 'তোমার বাড়ি ভেঙে ফেলো, আমি তোমাকে ঋণ দেবো।' এই ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে লোকটি বাড়ি ভেঙে ফেলল। এ ক্ষেত্রে বিচারিক দিক থেকে ওয়াদাকারীর জন্য ওয়াদাকৃত অর্থ ঋণ দেওয়া আবশ্যক হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে, 'তুমি হজে যাও, আমি তোমাকে ঋণ দেবো।' তার ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে হজে গেলে ওয়াদাকারীর জন্য প্রতিশ্রুত ঋণ দেওয়া আবশ্যক। একইভাবে যদি কেউ কাউকে বলে, 'তুমি অমুক মহিলাকে বিয়ে করো, আমি তোমাকে ঋণ

উভয়ই দুধারি তরবারির মতো চালনা করেছেন। তবে ইমামগণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যথাযথ আদব বজায় রাখতে পারেননি।' এ কারণে মুসলিম জনসাধারণের তীব্র রোষের মুখে মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হন। তাঁর পুত্র ফযল ইবনে আলি বলেছেন, 'আমার পিতা নিজের হাতে চারশত জিলদ কিতাব লিখেছেন। যাতে প্রায় আশি হাজার পৃষ্ঠা রয়েছে।' এ থেকে তাঁর অজস্র রচনাবলি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছেঃ আল-মুহাল্লা (এগারো খণ্ডে), আন-নাসেখ ওয়াল মানসুখ, জাওয়ামিউস সিরাহ, ফাযায়িলুল আন্দালুস, আল-ইহকাম লি উসুলিল আহকাম (আট খণ্ডে), ইবতালুল কিয়াস ওয়ার রাই, আল-ইজমা, ইখতিলাফুল ফুকাহা আল-খামসাহ–মালেক, আবু হানিফা, শাফেয়ি, আহমাদ এবং দাউদ–, আল-ইমলা ফি শারহিল মুয়াত্তা, মান তারাকাস সালাতা আমদান, মুখতাসারুল মিলাল ওয়ান নিহাল প্রভৃতি। নির্বাসিত জীবন কাটানো অবস্থায় আন্দালুসে ৪৫৬ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৮/১৮৪-২১২; আল-আ'লাম : ৪/২৫৪) –সম্পাদক

১৭৬. আল-মুহাল্লা : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৮।
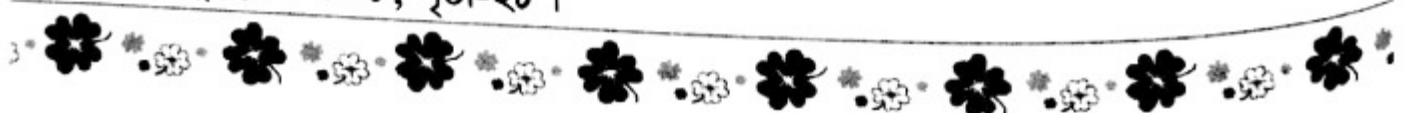
দেবো।' এরপর তার ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে সে বিয়ে করলে ধর্মীয় ও বিচারিক দিক থেকে ওয়াদাকারী প্রতিশ্রুত ঋণ দিতে বাধ্য থাকবে।

এটি মালেকি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। ইমাম ইবনুল কাসেম[১৭৭] ও ইমাম সাহনুন[১৭৮] (রহ.)-এরও এই মত। 'আল-মুদাওওয়ানা' কিতাবে এ মতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[১৭৯]

দ্বিতীয় পক্ষ : কোনো কারণে ওয়াদা করে থাকলে যার সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছে সে ওই কাজ না-করলেও ওয়াদাকারীর জন্য ওয়াদা রক্ষা করা

---

১৭৭. **ইমাম ইবনুল কাসেম :** আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম ইবনে খালেদ আল-আতাকি আল-মিশরি (রহ.)। জন্ম : ১৩২ হিজরিতে মিশরে। ইমাম মালেক (রহ.) এবং তাঁর পর্যায়ের বড়-বড় ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের কাছে ইলম অর্জন করেছেন। সাহনুন, হারেস ইবনে মিসকিন, আসবাগ ইবনুল ফারাজ (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁর শাগরেদ ছিলেন। দুনিয়াবি অনেক ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন তিনি। কিন্তু সেসব ইলমের জন্য ব্যয় করে দিয়েছিলেন। অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল আলেম ছিলেন। আলেমদের রাজদরবারে যাওয়াকে খুবই খারাপ চোখে দেখতেন। ইমাম মালেক থেকে তিনি যে ইলমে ফিকহ অর্জন করেছিলেন, তা তাঁর ছাত্র ইমাম সাহনুন "আল-মুদাওওয়ানাহ" কিতাবে সংকলন করেছেন। ইমাম আসাদ ইবনুল ফুরাত বলেছেন, তিনি প্রতি রাতে ও দিনে পূর্ণ কুরআন শরিফ দুইবার পড়ে শেষ করতেন। ১৯১ হিজরি সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৯/১২০-১২৫; আল-আ'লাম, যিরিকলি : ৩/৩২৩) –সম্পাদক

১৭৮. **ইমাম সাহনুন :** আবদুস সালাম ইবনে হাবিব আবু সায়িদ আত-তানুখি আল-মাগরিবি আল-মালিকি (রহ.)। সাহনুন বা সুহনুন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। জন্ম : ১৬০ হিজরি। মাগরিবের (উত্তর আফ্রিকা) শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। কাইরাওয়ানের বিচারকের পদ অলংকৃত করেন। ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছ থেকে ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম (রহ.) যে ফিকহ শিক্ষা করেছিলেন, ইবনুল কাসেম থেকে সেসব ইলম একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। যেটি মালেকি মাযহাবের অন্যতম প্রাচীন ও গ্রহণযোগ্য উৎসগ্রন্থ হিসাবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। ১৬ খণ্ডে লিখিত কিতাবটির নাম : "আল-মুদাওওয়ানাহ"। ইলমে দীন ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ উভয়ের মাঝে সমন্বয় সৃষ্টিকারী মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। তাঁর ও ইমাম আসাদ ইবনুল ফুরাত (রহ.)-এর নেতৃত্বে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সিসিলিতে অভিযান পরিচালিত হয়। সিসিলি বিজয়ের পর এরই ধারাবাহিকতায় মাল্টা দ্বীপও মুসলমানদের অধিকারে আসে। মাল্টা দ্বীপরাষ্ট্রটি তার ভাষা ও সংস্কৃতিতে আজও তাঁদের সেইসব স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে। ইমাম সাহনুন অত্যন্ত নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। হক কথা বলতে গিয়ে কোনো সুলতানের সালতানাত কিংবা আমিরের শাসনের বিন্দুমাত্র ভয় করতেন না। দুনিয়াজোড়া হাজারো শিষ্য-শাগরেদ ছিল তাঁর। ইন্তেকাল করেন ২৪০ হিজরিতে। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১২/৬৩-৬৯; আল-আ'লাম, যিরিক্‌লি : ৪/০৫) –সম্পাদক

১৭৯. আল-ফুরুক, ইমাম কারাফি (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫, ও ফাতহুল আলিয়্যিল মালেক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৪।

ওয়াজিব। সেটি আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে কাজি রায় দেবে। যেমন, আপনি বললেন, 'আমি বিয়ে করার ইচ্ছে করছি'/ 'অমুক জিনিস ক্রয় করতে চাচ্ছি'/ 'আমার ঋণ পরিশোধ করতে চাচ্ছি, তাই আপনি আমাকে ঋণ দিন'/ 'আগামীকাল অমুক জায়গায় সফর করার ইচ্ছে করছি, তাই আপনার বাহনটি আমাকে ধার দিন'/ 'আমার জমি চাষ করার ইচ্ছে করছি, তাই আপনার পশুটি দিন'– এমন কথার প্রেক্ষিতে সে বলল, 'হ্যাঁ, দেবো।' এরপর যার সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছে সে বিয়ে / ক্রয় / সফর করার আগে ওয়াদাকারী তার ওয়াদা থেকে ফিরে আসার ইচ্ছে করলেও বিচারিক দিক থেকে ওয়াদা রক্ষা করতে সে বাধ্য থাকবে। উপর্যুক্ত উদাহরণগুলো এক পক্ষের অনুরোধ এবং অন্য পক্ষের তাতে সাড়া প্রদান হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অপর পক্ষ থেকে অনুরোধ ছাড়াই এক পক্ষ থেকে এ রকম কোনো কাজ আবশ্যক করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত হবে। কেউ কিছু চাওয়া ছাড়া সে যদি বলে, তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য তোমাকে এ পরিমাণ অর্থ ঋণ দেবো। তুমি বিয়ে করলে বা অনুরূপ কিছু করলে তোমাকে এ পরিমাণ ঋণ দেবো। এমন ক্ষেত্রেও তার ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব এবং প্রতিশ্রুত পরিমাণ ঋণ দেওয়া আবশ্যক বলে রায় দেওয়া হবে। এটি মালেকি মাযহাবের ইমাম আসবাগ[১৮০] (রহ.)-এর মত।[১৮১]

সমকালীন অনেক আলেম মনে করেন, মালেকি মাযহাবে ওয়াদা রক্ষা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে যে মত পোষণ করা হয়েছে, সেটি শুধু সৌজন্যমূলক ওয়াদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিনিময়-সম্পৃক্ত ওয়াদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, মালেকি মাযহাবে এক পক্ষ থেকে সৌজন্যমূলক ওয়াদার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতের কোনো বিনিময়চুক্তির ওপর কৃত ওয়াদার বিষয়ে তাদের কিতাবে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না।

---

১৮০. **ইমাম আসবাগ** : আসবাগ ইবনুল ফারাজ ইবনে সায়িদ ইবনে নাফে আল-উমাবি আল-মালিকি (রহ.)। জন্ম : ১৫০ হিজরির পর। বেশ বয়স্ক হওয়ার পর তিনি ইলম অর্জন করতে শুরু করেন। ফলে ইমাম মালেক ও ইমাম লাইস ইবনে সা'দ (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিদের শিষ্যত্ব লাভ করতে পারেননি। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব, আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম (রহ.) প্রমুখ থেকে ইলমে দীন অর্জন করেন। বুখারি, তিরমিযি, ইয়াহইয়া ইবনে মায়িন, মুযানি, রাবি (রহ.) প্রমুখ ইমামগণ তাঁর থেকে ইলমে হাদিস ও ফিকহ অর্জন করেছেন। ইন্তেকাল করেন ২২৫ হিজরিতে। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১০/৬৫৬-৬৫৭) –সম্পাদক

১৮১. আল-ফুরুক, ইমাম কারাফি (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫, ও ফাতহুল আলিয়্যিল মালেক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৪।
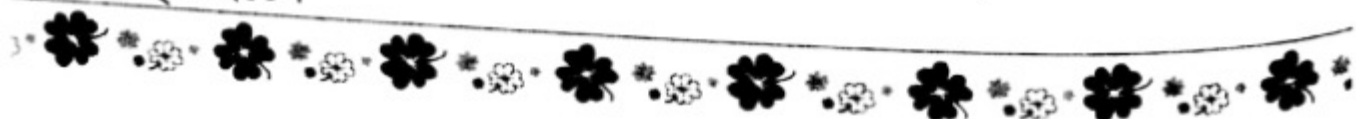
'তাহরিরুল কালাম ফি মাসাইলিল ইলযাম' নামে আল্লামা হাত্তাব (রহ.) এ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন। ওয়াদা ও তা আবশ্যক হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত সুন্দর ও বিস্তারিতভাবে সেখানে এর বিধি-বিধানের আলোচনা রয়েছে। তবে ভবিষ্যতে বিনিময়চুক্তি করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ থেকে করা ওয়াদা সম্পর্কে সেখানে কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না।

মালেকি মাযহাবে এই মাসআলা পাওয়া যায়, যেখানে একপক্ষ থেকে ভবিষ্যতে বিনিময়চুক্তি করার ব্যাপারে ওয়াদা করা হয়। সেটি হলো 'বাইউল ওয়াফা, (ওয়াদার ভিত্তিতে বিক্রয় করা) যেটিকে মালেকি মাযহাবে (بيع الثُّنيا) 'বাইউস সুনইয়া' বলে। এই বিক্রয়ের পদ্ধতিটি এরূপ: বিক্রেতা এমন শর্তে কোনো পণ্য বিক্রয় করবে যে, সে যদি মূল্য ফেরত দিতে পারে, তা হলে ক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্য ফেরত দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে যদি স্পষ্টভাবে আসল বিক্রয়চুক্তির মধ্যে শর্তটি করা হয়, তা হলে সেটি না-জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মালেকি মাযহাবের ফকিহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে প্রথম বিক্রয়টি যদি শর্তমুক্ত হওয়ার পর ক্রেতা সৌজন্যমূলক ওয়াদা করে, তা হলে বিক্রেতাকে এমন ওয়াদা দেওয়া জায়েয আছে যে, সে মূল্য ফেরত দিতে পারলে ক্রেতা পণ্যটি ফেরত দেবে। এমন ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক হবে। আল্লামা হাত্তাব (রহ.) বলেন–

> قال في معين الحكام، ويجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنه إن جاء بالثمن إلى أجل كذا فالمبيع له، ويلزم المشتري متى جائه بالثمن في خلال الأجل، أو عند انقضائه، أو بعده على القرب منه. ولا يكون للمشتري تفويت في خلال الأجل، فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك، نقض إن أراده البائع ورد إليه.
>
> 'মুয়িনুল হুক্কাম' কিতাবে বলা হয়েছে: চুক্তির পর ক্রেতার পক্ষ থেকে এ মর্মে বিক্রেতার জন্য সৌজন্যমূলক ওয়াদা করা জায়েয আছে যে, এ সময়ের মধ্যে সে যদি মূল্য ফেরত দিতে পারে, তা হলে পণ্যটি পেয়ে যাবে। ওই সময়ের মধ্যে, শেষে বা তার নিকটতম যে কোনো সময়ে বিক্রেতা মূল্য নিয়ে এলে, সেটি ফেরত দেওয়া আবশ্যক। ক্রেতার জন্য ওই সময়ের মধ্যে পণ্যটি নষ্ট করা উচিত হবে না। সে যদি বিক্রয়, দান বা অনুরূপ কোনোভাবে পণ্যটি অন্যের কাছে দিয়ে দেয়, তা হলে বিক্রেতা
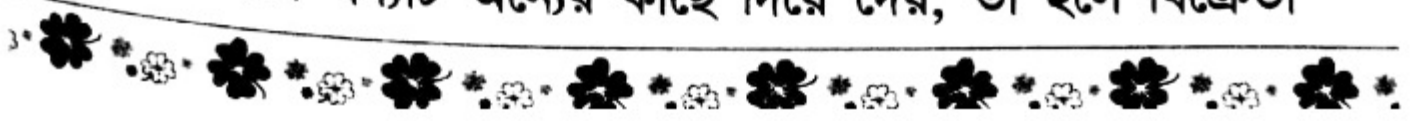
দাবি করলে পরবর্তী চুক্তিগুলো বাতিল হবে এবং বিক্রেতাকে সেটি ফেরত দিতে হবে।'[১৮২]

বর্ণিত মাসআলাতে বিক্রেতা মূল্য নিয়ে এলে পণ্য ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে ক্রেতা ওয়াদা করেছে। এভাবে ফেরত দেওয়াকে আমরা নতুন বিক্রয় বা ইকালা করা, যে নামেই নামকরণ করি না কেন, এটি ভবিষ্যতে বিনিময়চুক্তির ওয়াদা হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। মালেকি মাযহাবের ফকিহগণ ক্রেতার জন্য এ ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব বলেছেন। এমনকি তৃতীয় পক্ষের কাছে সেটি বিক্রয় করা জায়েয বলেননি এবং ওয়াদার সময়ের মধ্যে বিক্রয় করলে সে চুক্তি ভেঙে ফেলার কথা বলেছেন। কারণ, প্রথম বিক্রেতার জন্য এ অধিকার আছে যে, সে দ্বিতীয় বিক্রয় ভেঙে ক্রেতাকে তার ওয়াদা রক্ষায় বাধ্য করবে। সুতরাং তারা এ ওয়াদাকে পরবর্তী নিশ্চিত বিক্রয় অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী সাব্যস্ত করেছেন, যে কারণে পূর্বের ওয়াদার কারণে সেটি ভঙ্গ করতে হচ্ছে। তবে এটি হলো এক পক্ষ থেকে কৃত ওয়াদা। তারা এ ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন যে, উভয় পক্ষ থেকে ওয়াদা করা জায়েয নেই। এ মাসআলা উল্লেখ করার পর আল্লামা হাত্তাব (রহ.) বলেন–

وأصل المسألة في نوازل أصبغ من جامع البيوع، ونقلها ابن عرفة بإختصار فقال: الطوع بها، أي بالثنيا بعد تمام العقد وقبض عوضيه، دون توطئة ولا مواعدة ولا مراوضة موقتة ومطلقة حلال في كل شيء سوى الفروج.

'মূল মাসআলাটি ইমাম আসবাগ (রহ.)-এর কিতবুল নাওয়াযিল-এর জামিউল বুয়ু অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তভাবে আল্লামা ইবনে আরাফা (রহ.) তা উদ্ধৃত করে বলেছেন, চুক্তি সম্পন্ন হওয়া ও উভয় বিনিময় কব্জা করার পর সৌজন্যমূলক ওয়াদা করা যাবে। উভয় পক্ষ থেকে সমঝোতা করা, ওয়াদা দেওয়া, নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সময়ের তদবির করা ছাড়া সর্বক্ষেত্রে জায়েয। তবে বিয়ের বিষয়টি অনুরূপ নয়।'[১৮৩]

---

১৮২. তাহরিরুল কালাম ফি মাসায়িলিল ইলতিযাম, আল্লামা হাত্তাব (রহ.), পৃষ্ঠা-২৩৯, বৈরুতের দারুল গারবিল ইসলামি -১৪০৪ হি. থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।

১৮৩. তাহরিরুল কালাম ফি মাসায়িলিল ইলতিযাম, আল্লামা হাত্তাব (রহ.), পৃষ্ঠা-২৪০, বৈরুতের দারুল গারবিল ইসলামি -১৪০৪ হি. থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।
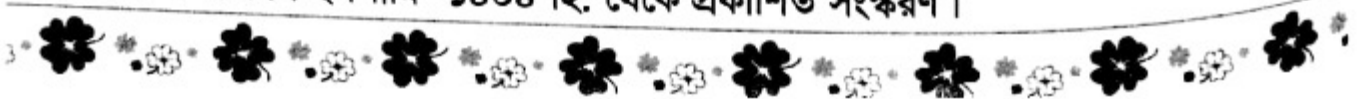
এ উদ্ধৃতিটি এই ব্যাপারে স্পষ্ট যে, শুধু ক্রেতার পক্ষ থেকে ওয়াদা দেওয়া হলে সেটি রক্ষা করা ওয়াজিব। তবে দীর্ঘ মেয়াদ পর্যন্ত এ ওয়াদাটি আবশ্যক থাকবে। এমনকি আল্লামা হাত্তাব (রহ.) বলেন–

إن لم يضربا لذلك أجلا، فللبائع أخذه متى جائه بالثمن في قرب الزمان أو بعده مالم يفوته المبتاع، فإن فوته فلا سبيل إليه، فإن قام عليه حين أراد التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضرا، فإن باعه بعد منع السلطان له رد البيع.

'উভয়ে যদি কোনো সময় নির্ধারণ না করে, তা হলে পণ্য হাতছাড়া হওয়ার আগে নিকটতম বা দূরবর্তী যে কোনো সময় বিক্রেতা মূল্য নিয়ে এলে পণ্যটি ফেরত নিতে পারবে। তবে ক্রেতা যদি পণ্যটি হাতছাড়া করে ফেলে, তা হলে সেটি ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকবে না। পণ্য উপস্থিত থাকাকালীন হস্তান্তর করতে চাইলে বিক্রেতা যদি ফেরত নিতে চায়, তা হলে শাসকের শরণাপন্ন হওয়ার মাধ্যমে বাধা দিতে পারবে। শাসক নিষেধ করার পরও যদি বিক্রয় করে দেয়, তা হলে সেই বিক্রয় প্রত্যাহার করার অধিকার থাকবে।'[১৮৪]

এ উদ্ধৃতিটি প্রমাণ করে যে, মালেকি মাযহাবে যে ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব, সেটি শুধু সৌজন্যমূলক ওয়াদাই নয়; বরং অন্যান্য বিনিময় চুক্তির ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য।

অনুরূপভাবে হানাফি মাযহাবে এমন কিছু বক্তব্য পাওয়া যায়, যেগুলো ওয়াদা আবশ্যক হওয়া সাব্যস্ত করে এবং ওয়াদাকারীর জন্য সেটি রক্ষা করা ওয়াজিব বোঝায়। ইমাম আবু বকর জাসসাস[১৮৫] (রহ.) ' يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ

---

১৮৪. তাহরিরুল কালাম ফি মাসায়িলিল ইলতিযাম, আল্লামা হাত্তাব (রহ.), পৃষ্ঠা-২৩৯, বৈরুতের দারুল গারবিল ইসলামি -১৪০৪ হি. থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।

১৮৫. **ইমাম আবু বকর জাসসাস** : আহমাদ ইবনে আলি আর-রাযি আল-জাসসাস (রহ.)। জন্ম : ৩০৫ হিজরি। তাঁর সময়ে হানাফিদের শ্রেষ্ঠ ফকিহ ছিলেন। ইরানের রাই শহরের অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁকে "আর-রাযি" বলা হয়। ইমাম আবুল হাসান আল-কারখি'র একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন তিনি। কাজির পদের জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বহু অমর গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। যেমন, আহকামুল কুরআন, উসুলুল ফিক্হ, শারহু মুখতাসারিল কারখি, শারহু মুখতাসারিত তাহাবি, শারহু জামিয়ি মুহাম্মাদ, আদাবুল কাযা প্রভৃতি। তিনি ৩৭০ হিজরিতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। (আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-২৭-২৮; আল-আ'লাম, যিরিকলি : ১/১৭১) –সম্পাদক
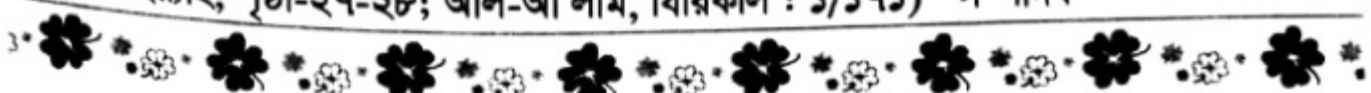
تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ‘হে ইমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা রক্ষা করো না?’[১৮৬] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

> يحتج به في أن كل من ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب على نفسه عقدا لزمه الوفاء به، إذ ترك الوفاء به يوجب أن يكون قائلا ما لا يفعل، وقد ذم الله فاعل ذلك، وهذا فيما لم يكن معصية، فأما المعصية فإن إيجابها في القول لا يلزمه الوفاء بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين"، وإنما يلزم ذلك فيما عقده على نفسه مما يتقرب به إلى الله عز وجل مثل النذور وفي حقوق الآدميين العقود التي يتعاقدونها.
>
> ‘এ আয়াত দ্বারা সেক্ষেত্রে দলিল দেওয়া হয়, যেখানে কোনো ব্যক্তি নিজের ওপর কোনো ইবাদত, দান অথবা কোনো চুক্তি আবশ্যক করে নেয়, সেটি তার জন্য রক্ষা করা আবশ্যক। সেটি রক্ষা না-করলে সে এমন ব্যক্তির আওতাভুক্ত হবে, যে নিজের কথা মোতাবেক কাজ করে না। আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিকে তিরস্কার করেছেন। এ হুকুম সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে কোনো অন্যায়ের ওয়াদা করা হবে না। যদি কোনো অন্যায় কাজের ওয়াদা করে, তা হলে সেটি রক্ষা করা ওয়াজিব হবে না। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘অন্যায় কাজের ব্যাপারে কোনো মান্নত হবে না। মানতের কাফফারা হলো কসমের কাফফারা।’ শুধু সেসব ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক হবে, যা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেবে। অনুরূপভাবে মান্নত, মানুষের অধিকার ও পারস্পরিক চুক্তিসমূহ রক্ষা করা আবশ্যক হবে।’[১৮৭]

উল্লিখিত উদ্ধৃতির যে অংশে দাগ দেওয়া আছে সেটি এ কথা প্রমাণ করে যে, মানুষের মাঝে প্রচলিত কোনো চুক্তি সম্পর্কিত ওয়াদা হলে তা রক্ষা করা ওয়াজিব। তবে যদি এমন ওয়াদা করা হয়, যা মানুষের ভবিষ্যতের কোনো মুবাহ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেক্ষেত্রে নিজের ওপর কোনো কিছু আবশ্যক

---

১৮৬. সুরা আস-সফ : আয়াত-২।

১৮৭. আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৪২।
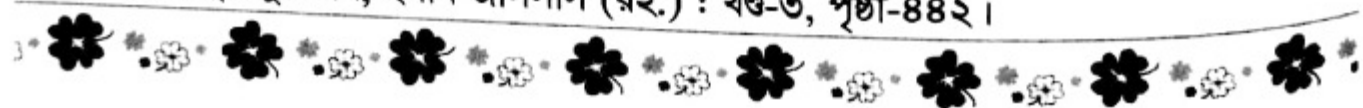
হবে না। কারণ তা রক্ষা করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। ইমাম জাসসাস (রহ.) নিজ বক্তব্যের মাধ্যমে এ দিকে ইশারা করেছেন। তিনি বলেছেন–

وكذلك الوعد بفعل يفعله في المستقبل، وهو مباح، فإن الأولى الوفاء به مع الإمكان.

'অনুরূপভাবে ভবিষ্যতের কোনো মুবাহ কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ওয়াদার বিধান হলো, সাধ্যমতো সে ওয়াদাগুলো রক্ষা করা উত্তম।'[১৮৮]

আমার সম্মানিত পিতা আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ শফি[১৮৯] (রহ.) وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا 'তোমরা ওয়াদা রক্ষা করো, নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'[১৯০] এ আয়াতের যে তাফসির করেছেন, তাতে তাঁর কাছেও এই মতটি পছন্দনীয় বলে অনুমিত হয়।[১৯১]

তবে সাধারণ অবস্থায় হানাফি মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহ বিচারিক দিক থেকে ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক না-হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। সেইসঙ্গে

---

১৮৮. আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৪২।

১৮৯. **আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ শফি** : মুহাম্মাদ শফি ইবনে মুহাম্মাদ ইয়াসিন ইবনে খলিফা আদ-দেওবন্দি (রহ.)। জন্ম: ১৩১৪ হিজরিতে ভারতের উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে। পাক-ভারত-বাংলার খ্যাতনামা মুফাসসির ও ফকিহ। অখণ্ড পাকিস্তানের মুফতিয়ে আযম। বিখ্যাত 'মাআরিফুল কুরআন' তাফসিরগ্রন্থের লেখক। তাঁর উস্তাদগণ: শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি, মুফতি আজিজুর রহমান দেওবন্দি, মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানি (রহ.) প্রমুখ। দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ১৩৩৫ হিজরিতে দাওরায়ে হাদিস শেষ করেন। তারপর দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদ হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পাশাপাশি ইফতা বিভাগের দায়িত্বও পালন করেন। সেসময় তাঁর হাতে কয়েক হাজার ফতোয়া লিখিত হয়। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি (রহ.)-এর কাছে তাসাওউফের দীক্ষা নেন এবং তাসাওউফের কাজ করার অনুমোদন প্রাপ্ত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। হিজরত করে ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে আসেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া দারুল উলুম করাচি'। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে: মাআরিফুল কুরআন, ইমদাদুল মুফতিন, আহকামুল কুরআন প্রভৃতি। তাঁর রচনাসমগ্র 'জাওয়াহিরুল ফিকহ' নামে সাতখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষে যুগোপযোগী জ্ঞান-গবেষণার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি। ১৩৯৬ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে রয়েছেন : দারুল উলুম করাচির মুহতামিম, মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান, আল্লামা মুহাম্মাদ রফি উসমানি এবং বক্ষ্যমাণ কিতাবের লেখক মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি (হাফিযাহুমাল্লাহু তাআলা ওয়া রাআহু) সূত্র: উসুলুল ইফতা, টীকা, পৃষ্ঠা-৬৯-৭০। –সম্পাদক

১৯০. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত-৩৪।

১৯১. তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন, মুফতি মুহাম্মাদ শফি (রহ.) : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬৮।
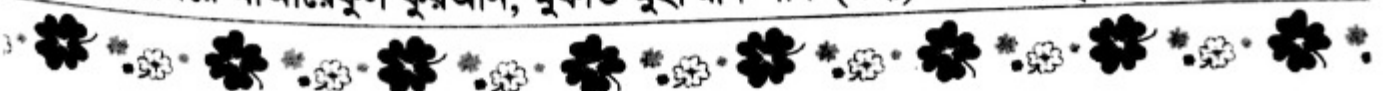
তারা বলেছেন, মানুষের প্রয়োজনে কিছু ক্ষেত্রে ওয়াদা রক্ষা আবশ্যক করা হয়ে থাকে। এ কারণে বাইয়ে ওয়াফার মধ্যে তারা ওয়াদা রক্ষা আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) ফাসেদ শর্তের আলোচনায় বলেছেন–

> قلت : وفي جامع الفصولين أيضا : لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس.
>
> 'জামেউল ফুসুলাইন'[১৯২] কিতাবেও উল্লেখ আছে, ক্রেতা-বিক্রেতা শর্তহীন বিক্রয় করার পর যদি ওয়াদাস্বরূপ শর্ত উল্লেখ করে, তা হলে বিক্রয় সহিহ হবে এবং ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব হবে। কেননা, কখনো-কখনো ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব করে দেওয়া হয়। সুতরাং মানুষের প্রয়োজনে সেটিকে ওয়াজিব করা হবে।'[১৯৩]

এরপর আল্লামা রমালি[১৯৪] (রহ.)-এর 'আল-ফাতাওয়াল খাইরিয়্যাহ' থেকে বর্ণনা করেছেন–

---

১৯২. **জামেউল ফুসুলাইন :** শাইখ বদরুদ্দীন মাহমুদ ইবনে ইসরাইল ইবনে কাজি সামাওয়ানাহ আল-হানাফি (মৃ. ৮২৩ হি.) রাহিমাহুল্লাহ-এর কিতাব। ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যবসায় নীতি সম্পর্কে রচিত উলামায়ে কেরামের নিকট সমাদৃত বিখ্যাত ও কালজয়ী গ্রন্থ। এতে তিনি শাইখ আবদুর রহিম ইবনে ইমাদুদ্দীন (রহ.) রচিত *আল-ফুসুলুল ইমাদিয়্যাহ* এবং শাইখ মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ ইবনে হুসাইন আল-আসতারুশানি (রহ.) রচিত *আল-ফুসুলুল আসতারুশানিয়্যাহ* কিতাবদ্বয়কে একত্রিত করেছেন। এই উভয় কিতাবকে একত্রিত করতে গিয়ে তিনি কোনো দ্বিরুক্ত মাসআলা উল্লেখ করেননি এবং উভয় লেখকের বক্তব্যকে যথাসংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি তিনি *আল-খুলাসা, আল-কাফি, লাতাইফুল ইশারাহ* প্রভৃতি কিতাব থেকে প্রাসঙ্গিক মাসায়েলও উল্লেখ করেছেন। (কাশফুয যুনুন : ১/৫৬৬) –সম্পাদক

১৯৩. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬৫৬, ফিকরাহ-২৩৫৫১।

১৯৪. **আল্লামা রমালি :** খাইরুদ্দিন ইবনে আহমাদ ইবনে আলি আল-আইউবি আর-রমালি (রহ.)। ফিলিস্তিনের রামলায় ৯৯৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন, যে শহরটি ১৯৪৮ সাল থেকে জায়নিস্ট ইসরাইলিদের দখলে রয়েছে। প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পর তিনি মিশর সফর করেন। জামিয়া আযহারে ছয় বছর অধ্যয়ন করে নিজ দেশে ফিরে আসেন। এরপর জীবনের শেষ পর্যন্ত দরস-তাদরিস ও ফতোয়া প্রদানের কাজে নিয়োজিত থাকেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা হানাফি ফকিহ ও গ্রন্থ রচয়িতা। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছেঃ আল-ফাতাওয়া আল-খাইরিয়্যাহ, মাযহারুল হাকায়েক প্রভৃতি। (আল-আ'লাম : ২/৩২৭) –সম্পাদক

فقد صرح علماؤنا بأنهما لو ذكرا البيع بلا شرط، ثم ذكرا الشرط على وجه العدة، جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد.

'আমাদের উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট করে বলেছেন, উভয় পক্ষ যদি শর্তহীন বিক্রয় করার পর ওয়াদা হিসাবে শর্ত উল্লেখ করে, তা হলে বিক্রয় জায়েয হবে এবং ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক হবে।'[১৯৫]

এ আলোচনার শেষে তিনি বলেছেন–

وقد سئل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده وعقدا البيع خاليا عن الشرط. فأجاب: بأنه صرح في الخلاصة والفيض والتتارخانية وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا.

'আল্লামা খাইরুদ্দিন রমালি (রহ.)-কে এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যারা বিক্রয়চুক্তির আগে ফেরত দেওয়ার শর্ত করে মূল বিক্রয়চুক্তিকে শর্তমুক্ত করে। (এ ক্ষেত্রে কী হুকুম হবে?) উত্তরে তিনি বললেন, খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ফয়েয[১৯৬], তাতারখানিয়া ও অন্যান্য কিতাবে বলা হয়েছে, উভয়ের শর্তানুযায়ী ফেরত দিতে হবে।'[১৯৭]

বাইয়ে ওয়াফার আলোচনায় আল্লামা খালেদ আতাসি (রহ.) 'ফাতাওয়ায়ে খানিয়া' থেকে উদ্ধৃত করেছেন–

وإن ذكرا البيع من غير شرط، ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة، فالبيع جائز، ويلزم الوفاء بالوعد، لأن المواعيد قد تكون لازمة، فتجعل لازمة لحاجة الناس.

---

১৯৫. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬৫৬, ফিকরাহ নং ২৩৫৫১।

১৯৬. ফয়েয : হানাফি মাযহাবের একটি প্রসিদ্ধ কিতাব। যার নাম : ফয়যুল মাওলা আল-কারিম আলা আবদিহি ইবরাহিম। এর লেখক ; আল্লামা ইবরাহিম ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে মুহাম্মাদ আল-কারকি আল-কাহেরি (রহ.)। তিনি আল্লামা তকিউদ্দিন আল-হিসনি, তকিউদ্দিন আশ-শুমুন্নি, কামাল ইবনুল হুমাম (রহ.) প্রমুখের শাগরেদ ছিলেন। তিনি ৯২৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। (রাদ্দুল মুহতার : ১/২৫) –সম্পাদক

১৯৭. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬৫৬, ফিকরাহ নং ২৩৫৫১।
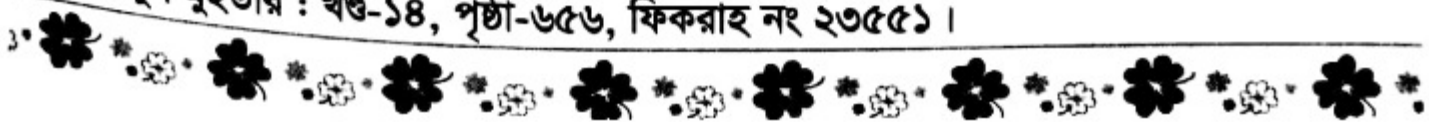
'যদি শর্তহীন বিক্রয় করার পর ওয়াদাস্বরূপ ফেরত দেওয়ার শর্ত উল্লেখ করে, তা হলে বিক্রয় জয়েয হবে এবং ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক হবে। কেননা, কখনো-কখনো ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং মানুষের প্রয়োজনে সেটি ওয়াজিব করা হবে।'[১৯৮]

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) 'আল-আশবাহ' কিতাবে বলেন–

الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية الذخيرة، وفي القنية :وعده أن يأتيه فلم يأته لا يأثم ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا كما في كفالة البزازية، وفي بيع الوفاء كما ذكره الزيلعي.

'ওয়াদা ভঙ্গ করা হারাম। যাখিরা কিতাবের কুরবানি অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আর কুনইয়া কিতাবে রয়েছে : কেউ যদি এ মর্মে কারো সঙ্গে ওয়াদা করে যে, সে আসবে; কিন্তু সে এলো না, তা হলে তার গোনাহ হবে না। কোনো কিছুর সঙ্গে শর্তযুক্ত করা ছাড়া ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়। 'ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়া'র কাফালাত অধ্যায়ে অনুরূপ উল্লেখ আছে। বাইয়ে ওয়াফার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হবে। যেমনটি আল্লামা যাইলায়ি[১৯৯] (রহ.) উল্লেখ করেছেন।'

---

১৯৮. আল্লামা খালেদ আতাসি (রহ.), শারহুল মাজাল্লাহ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪১৫।

১৯৯. **আল্লামা যাইলায়ি :** উসমান ইবনে আলি ইবনে মিহজান আবু মুহাম্মাদ ফখরুদ্দিন আয-যাইলায়ি (রহ.)। ইথিওপিয়ান সাগরের তীরবর্তী সোমালিয়ার যাইলা এলাকার দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে যাইলায়ি বলা হয়। ইলমে নাহু, ফিকহ ও ফারায়েযের খ্যাতনামা আলেম ছিলেন। ৭০৫ হিজরিতে কায়রো-তে আগমন করেন। সেখানে তিনি দরস-তাদরিস, ফতোয়া প্রদান ও লেখালেখির কাজ করেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে: তাবয়িনুল হাকায়িক ফি শারহি কানযুদ দাকায়িক (ছয়খণ্ডে), বারাকাতুল কালাম আলা আহাদিসিল আহকাম, শারহুল জামিয়িল কাবির প্রভৃতি। ৭৪৩ হিজরি মোতাবেক ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে কায়রো-তে তিনি ইন্তেকাল করেন। (আল-আ'লাম : ৪/২১০; আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-১১৫-১১৬)
উল্লেখ্য, যাইলায়ি নামে খ্যাত হানাফি মাযহাবের আরও একজন আলেম রয়েছেন। তাঁর পরিচয়– ইনশাআল্লাহ–সামনে আসবে। তিনি হচ্ছেন 'নাসবুর রায়াহ'র লেখক আল্লামা আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ জামালুদ্দিন আয-যাইলায়ি (মৃ. ৭৬২) রাহিমাহুল্লাহ। ফখরুদ্দিন যাইলায়ি জামালুদ্দিন যাইলায়ির উস্তাদ ছিলেন। ফিকহের কিতাবে, বিশেষত আল-বাহরুর রায়েকে ফিকহি মতামতের ক্ষেত্রে যে যাইলায়ির কথা উল্লেখ করা হয়, তিনি ফখরুদ্দিন যাইলায়ি। (আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-১১৫) –সম্পাদক
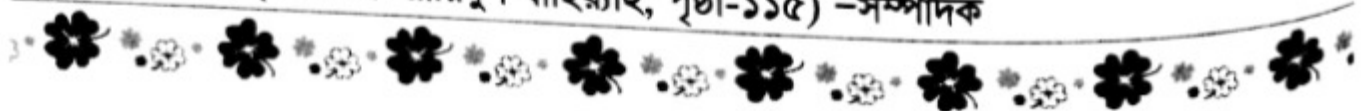
এ আলোচনার পরে আল্লামা হামাবি (রহ.) বলেছেন–

والتقدير: لا يلزم الوعد، إلا في التعليق وبيع الوفاء، وإن لم يكن معلقا.

'মূলকথা হলো, শর্ত ও বাইয়ে ওয়াফা ছাড়া অন্যক্ষেত্রে ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়। তবে যদি বাইয়ে ওয়াফাটি শর্তযুক্ত না-হয়।' (তা হলে ওয়াজিব হবে)

প্রকৃতপক্ষে ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে কুরআনুল কারিম ও হাদিস শরিফে পূর্ণ তাকিদের সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে স্পষ্টভাষায় ওয়াদা ভঙ্গ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

'হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের ওয়াদা পূর্ণ করো।'[২০০]

এ আয়াতের তাফসিরে ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) বলেন–

العقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه ... وسمي اليمين على المستقبل عقدا، لأن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل أو ترك، والشركة والمضاربة ونحوها تسمى أيضا عقودا، لما وصفنا من اقتضائه الوفاء بما شرطه على كل واحد من الربح والعمل لصاحبه وألزمه نفسه، وكذلك العهد والأمان، لأن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها، وكذلك كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد.

'আকদ' বলা হয় মানুষ নিজে ভবিষ্যতে যা করবে বা সে নিজের ওপর আব্যশক করে নেয় যে, অন্যের জন্য সেটা করবে। ভবিষ্যতের 'ইয়ামিন' (কসম)-কে 'আকদ' (চুক্তি) নামে নামকরণ করা হয়। কারণ, কসমকারী কোনো কিছু করা বা না-করার ব্যাপারে যে কসম করেছে, তার মাধ্যমে নিজের ওপর সেটি আবশ্যক করে নিয়েছে। শিরকাত, মুদারাবা ও অনুরূপ বিষয়কেও

২০০. সুরা মায়েদা : আয়াত-১।
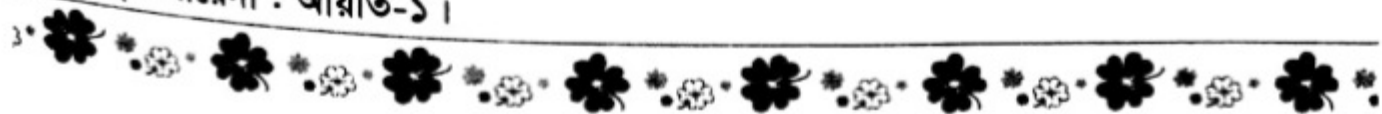
'আকদ' বলা হয়। কেননা, আমরা তার তাকাযা (দাবি) হিসাবে উল্লেখ করেছি যে, শর্ত অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য লাভের যে অংশ দেওয়া বা তার জন্য কাজ করার যে ওয়াদা করেছে তাকে সেটি রক্ষা করতে হবে। ওয়াদা ও নিরাপত্তার বিষয়টিও অনুরূপ। কারণ, নিরাপত্তাদাতা নিজের জন্য সেটি রক্ষা করা আবশ্যক করে নিয়েছে। একইভাবে সেসব শর্ত ওয়াদার আওতাভুক্ত হবে, যেগুলো ভবিষ্যতে করার বিষয়টি নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়।'[২০১]

আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ○ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.

'হে ইমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা রক্ষা করো না? আল্লাহ তাআলার কাছে এটি খুব খারাপ কথা যে, তোমরা এমন কথা বলবে, যা রক্ষা করবে না।'[২০২]

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর তাফসির ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াদা ভঙ্গ করার ব্যাপারে এটি গুরুতর সতর্কবাণী। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন–

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

'তোমরা ওয়াদা রক্ষা করো। নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'[২০৩]

হযরত আবু হুরাইরা (রহ.) থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

'মুনাফেকের আলামত তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে আর তার কাছে আমানত রাখলে খেয়ানত করে।'[২০৪]

---

২০১. আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস (রহ.), খ, ৩, পৃষ্ঠা-২৯৪-২৯৫।

২০২. সুরা : সফ, আয়াত-২-৩।

২০৩. সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত-৩৪।

২০৪. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: ইমান, পরিচ্ছেদ: মুনাফিকের আলামত; সহিহ মুসলিম, অধ্যায় : ইমান, পরিচ্ছেদ : মুনাফিকের অভ্যাস।

সহিহ সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে মারফু হাদিস বর্ণিত আছে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خالصا، ومن كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهن كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

'চারটি দোষ এমন, যার মধ্যে এগুলো থাকবে সে পরিপূর্ণ মুনাফেক হবে, যার মধ্যে এগুলোর কোনো একটি থাকবে, সেটি পরিহার না-করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকির দোষটি বিদ্যমান রয়েছে বলে গণ্য করা হবে : কথা বললে মিথ্যা বলা, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করা, চুক্তি করলে রক্ষা না-করা এবং ঝগড়ার সময় গালি দেওয়া।'[২০৫]

ইমাম বুখারি (রহ.) হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন–

أَنَّ النَبِيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَسْتَعِيْذُ فِي صَلَاتِهِ كَثِيْرًا مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، فقيل له: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাজে এ দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে পাপাচার ও ঋণের বোঝা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।' কোনো এক সাহাবি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি ঋণ থেকে এতবেশি আশ্রয় চান কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।'[২০৬]

সহিহ সনদে হযরত আবু বকর (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, বাহরাইন থেকে সম্পদ আসার পর তিনি এ ঘোষণা দিয়েছিলেন–

مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا.

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে যার ওয়াদা ছিল বা তাঁর কাছে ঋণ পেত, যে যেন আমাদের কাছে আসে।'

---

২০৫. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: অন্যায়, পরিচ্ছেদ: ঝগড়া করলে গালি দেয়, হাদিস নং ২৪৫৯।

২০৬. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: ঋণ নেওয়া, পরিচ্ছেদ: যারা ঋণ থেকে মুক্তি চায়, হাদিস নং ২৩৯৭।
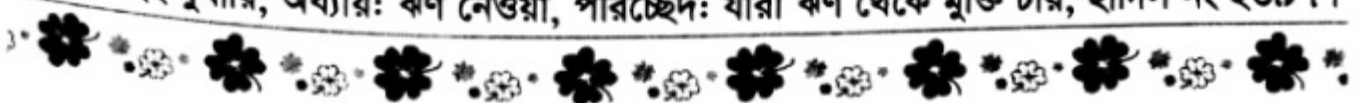
এ ঘোষণা শুনে হযরত জাবের (রাযি.) এসে বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে তিন আঁজলা পরিমাণ সম্পদ দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রাযি.) তাঁকে তিন আঁজলা পরিমাণ সম্পদ দিয়ে দেন।[২০৭] এখানে হযরত আবু বকর (রাযি.) ওয়াদাকে ঋণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন এবং রাসুল (ﷺ)-এর ওয়াদা পূরণ করেছেন।

হিরাক্লিয়াস সম্পর্কিত হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) রাসুল (ﷺ) সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন যে, 'তিনি নামাজ, সত্যকথন, সতিত্ব ও ওয়াদা রক্ষা এবং আমানত আদায়ের নির্দেশ দেন।'[২০৮] এ উদ্ধৃতিগুলো প্রমাণ করে যে, রাসুল (ﷺ) যেসব বিষয়ের ওপর তাঁর দাওয়াতের মূল বুনিয়াদ রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে একটি হলো ওয়াদা রক্ষা করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনায় রাসুল (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে। নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لا تُمَارِ أخاكَ وَلا تُمازِحْهُ وَلا تَعِدْهُ مَوْعِدةً فَتُخْلِفَهُ.

'তোমার ভাইকে সন্দেহ করো না। তার সঙ্গে বিবাদ করো না। তার সঙ্গে কোনো ওয়াদা করার পর তা ভঙ্গ করো না।'[২০৯]

হযরত আনাস (রাযি.) রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

'যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার ইমান নেই। যে ওয়াদা রক্ষা করে না, তার দীন নেই।'[২১০]

উপরের আয়াত ও হাদিসগুলো উল্লেখ করার পর এ ব্যাপারে আর কোনো

---

২০৭. সহিহ বুখারি, অধ্যায় : দান, পরিচ্ছেদঃ দান করে বা ওয়াদা দেওয়ার পর মারা যাওয়া, হাদিস নং ২৫৯৮, অধ্যায়ঃ শাহাদাহ, পরিচ্ছেদঃ যিনি ওয়াদা রক্ষার নির্দেশ দিলেন, হাদিস নং ২৬৮৩।

২০৮. সহিহ বুখারি, অধ্যায় : শাহাদাহ, হাদিস নং ২৬৮১।

২০৯. জামে তিরমিযি, অধ্যায়ঃ ভালো কাজ ও সম্পর্ক রক্ষা করা, হাদিস নং ১৯১৮, ইমাম তিরমিযি (রহ.) হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, এটি হাসান-গরিব হাদিস।

২১০. মুসনাদে আহমাদ : খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা-৩৭৬ : খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-৩৩ : খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-৪২৩ : খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২৩১।

সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব এবং যৌক্তিক কারণ ছাড়া তা ভঙ্গ করা গোনাহ। অনেক আলেম এসব হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিষয়টি তখনই হারাম হবে, যখন ওয়াদা করার সময় অন্তরে তা ভঙ্গ করার বিষয়টি গোপন রাখবে। তবে ওয়াদা রক্ষা করার নিয়ত থাকার পরও কোনো কারণে যদি তা রক্ষা করতে না-পারে, তা হলে সেটি হারাম হবে না। এ ব্যাপারে তারা ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযি (রহ.) কর্তৃক হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেন। যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

> إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.
>
> 'কেউ যখন তার মুসলিম ভাইকে কোনো ওয়াদা দেয় এবং সেটি রক্ষা করার নিয়ত থাকার পরও সেটি রক্ষা করতে পারে না এবং প্রতিশ্রুত বিষয় দিতে পারে না, তা হলে তার কোনো গোনাহ হবে না।'[২১১]

কিন্তু হাদিসটির সনদে মূলভিত্তিস্বরূপ[২১২] (مدار الحديث) যে দুজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন: আবু নোমান ও আবু ওয়াক্কাস (রহ.)। তাদের দুইজনই অপরিচিত। এ কারণে ইমাম তিরমিযি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, 'হাদিসটি গরিব এবং এর সনদ শক্তিশালী নয়। সনদের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আলি আবদুল আ'লা নির্ভরযোগ্য। তবে আবু নোমান ও আবু ওয়াক্কাস 'মাজহুল' এবং তাদের জীবনী অস্পষ্ট।'[২১৩]

হাদিসটিকে যদি গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত বলে মেনে নেওয়া হয়, তা হলে অন্যান্য আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে ওয়াদা রক্ষার বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে এ হাদিসটিকে যুক্তিসঙ্গত কারণে ওয়াদা রক্ষা করতে না-পারার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে, চাই ওয়াদা করার সময় তা পূর্ণ করার নিয়ত থাকুক বা না-থাকুক। যুক্তিসঙ্গত কারণের ক্ষেত্রটিকে এ হুকুম থেকে ভিন্ন রাখতে হবে। কারণ, সহিহ সূত্রে হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসে সে বিষয়টি

---

২১১. সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়: শিষ্টাচার, হাদিস নং ৪৩৪৩।

২১২. সম্পাদক

২১৩. জামে তিরমিযি, অধ্যায়: ইমান, হাদিস নং ২৫৫৭।
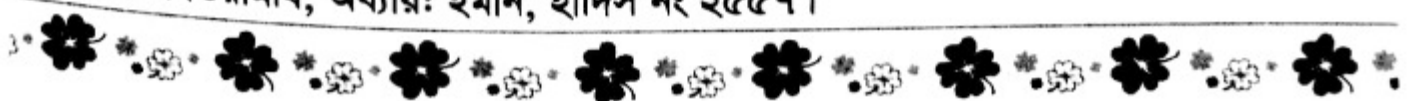
রয়েছে। তিনি বলেছেন–

وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةَ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ : مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلاَ رُسُلُهُ. ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَهُنَا. فَقَالَتْ وَاللهِ مَا دَرَيْتُ. فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ. فَقَالَ مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِى كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ.

'একবার হযরত জিবরাইল (আ.) রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নির্দিষ্ট সময়ে আসার ওয়াদা দেওয়ার পর সে সময়ে তিনি আসেননি। তখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে একটি লাঠি ছিল, তিনি সেটি ছুঁড়ে ফেলে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর দূত কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। এরপর দেখেন, তার খাটের নিচে একটি কুকুর ছানা রয়েছে। তিনি তখন বললেন, হে আয়েশা! এটি কখন এসেছে? উত্তরে আয়েশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি না। তারপর সেটি বের করার নির্দেশ দেওয়ার পর বের করা হলো এবং হযরত জিবরাইল (আ.) প্রবেশ করলেন। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন, আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন, আর আমি আপনার অপেক্ষায় বসে আছি, কিন্তু আপনি সে সময়ে আসেননি। তখন জিবরাইল (আ.) বললেন, আপনার ঘরের কুকুর আমাকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে। যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে, আমরা সেসব ঘরে প্রবেশ করি না।'[২১৪]

ইমাম গাযালি (রহ.) 'জবানের বিপদ' শীর্ষক আলোচনায় বলেন–

الآفة الثالثة عشر الوعد الكاذب ...فإن اللسان سباق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء، فيصير الوعد خلفا، وذلك من أمارات

---

২১৪. সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: পোশাক ও সৌন্দর্য, হাদিস নং ৩৯২৭।

النفاق، قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ...وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز، فقال : إنه كان صادق الوعد ... ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة، قال : إنه كان خطب إلى ابنتي رجل من قريش، وكان إليه مني شبه الوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، أشهدكم أني قد زوجته ابنتي ... وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله، وهو الأولى، ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء، إلا أن يتعذر، فإن كان عند الوعد عازما على أن لا يفي، فهذا هو النفاق، وقال أبو هريرة : قال : النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث من كن فيه، فهو منافق وإن صام وصلى ... وهذا ينزل على عزم الخلف، أو ترك الوفاء من غير عذر، فأما من عزم على الوفاء، فعن له عذر منعه من الوفاء، لم يكن منافقا، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق، ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضا، كما يتحرز من حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة.

'**ত্রয়োদশ বিপদ :** মিথ্যা ওয়াদা। কেননা, মুখে বেপরোয়াভাবে ওয়াদা করার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটি রক্ষা না-করায় ওয়াদা ভঙ্গ করা হয়। এটি মুনাফেকির আলামত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের ওয়াদা রক্ষা করো।' ...আল্লাহ তাআলা তার নবি হযরত ইসমাইল আ.-এর প্রশংসায় বলেন, 'তিনি ওয়াদা রক্ষা করতেন।' ... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) মৃত্যুর সময় বলেন, 'কুরাইশের জনৈক ব্যক্তি আমার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দেয়। আমার পক্ষ থেকে তার সঙ্গে ওয়াদার মতো কিছু কথা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি মুনাফেকির এক তৃতীয়াংশ নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই না। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি, আমার মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিলাম।' ...হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) কোনো ওয়াদা করার সময় 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন এবং এটিই উত্তম।

> ওয়াদার পর সেটিকে যদি চূড়ান্ত মনে হয়, তা হলে একান্ত বাধ্য হওয়া ছাড়া সেটি রক্ষা করা আবশ্যক। ওয়াদা করার সময় যদি রক্ষা না-করার দৃঢ় সংকল্প থাকে, তা হলে সেটি মুনাফেকি। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এমন তিনটি বিষয় রয়েছে, যার মধ্যে এগুলো থাকবে, সে নামাজ, রোযা করলেও মুনাফিক হবে।...' এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন ওয়াদা ভঙ্গ করার দৃঢ় সংকল্প থাকবে অথবা কারণ ছাড়া ওয়াদা ভঙ্গ করা হবে। যদি ওয়াদা রক্ষা করার ইচ্ছায় ওয়াদা করার পর কোনো কারণে সেটি রক্ষা করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে মুনাফেকি হবে না। যদিও তার ক্ষেত্রে মুনাফেকির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তারপরও প্রকৃত মুনাফেকির মতো এর সাদৃশ্যও এড়িয়ে চলা উচিত। একান্ত বাধ্য হওয়া ছাড়া নিজেকে অক্ষম বানানো উচিত নয়।'[২১৫]

কুরআনুল কারিম ও হাদিসের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, দৃঢ়ভাবে কোনো ওয়াদা করলে ধর্মীয় দিক থেকে তা রক্ষা করা ওয়াজিব এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তা ভঙ্গ করলে গোনাহ হবে। বিচারিক দিক থেকে ওয়াদা আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে মূলনীতি হলো, শুধু ওয়াদা করার কারণে বিচারিক দিক থেকে তা রক্ষা করা আবশ্যক হবে না। কেননা, ওয়াদার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে এবং বিচারের উদ্দেশ্য এ নয় যে, মানুষের সব কথা-বার্তার মধ্যে এর দখল বিরাজ করবে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারে অন্যের প্রস্তাব গ্রহণ করলে, এটি তার সঙ্গে নিজের মেয়ে বিয়ে দেওয়ার ওয়াদা। আবার পরে এমনও হতে পারে যে, ওয়াদা পালন করা তার মেয়ের জন্য অকল্যাণকর। অতএব, আমরা যদি বলি যে, বিচারিক দিক থেকে সব ধরনের ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব, তা হলে বর্ণিত ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী বিষয়টিকে কাজির কাছে উত্থাপন করতে পারবে এবং কাজি মেয়ের পিতাকে ওই পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য করবে। এমন সিদ্ধান্ত দিলে সেখানে সমস্যার বিষয়টি অতি স্পষ্ট। অনুরূপভাবে কেউ যদি অন্যকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে দরিদ্র হলে তাকে সৌজন্যমূলক ঋণ দেবে। ধর্মীয় দিক থেকে এমন ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব। তবে যাকে ওয়াদা দিয়েছে সে

---

২১৫. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন. ইমাম গাযালি (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩২।
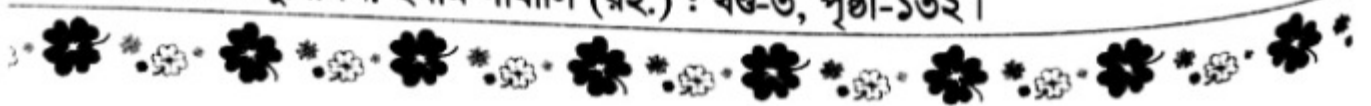
ওয়াদা আদায় করার উদ্দেশ্যে ওয়াদাকারীকে বিচারকের কাছে নিয়ে যাওয়া শরিয়ত সমর্থন করে না বা এমন কোনো বিধান নেই।

কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে বিচারিক দিক থেকে ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক সাব্যস্ত করা যায়। কারণ, সেসব ক্ষেত্রে ওয়াদা ভঙ্গ করার অর্থ হলো, যার সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছে তাকে স্পষ্টভাবে ক্ষতির সম্মুখীন করা। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কোনো ব্যবসায়ী থেকে পণ্য ক্রয়ের ওয়াদা করল। ক্রেতার ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে বিক্রেতা অনেক অর্থ ব্যয় ও কষ্ট করে সে পণ্য সংগ্রহ করল। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমন পণ্য হয়, যার ক্রেতার সংখ্যা খুব কম। এমন ক্ষেত্রে ওয়াদাকারী ক্রেতা যদি সেটি ক্রয় না-করে, তা হলে ব্যবসায়ীর ক্ষতির বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট। এ ধরনের ওয়াদার ক্ষেত্রে সেটি রক্ষা করা আবশ্যক না-হওয়ার সিদ্ধান্ত দিলে মানুষের জন্য বড় পরিসরে ব্যাবসায়িক লেনেদেন করায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হবে। কারণ, এ ধরনের চুক্তিগুলো প্রতিশ্রুতি ও এমন দরকষাকষির ওপর নির্ভরশীল, যার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং বিচারিক দিক থেকে যদি এ ওয়াদাগুলোকে অনাবশ্যক করা হয়, তা হলে কেউ কারো প্রতি আস্থা রাখবে না এবং লেনদেনে আগ্রহী হবে না। তাই এ ধরনের ওয়াদার ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের ফকিহগণ বলেছেন, 'কখনো-কখনো মানুষের প্রয়োজনে ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক করে দেওয়া হয়।' ইতঃপূর্বে 'রাদ্দুল মুহতার' ও অন্যান্য কিতাব হতে যার বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আমাদের সামনে এখন এমন একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা বাকি রয়েছে, যার মাধ্যমে বিচারিক দিক থেকে কোন ধরনের ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব এবং কোন ধরনের ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়, তার মধ্যে পার্থক্য সাধন করা সম্ভব হবে। আমার কাছে মনে হয়, মৌলিক দুটি কারণে বিচারিক দিক থেকে ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক সাব্যস্ত করা সম্ভব :

১. ইসলামি রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে। আইনের মাধ্যমে সেসব ওয়াদা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে, যেগুলো বিচারিক দিক থেকে রক্ষা করা আবশ্যক।
২. যার সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছে, সে ওই ওয়াদা রক্ষার জন্য ওয়াদার ওপর নির্ভর করে কঠিন কোনো কাজ করবে এবং ওয়াদাকারী তার ওয়াদায় স্বীকার করবে যে, বিচারিক দিক থেকে সেটি রক্ষা করা আবশ্যক এবং এ ব্যাপারে লিখিত প্রমাণ বা সাক্ষী রাখবে।

সুতরাং কেউ যদি কোনো কিছু ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে কারো সঙ্গে ওয়াদা করে স্বীকারোক্তি দেয় যে, তার ওপর বিচারিক দিক থেকে ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব। এমন ক্ষেত্রে তার জন্য ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক এবং বিচারিক দিক থেকেও এই সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত। এই মতের পক্ষে আমাদের দলিল সেসব আয়াত ও হাদিস, যেগুলো ধর্মীয় দিক থেকে ওয়াদা রক্ষাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। ধর্মীয় দিক থেকে যে বিষয়গুলো ওয়াজিব হয়, রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে বিচারিক দিক থেকে সেগুলো আবশ্যক করার সুযোগ রয়েছে। কারণ, বৈধ বিষয়ে শাসকের আদেশ পালন করা ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিব বিষয়ে তাদের আদেশ পালন করা আরও যৌক্তিকভাবে ওয়াজিব হবে। আর যেখানে এই আইন অনুপস্থিত, সেখানে ওয়াদাকারী নিজের ওপর আবশ্যক করে নেওয়ার বিষয়টিকে আইনের স্থলাভিষিক্ত করা যেতে পারে। কেননা, হানাফি মাযহাবের ফকিহদের মতানুযায়ী কখনো-কখনো মানুষের প্রয়োজনে ওয়াদা আবশ্যক করে দেওয়া হয়। বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে নিশ্চিত প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি[২১৬] (রহ.)-এর ছাত্র শাইখ ফাতাহ মুহাম্মাদ লাক্ষ্ণৌবি ও শাইখ সায়িদ আহমাদ লাক্ষ্ণৌবি (রহ.) বিচারিক দিক থেকে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত ওয়াদা আবশ্যক হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন।[২১৭]

১৪০৯ হিজরি সনের ১-৬ জমাদিউল উলা তারিখে কুয়েতে অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি পঞ্চম অধিবেশনে এ বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করে নিচের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়:

> الوعد يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الوعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر

---

২১১. **আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি** : আবদুল হাই ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আমিনুল্লাহ আবুল হাসানাত আল-লাক্ষ্ণৌবি (রহ.)। জন্ম: ১২৬৪ হিজরি মোতাবেক ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে। ভারতবর্ষের খ্যাতনামা হানাফি ফকিহ, মুহাদ্দিস ও রিজাল-শাস্ত্রবিদ। বহু গ্রন্থপ্রণেতা। রচনাবলি: আল-আসারুল মারফুআ ফিল আখবারিল মাওযুআহ, আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, আল-আজবিবাতুল ফাযিলাহ, আর-রাফউ ওয়াত তাকমিল ফিল জারহি ওয়াত তা'দিল, মাজমুআতুল ফাতাওয়া, আত-তা'লিকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা লিল ইমাম মুহাম্মাদ প্রভৃতি। ১৩০৪ হিজরি মোতাবেক ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযার নামায পড়া হয়েছিল তিনবার। উপস্থিত লোকেদের সংখ্যাধিক্যের কারণেই এটি করতে হয়েছিল। (আল-আ'লাম : ৬/১৮৭; উসুলুল ইফতা, তাকি উসমানি, টীকা, পৃষ্ঠা-১১৩) –সম্পাদক

২১৭. ইতরে হেদায়া, পৃষ্ঠা-১১০, ২৪৩, ২৪৪।

الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

'কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ না-থাকলে ধর্মীয় দিক থেকে ওয়াদাকারীর জন্য ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক। ওয়াদাটি যদি কোনো বিষয়কেন্দ্রিক হয় এবং যার সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছে সে যদি কোনো কিছু ব্যয় করে, তা হলে বিচারিক দিক থেকে এই ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে আবশ্যকের সীমানা নির্ধারণের ফলাফল হবে দুটি : ক. ওয়াদা বাস্তবায়ন করা। খ. যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ওয়াদা রক্ষা না-করার কারণে প্রকৃত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়া।'[২১৮]

হযরত উবাদা বিন সামেত (রাযি.) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিস থেকে নেওয়া একটি ব্যাপক মূলনীতির ওপর নির্ভর করে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি ক্ষতিপূরণের ফতোয়া দিয়েছে। হাদিসটিতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একাধিক ফয়সালা উদ্ধৃত হয়েছে। যার মধ্যে একটি হলো 'কাউকে ক্ষতি না-করা এবং নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না-হওয়ার ব্যাপারে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।'[২১৯] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কাউকে ক্ষতি করা যাবে না এবং নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না।'[২২০] হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণিত হাদিসটি এ মূলনীতির পক্ষে দলিল। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ইসলামে কাউকে ক্ষতি করা বা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো বিধান নেই।' ইমাম

---

২১৮. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যা : পঞ্চম : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৯৯, সিদ্ধান্ত নং ২ ও ৩

২১৯. মুসনাদে আহমাদ : খণ্ড-৩৭, পৃষ্ঠা-৪৩৬, হাদিস নং ২২৭৮৭। আল্লামা হাইসামি (রহ.) বলেছেন, "ইমাম ইবনে মাজাহ হাদিসটির একাংশ বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ-ও রেওয়ায়াত করেছেন। ইসহাক (রহ.) (অর্থাৎ, ইসহাক ইবনে ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালিদ ইবনে উবাদা ইবনে সামেত)-এর সঙ্গে উবাদাহ ইবনে সামেত (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ হয়নি। মাজমাউয যাওয়ায়েদ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৫।

২২০. মুসনাদে আহমাদ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৫। হাদীস নং ২৮৬৫, তবে এই রেওয়ায়াতটিতে জাবের আল-জু'ফি নামক জনৈক বর্ণনাকারী রয়েছে। তিনি সকল মুহাদ্দিসের মতে যয়িফ।
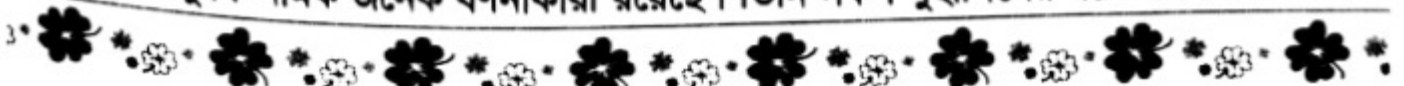
তাবারানি (রহ.) 'মুজামুল আওসাত' কিতাবে এটি বর্ণনা করেছেন।[২২১] একইভাবে তিনি 'মুজামুল আওসাত'-এ হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকেও যয়িফ সনদে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[২২২]

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের ওয়াদা করা হয়, যখন পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানায় থাকে না। সুতরাং বিচারিক দিক থেকে যদি ওয়াদা রক্ষা করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়, তা হলে সেটি বিক্রয়চুক্তির সদৃশ হয়ে যায়। আর সেটি মালিকানাহীন পণ্য বিক্রয় বা ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বিক্রয়ে পরিণত হবে, যার কোনোটিই জায়েয নেই। (তা হলে উপরে বর্ণিত বিক্রয়চুক্তি কীভাবে জায়েয হয়?)[২২৩]

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, বিক্রয়ের জন্য কৃত ওয়াদা আবশ্যক হওয়া মূলত বিক্রয় নয়। নিচের বিষয়গুলো থেকে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যটি স্পষ্ট হবে–

১. বিক্রয়ের ওয়াদা আসল বিক্রয় নয়। কারণ, বিক্রয় হওয়ার জন্য ওয়াদাকৃত সময়ে উভয় পক্ষ থেকে (মৌখিক) অথবা 'তাআতি'র মাধ্যমে ইজাব-কবুল হওয়া জরুরি। ইজাব-কবুল বা তাআতি'র কোনো একটি না-পাওয়া গেলে, বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। আর ভবিষ্যতের সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিক্রয়ের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, সেখানে নতুন করে ইজাব-কবুল করার প্রয়োজন হয় না। নির্ধারিত সময়ে উভয় পক্ষের জন্য অধিকার ও দায়িত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। সুতরাং আপনা-আপনিই পণ্যটি ক্রেতার মালিকানায় চলে যায় এবং তাকে মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

২. শুধু ওয়াদার মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন হয় না, নির্ধারিত সময়ে উভয় পক্ষ থেকে চুক্তি করতে হয়। ওয়াদাকারী ওয়াদা ভঙ্গ করলে নির্ধারিত সময়ে বিক্রয় সম্পন্ন হয় না। সুতরাং ওয়াদাকারী যদি ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং নির্ধারিত সময়ে বিক্রয়চুক্তি করতে ব্যর্থ হয়, তা হলেও বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। কাজি তাকে চুক্তি করতে বাধ্য করবে। আর

---

২২১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১০। আল্লামা হাইসামি (রহ.) বলেছেন, হাদিসটির সনদে ইসহাক নামের জনৈক বর্ণনাকারী রয়েছে। তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে 'তাদলিস' করতেন।

২২২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১০।

২২৩. সম্পাদক
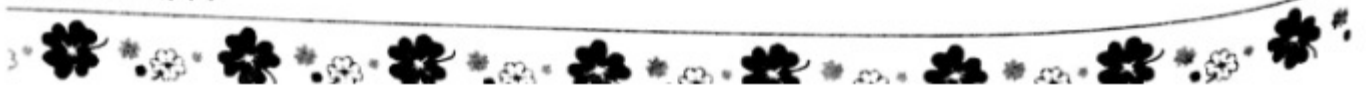
যদি ওয়াদাকারীর ইচ্ছা বহির্ভূত কোনো কারণে ওয়াদা ভঙ্গ হয় এবং তার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত স্পষ্ট কারণ থাকে, তা হলে তাকে অক্ষম গণ্য করতে হবে। ভবিষ্যতের বিক্রয়ের বিষয়টি হলো, বিক্রয়ের দিনেই সেটি চূড়ান্ত বিক্রয় হিসাবে সাব্যস্ত হয়। তাই চুক্তি রক্ষা করতে অক্ষম ব্যক্তিকে কোনো অবস্থায়ই অক্ষম সাব্যস্ত করা হয় না। যদি ভবিষ্যতের কোনো তারিখে বিক্রয় করে, তা হলে আপনা-আপনিই সে ওই তারিখে চুক্তিতে উল্লেখকৃত পরিমাণ অর্থের ঋণী সাব্যস্ত হয়ে যায়। সে যদি তখন মূল্য পরিশোধ করতে না পারে, তা হলে পরিশোধ করা পর্যন্ত সে ঋণী থেকে যাবে। এ ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ না-করাকে বিক্রয়চুক্তি বাতিলের কারণ সাব্যস্ত করা যাবে না। তবে উভয়ের সন্তুষ্টিতে 'ইকালা'চুক্তি[২২৪] হতে পারে।

এরপরও দেখার বিষয় হচ্ছে, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি সেসব ক্ষেত্রে ওয়াদা রক্ষা আবশ্যক সাব্যস্ত করাকে জায়েয বলেছে, যেখানে এক পক্ষ থেকে ওয়াদা করা হয়। যদি উভয় পক্ষ থেকে ওয়াদা করা হয়, সেক্ষেত্রে আবশ্যক সাব্যস্ত করাকে জায়েয বলেনি।[২২৫] কারণ, তখন সেটি ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পৃক্ত চুক্তির সদৃশ হয়ে যায়। কেননা, ভবিষ্যতের কোনো তারিখে চুক্তি করার বিষয়টি উভয় পক্ষ নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছে, তবে এক পক্ষ থেকে ওয়াদার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, সেখানে এক পক্ষ আবশ্যককারী হয়, অপর পক্ষ আবশ্যককারী হয় না। সুতরাং এ বিষয়গুলোর দিক থেকে উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তারপরও অনেক সময় উভয় পক্ষ থেকে ওয়াদা আবশ্যক করার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ও আমদানি চুক্তির ক্ষেত্রে।

৩৩. আমদানি চুক্তির অঙ্গীকার

আমদানি চুক্তি হলো, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে এমন চুক্তি করা যে, বিক্রেতা নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট প্রকারের ও মানের নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য উভয় পক্ষের চুক্তিকৃত নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রেতাকে দেবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো হোটেলে

---

২২৪. বিক্রীত পণ্য এবং তার মূল্য বিক্রেতা ও ক্রেতাকে ফেরত দিয়ে বিক্রয়চুক্তি উইদড্র করে নেওয়া কে বলা হয় : ইকালা। –সম্পাদক

২২৫. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যা: পঞ্চম : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৯৯, সিদ্ধান্ত নং ২ ও ৩। ১৪০৯ হিজরি সনে কুয়েতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম অধিবেশন।

প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য আমদানির প্রয়োজন হয়, তাই হোটেল মালিক কোনো একজন খাদ্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমদানির এগ্রিমেন্ট করল যে, চুক্তি অনুযায়ী তাকে নির্দিষ্ট মান ও পরিমাণে প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ করবে। মাজমাউল ফিকহিল ইসলামির পক্ষ থেকে আমদানিকে নিম্নোক্ত সংজ্ঞায় সজ্ঞায়িত করা হয়েছে :

عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.

'আমদানি চুক্তি : এমন একটি চুক্তি যেখানে উভয় পক্ষ চুক্তি করে যে, চুক্তিকৃত মেয়াদ পর্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট মানের ও নির্দিষ্ট পরিমাণের পণ্য, নির্দিষ্ট মূল্যে, আংশিক বা পূর্ণ পরিশোধকৃত মূল্যে আমদানি করবে।'[২২৬]

ব্যাবসায়িক ঝুঁকি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এমন চুক্তি করতে বাধ্য হয়। কারণ, চুক্তিকে উভয় পক্ষের ওপর আবশ্যক করা ছাড়া এ ধরনের কাঁচামাল সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। তা ছাড়া এমনটি করা ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে এগুলো পাওয়াও অসম্ভব। এ ধরনের সময় নির্ধারণ করা ব্যবসায়ী মহলে সফলতা ও ঝুঁকির ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা রয়েছে।

এ ধরনের চুক্তির হুকুম হলো, আমদানিকৃত পণ্যটি যদি শিল্পসংশ্লিষ্ট হয়, তা হলে অর্ডানি পণ্যের ক্ষেত্রে অনুসৃত মূলনীতি এ ক্ষেত্রেও মূলনীতি হিসাবে অনুসৃত হতে পারে। যথাস্থানে এর বিস্তারিত আলোচনা হবে– ইনশাআল্লাহ। একইভাবে প্রথমে যদি রপ্তানিকারীকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়, তা হলে সেটিকে বাইয়ে সালামের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, ফলে বাইয়ে সালামের বিস্তারিত শরয়ি শর্তানুযায়ী এটি বাস্তবায়ন করা যাবে। সালামের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে– ইনশাআল্লাহ।

আমদানিযোগ্য পণ্যটি যদি এমন হয়, যা শিল্পসংশ্লিষ্ট নয় এবং বাইয়ে সালামের পদ্ধতিতে সেটি পাওয়াও অসম্ভব, এমন ক্ষেত্রে এগ্রিমেন্ট সাইনকে চূড়ান্ত ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত করা জায়েয হবে না। কেননা, তা ভবিষ্যতের

---

২২৬. সিদ্ধান্ত নং ১০৭, (১-১২) মাজাল্লাতুল মাজমা, সংখ্যা : ১২।
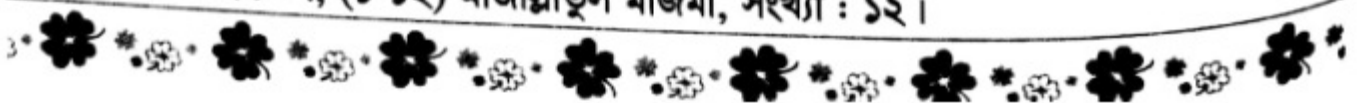
সঙ্গে সম্পৃক্ত চুক্তি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম এমন বিক্রয়কে না-জায়েয বলেছেন। কারণ, তাতে উভয় বিনিময় বাকি থাকে। ফলে তা 'বাকি বস্তুর বিনিময়ে অপর বাকি বস্তু বিক্রয়ে পরিণত হয়।'[২২৭] তা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগ্রিমেন্ট সাইন করার সময় বিক্রেতা পণ্যের মালিক থাকে না, তাই সেখানে মালিকানাহীন বা অস্তিত্বহীন পণ্য বিক্রয় করা হয়ে যাবে– আর এ দুটি পদ্ধতিই নিষিদ্ধ।

অতএব, সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, শরয়ি দিক থেকে আমদানি-রপ্তানির চুক্তিটি উভয় পক্ষের সমঝোতা ও ওয়াদা ছাড়া আর কিছুই নয়। পণ্য হস্তান্তরের সময়েই চূড়ান্ত বিক্রয় সম্পন্ন হবে। তারপরও এখানে সেই একই প্রশ্ন রয়ে যায় যে, উভয় পক্ষের ওয়াদা রক্ষা করা উভয় পক্ষের জন্য আবশ্যক কি না? স্বাভাবিকভাবে উভয় পক্ষ থেকে কৃত ওয়াদা তাদের জন্য আবশ্যক হয় না। আমদানি-রপ্তানির বিষয়ে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি থেকে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে যে, উভয় পক্ষ থেকে বা এক পক্ষ থেকে ওয়াদার মাধ্যমে এক পক্ষের ওপর কোনো বিষয় আবশ্যক করলে সেটি জায়েয আছে। আর যদি উভয় পক্ষ থেকে ওয়াদার মাধ্যমে উভয় পক্ষের ওপর কোনো বিষয় আবশ্যক করা হয়, তা হলে শরয়ি দিক থেকে এমন চুক্তি জায়েয নেই।

কিন্তু অনেক ফকিহ বলেছেন, মানুষের প্রয়োজনে কখনো-কখনো উভয় পক্ষ থেকে ওয়াদা আবশ্যক করে দেওয়া হয়। আল্লামা কাজিখান[২২৮] (রহ.) বাইয়ে

---

২২৭. যাকে ফিকহের পরিভাষায় বলে : بيع الكالي بالكالي -সর্বসম্মতিক্রমে এ ধরনের কল্পনাপ্রসূত বিক্রয়চুক্তি না-জায়েয। –সম্পাদক

২২৮. **আল্লামা কাজিখান :** হাসান ইবনে মানসুর ইবনে মাহমুদ ইবনে আবদুল আজিজ ফখরুদ্দিন আল-বুখারি আল-আওযাজান্দি (রহ.)। কাজিখান নামে প্রসিদ্ধ। ইরানের ইসপাহান ও উজবেকিস্তানের ফারগানা প্রদেশের নিকটবর্তী আওযাজান্দ-এর দিকে নিসবত করে তাঁকে আওযাজান্দি এবং ফারাগানিও বলা হয়। তিনি মুজতাহিদ পর্যায়ের হানাফি ফকিহ ছিলেন। তাঁর উস্তাদগণ: ইমাম যহিরুদ্দিন আল-হাসান ইবনে আলি ইবনে আবদুল আজিজ আল-মারগিনানি, নিযামুদ্দিন ইবরাহিম ইবনে আলি আল-মারগিনানি, ইবরাহিম ইবনে উসমান আস-সাফারি, তাঁর দাদা মাহমুদ ইবনে আবদুল আজিজ আল-আওযাজান্দি (রহ.) প্রমুখ। তাঁর ছাত্রগণ: নাজমুল আয়িম্মা আল-হাকিমি, আবুল ফযল উবাইদুল্লাহ ইবনে ইবরাহিম আল-বুখারি, শামসুল আয়িম্মা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুস সাত্তার আল-কারদারি (রহ.) প্রমুখ। তিনি বহু কিতাবের রচয়িতা। যেমন, আল-ফাতাওয়া (তিনখণ্ডে, যা ফাতাওয়ায়ে খানিয়া বা ফাতাওয়ায়ে কাজিখান নামে প্রসিদ্ধ), আল-আমালি, আল-ওয়াকিআত, শারহুয যিয়াদাত, শারহুল জামিয়িস সগির, শারহু আদাবিল কাজি লিল খাস্সাফ প্রভৃতি। হিজরি ৫৯২ মোতাবেক ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে রমযান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। সেখানকার প্রসিদ্ধ সাতজন

ওয়াফার আলোচনায় বলেছেন–

وإن ذكرا البيع من غير شرط، ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس.

'ক্রেতা-বিক্রেতা যদি শর্তহীন বিক্রয় করার পর ওয়াদা হিসাবে শর্ত উল্লেখ করে, তা হলে বিক্রয় সহিহ হবে এবং ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক হবে। কেননা, কখনো-কখনো মানুষের প্রয়োজনে উভয় পক্ষের ওয়াদা রক্ষা করাকে আবশ্যক করে দেওয়া হয়।'[২২৯]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ.

'হে ইমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা রক্ষা করো না?'[২৩০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.)-এর তাফসির থেকে এটিই অনুমিত হয়। ওয়াদা রক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় তার বক্তব্য উল্লেখ করেছি। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (রহ.)[২৩১] হযরত শুআইব (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কিত–

কাজির মাজারের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২১/২৩২-২৩৩, ২২/৩৪৫, ২৩/১১৩; আল-আ'লাম : ২/২২৪; আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-২২০; আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ, তকিউদ্দিন আল-গাযযি, পৃষ্ঠা-২২০, ২৪৩; আত-তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ, আবদুল কাদের আল-কুরাশি : ২/১০৮) –সম্পাদক

২২৯. ফাতাওয়ায়ে কাজিখান, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ার সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ, পরিচ্ছেদঃ বিক্রয়ে ফাসেদ শর্তসমূহ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৫।

২৩০. সুরা সফ : আয়াত-২।

২৩১. **আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি** : মাহমুদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুসা ইবনে আহমাদ আবু মুহাম্মাদ বদরুদ্দিন আল-আইনি আল-হানাফি। জন্ম : সিরিয়ার (আল্লাহ একে মুক্ত করুন) আইনতাবে ৭৬২ হিজরি মোতাবেক ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দে। তিনি কায়রোয় হানাফিদের কাজি নিযুক্ত হন। সে সময়কার বাদশাহ মুআইয়্যিদুদ্দিন এর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। বাদশাহ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও সমীহ করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সরকারি দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে দরস-তাদরিস ও ইলমের খেদমতের জন্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। তাঁর উস্তাদগণ : আলাউদ্দিন সাইরামি, যাইনুদ্দিন ইরাকি, উমর ইবনে রাসলান বুলকিনি, তকিউদ্দিন দাজাবি (ইবনে হাজারের উস্তাদ), নুরুদ্দিন হাইসামি, কুতবুদ্দিন হালাবি, আবুল ফাতাহ আসকালানি (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। তাঁর শিষ্যগণ : কামাল ইবনুল হুমাম (ফাতহুল কাদির-এর লেখক), শামসুদ্দিন সাখাবি শাফেয়ি, ইউসুফ ইবনে তাগরি বারদি হানাফি, কাসেম ইবনে কুতলুবুগা হানাফি, জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। রচনাবলি : আল্লামা আইনি (রহ.)-এর
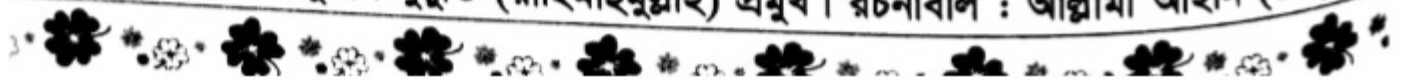
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ.

'আমাকে আট বছর শ্রম দেওয়ার বিনিময়ে আমার এই দুই মেয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাচ্ছি।'[২৩২]

এই আয়াতের আলোচনায় তিনি বলেছেন–

فإن قلت: كيف يصح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير تمييز؟ قلت: لم يكن ذلك عقد النكاح، ولكن مواعدة ومواضعة أمر، قد عزم عليه.

শাগরেদ আল্লামা সাখাবি (রহ.) বলেছেন: "আমাদের শাইখ বদরুদ্দিন আইনি'র পর তার মতো এতো অধিকসংখ্যক কিতাব কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।" উল্লেখযোগ্য রচনাবলি: উমদাতুল কারি ফি শারহি সহিহিল বুখারি (এগারো খণ্ডে), মাগানিল আখইয়ার ফি রিজালি মাআনিল আছার (দুই খণ্ডে), আল-ইলমুল হায়্যিব ফি শারহিল-কালিমিত তায়্যিব লি ইবনে তাইমিয়াহ, ইকদুল জুমান ফি তারিখি আহলিয যামান (৮৫০ হি. পর্যন্ত ইতিহাসের বিবরণ), মাবানিল আখইয়ার ফি শারহি মাআনিল আছার, নুখাবুল আফকার (আট খণ্ডে, শরহে মাআনিল আছার-এর রিজাল ও মাসায়েলের প্রমাণসিদ্ধ আলোচনায় সমৃদ্ধ), আল-বিনায়াহ ফি শারহিল হিদায়াহ (ছয় খণ্ডে), রামযুল হাকায়েক শারহু কানযুদ দাকায়েক, তবাকাতুশ শুআরা, রিজালুত তাহাবি, আল-জাওয়াহিরুস সানিয়্যাহ ফি তারিখিদ দাওলাতিল মুআইয়্যাদাহ, শারহু সুনানি আবি দাউদ (দুই খণ্ড, অসমাপ্ত), তারিখুল আকাসিরাহ (তুর্কিভাষায় রচিত ইতিহাসগ্রন্থ), তাতরিকুল কুদুরি (মুখতাসারুল কুদুরি কিতাবের তুর্কি অনুবাদ) প্রভৃতি। ইন্তেকাল : মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তিনি একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচুরসংখ্যক সাহিত্যকর্ম তিনি এই মাদরাসার তালিবুল ইলমদের জন্যে ওয়াক্‌ফ করে দেন। জীবনের শেষভাগে এসে তিনি দারিদ্র্যের শিকার হন। তাঁকে তাঁর মালামাল ও আসবাবপত্র বিক্রি করে ফেলতে হয়। মাদরাসার জন্যে ওয়াকফকৃত কিতাব ছাড়া অল্পকিছু কিতাব তাঁর কাছে ছিল। সেগুলোও বিক্রি করে ফেলেন। ৮৫৫ হিজরি মোতাবেক ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে তিরানব্বই বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাতেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর শাগরেদ আল্লামা ইবনে তাগরি বারদি বলেন: "এমন কোনো ইলম ছিল না, যাতে তিনি নৈপুণ্য প্রকাশ করেননি। ফিকহ, উসুলে ফিকহ, ইলমে নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে লুগাহ–সবক্ষেত্রেই তিনি অসাধারণ দক্ষতা রাখতেন। তাঁর লেকচারগুলো ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও আনন্দদায়ক।" তাঁর আরেক শাগরেদ আল্লামা শামসুদ্দিন সাখাবি (রহ.) বলেন: "তিনি ছিলেন ইমাম, আল্লামা, আরবি ব্যাকরণবিদ, ইতিহাসের হাফেজ। পড়া ও লেখায় তাঁর বিন্দুমাত্র বিরক্তবোধ ছিল না। তিনি ছিলেন মানবিক গুণের অধিকারী এবং প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আলেম।" (আল-আ'লাম, যিরিকলি: ৭/১৬৩; আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি, পৃষ্ঠা-২০৭; বদরুদ্দিন আইনি ওয়া আসারুহু ফি ইলমিল হাদিস, সালেহ ইউসুফ মা'তুক, দারুল বাশায়ের, বৈরুত, লেবানন) –সম্পাদক

২৩২. সুরা কাসাস : আয়াত-২৭

> 'যদি প্রশ্ন করেন, দুই মেয়ের মধ্যে পার্থক্য না-করে তাদের একজনকে বিয়ে দেওয়ার কথা বলা কীভাবে সহিহ হলো? আমি বলবো, সেটি বিয়ের চুক্তি ছিল না। সেটি ছিল উভয় পক্ষ থেকে ওয়াদা ও সমঝোতা, যেটি বাস্তবায়নের ব্যাপারে দৃঢ় ইচ্ছা ছিল।'[২৩৩]

এখানে স্পষ্ট যে, আল্লামা আইনি (রহ.) উভয় পক্ষের ওয়াদাকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন এবং ওয়াদা ও চুক্তির মধ্যে পার্থক্য সাধন করেছেন।

আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের ওয়াদা আবশ্যক সাব্যস্ত করার প্রয়োজনটি স্পষ্ট। সেটি আবশ্যক সাব্যস্ত না-করলে এক পক্ষের ক্ষতির বিষয়টি বুঝতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। এ কারণে শাইখ আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি (রহ.)-এর ছাত্র ফাতাহ মুহাম্মাদ লাক্ষ্ণৌবি ও শাইখ সায়িদ আহমাদ লাক্ষ্ণৌবি (রহ.) ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিচারিক দিক হতে উভয় পক্ষের জন্য ওয়াদা রক্ষা আবশ্যক হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন।[২৩৪]

কেউ যদি প্রশ্ন করে, উভয় পক্ষের ওপর আবশ্যক ওয়াদা ও ভবিষ্যৎ বিক্রয়ের মধ্যে কী পার্থক্য? উত্তরে বলা হবে, উভয় পক্ষের আবশ্যকীয় ওয়াদা কখনো চূড়ান্ত বিক্রয়ের হুকুমে হবে না। কারণ, বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে চুক্তিকৃত বস্তুটি একজনের মালিকানা থেকে অন্যের মালিকানায় চলে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি চূড়ান্ত ক্রয় করল, সে মূল্যটিকে নিজের ওপর ঋণ হিসাবে মেনে নিল। আর যে ব্যক্তি চূড়ান্ত বিক্রয় করল, সে পণ্যের মালিকানা ক্রেতার কাছে হাস্তান্তর করল। যদি বাইয়ে সালামের পদ্ধতিতে বিক্রয় করে, তা হলে পণ্যটি নিজের জিম্মায় ওয়াজিব করে নিল। ইজাব-কবুল সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এ দায়িত্বগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে। এ কারণে বসবাসের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি কোনো বাড়ি ক্রয় করে বিক্রেতাকে তার মূল্য পরিশোধ করে না, বিক্রেতার কাছে সে মূল্যের সমপরিমাণ অর্থের ঋণী হয়ে যায় এবং তার ওপর ঋণের সব ধরনের বিধি-বিধান প্রয়োগ হতে থাকে। যারা নগদ-বাকি সব ধরনের ঋণের ওপর যাকাত ওয়াজিব না-হওয়ার মত পোষণ করেছেন,[২৩৫]

---

২৩৩. উমদাতুল কারি, অধ্যায়: ইজারা, পরিচ্ছেদ: শ্রমিক নিয়ে তার পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করে কাজ নির্দিষ্ট না-করা : খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-১২১।

২৩৪. ইতরে হেদায়া : পৃষ্ঠা-১১০, ২৪৩, ২৪৪।

২৩৫. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, আল্লামা কাসানি (রহ.) : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৩। ১৪১৮ হিজরি সনে বৈরুতের দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবি থেকে প্রকাশিত।

তাদের কাছে এ ব্যক্তি থেকে বাড়ির মূল্য পরিমাণ অর্থের যাকাত রহিত হবে। হানাফি মাযহাবের ফকিহদের মতানুযায়ী ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে পড়লে অন্যান্য ঋণদাতা অপেক্ষা বাড়ির মালিক সেটি ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। অনুরূপভাবে বাইয়ে সালামের পদ্ধতিতে যে ব্যক্তি কারো কাছে গম বিক্রয় করবে, চুক্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ গমের ব্যাপারে ক্রেতার কাছে সে ঋণী, তাই তাকে ওই পরিমাণ গমের যাকাত দিতে হবে না। বাইয়ে সালামের বিক্রেতা মরে গেলে তার এই ঋণ রহিত হবে না। সুতরাং তার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে তাৎক্ষণিকভাবেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।[২৩৬]

আর উভয় পক্ষের প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয়ে কথা হলো, এটা কোনো পক্ষের ওপরই ঋণ আরোপ করে না। তাই এর মাধ্যমে নতুন কোনো ফলাফল দৃশ্যমান হয় না। সুতরাং ভবিষ্যতের কোনো তারিখে বিক্রয় করার ব্যাপারে যখন উভয় পক্ষ চুক্তি করবে, তখন ক্রয়ের ওয়াদাকারীর ওপর ওয়াদাকৃত মূল্য ঋণ হিসাবে গণ্য করা হবে না এবং তার যাকাতও রহিত হবে না। বিক্রয়ের ওয়াদাকারীর দায়িত্বে এভাবেও পণ্যটি ঋণ হিসাবে গণ্য হবে না এবং তারও যাকাত রহিত হবে না। বিক্রয়ের ওয়াদাকারী মরে গেলে বা দেউলিয়া হলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে সেটি উসুল করা হবে না। সুতরাং এখান থেকে স্পষ্ট হলো যে, উভয় পক্ষের ওয়াদা বাস্তবিকপক্ষে কোনো চূড়ান্ত চুক্তি নয় এবং তার ক্ষেত্রে বাস্তব চুক্তির প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। ওয়াদাকৃত তারিখে চূড়ান্ত চুক্তি করার আগে কেউই ঋণী সাব্যস্ত হয় না। বরং ওয়াদার কারণে এটি আবশ্যক হয় যে, নির্দিষ্ট তারিখে তারা ইজাব-কবুল করবে। তারপর কোনো পক্ষ যদি এমন কোনো যুক্তিসঙ্গত সমস্যার সম্মুখীন হয়, যার কারণে ওয়াদা রক্ষা করতে পারছে না, তা হলে তাকে অক্ষম সাব্যস্ত করে চুক্তি করতে বা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাবে না। পক্ষান্তরে ভবিষ্যৎ বিক্রয়ের বিষয়টি হলো, কাঙ্ক্ষিত সময়ে কোনো এক পক্ষ চাহিদা পূরণে অক্ষম হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে বলে সাব্যস্ত করা হয় না; বরং তার জন্য সন্তুষ্টচিত্তে উভয় পক্ষ থেকে 'ইকালা' করতে হয়।

উভয় পক্ষের উপর ওয়াদা রক্ষা আবশ্যক করার ফলাফল হলো, নির্দিষ্ট তারিখে চুক্তি করার ব্যাপারে বিচারক উভয় পক্ষকে বাধ্য করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না। কোনো পক্ষ যদি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ওয়াদা

---

২৩৬. রাদ্দুল মুহতার, পরিচ্ছেদ : বাইয়ে সালাম : খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৩৭৫, ফিকরাহ নং ২৪৭৪৭।
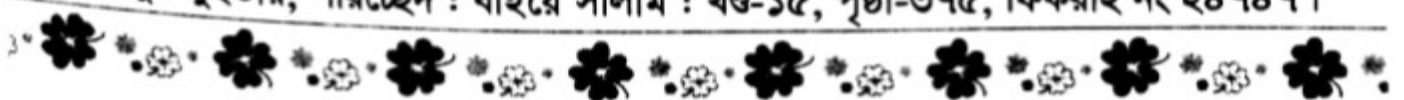
ভঙ্গ করে, তা হলে তার ওয়াদার কারণে অপর পক্ষ যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুধু সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে তাকে বাধ্য করবেন।[২৩৭] বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার কারণে একজন হতে অন্যের কাছে দায়িত্ব পরিবর্তন হওয়া এবং এ বিষয়গুলোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।[২৩৮]

৩৪. লেটার অব ক্রেডিট (এল. সি.) ইস্যু করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের অঙ্গীকার

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লেটার অব ক্রেডিটের মাধ্যমে যেসব লেনদেন হয়, সেগুলোকে বিক্রয়চুক্তির পারস্পরিক ওয়াদার নীতিমালা ছাড়া অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তখনই এল. সি. ইস্যু করা হয়, যখন ইস্যুকারীর কাছে উভয় পক্ষের আবশ্যকীয় এগ্রিমেন্ট থাকে। সাধারণ অবস্থায় এ এগ্রিমেন্টকে চূড়ান্ত বিক্রয় সাব্যস্ত করার সুযোগ নেই। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় এগ্রিমেন্টে সাইন করা হয়, যখন বিক্রেতার কাছে কাঙ্ক্ষিত পণ্য থাকে না। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ইসলামি শরিয়তে মালিকানাহীন পণ্য বিক্রয়কে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর যদিও পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানায় থাকে, তারপরও বিক্রয়কৃত পরিমাণ পণ্য নির্দিষ্টভাবে আলাদা করা হয় না। একইভাবে এগ্রিমেন্ট সাইন করার সময় পণ্যটি বাকি রাখা হয়। যে কারণে উভয় বিনিময় বাকি রাখা আবশ্যক হবে। আর বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রয় করা জায়েয নেই। সুতরাং আন্তর্জাতিক ব্যবসাকে বিক্রয়ের ব্যাপারে উভয় পক্ষের ওয়াদা ছাড়া অন্য কোনোভাবে সহিহ সাব্যস্ত করার সুযোগ নেই। তবে সে ওয়াদার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সব শর্তগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হতে হবে।

এল. সি.-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের ওপর ওয়াদা রক্ষা আবশ্যক করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ, সাধারণত এমন ওয়াদা ছাড়া এল. সি. ইস্যু করা হয় না এবং এল. সি. ছাড়া আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চূড়ান্ত বিক্রয় সম্পন্ন করা অসম্ভব। একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে এল. সি. সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ। আমরা এ কথা আলোচনা করব যে, এগ্রিমেন্ট ও বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণ আলাদা চুক্তি। এগ্রিমেন্ট উভয় পক্ষের

---

২৩৭. এক পক্ষ থেকে ওয়াদা ভঙ্গ সম্পর্কে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি থেকে এ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যা: পঞ্চম : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৯৯।

২৩৮. বিস্তারিত জানতে বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ-এর 'عقود التوريد والمناقصة' প্রবন্ধ দেখুন।

ওয়াদা ছাড়া আর কিছুই নয়। এগ্রিমেন্টের পর নির্দিষ্ট সময়ে ইজাব-কবুল অথবা দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে 'তাআতি'র পদ্ধতিতে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে এ পদ্ধতিতে অনেক প্রোপার্টি লেনদেন করা হচ্ছে এবং মূল বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগে এগ্রিমেন্ট সাইন করা হচ্ছে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি এমন শর্তের ওপর নির্ভর করে, যেগুলোর বাস্তবায়ন ছাড়া কোনো পক্ষই চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন করতে রাজি হয় না। অতএব, উভয় পক্ষের ওয়াদাকে আবশ্যক করা ছাড়া এমন বিক্রয় সহিহ করার আর কোনো সুযোগ নেই।

তবে এটা স্পষ্ট যে, উভয় পক্ষের জন্য ওয়াদা আবশ্যক করার বিষয়টি মূলনীতির বিপরীত। তাই প্রকৃত ব্যবসার ক্ষেত্রেই সেটির অনুমতি দেওয়া যায়। সুতরাং পুঁজিবাদের প্রচলিত বাজারে সেটিকে মৌলিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত হবে না। কারণ, এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেগুলো প্রকৃত ব্যাবসায়িক প্রয়োজন নয়; বরং সেগুলোর মূল উদ্দেশ্য থাকে পুঁজিবাদি বাজারের সৃষ্ট অনুমান নির্ভর (Speculations) লেনদেনে অংশ নেওয়া। এগুলোর মাধ্যমে পণ্য দেওয়া-নেওয়ার কোনোটিই মূল উদ্দেশ্য থাকে না। এসব ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য থাকে উভয় মূল্যসূচকের মধ্যে সমন্বয় করে লাভ অর্জন করা। এমন লেনদেন ব্যবসার চেয়ে জুয়ার সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ এবং বহুবিধ ক্ষতির কারণ। এখানে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই।

বর্তমানে ব্যাবসায়িক চুক্তিসমূহে যে বিষয়গুলো হয়ে থাকে, সেগুলো জানতে প্রচলিত ব্যবসায় আইন অধ্যয়ন করা উচিত।

৩৫. আইনের দৃষ্টিতে এগ্রিমেন্ট ও চূড়ান্ত বিক্রয়ের মধ্যকার পার্থক্য

বর্তমান সময়ে দুটি পদ্ধতিতে ব্যবসায় চুক্তি করা হয়ে থাকে :

১. সরাসরি বা পত্রের মাধ্যমে ইজাব-কবুল সম্পাদন করে তৎক্ষণাৎ যেসব বিক্রয় সম্পন্ন করা হয়। এর মাধ্যমে ইজাব-কবুল সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পণ্যটি ক্রেতার মালিকানায় চলে যাবে। মালিকানা পরিবর্তন হওয়া অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল হবে না। এ পদ্ধতির বিক্রয় হলো সাধারণ বিক্রয়। যার ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সব বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। একক পণ্য বা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার দাবি রাখে না এমন ইউনিট পণ্যের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয়ে থাকে।
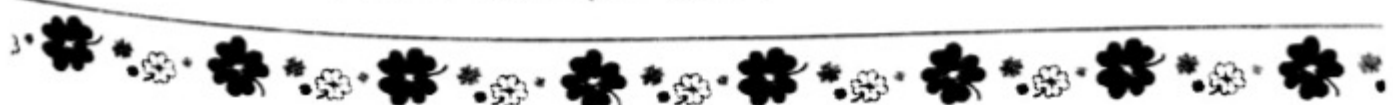
২. বিক্রয়ের ব্যাপারে উভয় পক্ষ চুক্তি করে তবে তৎক্ষণাৎ চূড়ান্ত চুক্তি না-করে ভবিষ্যতের কিছু বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রাখে। সাধারণত সেসব ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে লেনদেন করতে হয়, যেখানে অনেক পণ্য ক্রয় করা হয় এবং সেগুলো সাপ্লাইয়ের জন্য বিক্রেতার সময় লাগে, অথবা এমন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে লেনদেন করা হয়, যেখানে দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। যেমন, জমিজমা বিক্রয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে এমনটি হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পদ্ধতির বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিক্রয়ে চূড়ান্ত চুক্তি করার আগে এগ্রিমেন্ট সাইন করা হয়। এর শরয়ি বাস্তবায়ন-পদ্ধতি জানতে প্রচলিত আইন জানা জরুরি।

প্রচলিত আইনে এগ্রিমেন্ট টু সেল (Agreement to sell) ও চূড়ান্ত বিক্রয়চুক্তির (Sale) মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

এগ্রিমেন্ট বা বিক্রয় সম্পর্কে ওয়াদা হলো, ভবিষ্যৎ কোনো তারিখে বা শর্ত পাওয়া যাওয়ার পর বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। এ প্রতিশ্রুতির কারণে কোনো পক্ষের মালিকানা পরিবর্তন হয় না। এ সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যে, প্রথম পক্ষ তথা বিক্রেতা বিক্রয়ের ব্যাপারে এবং দ্বিতীয় পক্ষ তথা ক্রেতা ক্রয়ের ব্যাপারে ওয়াদা করে যে, তাদের চুক্তি অনুযায়ী অমুক তারিখে বা অমুক শর্ত পাওয়া গেলে পণ্য বিক্রয় করা হবে।[২৩৯]

পক্ষান্তরে বিক্রয় হচ্ছে, বিক্রয় বাস্তবায়নের চুক্তি। এ চুক্তির মাধ্যমে পণ্যটি ক্রেতার মালিকানায় চলে যায় এবং তার সমষ্টির ওপর 'বিক্রয়চুক্তি' (Contract of sale) পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় যে নিয়ম অনুসৃত হয় তা হলো, শর্ত পাওয়া বা নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রয় করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করে। যাতে পরবর্তী নির্দিষ্ট তারিখ বা শর্ত পাওয়া গেলে বিক্রয় সংঘটিত হয়। সুতরাং যখন ওই তারিখ আসে বা শর্ত পাওয়া যায়, তখন নতুন কোনো ইজাব-কবুল ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে

---

২৩৯. মৌলিকভাবে এটি যদিও বিক্রয় করার ব্যাপারে উভয়পক্ষ থেকে আবশ্যক ওয়াদা করা, যার ফলাফলটি ভবিষ্যতে কার্যকর হয়; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্বাক্ষরের সময় এগ্রিমেন্টকে বিক্রয় চূড়ান্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ অবস্থায় এর ও প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী সাধারণ বিক্রয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে যায়। 'ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয় আইন' (Sale of Goods Act 1930)-এর ৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে–

1. A contract of sale is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price.
2. A contract of sale may be absolute or conditional.
3. Where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called a sale, but where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell.
4. An agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred.

১. বিক্রয় হলো এমন একটি চুক্তি, যেখানে মূল্যের বিনিময়ে বিক্রেতা পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করে অথবা ক্রেতার কাছে সেটির মালিকানা হস্তান্তরিত হওয়ার চুক্তি করে।

২. বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত করা যায় কিংবা শর্তের সঙ্গে সম্পৃক্তও করা যায়।

৩. চুক্তি করার সঙ্গে-সঙ্গে পণ্যটি যদি বিক্রেতার মালিকানা হতে ক্রেতার মালিকানায় চলে যায়, তা হলে সেটিকে চূড়ান্ত বিক্রয় সাব্যস্ত করা হয়। মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি যদি ভবিষ্যতের কোনো তারিখ বা শর্তের ওপর নির্ভরশীল হয়, তা হলে সেটিকে বিক্রয়ের এগ্রিমেন্ট নামে অভিহিত করা হয়।

৪. নির্ধারিত তারিখ আসামাত্র বিক্রয়ের এগ্রিমেন্ট চূড়ান্ত বিক্রয়চুক্তিতে পরিণত হয়ে যায় অথবা চুক্তিতে বর্ণিত শর্তপ্রাপ্তির পর মালিকানা পরিবর্তন হয়ে যায়।

জোসেফ গোট্টি উপর্যুক্ত ধারার ব্যাখ্যায় বলেন–

'চূড়ান্ত বিক্রয় ও এগ্রিমেন্ট টু সেল-এর মধ্যে পার্থক্য করা জরুরি। কারণ, বিক্রয়ের মধ্যে চুক্তি ও মালিকানা রয়েছে। বিক্রয় এগ্রিমেন্টটি শুধু এক পক্ষ
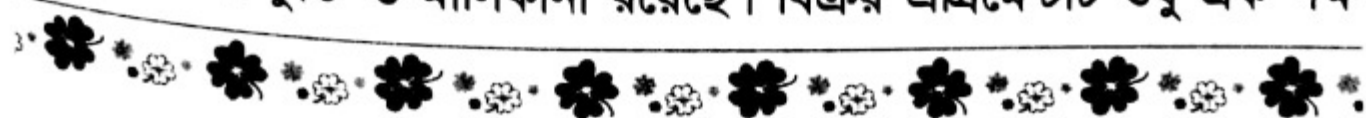
থেকে চুক্তি ছাড়া আর কিছুই না। এখান থেকে বোঝা যায় যে, বিক্রয় এগ্রিমেন্টে কোনো এক পক্ষ যদি ইচ্ছাকৃত চুক্তিভঙ্গ করে, তা হলে অপর পক্ষ ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ (Personal remedy)[২৪০] ছাড়া আর কিছুই দাবি করতে পারবে না। যদি চূড়ান্ত বিক্রয়চুক্তি করে, তা হলে বিচারিক দিক থেকে বিক্রেতার জন্য হুবহু পণ্যের মালিকানা দাবি ও ক্রেতার জন্য মূল্য দাবি করার অধিকার থাকবে। বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে পণ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হলে অথবা লোকসান হলে বিক্রেতার ওপর তার দায়ভার বর্তাবে। তাই এগ্রিমেন্টের পর চূড়ান্ত বিক্রয় হওয়ার আগে পণ্য নষ্ট হলে চুক্তি বাতিল হবে এবং বিক্রেতার ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ আরোপ হবে না। 'ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয় আইন'-এর আট নম্বর ধারায় অনুরূপ বর্ণিত আছে। যদি বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করা হয়, তা হলে সাধারণ আইন অনুযায়ী বর্ণিত ঝুঁকিগুলো ক্রেতার ওপর বর্তায়।'[২৪১]

৩৬. এগ্রিমেন্ট টু সেল-এর শরয়ি বাস্তবায়ন-পদ্ধতি

'পণ্য বিক্রয় আইন'-এর বর্ণিত ধারা ও তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী শরয়ি দিক থেকে এগ্রিমেন্ট টু সেল-এর দুটি সম্ভাবনা হতে পারে:

প্রথম সম্ভাবনা : ভবিষ্যতের কোনো তারিখের সঙ্গে বিক্রয় সম্পন্ন করা। কারণ, নির্দিষ্ট তারিখ বা কাঙ্ক্ষিত শর্ত পাওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্যের মালিকানা পরিবর্তন হবে। নতুন কোনো ইজাব-কবুলের প্রয়োজন হবে না। এ পদ্ধতিটি ভবিষ্যৎ তারিখের সঙ্গে সম্পৃক্ত অথবা শর্তনির্ভর বিক্রয়। এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে যে, ইসলামি শরিয়তে বিক্রয়চুক্তিটি ভবিষ্যতের তারিখ বা শর্তনির্ভর হওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। এ পদ্ধতির বিক্রয় বাতিল বিক্রয় হিসাবে বিবেচিত হবে। আমরা যদি এমন দাবি করি যে, বর্ণিত পদ্ধতির বিক্রয়টি বাতিল হলেও পণ্য দেওয়া-নেওয়ার সময় 'তাআতি'র পদ্ধতিতে বিক্রয় সম্পন্ন হবে, তা হলেও এ পদ্ধতিকে সহিহ বিক্রয়চুক্তি বলা যায় না। কারণ, 'তাআতি'র আলোচনায় আমরা বলেছি যে, 'তাআতি'র

---

২৪০. ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ দাবির উদ্দেশ্য হলো, ওয়াদা ভঙ্গকারীকে ওয়াদা রক্ষায় বাধ্য করা হবে অথবা তার ওয়াদা ভঙ্গের কারণে অপর পক্ষ যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তার জরিমানা দিতে বাধ্য করা হবে। সুতরাং বিক্রয়ের এগ্রিমেন্ট করার মাধ্যমে যে অধিকার প্রমাণিত হয়, সেটি ব্যক্তিগত অধিকার, নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর অধিকার প্রমাণিত হয় না। অর্থাৎ, পণ্য বা মূল্যে কোনো অধিকার সাব্যস্ত করে না। বিস্তারিত জানতে দেখুন: Pollock & Mulla: On Sale of Goods Act, Section 4, P. 85.

২৪১. Chitty on Contracts v. 2 p. 860 para 4407.

পদ্ধতিটি কোনো বাতিল বা ফাসেদ চুক্তির ওপর হলে ওই বাতিল বা ফাসেদ কারণটি পরিহার করা ছাড়া বিক্রয় সহিহ হবে না।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা : এগ্রিমেন্ট টু সেল-এর চুক্তিটি ভবিষ্যৎ বা শর্তনির্ভর কোনো বিক্রয় নয়; বরং ভবিষ্যতে বিক্রয় করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ থেকে কৃত একটি প্রতিশ্রুতি। অন্যভাবে বললে, উভয় পক্ষ থেকে বিক্রয়ের ওয়াদা কারো ওপর ঋণ আরোপ করে না; বরং এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ওপর বিনিময় করাকে আবশ্যক করে নেয়। এরপর পণ্য ও মূল্য দেওয়া-নেওয়ার সময় ইজাব-কবুল বা 'তাআতি'র মাধ্যমে চুক্তি চূড়ান্ত বলে সাব্যস্ত হয়।

উপর্যুক্ত উভয় সম্ভাবনার পক্ষে যথেষ্ট দলিল রয়েছে। নিচের বিষয়গুলো প্রথম সম্ভাবনাকে সমর্থন করেঃ

এক. এগ্রিমেন্ট টু সেল-কে চুক্তি নামে অভিহিত করা হয়, সেটি শুধু এক পক্ষ বা উভয় পক্ষের ওয়াদা নয়।

দুই. পণ্য বিক্রয় আইনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী শর্ত পাওয়া গেলেই মালিকানা পরিবর্তন হয়ে যাবে। সেখানে নতুন কোনো ইজাব-কবুলের প্রয়োজন হবে না।

তিন. বিক্রয়ের এগ্রিমেন্টকে উভয় পক্ষের জন্য আবশ্যক সাব্যস্ত করা হয়। অথচ ওয়াদার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, বিচারিক দিক থেকে সেটি আবশ্যক হয় না।

আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা, যেখানে বলা হয়েছিল, এগ্রিমেন্ট হলো উভয় পক্ষের ওয়াদা। নিচের বিষয়গুলো এ মতকে সমর্থন করে–

এক. মালিকানা পরিবর্তন হওয়া সম্পর্কিত আইনের ৫৪ নম্বর ধারায় (Transfer of Property Act 1882) বলা হয়েছে–

> "A contract for the sale of immovable property is a contract that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties. It does not, of itself, create any interest in or charge on such property."
>
> 'পরিবর্তনশীল নয় এমন মালিকানাভুক্ত জিনিসের ক্ষেত্রে এভাবে চুক্তি করা যে, উভয় পক্ষের চুক্তি অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত শর্ত পাওয়া গেলে বিক্রয় সম্পন্ন হবে, এ পদ্ধতির এগ্রিমেন্ট চুক্তি ও মালিকানাভুক্ত পণ্যের মধ্যে কোনো ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠা বা সেটিকে বন্ধকযোগ্য করে না।'

মালিকানা পরিবর্তনের এ ধারাটি প্রমাণ করে যে, এগ্রিমেন্টকে যদিও চুক্তি বলা হচ্ছে, কিন্তু তার মাধ্যমে পণ্যে কোনো মালিকানা বা বিক্রয়ের কোনো অধিকার সাব্যস্ত করা হয় না। এটি হলো ভবিষ্যতে বিক্রয়চুক্তি করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ থেকে সম্মত হওয়া। আইনে বর্ণিত 'কাঙ্ক্ষিত শর্ত পাওয়া গেলে বিক্রয় সম্পন্ন হবে' বাক্যটি এ মতকে সমর্থন করে।

দুই. বিক্রয়ের এগ্রিমেন্ট সাইন করার পর কোনো এক পক্ষ যদি চুক্তি থেকে সরে যেতে চায়, তা হলে আইন তাকে দুটি সুযোগ দেয়ঃ অপর পক্ষের সঙ্গে প্রকৃত বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে (Specific Performance) অথবা তার ওয়াদা ভঙ্গের কারণে অপর পক্ষ যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ (Damages) দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যায়েদ আমরের সঙ্গে এভাবে এগ্রিমেন্ট করল যে, জানুয়ারি মাসের এক তারিখে নির্দিষ্ট মূল্যে সে আমরকে এক টন গম দেবে এবং ওই তারিখে আমর মূল্য পরিশোধ করবে। নির্দিষ্ট তারিখ আসার পর যায়েদ আমরকে দেওয়ার জন্য এক টন গম জোগাড় করে আমরকে সেটি গ্রহণ করে মূল্য পরিশোধ করতে বলল। কিন্তু আমর গম নিতে ও মূল্য পরিশোধ করতে রাজি হলো না, অথবা আমর যায়েদকে মূল্য পরিশোধ করতে চাইলে যায়েদ গম দিতে রাজি হলো না। কাজির কাছে যদি এটা উত্থাপন করা হয়, তা হলে কাজির জন্য দুটি পদ্ধতির কোনো একটির ওপর সিদ্ধান্ত দেওয়ার সুযোগ থাকবে:

প্রথম পদ্ধতি : এক পক্ষ এগ্রিমেন্ট রক্ষা না-করার কারণে অন্য পক্ষের ক্ষতির বিষয়ে লক্ষ করে কাজি সাহেব ওই পক্ষকে অপর পক্ষের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার রায় দেবেন। 'পণ্য বিক্রয় আইন'-এর ৫৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে—

> Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer, the buyer may sue the seller for damages for non delivery.
>
> 'এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে পণ্য দিতে অস্বীকার করে বা টালবাহানা করে, তা হলে ক্রেতার জন্য অধিকার রয়েছে যে, বিক্রেতা তাকে পণ্য না-দেওয়ার কারণে বিচারের মাধ্যমে সে তার ক্ষতিপূরণ দাবি করবে।'

আইনে বর্ণিত ক্ষতিপূরণ দুইভাবে হয়ে থাকে:

এক. নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ (Liquidated Damages)। এ প্রকার ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্য হলো, পূর্ব থেকে উভয় পক্ষ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ
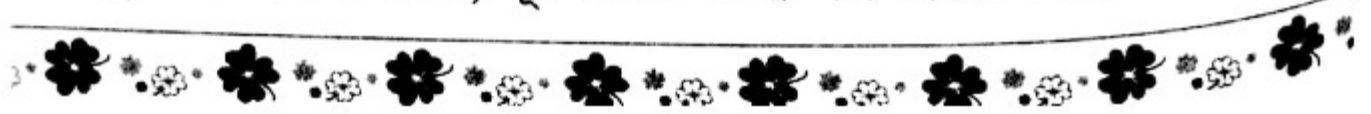
নির্ধারণ করে রাখবে। যেটি এগ্রিমেন্টের কোনো বিষয় ভঙ্গকারী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে দেবে, অথবা আইন ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবে।[২৪২]

দুই. অনির্ধারিত ক্ষতিপূরণ (Unliquidated Damages) বা প্রকৃত ক্ষতিপূরণ (Actual Damages)। এ প্রকার ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্য হলো, এগ্রিমেন্ট ভঙ্গকারী চূড়ান্ত চুক্তি না-করার কারণে অপর পক্ষ বাস্তবিকভাবেই যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া। ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয় আইনে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে চুক্তিকৃত মূল্য এবং পণ্যের বাজার দরের মধ্যে হিসাব করতে হবে। ক্রেতার পক্ষ থেকে যদি এভাবে এগ্রিমেন্ট ভঙ্গ করা হয় যে, নির্ধারিত তারিখে মূল্য পরিশোধ ও পণ্য গ্রহণ করছে না, আর ওই দিনে ওই পণ্যের বাজার দরটি এগ্রিমেন্টে নির্ধারিত বাজার দর অপেক্ষা কম, তা হলে উভয় মূল্যের ব্যবধানই বিক্রেতার প্রকৃত ক্ষতি। তাই ক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রেতাকে ওই ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবে। যদি বিক্রেতার পক্ষ থেকে এভাবে এগ্রিমেন্ট ভঙ্গ করা হয় যে, নির্ধারিত তারিখে বিক্রেতা পণ্য হস্তান্তর করছে না, আর সেদিনে ওই পণ্যের বাজার দর এগ্রিমেন্টে নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশি, তা হলে এক্ষেত্রে উভয় মূল্যের ব্যবধানই হলো ক্রেতার প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ, তাই বিক্রেতাকে বাধ্য করা হবে, যেন সে ক্রেতাকে ওই ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়।[২৪৩]

দ্বিতীয় পদ্ধতি : একপক্ষ এগ্রিমেন্ট রক্ষা না-করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ক্ষতিপূরণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, এগ্রিমেন্ট ভঙ্গকারী ক্রেতা হলে কাজি সাহেব তাকে বিক্রয়চুক্তি করতে এবং মূল্য পরিশোধ করতে নির্দেশ দেবেন, আর বিক্রেতা হলে তাকে পণ্য হস্তান্তরের নির্দেশ দেবেন। এ পদ্ধতিকে 'বাস্তবিক ক্ষতিপূরণ' (Specific Performance)[২৪৪] বলা হয়। এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য 'Specific Relief Act' নামক স্বতন্ত্র একটি আইন রয়েছে। এ আইনের বারো নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, সাধারণত বিচারক এ পদ্ধতিটি তখন গ্রহণ করবেন, যখন ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা অসম্ভব হবে

---

২৪২. chitty: On Contracts, Chapter 26, para 1556.

২৪৩. The English Sale of Goods Act, Sections 50 & 51 as quoted by Pollock & Mulla, Section 56.

২৪৪. এটি ইংরেজি 'specifie performance' পরিভাষার অনুবাদ। অনেক সময় এটিকে চুক্তির চূড়ান্ত বাস্তবায়ন বা ওয়াদা রক্ষা নামে অভিহিত করা হয়।

বা নির্ধারণে সমস্যা সৃষ্টি হবে। এ কারণে পণ্য বিক্রয় আইনের ৫৭ নম্বর ধারার পর, স্বতন্ত্রভাবে ৫৮ নম্বর ধারায় আগের ধারার অনুগামী করে এ ধারাটি উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরও সেটি ওই সময় প্রযোজ্য হবে, যখন কাজি সাহেব সেটিকে ভালো মনে করবেন। 'বাস্তবিক ক্ষতিপূরণ' (Specific Performance)-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইন অভিধানে বলা হয়েছে–

> The actual accomplishment of a contract by a party bound to fufil it. The doctrine of specifie performance is that, where damages would be an inadequate compensation for the breach of an agreement, the contractor or vendor will be compelled to perform specifically what he has agreed to do.[২৪৫]
>
> 'এক পক্ষ অপর পক্ষকে চূড়ান্ত চুক্তি করতে বাধ্য করবে। 'বাস্তবিক ক্ষতিপূরণ' (Specific Performance)-এর উদ্দেশ্য হলো, চূড়ান্ত চুক্তি করতে অস্বীকারকারীর কারণে সাধিত ক্ষতির জন্য যখন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হবে না, তখন বিক্রেতা বা চুক্তিকারী এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী চুক্তি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করবে। যেটি বাস্তবয়নের ব্যাপারে সে পূর্বে রাজি হয়েছিল।'

এখান থেকে অনুমিত হয়, এগ্রিমেন্ট ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে মূল সিদ্ধান্ত হচ্ছে ক্ষতিপূরণ দেওয়া। বিক্রয় সম্পন্ন করার বিষয়টি বিশেষ অবস্থার বিধান।

উপর্যুক্ত বিধি-বিধানের দাবি হলো, এগ্রিমেন্ট টু সেল-এর চুক্তি প্রকৃত বিক্রয়চুক্তি নয়। কেননা, সেটিকে যদি ভবিষ্যৎ বা শর্তনির্ভর বিক্রয় বলে গণ্য করা হয়, তা হলে দেওয়া-নেওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকত না এবং চূড়ান্ত চুক্তির আগে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি উল্লেখ করা হতো না।

তিন.[২৪৬] আইনে 'বাস্তবিক ক্ষতিপূরণ' (Specific Performance)-এর আলোচনায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : মালিকানা পরিবর্তন (Conveyance), চুক্তি বাস্তবায়ন (Performance of the Contract),

---

২৪৫. Black's Law Dictionary, `Performance' p. 1024

২৪৬. এই অনুচ্ছেদটির সম্পর্ক হচ্ছে ওই আলোচনার সঙ্গে, যেখানে বলা হয়েছিল: "এগ্রিমেন্ট হলো উভয় পক্ষের ওয়াদা। নিচের বিষয়গুলো এ মতকে সমর্থন করে–"। তার তিন নম্বর সমর্থক দলিল এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। –সম্পাদক

বিক্রয় সম্পন্ন করা (Completion of the sale)।[২৪৭] (Performance)-এর অনুবাদে আমরা যে 'প্রকৃত' শব্দটি ব্যবহার করেছি, সেটির ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ আইন অভিধান বলেছে–

> The fulfillment or accomplishment of a promise, contract, or other obligation according to its terms.
>
> 'অর্থাৎ, শর্ত অনুযায়ী ওয়াদা রক্ষা, চুক্তি সম্পন্ন করা বা অন্য কোনো দায়িত্ব পালন ও বাস্তবায়ন করা।'[২৪৮]

এ উদ্ধৃতিটি প্রমাণ করে যে, এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয় না; বরং সেটি হলো উভয় পক্ষ থেকে বিক্রয় করার সম্মতিচুক্তি। পণ্য বিক্রয়ের ৪-৪ নম্বর ধারায় যে কথা বলা হয়েছে যে, 'বিক্রয়ের এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে।' এ কথার উদ্দেশ্য হলো, শর্ত অনুযায়ী দেওয়া-নেওয়া হলে নতুন কোনো ইজাব-কবুলের প্রয়োজন হবে না; বরং দেওয়া-নেওয়া বা ফিকহি পরিভাষা অনুযায়ী 'তাআতি'র পদ্ধতিতে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। যদি দেওয়া-নেওয়া সম্পন্ন না-হয়, তা হলে বিক্রয়ের এগ্রিমেন্টটি সংঘটিত বিক্রয়চুক্তি বলে বিবেচিত হবে না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বিক্রয়ের এগ্রিমেন্ট ভবিষ্যতে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করার ব্যাপারে উভয় পক্ষের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই না। এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে 'চুক্তি' শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে চূড়ান্ত চুক্তি বোঝানো হয় না। কারণ, এখানে 'চুক্তি' বলতে উভয় পক্ষের আবশ্যকীয় ওয়াদা বোঝানো হয়েছে। অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় পক্ষের ওয়াদাকে যখন এমন আবশ্যকীয় করে দেওয়া হয় যে, ওয়াদা ভঙ্গকারীকে বিচারিক দিক থেকে চূড়ান্ত চুক্তি বা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবে, তখন তো সেটি শর্ত-নির্ভর বিক্রয়ে পরিণত হয়। এর উত্তর হলো, বিষয়টি আসলে এরকম নয়। কারণ, সেটি যদি শর্তনির্ভর বিক্রয়চুক্তি হতো, তা হলে ওই শর্তপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই চুক্তি সম্পন্ন হয়ে পণ্যটি ক্রেতার মালিকানায় চলে যেত। এমন ক্ষেত্রে বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতাকে পণ্য হস্তান্তর করা ছাড়া আর কোনো সুযোগ থাকত না। অথচ প্রচলিত আইনে বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে বিক্রেতা বিক্রয়চুক্তি বাস্তবায়ন না করলে ফয়সালা হলো, ক্ষতিপূরণ দেওয়া–

---

২৪৭. Specific Relief Act ১৮৭৭-এর ১২ নম্বর ধারাসমূহ দ্র.।

২৪৮. Black's Law Dictionary, `Performance' p. 1024

(পাকিস্তান ও ভারতের) পণ্য বিক্রয় সম্পর্কিত আইনের দুটি ধারায় এমন বিষয় রয়েছে, যার মূলভিত্তি হলো ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয় আইন। বিশেষভাবে সে ধারা দুটিতে শর্তযুক্ত বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ধারাটি হলো– ২, ৪

"A contract of sale may be absolute or conditional."

অর্থাৎ, 'বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত বা শর্তযুক্ত হতে পারে।'

দ্বিতীয় ধারাঃ তা হলো ২,৬ নম্বর ধারা এবং সেখানে বলা হয়েছে–

"There may be a contract for the sale of goods the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen."

অর্থাৎ, 'পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতার পক্ষ থেকে এমন অস্পষ্ট শর্তে কোনো চুক্তি হতে পারে, যেটি পাওয়া বা না-পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'[২৪৯]

এ আইনের ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, এ ধারাকে সে সময় চূড়ান্ত চুক্তি হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে, যখন উভয় পক্ষ এ ব্যাপারে সম্মত হবে যে, শর্ত পাওয়া যাওয়া ও না-যাওয়া উভয়ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করবে। এমন ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আইনের ভিত্তিতে গৃহীত বিচারিক সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ–

"The contrary view is, however, preferable in view of the plain language of section 4 (2) and 6 (2) of the Act, and the buyer may have to pay in any event, for 'a man may buy the chance of obtaining goods' and 'if a man should be foolish enough to make a purchase of a chance, he must perhaps abide by the consequence of his rashness."[২৫০]

'আইনের ২. ৪ ও ২. ৬ নম্বর ধারায় উল্লেখকৃত পদ্ধতি অপেক্ষা অন্য একটি পদ্ধতি বেশি ভালো মনে হয়। সেটি হলো, যে কোনো অবস্থায় ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা হবে। কারণ, এমনটি হতে পারে যে, কেউ নিজে পণ্য জোগাড় করার জন্য শুধু সময়টি

---

২৪৯. Sale of Goods Act 1930 Section 6 (2)
২৫০. Pollock & Mulla, Eighth edition p. 98.

কিনে নিল। যদি চূড়ান্ত পর্যায়ের কোনো নির্বোধ লোক শুধু সময় ক্রয় করে, তা হলে তার হাস্যকর পরিণতি ভোগ করানোর লক্ষ্যে তাকে চুক্তি বাস্তবায়নে বাধ্য করা হবে।'

আমাদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, এ আইন অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিক্রয়ের এগ্রিমেন্টটি যদিও শর্ত-নির্ভর বিক্রয় নয়, তবে সেটিকে শর্ত-নির্ভর বিক্রয়ে পরিণত করার সুযোগ রয়েছে। তা এভাবে যে, সর্বাবস্থায় ক্রেতা কর্তৃক মূল্য পরিশোধকে বাধ্যতামূলক করা হবে। এ পদ্ধতিতে শর্ত পাওয়ামাত্র পণ্যটি ক্রেতার মালিকানায় চলে যাবে। একইভাবে শুধু এগ্রিমেন্ট করার মাধ্যমে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা যায়, যদিও তাদের সম্মতিতে নির্ধারিত শর্ত না-পাওয়া গেলে বিক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্যটি হস্তান্তর করা হবে না।

অনুরূপভাবে বিক্রয়ের এগ্রিমেন্টটি ভবিষ্যতে বিক্রয়চুক্তি করার ওয়াদা হতে পারে। যেমনটি ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি।

একপক্ষ ও উভয় পক্ষ থেকে ওয়াদার আলোচনায় আমরা যে শরয়ি হুকুম উল্লেখ করেছি, তার আলোকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিক্রয়ের এগ্রিমেন্টকে চূড়ান্ত চুক্তি বলে স্বীকার করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্ন রয়েছে। যেমন :

এক. আইন অনুযায়ী বিক্রয়কে শর্ত-নির্ভর করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইনের যে ব্যাখ্যা আলোচনা করেছি, সে অনুযায়ী শুধু শর্ত পাওয়া গেলে পণ্যটি ক্রেতার মালিকানায় চলে যাবে। অনুরূপভাবে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা যাবে, যদিও শর্ত না-পাওয়া গেলে পণ্য হস্তান্তর করা হবে না। শরয়ি দিক থেকে এই পদ্ধতি নিষিদ্ধ। কারণ, উভয় পক্ষ থেকে বিক্রয়কে শর্তের ওপর নির্ভরশীল এবং বিক্রয়কে শর্তনির্ভর রাখা জায়েয নেই। কেননা, শরিয়ত উভয় পক্ষের অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখে। কেউ যদি একেবারে নির্বোধ হয়ে শুধু সময় ক্রয় করে, তা হলে সেটি জুয়ায় পরিণত হবে, বিক্রয়ের আওতাভুক্ত থাকবে না।

দুই. বিক্রয়ের এগ্রিমেন্টটি যদি ভবিষ্যৎ তারিখে বা নির্দিষ্ট শর্ত পাওয়ার পর চূড়ান্ত চুক্তি করার ব্যাপারে ওয়াদা হিসাবে থাকে, তা হলে এ ওয়াদাটি উভয় পক্ষের জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বিচারিক দিক থেকে ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক নয়। তবে প্রকৃত ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে সেটিকে আবশ্যক করা জায়েয আছে। সুতরাং আমাদের আলোচিত বিষয়ে যদি এমন বাস্তবিক প্রয়োজন পাওয়া যায়, তা হলে এখানেও সেটি আবশ্যক করে দেওয়া জায়েয হবে।
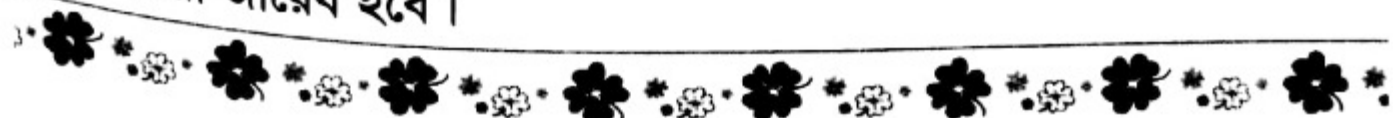
তিন. আইন অনুযায়ী ওই তারিখে বা চুক্তিকৃত শর্ত পাওয়া গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার জন্য ইজাব-কবুলের প্রয়োজন হবে না। শরয়ি দিক থেকে এ পদ্ধতিটি না-জায়েয। এক্ষেত্রে সরাসরি ইজাব-কবুল বা তার স্থলাভিষিক্ত 'তাআতি'র পদ্ধতি হতে হবে।

চার. কোনো একপক্ষ যদি এগ্রিমেন্ট ভঙ্গ করে, তা হলে আইন চুক্তিভঙ্গকারীর ওপর ক্ষতিগ্রস্তের জন্য ক্ষতিপূরণ আরোপ করবে। এ ক্ষতিপূরণটি যদি নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ (Liquidated Damages) হয়–যার অর্থ হলো, এগ্রিমেন্ট চূড়ান্ত করার সময় উভয় পক্ষ ক্ষতিপূরণের যে পরিমাণ নির্ধারণ করে রাখে–তা হলে শরয়ি দিক থেকে এমন ক্ষতিপূরণ আরোপ করা জায়েয নেই। কারণ, এগ্রিমেন্ট চূড়ান্ত করার সময় কেউ জানে না যে, এক পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে অপর পক্ষ বাস্তবে কী পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আর যদি অনির্ধারিত ক্ষতিপূরণ (Unliquidated Damages) বা প্রকৃত ক্ষতিপূরণ (Actual Damages) হয়, এ অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন এগ্রিমেন্টের মূল্য ও বাজার দরের মধ্যে হিসাব করে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করে। তাতে অপর পক্ষ সে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হোক বা না হোক। উদাহরণস্বরূপ, এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে যায়েদ যদি এক হাজার ডলারের বিনিময়ে আমরের কাছে এক টন গম বিক্রয়ের চুক্তি করে এবং ক্রেতা আমর নির্দিষ্ট তারিখে মূল্য পরিশোধ করে সেটি গ্রহণের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত করতে অস্বীকার করে, আর সেদিন ওই গমের বাজার দর নয়শত ডলার থাকে, তা হলে এ ক্ষেত্রে আইন আমরের ওপর একশত ডলারকে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ হিসাবে জরিমানা আরোপ করবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই জরিমানা আরোপ করে যে, যায়েদ যদি তার পণ্য নয়শত ডলারে বাজারে বিক্রয় করে, তা হলে একশত ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তবে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, বাস্তবে যায়েদ কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। সেটি এভাবে যে, যায়েদ আটশত ডলারে পণ্যগুলো ক্রয় করেছে, ফলে এখন নয়শত ডলারে বিক্রয় করে একশত ডলার লাভ করেছে, অথবা এমন কোনো ক্রেতা পেয়ে গেছে, যে এক হাজার ডলারে সেটি ক্রয় করবে, অথবা নির্ধারিত তারিখের পর পণ্যের মূল্য বেড়ে এক হাজারের বেশি হয়েছে। বর্তমান সময়ের উলামায়ে কেরাম প্রয়োজনে ওয়াদা আবশ্যক করার পক্ষে যে মত দিয়েছেন, সেটি হলো : ওয়াদা রক্ষা না-করার কারণে বাস্তবিক অর্থে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে বাধ্য হয়ে যদি সে কম মূল্যে বিক্রয় করে। অর্থাৎ, সে বাজারে পণ্য নেওয়ার পর সেটিকে কম মূল্যে বিক্রয় করতে
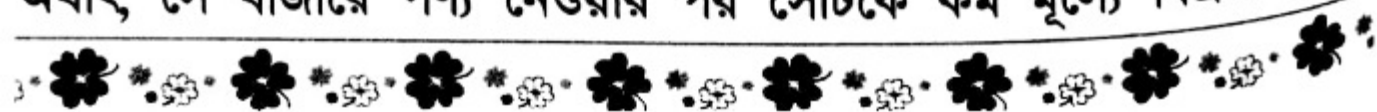
হলো। যার উদাহরণ হলো, নয়শত ডলারে ক্রয় করার পর আটশত ডলারের চেয়ে বেশি মূল্যে ক্রয়ের জন্য সে কোনো ক্রেতা পেল না, ফলে সে একশত ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হলো।

এ কারণে তারা বলেছেন, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় সুযোগ হারানোর (Opportunity Cost) বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হলো, চুক্তি ভঙ্গকারী লাভ অর্জনের সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে। তাই তার ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে অপর পক্ষের সম্ভাব্য লাভ নষ্ট করায় তাকে সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 'সুযোগ হারানো' গ্রহণযোগ্য না-হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, যদি অপর পক্ষ স্বাভাবিকভাবে বাজারে তার পণ্য বিক্রয় করতে পারে, তা হলে ওয়াদা ভঙ্গকারীর কাছে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করা জায়েয নেই। সুতরাং প্রচলিত আইন অনুযায়ী যদি বিক্রয়ের এগ্রিমেন্টকে গ্রহণ করা হয়, তা হলে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা একান্ত জরুরি। যার মোদ্দাকথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে–

১. বিক্রয়ের এগ্রিমেন্টকে তৎক্ষণাৎ মালিকানা পরিবর্তন হিসাবে সাব্যস্ত করা জায়েয আছে।

২. ভবিষ্যতের কোনো তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় সম্পন্ন করার জন্য এগ্রিমেন্টকে উভয় পক্ষের ওয়াদা সাব্যস্ত করা জায়েয আছে।

৩. যদি উভয় পক্ষের ওয়াদা সাব্যস্ত করা হয়, তা হলে ভবিষ্যতে নতুন ইজাব-কবুল বা তার স্থলাভিষিক্ত 'তাআতি'র মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন করতে হবে। নির্ধারিত তারিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রয় সংঘটিত হবে না।

৪. ওয়াদা ভঙ্গকারীর উপর শুধু সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আরোপ করা জায়েয, তার ওয়াদা ভঙ্গের কারণে অপর পক্ষ বাস্তবিক অর্থে যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিক্রেতা তার খরচের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হলো।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই সর্বজ্ঞ।

৩৭. 'আরাবুন' পদ্ধতির বিক্রয়ের বিধান

আল্লামা ইবনে মানযুর (রহ.) 'আরাবুন ও উরবান' পদ্ধতির বিক্রয়ের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'আরাবুন হলো, বিক্রেতা থেকে কোনো পণ্য ক্রয় করে এ শর্তে তাকে কোনো জিনিস দেওয়া যে, বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত হলে সেটিকে মূল্য হিসাবে গ্রহণ করবে। আর যদি বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত না-হয়, তা হলেও ওই

জিনিসটি বিক্রেতার কাছে থেকে যাবে, ক্রেতা সেটি ফেরত নেবে না।'[২৫১] এ পদ্ধতির বিক্রয় বোঝানোর জন্য বর্ণিত শব্দটি একটি ক্রিয়ামূল (مصدر)। অনেক সময় বিক্রেতাকে প্রদত্ত বস্তুটিকেই 'আরাবুন' নামে অভিহিত করা হয়; যেমনিভাবে আরবি ভাষায় مصدر বলে مفعول به বোঝানো হয়ে থাকে। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন, 'বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আরাবুন বলা হয়, কোনো পণ্য ক্রয় করে এ শর্তে বিক্রেতাকে দিরহাম বা অন্য কিছু দেওয়া যে, ক্রেতা পণ্য নিলে প্রদত্ত অর্থ তার মূল্য হিসাবে বিবেচিত হবে। আর যদি পণ্য না-নেয়, তা হলেও বিক্রেতা সেটি পেয়ে যাবে।'[২৫২]

'আরাবুন' পদ্ধতির বিক্রয়ের সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হলো যে, এটি এমন একটি বিক্রয়, যেখানে ক্রেতার জন্য চুক্তি করা বা না-করার খিয়ার থাকে। বিক্রয় চূড়ান্ত করলে আগে দেওয়া অর্থকে পণ্যের মূল্য সাব্যস্ত করা হবে। আর যদি বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত না করে, তা হলে বিক্রেতা ওই প্রদেয় অর্থের মালিক হবে। সুতরাং এটি ক্রেতার জন্য এমন একটি শর্ত-নির্ভর অধিকার, বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত না-করার ক্ষেত্রে যার বিনিময়ে অর্থ দিতে হয়। পক্ষান্তরে বিক্রেতার জন্য কোনো ধরনের খিয়ার থাকে না। যারা এ পদ্ধতির বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন, তারা উল্লিখিত খিয়ারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করেননি। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে, খিয়ারের মেয়াদের বিষয়টি ক্রেতা-বিক্রেতার আওতাধীন।

'আরাবুন' বিক্রয় জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম মতানৈক্য করেছেন। হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এবং হাম্বলি মাযহাবের আবুল খাত্তাব (রহ.) বলেছেন, এ পদ্ধতির বিক্রয় জায়েয নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও হাসান বসরি (রহ.) থেকে এ পদ্ধতির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।[২৫৩] ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, এ পদ্ধতির বিক্রয় জায়েয। হযরত উমর (রাযি.), ইবনে উমর (রাযি.) ও তাবেয়িদের মধ্য থেকে মুজাহিদ, ইবনে সিরিন, নাফে বিন আবদুল হারেস ও যায়েদ বিন আসলাম (রহ.)সহ অনেক তাবেয়ি থেকে জায়েযের মত বর্ণিত হয়েছে।

---

২৫১. লিসানুল আরব : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৯২।

২৫২. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৯।

২৫৩. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৯। হাশিয়াতুদ দুসুকি : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৩। মালেকি মাযহাবের 'যুরকানি আলা মুখতাসারিল খলিল' : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৩। শাফেয়ি মাযহাবের 'আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব' : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৬৮।

না-জায়েযের পক্ষের উলামায়ে কেরাম ইমাম মালেক (রহ.) কর্তৃক 'মুয়াত্তা'য় বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেন। হাদিসটি এরূপ–

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

'হযরত আমর বিন শোআইব তার পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উরবান বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।'[২৫৪]

তা ছাড়া এটি এমন একটি বিক্রয়, যার মধ্যে ধোঁকা রয়েছে। কারণ, বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত সাব্যস্ত না করলে ক্রেতা কোনো বিনিময় ছাড়া তার অর্থ বিনিয়োগ করছে।

'আরাবুন' বিক্রয় জায়েয হওয়ার পক্ষের উলামায়ে কেরাম মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক-এ হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে দলিল দিয়ে থাকেন। হাদিসটি নিচে উল্লেখ করা হলো–

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ.

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উরবান বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি সেটিকে জায়েয বলেন।'[২৫৫]

ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন, 'ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) হযরত নাফে বিন আবদুল হারেস (রহ.) থেকে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে আরাবুন জায়েযের পক্ষে দলিল দেন। কারাগার নির্মাণের জন্য সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ থেকে হযরত নাফে (রহ.) হযরত উমর (রাযি.)-এর পক্ষে এ শর্তে একটি বাড়ি ক্রয় করেন যে, উমর (রাযি.) রাজি হলে বিক্রয় চূড়ান্ত হবে, অন্যথায় তাঁকে এ পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে।' ইমাম আসরাম[২৫৬]

---

২৫৪. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, অধ্যায়: বিক্রয়। সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: আরাবুন, হাদিস নং ৩৩৫৯। মাআলিমুস সুনানের সঙ্গে আল্লামা মুনজিরি (রহ.)-এর তালখিস : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪২। সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: ব্যবসা, হাদিস নং ২১৯২। সুনানে বাইহাকি : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৪২।

২৫৫. ইলাউস সুনান : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৭৪।

২৫৬. ইমাম আসরাম : আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানি আবু বকর আল-ইসকাফি আল-আসরাম (রহ.)। আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের রাজ্যে তাঁর জন্ম। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর খাস শাগরিদ ছিলেন। হাম্বলি মাযহাবকে সুবিন্যস্ত করার পেছনে তাঁর
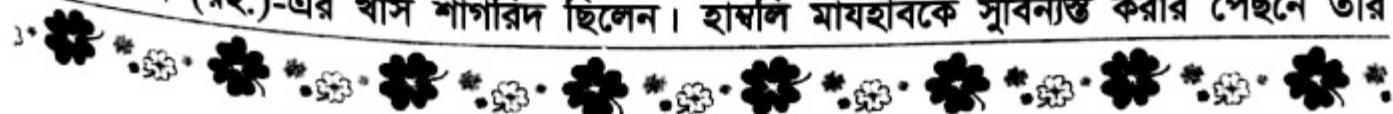
(রহ.) বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এটি সমর্থন করেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি আর কী বলবো? এটি তো উমর (রাযি.)-এর আমল।' ইমাম আহমাদ (রহ.) বর্ণিত হাদিসকে যয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। (অর্থাৎ, আরাবুন নিষিদ্ধের হাদিসকে দুর্বল বলে মত প্রকাশ করেছেন) ইমাম আসরাম (রহ.) নিজ সনদেও এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।[২৫৭]

আরাবুন নিষিদ্ধের হাদিসকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) দুর্বল সাব্যস্ত করার কারণ, ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর উস্তাদের নাম উল্লেখ করেননি এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে কে, তা নির্ধারণে বিভিন্ন বর্ণনায় ভিন্নতা এসেছে। ইমাম বাইহাকি (রহ.)-এর বর্ণিত সনদটি হলো–

حبيب بن أبي حبيب عن مالك قال: حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب.[২৫৮]

এ সনদের সারকথা হলো, ইমাম মালেক (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আমের আসলামি (রহ.) থেকে শ্রবণ করেছেন। অথচ অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে আবদুল্লাহ বিন আমের (রহ.) একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।[২৫৯] ইমাম ইবনে মাজাহ ইমাম মালেক (রহ.)-কে বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদটি নিচে দেওয়া হলো–

حبيب بن أبي حبيب عبد الله بن عامر الأسلمي.

ইমাম ইবনে আবদুল বার[২৬০] (রহ.)-এর 'আল-ইস্তিয্কার' নামক কিতাবের

বিরাট অবদান রয়েছে। আবু নুআইম, আফফান, আবুল ওয়ালিদ তায়ালিসি, মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ, ইবনে আবি শাইবা (রহ.) প্রমুখ তাঁর উস্তাদ ছিলেন। তাঁর ছাত্রগণ: ইমাম নাসায়ি, মুসা ইবনে হারুন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়েদ (রহ.) প্রমুখ। তিনি ছিলেন সেকালের অন্যতম হাফিযুল হাদিস। অস্বাভাবিক ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। এমনকি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়িন বলতেন, 'মনে হয় তাঁর বাবা-মায়ের কেউ জিন ছিল!' বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। যেমন, ইলালুল হাদিস, আস-সুনান, নাসিখুল হাদিস ওয়া মানসুখুহু প্রভৃতি। ইরাকের ইসকাফ শহরে ২৬১ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১২/৬২৩; আল-আ'লাম : ১/২০৫) –সম্পাদক

২৫৭. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৯।

২৫৮. সুনানে বাইহাকি : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৪২।

২৫৯. তাহযিবুত তাহযিব : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭৫-২৭৬।

২৬০. **ইমাম ইবনে আবদুল বার :** ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বার আন-নামারি আল-কুরতুবি। জন্ম: ৩৬৮ হিজরি, মুসলিম স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে। পিতা

বক্তব্য অনুযায়ী এ সনদের হাবিব নামক বর্ণনাকারী অগ্রহণযোগ্য এবং মুহাদ্দিসগণ তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন। তিনি এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, বর্ণিত হাদিসে ইমাম মালেক (রহ.)-এর শাইখ হলেন আবদুল্লাহ বিন লাহিয়াহ, আর তার দুর্বলতার বিষয়টি মশহুর।[২৬১]

'আরাবুন' জায়েয হওয়ার পক্ষে বর্ণিত হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রহ.)-এর হাদিসটিও দুর্বল। কারণ, তার মূলভিত্তি (مدار) হলো ইবরাহিম বিন আবু ইয়াহইয়া (রহ.)। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের কাছে তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। তবে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং তাঁর থেকে প্রচুর হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৬২]

হযরত নাফে বিন আবদুল হারেস (রহ.)-এর বর্ণনাটিকে ইমাম বুখারি (রহ.) 'মুআল্লাক'[২৬৩] হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন–

وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ، مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ.

ছিলেন কর্ডোভার প্রসিদ্ধ ফকিহ ও মুহাদ্দিস। তাঁর উস্তাদগণ: ইসহাক ইবনে ইবরাহিম আত-তুজাইবি, ইসমাইল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফফার, হাফিযুল হাদিস খালাফ ইবনুল কাসেম, আবু উমার আল-বাযি প্রমুখ খ্যাতনামা আলেমের শিষ্যত্ব লাভ করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবনে হাযম আয-যাহেরি, আবু মুহাম্মাদ ইবনে আবি কুহাফা, মুহাম্মাদ ইবনে ফাতুহ আল-আনসারি, হাফিযুল হাদিস আবু আবদুল্লাহ আল-হুমাইদি (রহ.) প্রমুখ। ইমাম যাহাবি বলেন: "তিনি ছিলেন ইমাম, শাইখুল ইসলাম, নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী, সমুদ্রসম ইলমের অধিকারী, সুন্নাতে নববির খাঁটি অনুসারী। প্রথমদিকে তিনি হাদিস অনুসরণের ক্ষেত্রে যাহেরি ছিলেন। পরে মালেকি মাযহাব গ্রহণ করেন। যদিও মাসায়েলের ক্ষেত্রে ফিকহে শাফেয়ির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। কিন্তু তাঁর জন্যে একাধিক মাযহাব অনুসরণ নিন্দনীয় ছিল না। কারণ, তিনি নিজেই মুজতাহিদ পর্যায়ের আলেম ছিলেন। তাঁর রচনাবলিই এর স্পষ্ট প্রমাণ।" বহু অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। যেমন, আত-তামহিদ, আল-ইস্তিয্কার, আল-ইস্তিআব, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, আল-কাফি ফি মাযহাবি মালেক, আল-ইনতিকা লি মাযাহিবিস সালাসাহ আল-উলামা প্রভৃতি। তিনি পঁচানব্বই বছর বয়সে ৪৬৩ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ১৮/১৫৩-১৫৯) –সম্পাদক

২৬১. আওজাযুল মাসালেক : খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৫।

২৬২. তাহযিবুত তাহযিব : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬১। মিযানুল এতেদাল : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৮।

২৬৩. মুআল্লাক : সনদবিহীনভাবে। –সম্পাদক

'মক্কার কারাগারের জন্য হযরত নাফে বিন আবদুল হারেস (রাযি.) সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ থেকে এ শর্তে একটি বাড়ি ক্রয় করেন যে, হযরত উমর (রাযি.) রাজি হলে বিক্রয়টি চূড়ান্ত হবে। হযরত উমর (রাযি.) যদি রাজি না হন, তা হলে সাফওয়ান চারশত দিনার পাবে।'[২৬৪]

তবে ইমাম আবদুর রাযযাক (রহ.) হাদিসটিকে সুফিয়ান সাওরি (রহ.) থেকে মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসটি এরূপ–

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا لِسِّجْنِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، فَإِنْ عُمَرُ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْعِ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ.

ইমাম আবদুর রাযযাক (রহ.) ইবনে জুরাইজ (রহ.)-এর সনদেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে মূল্যের পরিমাণ বলা হয়েছে তিন হাজার দিনার।[২৬৫] ইমাম বাইহাকি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসটি এরূপ–

اشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ صفوانَ بنِ أُمَيَّةَ بِأربعِمائَةِ دارا لسِجْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنْ رَضِيَهَا، وَإِنْ كَرِهَهَا أَعْطَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَرْبَعَ مِائَةٍ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَهُوَ سِجْنُ النَّاسِ الْيَوْمَ بِمَكَّةَ.[২৬৬]

যেসব ফকিহ আরাবুনকে না-জায়েয বলেছেন তারা বিভিন্নভাবে এ বর্ণনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইবনুল মুনাইয়ির (রহ.) বলেছেন–

'হযরত নাফে (রহ.) সাফওয়ান-কে যে চার হাজার দিনার দেওয়ার শর্ত করেছিলেন, সেটি মূল্য ছিল, উরবান ছিল না।

---

২৬৪. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: ঋণ নেওয়া, পরিচ্ছেদ: হারাম শরিফে বাঁধা ও বন্দি করা।

২৬৫. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, অধ্যায়: হজ, পরিচ্ছেদ: হারাম শরিফের মধ্যে ভাড়া দেওয়া : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪৮, হাদিস নং ৯২১৩।

২৬৬. সুনানে বাইহাকি, অধ্যায় : বিক্রয়, পরিচ্ছেদ : মক্কার বাড়ি বিক্রয় করা সম্পর্কে : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪।

এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা। যদিও অন্যের জন্য ক্রয়ের কথা বলা হোক। কারণ, সে নিজেই ক্রয় করছে। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হলো, হযরত নাফে (রহ.) হযরত উমর (রাযি.)-এর জন্য ক্রয় করেছেন। এখন উমর (রাযি.) সে ক্রয়ের প্রতি সন্তুষ্টি থাকলে তাঁর পক্ষ থেকে ক্রয় সম্পন্ন হবে, অন্যথায় নাফে নিজের জন্যই ক্রয় করে নেবে।'

ইমাম বুখারি (রহ.)-এর মুআল্লাক' রেওয়ায়াতের ওপর নির্ভর করে উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। কারণ, সেখানে আসল মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ না-করে বলা হয়েছে, সাফওয়ান চারশত দিনার পাবেন। তা ছাড়া ইতঃপূর্বে ইমাম বাইহাকি (রহ.)-এর বর্ণনার ওপরও এ উত্তরটির ভিত্তি। কেননা, উভয় জায়গায় চারশত দিনারের কথা বলা হয়েছে।

আর ইমাম ইবনে হাযম (রহ.)-এর যে বর্ণনাটি রয়েছে, তা হলো—

اشْتَرَى دَارًا لِسجْن مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةٍ.

'কারাগারের জন্য তিনি সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ থেকে চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে এ শর্তে একটি বাড়ি ক্রয় করেন যে, উমর (রাযি.) যদি সেটি নিতে রাজি না-হয়, তা হলে সাফওয়ান চারশত দিনার পাবে।'[২৬৭]

'আরাবুন' না-জায়েযের পক্ষের ফকিহগণ এ বর্ণনার ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আসল মূল্য ছিল চার হাজার দিরহাম। এ চার হাজার দিরহাম সেই চারশত দিনারের সমমূল্যের, যেটিকে নাফে শর্ত করেছিলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) উল্লিখিত ঘটনার উত্তরে বলেন, হযরত উমর (রাযি.) থেকে কবুল করা না-করার ব্যাপারে কোনো উত্তর আসার আগ পর্যন্ত নাফে (রহ.)-এর জন্য বাড়িটি ব্যবহারের ভাড়া ছিল চারশত দিনার। তবে তার এ উত্তরটি দুর্বল। কারণ, উমর (রাযি.) থেকে উত্তর আসার স্বল্প সময়ের জন্য চারশত দিনার ভাড়া হওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক।

সঠিক কথা হলো, নাফে বিন আবদুল হারেস-এর ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে মূল্য ও

---

২৬৭. আল-মুহাল্লা, ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৭১।
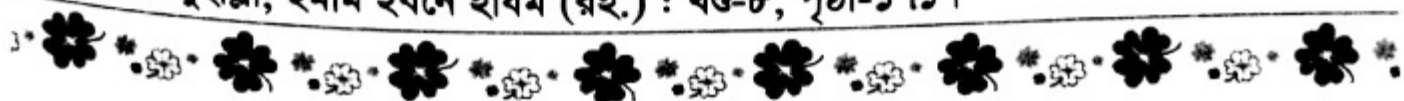
সাফওয়ানের জন্য নির্ধারিত অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে বর্ণনাকারীদের মতে প্রচণ্ড মতানৈক্য রয়েছে। উপর্যুক্ত বর্ণনাতে সে বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট। অনুরূপভাবে তার সম্ভাবনার মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। তাই এখান থেকে বোঝা যায়, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর কাছে এমনভাবে ঘটনাটি পৌঁছেছিল, যেখানে চারশত দিনারকে উরবান সাব্যস্ত করা ছাড়া আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না, অথবা তিনি অন্যান্য বর্ণনার উপর সে বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি বলেছিলেন, এটি হলো উমর (রাযি.)-এর আমল, সুতরাং এখানে আমি কি বলতে পারি?

সারকথা, এটি ইজদেহাদি মাসআলা। অধিকাংশ ফকিহ যেহেতু এটি নিষিদ্ধের পক্ষে এবং নাফে (রহ.)-এর ঘটনাতে বিভিন্ন সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এটি না-জায়েযের সিদ্ধান্ত দেওয়াই সতর্ক অবস্থান হবে। কিন্তু কোনো ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য থাকা, প্রয়োজনের সময় এমন বিষয় গ্রহণকে শিথিল করে দেয়। বিশেষ করে দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে সে ব্যাপারে কোনো আইন প্রণয়ন করা হলে সেটি গ্রহণ করার সুযোগ তৈরি হয়। কারণ, বিচারকের রায় যে কোনো মতানৈক্য দূর করে দেয়। والله تعالى أعلم
ব্রুনাইয়ের দারুস সালামে অনুষ্ঠিত ইসলামি ফিকহ বোর্ডের অষ্টম সম্মেলনে ৮১/৩/৭৬ নম্বর সিদ্ধান্তে ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মত গ্রহণ করা হয়েছে। সে সিদ্ধান্তটি তুলে ধরা হলো−

١. المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.

٢. ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة.

٣. يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.

১. আরাবুন বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো, ক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রেতাকে এ শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ার পর পণ্য ক্রয় করা যে, ক্রেতা পণ্য নিলে প্রদত্ত অর্থকে মূল্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে। তবে যদি পণ্য না-নেয়, তা হলে বিক্রেতাই প্রদত্ত অর্থ পেয়ে যাবে।
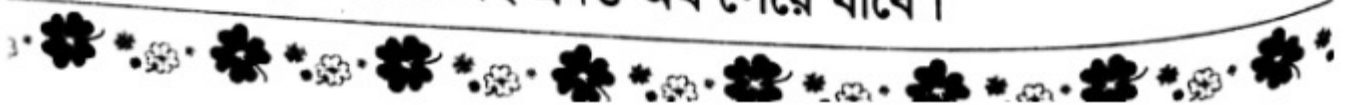
২. ভাড়ার বিষয়টিও বিক্রয়ের মতো। কারণ, সেখানে 'উপকারিতা' বিক্রয় করা হয়। এ ধরনের বিক্রয় থেকে সেসব বিক্রয় আলাদা, যেগুলোর ক্ষেত্রে চুক্তির মজলিসে কোনো একটি বা উভয় বিনিময় হস্তগত করা শর্ত। যেমন, বাইয়ে সালাম ও সুদি মাল[২৬৮] এবং বাইয়ে সরফ। উভয় পক্ষ থেকে ওয়াদার ভিত্তিতে 'মুরাবাহা লিল আমের বিশ-শিরা'[২৬৯]-এর ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না, তবে ওয়াদা অনুযায়ী পরবর্তীতে বিক্রয় সম্পন্ন করার সময় এ হুকুমটি প্রযোজ্য হবে।

৩. অপেক্ষার সময়কে যদি নির্দিষ্ট করা হয়, তা হলে সেখানে আরাবুন জায়েয আছে। ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর আরাবুন হিসাবে প্রদত্ত অর্থকে মূল্য হিসাবে গণ্য করতে হবে। ক্রেতা যদি ক্রয় করা থেকে সরে দাঁড়ায়, তা হলে বিক্রেতা আরাবুনের অর্থ পেয়ে যাবে।[২৭০]

হানাফি, শাফেয়ি ও মালেকি মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ, যারা আরাবুনকে জায়েয বলেন না, তাঁদের মতানুযায়ী ক্রেতার খিয়ার থাকলেও আরাবুন হিসাবে প্রদত্ত অর্থটি সর্বাবস্থায় মূল্যের অংশ হবে। সুতরাং ক্রেতা যদি চুক্তিকে চূড়ান্ত করে, তা হলে তার পক্ষ থেকে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তবে যদি তার এখতিয়ারের সময়ের মধ্যে চুক্তি বাতিল করে, তা হলে বিক্রেতা আরাবুনের অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

৩৮. বায়নাকৃত অর্থ বা Earnest Money

আরাবুন ও সমকালীন বায়না করার পদ্ধতি, যাকে আরবিতে বলে هامش الجدية। এর মধ্যে পার্থক্য করা জরুরি। কারণ, চূড়ান্ত বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই আরাবুনের হুকুম প্রযোজ্য। সুতরাং আরাবুনের পদ্ধতিতে বিক্রয়টি পরিপূর্ণ,

---

২৬৮. সুদি মাল : অর্থাৎ, যেসব সম্পদে সুদ হতে পারে। যেমন: গম, চাল, যব, লবণ, ঘি, দিনার, দিরহাম ইত্যাদি। –সম্পাদক

২৬৯. **মুরাবাহা লিল আমের বিশ শিরা :** আধুনিক ব্যবসায়ের একটি বিশেষ প্রকার। যার প্রায়োগিক সংজ্ঞা: এক পক্ষ অন্য পক্ষকে একটি নির্দিষ্ট মাল কিনতে অনুরোধ করল এবং এই প্রতিশ্রুতি দিল যে, "তুমি যদি অমুক মাল ক্রয় করে আমার কাছে বিক্রয় করো, তা হলে আমি তোমাকে এই পরিমাণ লাভ দেবো।" এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে অপর পক্ষ সেই মাল কিনে প্রথম পক্ষের কাছে বিক্রি করল। এই বিক্রয়চুক্তিকে বলে 'মুরাবাহা লিল আমের বিশ শিরা'। (মাজাল্লাতু মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি: ৫/৭২৬; ৫/৭৩৭; আল-ফিকহুল মুয়াসসার: ১০/২৮) –সম্পাদক

২৭০. মাজাল্লাতু মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যা : ৮, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা-৭৯১।
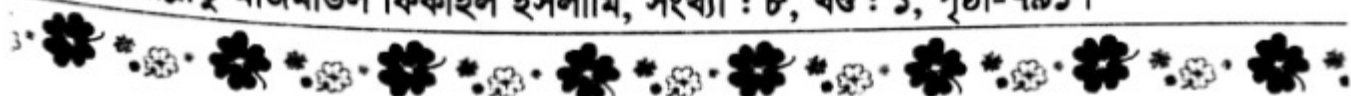
তবে সেক্ষেত্রে ক্রেতা নিজের জন্য খিয়ারের শর্তারোপ করে। তবে যদি বিক্রয়টি চূড়ান্ত না করে উভয় পক্ষ ওয়াদার পর্যায়ে থাকে, তা হলে সেখানে আরাবুনের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। এমনকি ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মতেও সেক্ষেত্রে আরাবুনের হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

বর্তমান সময়ের লেনদেনে এ রকম একটি পদ্ধতি চালু রয়েছে যে, বিক্রয়ের আগে ওয়াদার পর্যায়ে থাকাকালীন এক পক্ষ অপর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেয়। লেনদেনে আগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে এমনটি করা হয়। যেমন : টেন্ডারের ক্ষেত্রে পণ্যের মালিক-পক্ষ থেকে ক্রেতা-পক্ষের কাছে 'আগ্রহ প্রকাশক' হিসাবে নির্দিষ্ট অর্থ দাবি করা হয়। অনুরূপভাবে অনেক এলাকায় বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত সাব্যস্ত করার আগে ক্রেতা-পক্ষ থেকে বিক্রেতা–পক্ষের কাছে মূল্যের নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের প্রচলন রয়েছে। এমনটি করার কারণ হলো, ক্রেতার আগ্রহ নিশ্চিত করা। পরিভাষায় এ অর্থকে هامش الجدية বা ضمان الجدية নামে অভিহিত করা হয়, যদিও ফিকহি পরিভাষায় এটি কোনো জামানত নয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত অর্থ আরাবুন নয়; বরং বিক্রেতার কাছে ক্রেতার আমানত এবং এক্ষেত্রে আমানতের সব বিধান প্রযোজ্য। ক্রেতার অনুমতি ছাড়া বিক্রেতা নিজে তা থেকে লাভবান হওয়ার জন্য ওই অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে না। যদি ক্রেতার অনুমতি ছাড়া অর্থ বিনিয়োগ করে লাভ উপার্জন করে থাকে, তা হলে বিক্রেতার জন্য লভ্যাংশ নেওয়া জায়েয হবে না; বরং ক্রেতাকে তা ফেরত দিতে হবে। অনুরূপভাবে ক্রেতার সঙ্গে যদি বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন না-হয়, তা হলে বিক্রেতা সেই অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য। সুতরাং এক্ষেত্রে বিক্রেতা এই অর্থের মালিকানা লাভ করতে পারবে না। এমনকি এটা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মাযহাবেও জায়েয নেই; যিনি বলেছেন, 'ক্রেতা যদি বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত না-করে, তবুও বিক্রেতার জন্য আরাবুনের অর্থের মালিক হওয়া জায়েয। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন–

> فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما، وقال لا تبع هذه السلع لغيري، وإن لم أشترها منك، "فهذا الدرهم لك" ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن، "صح" لأن البيع خلا عند الشرط المفسد ... وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة، لم يستحق البائع الدرهم، لأنه يأخذه بغير عوض، ولصاحبه الرجوع فيه، ولا يصح جعله عوضا عن

انتظاره وتأخر بيعه من أجله، لأنه لو كان عوضا عن ذلك، لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه.

'বিক্রয় সম্পন্ন করার আগে ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে কিছু অর্থ দিয়ে বলে, আমি না-কিনলেও অন্যের কাছে এ পণ্যটি বিক্রয় করবেন না। আমি যদি পণ্য ক্রয় না করি, তবুও এ দিরহামগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। এরপর নতুন চুক্তির মাধ্যমে সে পণ্যটি ক্রয় করে প্রদত্ত অর্থকে মূল্যের অংশ সাব্যস্ত করে। এ পদ্ধতিতে চুক্তি সহিহ হবে। কারণ, বিক্রয়চুক্তিটি ফাসেদ শর্তমুক্ত রয়েছে। ... এক্ষেত্রে ক্রেতা যদি পণ্যটি না-কেনে, তা হলে বিক্রেতা প্রদত্ত অর্থের মালিক হবে না। কারণ, সেটি সে কোনো বিনিময় ছাড়া নিয়েছে এবং অর্থদাতা সেটি ফিরিয়ে নিতে পারবে। এ অর্থকে অপেক্ষা এবং তার কারণে বিক্রয় বিলম্বিত করার বিনিময় সাব্যস্ত করা জায়েয হবে না। কেননা, সেটি যদি সময় বা বিলম্বের বিনিময় হতো, তা হলে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সেটিকে মূল্য সাব্যস্ত করা জায়েয হতো না। তা ছাড়া বিক্রয় বিলম্বিত করার বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই।'[২৭১]

আল-মুআসসাসাতুল মালিয়াতুল ইসলামিয়া-এর শরিয়া বোর্ড এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে–

"ولايعتبر هامش الجدية عربونا، وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدّية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة، فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة.

لايجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولايشمل التعوض ما يسمي بالفرصة الضائعة."

'বায়নার অর্থকে আরাবুন সাব্যস্ত করা যাবে না। ক্রয়ের ব্যাপারে

২৭১. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৯।

আগ্রহের প্রমাণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থ হয়তো বিক্রেতার প্রতিষ্ঠানের কাছে আমানত হিসাবে থাকবে, ফলে তারা সেখানে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, অথবা লাভ অর্জনের লক্ষ্যে বিক্রেতার কাছে আমানত হিসাবে থাকবে। সেটি এভাবে যে, মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করার ব্যাপারে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগের অনুমতি দেবে।

'গ্রাহক তার কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন না-করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বায়নার টাকা আটকে রাখতে পারবে না। গ্রাহক তার ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে প্রতিষ্ঠান বাস্তবপক্ষে যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে, শুধু সেই পরিমাণ অর্থ নেওয়া জায়েয আছে। ক্ষতির সেই পরিমাণটি হলো, পণ্যটি সংগ্রহের মূল্য ও অন্যের কাছে বিক্রয় মূল্যের মধ্যকার ব্যবধান পরিমাণ অর্থ। এক্ষেত্রে সুযোগ হারানোর জন্য কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ নেওয়া যাবে না।'[২৭২]

ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, প্রচলিত আইনে বিক্রয়ের এগ্রিমেন্ট ও চূড়ান্ত বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সেটি এভাবে যে, এগ্রিমেন্ট হচ্ছে ভবিষ্যতের কোনো তারিখে বিক্রয় সম্পন্ন করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ থেকে ওয়াদা এবং এর কারণে পণ্যটি ক্রেতার মালিকানায় যাবে না। আর চূড়ান্ত বিক্রয়চুক্তি হলো, চুক্তি সম্পন্ন করার সঙ্গেই পণ্যটি ক্রেতার মালিকানায় চলে যাবে। যদিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট সময়ে এগ্রিমেন্টকে কোনো ধরনের ইজাব-কবুল ছাড়াই চূড়ান্ত বিক্রয়চুক্তিতে পরিণত করা হয়ে থাকে। তবে ওই তারিখের আগে বিক্রয়টি সম্পন্ন হয় না। আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি চালু রয়েছে যে, পণ্য বিক্রয়ের আগেই ক্রেতা থেকে বিক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেয়। এরপর ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট তারিখে পণ্যটি ক্রয় না-করে, তা হলে বিক্রেতার জন্য ওই অর্থ আটকে রাখার অধিকার থাকে এবং ক্রেতাকে তা ফেরত দেয় না। এ পদ্ধতিতে প্রদত্ত অর্থকে Earnest Money (বায়নার অর্থ), Down Payment or Part Payment (আগে পরিশোধ-

---

২৭২. আল-মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, মি'ইয়ার : ক্রেতার আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্রয় করে মুরাবাহা করা, ধারা নং ২/৫/৩ ও ২/৫/৪। সুযোগ হারানোর উদ্দেশ্য হলো, অর্থের মালিক ওই সময়ে বিনিয়োগ করলে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ করতে পারত। আর ওয়াদাকারী তার ওয়াদা রক্ষা না করার কারণে এ সুযোগটি হাতছাড়া হয়েছে। সুতরাং যাকে ওয়াদা দিয়েছে সে যদি ওয়াদাকারীর ওপর এ সম্ভাব্য লাভ আরোপ করে, তা হলে সেটিকে সুযোগ হারানোর জরিমানা হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে, শরিয়তে এটি জায়েয নেই।
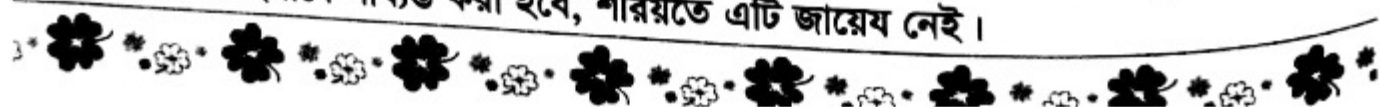
করা বা আংশিক পরিশোধ-করা মূল্য) বা Deposit (জামানত)[২৭৩] নামে অভিহিত করা হয়। আইনের দৃষ্টিতে এ পরিভাষাগুলোর সংজ্ঞা থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলোর একটি অন্যটির স্থানে ব্যবহার করা হয়, তবে Earnest Money (বায়নার অর্থ) বলা হয় ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত করার আগে ওয়াদার পর্যায়ে প্রদত্ত অর্থকে। আর আগে পরিশোধ-করা মূল্য বা আংশিক পরিশোধ-করা মূল্য বলা হয়, চূড়ান্ত চুক্তির পর প্রদত্ত অর্থকে।[২৭৪] কিন্তু এগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আইনি দাবির অর্থ হলো, চুক্তিটি চূড়ান্ত না-করলে বিক্রেতার জন্য ওই অর্থ আটকে রাখার অধিকার থাকবে।

শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা জরুরি :

প্রথম অবস্থা : বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগে বা পরে প্রদত্ত এমন অর্থ, যেটিকে পণ্যের মূল্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে। যদিও তাকে Earnest Money (বায়নার অর্থ) নামে অভিহিত করা হোক। ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের অর্থের হুকুম আরাবুনের হুকুমের অনুরূপ। তাই ক্রেতা যদি পণ্য ক্রয় থেকে সরে আসে, তা হলে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহ.)-এর মতে, বিক্রেতার জন্য আগে প্রদত্ত অর্থ আটকে রাখা জায়েয আছে। অন্যান্য ইমামদের মতে, এটি জায়েয নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা : চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে ওয়াদার পর্যায়ে যে অর্থ প্রদান করবে– সেটিকে আরাবুন বা আগে প্রদত্ত অর্থ কিংবা যে নামেই অভিহিত করা হোক না-কেন, সেটিকে আরাবুন সাব্যস্ত করা যাবে না। এ ধরনের অর্থের হুকুম পূর্বোক্ত Earnest Money (বায়নার অর্থ)-এর হুকুমের অনুরূপ। চার ইমাম, যাঁদের মধ্যে ইমাম আহমাদ (রহ.)-ও রয়েছেন, তাদের কারো মতেই ক্রেতা চুক্তি চূড়ান্ত না-করলে বিক্রেতার জন্য অর্থ আটকে রাখা জায়েয নেই।

পূর্বোক্ত আলোচনা অনুযায়ী উভয় পক্ষ যদি এগ্রিমেন্ট সাইন করেও বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন না-করে–সেটি এভাবে যে, নির্দিষ্ট তারিখ বা শর্ত পাওয়ার পরে চূড়ান্ত চুক্তি করার বিষয়টি নির্ধারণ করা হবে– এ পদ্ধতিতে প্রদত্ত অর্থের হুকুম Earnest Money (বায়নার অর্থ)-এর হুকুমের মতো। কোনো কারণে ক্রেতা যদি চূড়ান্ত চুক্তি করতে না পারে, তা হলে তার প্রদত্ত অর্থ ফেরত দেওয়া ওয়াজিব।

* * *

২৭৩. Pollock And Mulla, On Sale Of Goods Act, 1930, Section 5, P. 94-96.
২৭৪. Black's Law Dictionary, `Down Payment' and `Earnest Money'.

নিলাম পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

৩৯. নিলাম (Auction) পদ্ধতিতে বিক্রয়ের হুকুম

প্রচলিত বিক্রয় পদ্ধতির মধ্যে আরও একটি পদ্ধতির নাম হলো নিলাম বিক্রয়। যার আরবি নাম "بيع المزايدة" / "بيع من يزيد" বা "المزاد"। ইংরেজিতে এ পদ্ধতিকে Auction বলা হয়। আর উর্দু ভাষায় বলা হয় 'নিলাম'। আল্লামা ইবনে জুযাই (রহ.) এ বিক্রয়কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এই ভাষায়–

> أن ينادى على السلعة، ويزيد الناس فيما بعضهم على بعض، حتى تقف على أخر زائد فيها، فيأخذها.
>
> 'পণ্যের দাম হাঁকাতে থাকবে এবং মানুষ একে অন্যের চেয়ে বেশি মূল্য বলতে থাকবে। এভাবে যে ব্যক্তি অন্যের চেয়ে বেশি মূল্য বলবে, সে পণ্যটি ক্রয় করবে।'[২৭৫]

নিলাম বিক্রয়কে অনেক সময় 'দালালি বিক্রয়', 'ডেকে বিক্রয়' বা 'ফকিরদের বিক্রয়' নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। কারণ, সাধারণত প্রয়োজনের সময় ফকিরদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। আবার কখনো 'পুঁজিতে লোকসানগ্রস্ত ব্যক্তির' নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। কেননা, সাধারণত অচল পণ্যের ক্ষেত্রে এমনটি করা হয়।[২৭৬]

নিলাম বিক্রয়ের বেশকিছু পরিভাষা রয়েছে। সুতরাং বিক্রেতা বা তার উকিল কর্তৃক নিলামের জন্য পণ্য পেশ করাকে ডাকা বা 'صياح' বলা হয়। ক্রয়ের জন্য কারো পক্ষ থেকে মূল্য বলাকে 'প্রদান' বা 'উপস্থাপন' বলা হয়। বিক্রেতা কর্তৃক পেশকৃত মূল্য গ্রহণ করাকে 'রুসু' (رُسوّ) বা দৃঢ়করণ বলা হয়। সাধারণত সরাসরি মূল্য হাঁকানো ও অপর পক্ষ থেকে ক্রয়মূল্য উল্লেখের মাধ্যমে নিলাম ডাকা হয়। বর্তমান বাজারে এ পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। তবে কখনো-কখনো পত্রের মাধ্যমে নিলাম করা হয়ে থাকে। তার প্রক্রিয়াটি এরূপ, বিক্রেতা কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য নির্দিষ্ট গুণের এবং তার অবস্থান ও নিলামের জায়গা উল্লেখ করে ঘোষণা দিয়ে ক্রেতা থেকে সেটি ক্রয়ের জন্য

---

২৭৫. আল-কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যাহ, আল্লামা ইবনে জুযাই (রহ.), পরিচ্ছেদ : অষ্টম, পৃষ্ঠা-৪১৫।
২৭৬. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ, নিলামের আলোচনা : খণ্ড-৩৭, পৃষ্ঠা-৮৬।

লিখিত প্রস্তাব আহ্বান করে। সাইন করা নির্দিষ্ট খামে নিলামের মূল্য জমা দেওয়ার পর সেটি খোলার তারিখ পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট দিনে সেটি খোলার পর যার পত্রের মূল্যটি কাঙ্ক্ষিত মূল্যে পৌঁছে, সে ওই পণ্য ক্রয় করতে পারে। রাষ্ট্রীয়ভাবে বা কোনো কোম্পানী বিভিন্ন ব্যবহারিক পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

হযরত ইবরাহিম নাখায়ি (রহ.) থেকে এ পদ্ধতির বিক্রয় মাকরুহ হওয়ার মত বর্ণিত আছে। কেননা, বিক্রেতার পণ্যের জন্য যে ব্যক্তি মূল্য বলল, সে ওই পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে দাম বলল। এখন অন্য কেউ যদি তার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য বলে, তা হলে একজনের দামের ওপর অন্যজন দাম বলা হয়। হাদিসের ভাষ্য দ্বারা এমন করা নিষিদ্ধ। ইমাম আওযায়ি[২৭৭], ইসহাক বিন রাহাওয়াইহ্, হাসান বসরি ও মুহাম্মাদ বিন সিরিন (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, গনিমত ও মিরাছ ছাড়া অন্য কোনো সম্পদে এ পদ্ধতির বিক্রয় জায়েয নেই। তাদের মতের পক্ষে তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেন। হাদিসটি এরূপ–

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ.

'কেউ ক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর সেটি প্রত্যাহার করা ছাড়া সেখানে প্রস্তাব দিতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

---

২৭৭. **ইমাম আওযায়ি :** আবদুর রাহমান ইবনে আমর ইবনে ইয়াহমাদ আল-আওযায়ি (রহ.)। জন্ম : বা'লাবাক্ক নগরীতে ৮৮ হিজরি মোতাবেক ৭০৭ খ্রিস্টাব্দে। আওযা গোত্রে বসবাস করায় তাঁকে আওযায়ি বলা হয়। তিনি ছিলেন শাইখুল ইসলাম, শামের প্রধান আলেম। তাঁর উস্তাদগণ: আতা ইবনে আবি রাবাহ, আবু জাফর আল-বাকের, মাকহুল, কাতাদা, ইবনে শিহাব যুহরি, আতা খুরাসানি, মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, মাইমুন ইবনে মিহ্রান, নাফে মাওলা ইবনে উমর (রহ.) প্রমুখ। তাঁর ছাত্রগণ: শুবা ইবনুল হাজ্জাজ, সুফিয়ান সাওরি, ইমাম মালেক, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান (রহ.) প্রমুখ। তাঁকে কাজির দায়িত্ব নিতে প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সালেহ ইবনে ইয়াহইয়া 'তারিখে বৈরুত'-এ বলেছেন, 'শামে ইমাম আওযায়ির প্রভাব ছিল অকল্পনীয়। এমনকি সুলতানের চেয়েও মানুষ তাঁকে বেশি গুরুত্ব দিত।' হাকাম ইবনে হিশাম (১৫৪-২০৬ হি.)-এর আমল পর্যন্ত সমগ্র আন্দালুসে তাঁর মাযহাবই প্রচলিত ছিল। 'আস-সুনান' (ফিকহ) ও 'আল-মাসায়িল' নামে তাঁর রচিত দুটি কিতাব রয়েছে। হিজরি ১৫৭ মোতাবেক ৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বৈরুতে ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৭/১০৭; আল-আ'লাম : ৩/৩২০) –সম্পাদক
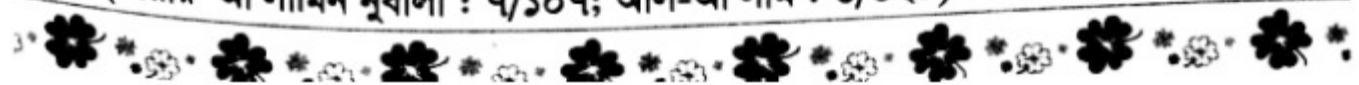
নিষেধ করেছেন। তবে গনিমত ও মিরাছের সম্পদে এমন প্রস্তাব দেওয়া যাবে।'[২৭৮]

চার মাযহাব ও অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ এ পদ্ধতির বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা হযরত আনাস বিন মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেন। হাদিসটি নিচে উল্লেখ করা হলো–

أَنَّهُ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ : مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি জিনপোষ ও পেয়ালা বিক্রয়ের জন্য পেশ করে বললেন, 'এই জিনপোষ ও পেয়ালাটি কে ক্রয় করবে?' এ কথা শুনে জনৈক ব্যক্তি বলল, 'আমি এক দিরহামে ক্রয় করছি।' এ কথা শুনে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'কে এক দিরহামের বেশি দেবে?' তখন আরেকজন বলল, 'আমি দুই দিরহাম দেবো।' তখন তার কাছে সে দুটি বিক্রয় করলেন।'[২৭৯]

---

২৭৮. সহিহ ইবনে খুযাইমা, ইবনুল জারুদ ও দারাকুতনি। এর সূত্রে 'ওয়াকেদি অথবা ইবনে লাহিয়্যাহ' রয়েছেন। আল্লামা আইনি (রহ.) উমদাতুল কারি খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৯৮, কিতাবে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) তার 'মুসনাদে' ও তাবারানি (রহ.) 'মুজামুল আওসাত' কিতাবেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনার সূত্রে ইবনে লাহিয়্যাহ রয়েছে। 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৪ কিতাবে এমনটি উল্লেখ আছে। তবে ইবনুল জারুদ (রহ.)-এর 'আল-মুনতাকা' কিতাবে উমর বিন মালেক থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনার নম্বর ৫৭০।

২৭৯. সুনানের চারটি কিতাবে হাদিসটি বর্ণিত আছে এবং এটি সুনানে তিরমিযির বর্ণনা। হাদিস নং ১২১৮। ইমাম তিরমিযি (রহ.) হাদিস বর্ণনা করার পর বলেছেন, এটি হাসান হাদিস। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) দীর্ঘ ঘটনার মধ্যে এটি বর্ণনা করেছেন। বেশ কিছু ফায়দা থাকার কারণে সেটিকে এখানে উল্লেখ করা ভালো মনে করছি।

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ -ﷺ- يَسْأَلُهُ فَقَالَ : أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ. قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ : ائْتِنِي بِهِمَا. فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِيَدِهِ وَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِى هَذَيْنِ. قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ : مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ : اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ. فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -
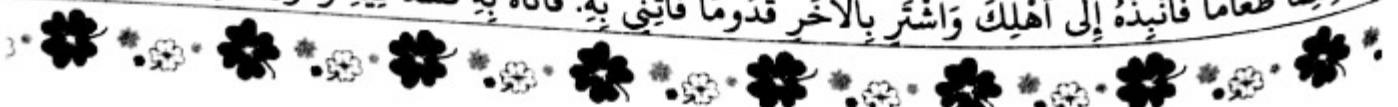
একজনের বিক্রয়ের ওপর আরেকজন প্রস্তাব দেওয়া নিষিদ্ধের বিষয়টিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ মূল্য নির্ধারণ হওয়া এবং এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার পরের অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। মাকরুহ বিক্রয়ের আলোচনায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে–ইনশাআল্লাহ। মূল্য নির্ধারণ হওয়া ও এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার আগেই নিলাম হয়ে থাকে। তা ছাড়া বিক্রেতা কর্তৃক এ কথা বলা যে, 'কে বেশি

عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ : اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِى فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِى غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِى دَمٍ مُوجِعٍ.

'এক আনসারি সাহাবি রাসুল (ﷺ)-এর কাছে এসে কিছু চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়িতে কি কিছু আছে? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, একটি বিছানা রয়েছে, যার একাংশ পরিধান করি ও অন্য অংশ বিছাই। আর পান করার জন্য একটি পানপাত্র রয়েছে। তখন তিনি বললেন, সেগুলো উপস্থিত করো। সেগুলো আনার পর রাসুল (ﷺ) সেগুলো নিয়ে বললেন, কে এ দুটি ক্রয় করবে? জনৈক ব্যক্তি বলল, এক দিরহামের বিনিময় আমি ক্রয় করব। এরপর দুই বা তিন বার তিনি বললেন, কে এক দিরহামের বেশি দেবে? এ কথা শোনার পর আরেকজন বলল, আমি দুই দিরহামে ক্রয় করব। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে দুটিকে দুই দিরহামের বিনিময়ে দিয়ে দিলেন এবং ওই আনসারিকে দিরহাম দুটো দিয়ে বললেন, এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে তোমার পরিবারকে দাও এবং অন্য দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল ক্রয় করে আমার কাছে এসো। সে কুড়াল ক্রয় করে আনার পর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ হাতে তাতে কাঠ লাগিয়ে দিয়ে বললেন, এটি নিয়ে যাও এবং কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রয় করো। আর পনেরো দিনের মধ্যে আমি যেন তোমাকে না দেখি। এরপর সে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রয় করল এবং দশ দিরহাম অর্জন করে তার কিছু দিয়ে কাপড় ও কিছু দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে এলো। তখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় ভিক্ষার চিহ্ন নিয়ে উপস্থিত হওয়া অপেক্ষা এটি তোমার জন্য ভালো। শুধু তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য ভিক্ষা করা বৈধ। মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার মতো দরিদ্রতার শিকার, ঋণে ভেঙে পড়া ব্যক্তি ও ভুলক্রমে ঘটে যাওয়া হত্যার রক্তপনের জন্য। (সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়: যাকাত, পরিচ্ছেদ: যে অবস্থায় ভিক্ষা বৈধ, হাদিস নং ১৬৪১।) আল্লামা হাফেজ মুনযিরি (রহ.) এ হাদিসের পর বলেছেন, ইমাম তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি (রহ.) বলেছেন, 'এটি হাসান হাদিস, আখযার বিন আজলান ছাড়া অন্যের সূত্রে এ বর্ণনা জানি না।' আখযার বিন আজলান সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মায়িন (রহ.) বলেছেন, 'তিনি সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি।' আবু হাতেম রাযি (রহ.) বলেছেন, 'তার হাদিস গ্রহণ করা যায়।' (মুখতাসারু সুনানে আবু দাউদ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪০) আল্লামা মাকদিসি (রহ.) 'মুখাতারাহ'-তে (খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৭, হাদিস নং ২২৬৫) বলেছেন, আহমাদ বিন মানি' তার মুসনাদে (ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৫, নং ৪/২১৪৪) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

দেবে?' এটি প্রমাণ করে যে, প্রস্তাবিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য ছাড়া সে বিক্রয় করতে রাজি নয়। সুতরাং দুই অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

নিলাম বিক্রয় জায়েয হওয়ার পক্ষে দলিল হলো 'নাজ্‌শ' হারামকারী হাদিসসমূহ। 'নাজাশ' হলো ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যের আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া। মাকরুহ বিক্রয়ের আলোচনায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে–ইনশাআল্লাহ। নিলামের মধ্যে সাধারণত এমন করা হয় না। সুতরাং এখান থেকে বোঝা গেল যে, 'নাজাশ' নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, অন্যকে ধোঁকা দেওয়া। তাই যেখানে ধোঁকা দেওয়ার ইচ্ছে থাকবে না, বরং ক্রয়ের ইচ্ছে থাকবে, সেখানে অন্যের প্রস্তাবিত মূল্যের ওপর মূল্য বলতে কোনো সমস্যা নেই।

৪০. নিলামে ইজাব-কবুল

বিক্রেতা বা বিক্রেতার প্রতিনিধি যখন নিলামে দাম হাঁকাবে এবং উপস্থিত ক্রেতারা মূল্য বলতে থাকবে, তখন প্রস্তাবিত মূল্যের সঙ্গে বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। এ বিষয়টি নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। এক্ষেত্রে যদিও পরিভাষায় মতানৈক্য রয়েছে যে, হানাফি মাযহাবের ফকিহদের মতে উপস্থিত ক্রেতা কর্তৃক প্রস্তাবিত মূল্য হলো ইজাব। বিক্রেতার পক্ষ থেকে সে মূল্যে সম্মত হওয়া হলো কবুল। তবে অন্য তিন মাযহাবে বিক্রেতার সম্মতি হলো বিলম্বিত ইজাব এবং ক্রেতা কর্তৃক প্রস্তাবিত মূল্য হলো অগ্রিম কবুল। মতনৈক্যের এ বিষয়টি শুধু পরিভাষাগত মতানৈক্য। ইজাব-কবুলের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তবে এ ব্যাপারে সব মাযহাব একমত যে, শুধু নিলামের জন্য পণ্য উপস্থাপন করলেই বিক্রয় সম্পন্ন হবে না; বরং বিক্রেতার পক্ষ থেকে কোনো একটি মূল্যের প্রতি সম্মত হওয়া জরুরি।

৪১. বিক্রেতার জন্য বেশি মূল্যের প্রস্তাব গ্রহণ করা আবশ্যক কি না

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, ক্রেতা কর্তৃক মূল্য পেশ করা হলো ইজাব, যেটি বিক্রেতার পক্ষ থেকে কবুলের মুখাপেক্ষী। বিক্রেতার জন্য বেশি মূল্যের প্রস্তাব গ্রহণ করা জরুরি না; বরং তার কাঙ্ক্ষিত মূল্য না-পেলে সেক্ষেত্রে সব প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে নিলাম জারি রাখার অধিকার রয়েছে। তা ছাড়া বেশি মূল্যের প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতার জন্য কম

মূল্যের প্রস্তাব গ্রহণ করা জায়েয কি না? এ ব্যাপারে মালেকি মাযহাবের ফকিহগণ এ পদ্ধতিকে জায়েয বলেছেন। ইমাম ইবনে রুশদ (রহ.) বলেছেন–

وهو مخير في أن يمضيها لمن شاء ممن أعطى فيها ثمنا، وإن كان غيره قد زاد عليه.

'নিলামে বিক্রয়কারী ক্রেতাদের যে কোনো একজনের সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীন। যদিও অন্যরা তার চেয়ে বেশি মূল্য বলুক।'[২৮০]

হানাফি মাযহাবের কিতাবে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাইনি। তবে তাঁদের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁদের কাছেও অনুরূপ বিক্রয় করা জায়েয আছে। কারণ, হানাফি মাযহাবে ক্রেতার পক্ষ থেকে প্রতিটি প্রস্তাবই স্বতন্ত্র ইজাব এবং বিক্রেতার জন্য তার যে কোনো একটি কবুল করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু হানাফি মাযহাবের ফকিহগণ বলেছেন, কোনো একজনের প্রস্তাবিত মূল্যের ওপর বিক্রেতা যখন নিলামের ডাক বন্ধ করে দেবে এবং সেটিকে স্থির করবে, তারপর অন্য কারো জন্য বেশি মূল্য বলা জায়েয নেই। কেননা, বিক্রেতা বিক্রয়ের বিষয়টি স্থির করার পর সেখানে দাম বলা হাদিসে নিষিদ্ধ 'দামের ওপর দাম বলার' আওতাভুক্ত হয়ে যায়। নিলাম আহ্বানকারী যদি বিক্রেতার দালাল হয় এবং কেউ মূল্য বলার পর সে বলে, আমার মালিকের কাছে জিজ্ঞেস করে জানাব, তা হলে এমন ক্ষেত্রে মালিককে জানানোর আগে অন্য কেউ বেশি মূল্য বললে কোনো সমস্যা নেই। দালাল মালিককে সংবাদ দেওয়ার পর সে যদি বলে, এ মূল্যে বিক্রয় করে মূল্য নিয়ে নাও, তা হলে মালিকের এমন সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর কারো জন্য বেশি মূল্য প্রস্তাব করা জায়েয নেই। এটি হলো অন্যের ওপর দাম বলা।[২৮১] এ মাসআলাটি প্রমাণ করে যে, হানাফি মাযহাবে বিক্রেতার জন্য কম মূল্যের প্রস্তাব গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

ব্রিটিশ আইন এ দর্শনের সঙ্গে মিল রাখে। যেমনটি 'পণ্য বিক্রয় আইন' (Sale of goods Act)-এর ৬৪-২ নম্বর ধারা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু

---

২৮০. আল-বয়ান ওয়াত তাহসিল, ইমাম ইবনে রুশদ (রহ.) : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৭৫-৪৭৬।

২৮১. আল-মুহিতুল বুরহানি, অধ্যায় : কারাহিয়্যাহ ও ইস্তিহসান, পরিচ্ছেদ : নং ৯ : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১০২-১০৩। ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১০-২১১।

একাধিক ব্রিটিশ আদালতের পক্ষ থেকে আইন করা হয়েছে যে, কেউ নিলাম আহ্বান করলে বেশি মূল্যদাতার সঙ্গে বিক্রয় সম্পন্ন করার ব্যাপারে সে নিজেকে বাধ্য করেছে বলে ধরা হবে। তাই বেশি মূল্যদাতাই পেশকৃত পণ্যের ক্রেতা হবে। এ আইনের সারকথা এ নয় যে, বেশি মূল্যের প্রস্তাব দেওয়ামাত্র বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে; বরং তার সারকথা হলো, যে ব্যক্তি বেশি মূল্য দিতে আগ্রহী হবে, তার কাছে বিক্রয় করার ব্যাপারে বিক্রেতা ওয়াদা করেছে এবং এক্ষেত্রে তার ওয়াদাটি আবশ্যক করে দেওয়া সম্ভব। বর্তমানে এমন কিছু আইন করা হয়েছে যে, কোনো রাষ্ট্রীয় পণ্য নিলামে ওঠালে বেশি মূল্যদাতার কাছে ওই পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু আইন ও আদালতের সিদ্ধান্তে এমন বক্তব্য রয়েছে যে, নিলামে ওঠানোর সময় বিক্রেতা যদি তার জন্য ইচ্ছামতো যে কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করার অধিকার সংরক্ষণ করার ঘোষণা দেয়, তা হলে কোনো অবস্থায়ই বেশি মূল্যের প্রস্তাবকারীর কাছে সে বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবে না।[২৮২]

সারকথা, ব্রিটিশ আইন ইসলামি ফিকহের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত যে, নিলাম বিক্রয়ে বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। তবে কিছু নিলামকে এ ব্যাপারে কৃত্রিম ওয়াদা সাব্যস্ত করেছে যে, বেশি মূল্যের প্রস্তাবকারীর সঙ্গে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করবে।

শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত ওয়াদার বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। সেটি হলো, মৌলিকভাবে বিচারিক দিক থেকে ওয়াদাকারীর জন্য ওয়াদা রক্ষা করা আবশ্যক নয়। কিন্তু বাস্তবিক প্রয়োজনে সেটি আবশ্যক সাব্যস্ত করা জায়েয আছে। তার পদ্ধতি এমন হবে যে, উভয় পক্ষের কল্যাণ অনুভূত হলে দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে আবশ্যক বিধান দিয়ে আইন জারি করতে পারবে।

৪২. নিলামে মূল্য প্রস্তাবকারীরা নিজ প্রস্তাবিত মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য কি না

ক্রেতাদের বিষয়টি হলো, তাদের প্রস্তাবিত মূল্যে বিক্রেতা সম্মত হলে সে মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য কি না? এ ব্যাপারে হানাফি মাযহাবে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাইনি। তবে তাদের মূলনীতির দাবি হলো, লেনদেনের মজলিস

---

২৮২. Pollock & Mulla on Sale of Goods Act P. 464, Section 64, sub-section-2.

অবশিষ্ট থাকলে ক্রেতারা তাদের প্রস্তাবিত মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য থাকবে। যেমন, সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খিয়ারে কবুলের হুকুম হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তাদের মূলনীতির দাবি হলো, বিক্রেতা তার প্রস্তাব কবুল বা প্রত্যাখ্যানের আগে ক্রেতা তার ইজাব প্রত্যাহার করতে পারবে।

মালেকি মাযহাবের মত : ইজাব-কবুলের আলোচনায় ইবনে রুশদ (রহ.)-এর বক্তব্যে মালেকি মাযহাবের মত উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন–

لو رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقبول.

'অপর পক্ষ কবুল করার আগে যদি কোনো এক পক্ষ তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়, তা হলে তার প্রত্যাহার করা কোনো ফায়দা দেবে না। পরবর্তীতে অপর পক্ষ কবুল করলে সেটি কবুল হিসাবে সাব্যস্ত হবে।'

ইতঃপূর্বে আল্লামা হাত্তাব (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছি যে, এ সিদ্ধান্তের ওপরই মালেকি মাযহাবের আমল রয়েছে।[২৮৩] কিন্তু তাদের কাছে বিক্রয়ের মজলিস শেষ হওয়ার আগে ইজাবের সঙ্গে কবুল না-পাওয়া গেলে ইজাব বাতিল সাব্যস্ত হয়। নিলাম সম্পর্কে শুরুতেই মালেকি মাযহাবের ফকিহগণ বলেছেন, বিক্রেতা যদি কোনো একজন ক্রেতার মূল্যে সম্মতি প্রকাশ করে, তা হলে সে ওই মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য, যদিও অন্য ক্রেতা অপেক্ষা তার প্রস্তাবিত মূল্যটি কম হয়। এরপর তারা বলেছেন, বিক্রেতার বিক্রয় করার খিয়ার ওই মজলিসের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে। প্রথম বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে ইবনে রুশদ (পিতামহ) (রহ.) বলেছেন–

الحكم فيه: أن كل من زاد في السلعة لزمته بما زاد فيها، إن أراد صاحبها أن يمضيها له، ما لم يسترد سلعته، فيبيع بعدها أخرى، أو يمسكها، حتى ينقضي مجلس المناداة، وهو مخير في أن يمضيها لمن يشاء ممن أعطى فيها، وإن كان غيره قد زاد عليه.

'এক্ষেত্রে বিধান হলো, যে ব্যক্তি বেশি মূল্য বলবে, বিক্রেতা পণ্য

---

২৮৩. মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪১।
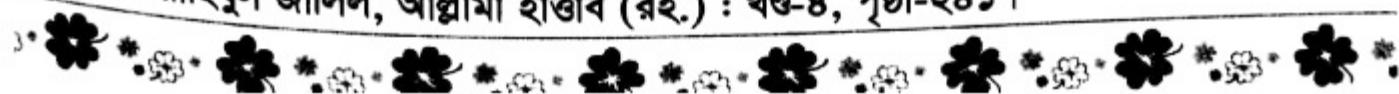
প্রত্যাহার না-করে ক্রেতার প্রস্তাবে সম্মত হলে ক্রেতার জন্য প্রস্তাবিত মূল্যে ক্রয় করা আবশ্যক। নিলামের মজলিস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বিক্রেতা সেটি বিক্রয় করা না-করার ব্যাপারে স্বাধীন। মূল্য প্রস্তাবকারীদের যে কোনো একজনের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করার ব্যাপারেও স্বাধীন, যদিও তার প্রস্তাবিত মূল্য অন্যের মূল্য অপেক্ষা কম হোক।'[২৮৪]

দ্বিতীয় বিষয় হলো, বিক্রয়চুক্তি আবশ্যক হওয়ার মেয়াদটি মজলিস শেষ হওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকবে। দীর্ঘ সময় অতীত হওয়ার পরও বিক্রেতা কোনো একজন ক্রেতার সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে। আল্লামা দুসুকি (রহ.) এ বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন–

وللبائع إلزام المشتري في المزايدة، ولو طال الزمان، أو انفض المجلس، حيث لم يجر العرف بعدم إلزامه. كما عندنا بمصر، من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انفض المجلس، فإنه لا يلزمه بها، وهذا ما لم تكن السلعة بيد المشتري، وإلا كان لربها إلزامه بها.

'নিলামে দীর্ঘ সময় অতীত হওয়া বা মজলিস শেষ হওয়ার পরও বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে চুক্তি করতে বাধ্য করতে পারবে। কারণ, বাধ্য না-করার ব্যাপারে কোনো প্রচলন জারি হয়নি। যেমন : আমাদের মিশর এলাকায় প্রচলন রয়েছে যে, কেউ পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেওয়ার পর বিক্রেতার কাছে পণ্য না-থাকা অবস্থায় সে যদি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বা মজলিস শেষ হয়ে যায়, তা হলে ক্রেতা তার প্রস্তাবিত মূল্যে সেটি ক্রয় করতে বাধ্য হবে না। তবে যদি বিক্রেতার কাছে পণ্য থাকে, তা হলে ক্রেতাকে বাধ্য করতে পারবে।'[২৮৫]

আল্লামা দুসুকি (রহ.)-এর বক্তব্যের সারকথা হলো, নিলামে মূল্য প্রস্তাবকারীর জন্য সেটি ক্রয় করা আবশ্যক এবং মজলিস শেষ হওয়ার পরও এই আবশ্যকতা অবশিষ্ট থাকবে। এ দিক থেকে নিলাম ও অন্যান্য বিক্রয়ের মধ্যে

---

২৮৪. আল-বয়ান ওয়াত তাহসিল, ইমাম ইবনে রুশদ (রহ.) : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৭৫-৪৭৬।
২৮৫. হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা শারহি মুখতাসারি খলিল : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫।
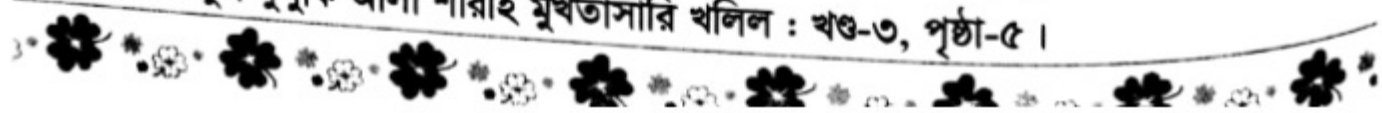
পার্থক্য হয় যে, অন্যান্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মজলিস শেষ হওয়ার পর ক্রেতাকে বাধ্য করা যায় না। কোনো এলাকায় যদি এমন প্রচলন থাকে যে, মজলিস শেষ হওয়ার পরও নিলাম বিক্রয়ে ক্রেতাকে বাধ্য করা হয়, অথবা মূল্য প্রস্তাব করার আগে প্রস্তাবকারী এমন শর্ত করে থাকে, তা হলে সে ক্ষেত্রকে এ বিধানের বাইরে রাখতে হবে। আল্লামা হাত্তাব (রহ.) কর্তৃক আল্লামা মাযারি[২৮৬] (রহ.) থেকে বর্ণিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি সামাজিক প্রচলনের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং মজলিস শেষ হওয়ার পর ক্রেতাকে বাধ্য করার ব্যাপারে সামাজিক প্রচলন না-থাকলে বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে বাধ্য করা জায়েয নেই। আল্লামা মাযারি (রহ.) বলেছেন, নিলাম ও সাধারণ বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্যের একমাত্র মাধ্যম হলো, মূল্যের প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রটি। এরপর তিনি বলেন–

ولو شرط المشتري إنما يلتزم الشراء في الحال قبل المفارقة، أو شرط البائع لزومه له أو أنه بالخيار في أن يعرضها على غيره أمدا معلوما أو في حكم معلوم لزم الحكم بالشرط في بيع المساومة والمزايدة اتفاقا، وإنما افترقا للعادة حسبما علل به ابن حبيب الفرق بينهما.

'ক্রেতা যদি শর্তারোপ করে যে, শুধু মজলিস থেকে ভিন্ন হওয়ার আগেই ক্রয় করা আবশ্যক হবে, অথবা বিক্রেতা আবশ্যক হওয়ার শর্তারোপ করে অথবা এমন শর্তারোপ করে যে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সে অন্যের কাছে পেশ করতে পারবে বা নির্দিষ্ট হুকুমের শর্তারোপ করে, তা হলে সর্বসম্মতিতে দরদাম ও নিলাম বিক্রয় শর্তের সঙ্গে আবশ্যক হবে। তবে আল্লামা ইবনে হাবিব (রহ.) শুধু সামাজিক প্রচলনের কারণেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।'[২৮৭]

---

২৮৬. আল্লামা মাযারি : মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে উমর আবু আবদুল্লাহ আত-তামিমি আল-মাযারি (রহ.)। মালেকি মাযহাবের খ্যাতনামা ফকিহ ও মুহাদ্দিস। দক্ষিণ ইতালির সিসিলি দ্বীপের মাযারা (Mazzara) নামক এলাকার দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে মাযারি বলা হয়। জন্ম : ৪৫৩ হিজরি মোতাবেক ১০৬১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে: আল-মু'লিম বি ফাওয়ায়িদি মুসলিম, আত-তালকিন, আল-কাশফু ওয়াল ইনবা, ইযাহুল মাহসুল ফিল উসুল। ইন্তেকাল : ৫৩৬ হিজরি মোতাবেক ১১৪১ খ্রিস্টাব্দে মাহদিয়্যাহ নগরীতে। (আল-আ'লাম, যিরিকলি : ৬/২৭৭) –সম্পাদক

২৮৭. মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩৮।

ইজাব-কবুলের আলোচনায় বলেছি, এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের মতটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। সেটি হলো, অপর পক্ষ কবুল করার আগ পর্যন্ত ইজাবকারী তার ইজাব প্রত্যাহার করতে পারবে। সুতরাং নিলামের ক্ষেত্রে সেটি প্রয়োগ করা উচিত।

৪৩. নিলাম আহ্বায়কের জন্য নিলামকৃত পণ্য ক্রয়ের অধিকার রেখে নিলাম করা

ব্রিটিশ আইন বিক্রেতাকে এ অধিকার দিয়েছে যে, নিলামের আহ্বান করার সময় এ ঘোষণা দেবে যে, সে-ও মূল্য প্রস্তাব করতে পারবে। অর্থাৎ, ক্রেতা হতে চাইলে সে নিজেও মূল্য প্রস্তাব করবে। এ পদ্ধতির নিলামকে 'অধিকার সংরক্ষিত নিলাম' (Auction With Reserve) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এমন ঘোষণা দেওয়ার পর তার জন্য এ সুযোগ থাকে যে, সে যদি দেখে প্রস্তাবিত মূল্য তার কাঙ্ক্ষিত মাত্রা স্পর্শ করছে না, সেক্ষেত্রে বিক্রেতা নিজে বেশি মূল্য বলে নিলামের পণ্য ক্রয় করে নেয়, যাতে করে দ্বিতীয়বার বেশি মূল্যে বিক্রয় করতে পারে।[২৮৮]

শরয়ি দৃষ্টিতে এ পদ্ধতিতে অধিকার সংরক্ষণ করা জায়েয আছে কি না? এক্ষেত্রে যে উত্তর বোঝা যায় তা হলো, কেউ নিজেই নিজের পণ্য ক্রয় করতে পারে না। সুতরাং এ প্রক্রিয়ায় অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি বিক্রেতার পক্ষ থেকে এমন ঘোষণা ছাড়া কিছুই নয় যে, সে সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবে এবং বিক্রয় বন্ধ করে নিজের কাছেই পণ্য রেখে দেবে, যেন পরবর্তী সময়ে সেটি বেশি মূল্যে বিক্রয় করতে পারে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বিক্রেতার জন্য এমনটি করার অধিকার রয়েছে। আশা করি, সেক্ষেত্রেও এ হুকুমে কোনো পরিবর্তন হবে না, যখন বিক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য নির্ধারণ করে বলবে, এ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে তার পণ্য বিক্রয় করবে না। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদ্ধতিটি জায়েয আছে।

* * *

২৮৮. Sale of Goods Act 1930, Section 64, (4) & (6) with commentary of Pollock & Mulla, p. 466 cf Contract Act 1872 Section 123.

টেন্ডার সম্পর্কিত বিধি-বিধান

৪৪. টেন্ডার (Reverse Auction)

টেন্ডার (Reverse Auction) হলো এমন একটি আধুনিক পরিভাষা, যাকে বিভিন্ন পক্ষ পণ্য বা সেবা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত মূল্যের মধ্যে কম মূল্যে ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করে থাকে। 'আন্তর্জাতিক মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'-এর সিদ্ধান্তে টেন্ডারের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে–

> المناقصة : طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقوم فيها الجهة الطالبة لها بدعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة.

> 'পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য কম মূল্য অনুসন্ধান করা। এক্ষেত্রে আহ্বায়ক পক্ষ শর্ত ও নির্দিষ্ট গুণের সঙ্গে আগ্রহীদেরকে মূল্য বলতে আহ্বান করে।'[২৮৯]

বাস্তবিক অর্থে এটি হলো নিলামের বিপরীত দিক। নিলামে বিক্রেতা পক্ষ প্রস্তাবিত বেশি মূল্যে বিক্রয় করতে চেয়ে তাদের থেকে মূল্যের প্রস্তাব চায়। টেন্ডারে ক্রেতারা আসে এবং তাদের থেকে মূল্যের প্রস্তাব নেওয়ার পর সবচেয়ে কম মূল্যের প্রস্তাবকারীর সঙ্গে চুক্তি করা হয়। এ পদ্ধতিটি শরিয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে নিলামের অনুরূপ। ফিকহি কিতাবসমূহে যদিও টেন্ডারের আলোচনা নেই, তবে সেটিকে নিলামের ওপর কিয়াস করা সম্ভব। কেননা, মৌলিকভাবে উভয়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। নিলামের মতো এখানেও মূল্য প্রস্তাব করা হয়। নিলামের আলোচনায় একজনের ওপর অন্যজন দাম বলা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের বড় বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে টেন্ডারের পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিলামের পদ্ধতিটি দরিদ্র লোকজন ব্যবহার করত, ফলে সেটিকে দরিদ্রদের বিক্রয় নামে অভিহিত করা হতো। কিন্তু টেন্ডারের পদ্ধতিটি ব্যবসা ও শিল্পের বড় অঙ্কের আর্থিক

---

২৮৯. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যা-১২, সিদ্ধান্ত নং ১০৭ (১-১২)।

লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিলাম অপেক্ষা এ পদ্ধতিকে লিখিতভাবে বেশি সূক্ষ্ম ও নিয়মানুবর্তীতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

টেন্ডারের পদ্ধতি হলো, কোনো পক্ষ যখন বিল্ডিং নির্মাণের জন্য কোনো ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি করতে চায় এবং একাধিক ঠিকাদার থেকে বিভিন্ন রেট জানতে আগ্রহী হয়, তখন বিল্ডিং-এর বিস্তারিত বিবরণ, গুণাগুণ ও চুক্তির শর্তগুলো একটি ফাইলে লেখে। এরপর পত্রিকা বা বিজ্ঞপ্তিপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদারকে আহ্বান করে। বিজ্ঞপ্তিতে মূল কাজ ও প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ের বিবরণ দেওয়া থাকে। কাজের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং চুক্তির জন্য আবশ্যকীয় অন্যান্য শর্তাবলির একটি ফাইল সেসব ঠিকাদারদেরকে দেওয়া হয়, যারা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে টেন্ডারে অংশ নেয়। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞপ্তিতে টেন্ডারে অংশ নেওয়ার শেষ তারিখ এবং টেন্ডার আহ্বানের তারিখ ইত্যাদি থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মূল্য প্রস্তাবে আগ্রহী হওয়ার প্রমাণস্বরূপ ঠিকাদারদের থেকে জামানত হিসাবে প্রথমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা নেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ঠিকাদাররা সিলযুক্ত খামে জামানতসহ তাদের মূল্য প্রস্তাব করে। এরপর টেন্ডার কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট তারিখে ঠিকাদার বা তাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার বক্স খুলে প্রত্যেকের নাম ও মূল্য উল্লেখ করে সেটিকে লিখে রাখে। তারপর বর্ণিত শর্ত, কাঙ্ক্ষিত গুণাগুণ ও আইনি প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রস্তাবগুলো নিরীক্ষা করে টেন্ডারে সবচেয়ে কম মূল্যের প্রস্তাবকারীকে নির্বাচন করে। তবে যদি প্রস্তাবিত সব মূল্যের চেয়ে কম মূল্যটি বাজার দর অপেক্ষা বেশি হয়, তা হলে টেন্ডার আহ্বায়ক পক্ষ কম মূল্যের প্রস্তাবকারীর সঙ্গে বাজার দরের সঙ্গে মিল রাখার ব্যাপারে আলোচনা করে।

অনুরূপভাবে অনেক সময় একাধিক প্রস্তাবিত মূল্য বারাবর হয়। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারীদের মধ্যে বেশি উপযুক্ত পক্ষ নির্ধারণে অধিকাংশ সময় সরাসরি আলোচনা করা হয়, অথবা টেন্ডার আহ্বানকারী পক্ষের ভালোদিক বিবেচনা করে তাদের মধ্যে কাজ বণ্টন করে দেওয়া হয়। বর্ণিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর যার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তার মূল্যকে চূড়ান্ত সাব্যস্ত করা হয়।

কোনো কিছু আমদানির টেন্ডারের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং টেন্ডার আহ্বানকারী পক্ষ থেকে কাঙ্ক্ষিত পণ্যের মান ও পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। তারপর ব্যবসায়ীরা বর্ণিত

পণ্য বিক্রয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে এবং টেন্ডারের মতোই বর্ণিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কম মূল্যের প্রস্তাব নির্বাচন করে।

টেন্ডারের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের আইন ও প্রক্রিয়া রয়েছে, যেগুলোর বিস্তারিত বাস্তবায়ন পদ্ধতি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, সেগুলো প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ও ফিকহি হুকুমের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু টেন্ডারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ফিকহি মাসআলাগুলো বর্ণিত নিলামের মাসআলার মতোই।

সুতরাং টেন্ডার চুক্তিটি যদি এমন চুক্তি হয়, যেগুলোকে শরয়ি দিক থেকে তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করা যায়– উদাহরণস্বরূপ, বিক্রেতার কাছে থাকা বিভিন্ন পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি, ইজারা বা অর্ডারের চুক্তি, সেক্ষেত্রে নিলামে যে হুকুম আলোচনা করেছি এক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য হবে। কিন্তু অধিকাংশ সময় আমদানী এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। নিলাম আর টেন্ডারের মাধ্যে এ দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে যে, চুক্তির মজলিসে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে নিলাম চুক্তি সম্পন্ন করা হয়, আর আমদানী চুক্তির বিষয়টি এমন নয়। সেটি তৎক্ষণাৎ বিক্রয়ের আওতাভুক্ত নয়; বরং ভবিষ্যৎ তারিখে বিক্রয়চুক্তি করার ব্যাপারে উভয় পক্ষের ওয়াদা বৈ কিছু নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য কোনো ইজাব-কবুল থাকে না; বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ব্যবসায়ীদেরকে টেন্ডারে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে ওয়াদা বা চুক্তির আহ্বান করা হয়। তবে প্রস্তাবিত মূল্যকে ভবিষ্যতের চূড়ান্ত বিক্রয়চুক্তি মনে না-করে বিজ্ঞপ্তির প্রক্রিয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পন্ন করতে কোনো বাধা নেই। বরং ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য উভয় পক্ষের ওপর আবশ্যকীয় ওয়াদা হিসাবে মূল্য প্রস্তাব করতে হবে। আমদানীর এগ্রিমেন্টে উভয় পক্ষের ওয়াদার আলোচনায় এ দুটির মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৪৫. চুক্তির শর্তসম্বলিত ফাইলের বিনিময় নেওয়ার হুকুম

সাধারণত টেন্ডারের ক্ষেত্রে এবং নিলামের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, যে প্রতিষ্ঠান নিলাম বা টেন্ডার আহ্বান করে, তারা একটি ফাইলে চুক্তির শর্ত ও যাবতীয় গুণাগুণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার পর নিলাম বা টেন্ডারে অংশগ্রহণকারীদের নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে সেটি দিয়ে থাকে।

এখানে প্রশ্ন হলো, টেন্ডার আহ্বানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য চুক্তির শর্ত সম্বলিত
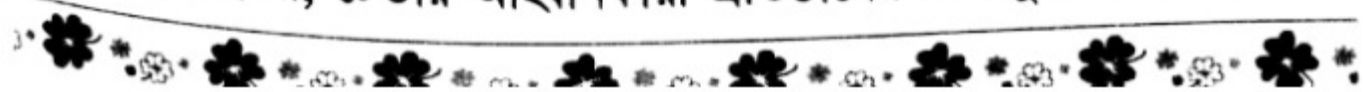
ফাইলের বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে কি না? আমরা যদি এদিকে লক্ষ করি যে, টেন্ডার আহ্বানকারী প্রতিষ্ঠানই ওই ফাইলের উপকারিতা ভোগ করছে। সেটি এভাবে যে, আহ্বানকারী প্রতিষ্ঠান নিজ উপকারে সেটি প্রস্তুত করেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আহ্বানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ওই ফাইলের বিনিময় নেওয়ার সুযোগ নেই।

তবে এখানে আরও একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যেটি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। তা হলো, অনেক সময় চুক্তির শর্ত ও গুণাগুণ সম্বলিত ফাইল প্রস্তুত করতে সে বিষয়ে গবেষণা ও এমন সূক্ষ্ম ম্যাপ তৈরির প্রয়োজন হয়, যার জন্য যথেষ্ট শ্রম ও অর্থের প্রয়োজন পড়ে। অন্যদিকে এ ফাইলটি ঠিকাদার বা ব্যবসায়ীদের ব্যয় কমিয়ে দেয়। কেননা, এ ফাইল না থাকলে প্রত্যেক প্রস্তাবক সে ব্যাপারে গবেষণা রিপোর্ট প্রস্তুত করতে অর্থ ও শ্রম ব্যয়ে বাধ্য হতো। এ দৃষ্টিকোণ থেকে টেন্ডার আহ্বানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ওই ফাইলের বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে বলে মনে হয়।

এ অধমের কাছে যেটি স্পষ্ট হয় তা হলো, চুক্তির শর্ত সম্বলিত ফাইলটি যদি এমন হয় যে, তার জন্য কোনো ধরনের গবেষণার প্রয়োজন হয় না; বরং সেখানে শুধু চুক্তির শর্তগুলো উল্লেখ করা হয়, তা হলে টেন্ডার আহ্বানকারী ফাইলের বিনিময়ে কোনো অর্থ নিতে পারবে না। কারণ, সেটি উভয় পক্ষের চুক্তির শর্ত, যার বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। পক্ষান্তরে সেটি যদি এমন গবেষণা সম্বলিত হয়ে থাকে যে, টেন্ডারে অংশগ্রহণকারীরা তা জানার প্রয়োজন অনুভব করে, তা হলে এক্ষেত্রে আহ্বানকারী প্রতিষ্ঠান সেটি প্রস্তুত করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে, তার ন্যায্য মূল্য নিতে পারবে।

মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি নিলামের আলোচনায় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমার এ মতটি সে সিদ্ধান্তের মতোই। তাদের সিদ্ধান্তটি নিচে তুলে ধরা হলো-

> لا مانع شرعا من استفاء رسم الدخول- قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية- لكونه ثمنا له.

> 'অংশগ্রহণের ফি নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো শরয়ি বাধা নেই। তবে শর্তের ফাইলের মূল্যটি তার বাস্তবিক মূল্য হতে হবে। কারণ, তার মাধ্যমে বাস্তবিক ব্যয় উসুল করা হচ্ছে।'[২৯০]

---

২৯০ মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যা : অষ্টম : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫, ফিকরাহ নং ৫, সিদ্ধান্ত নং ৭৩ (৮/৪)। ১৪১৪ হিজরি সনে ব্রুনাইয়ের দারুস সালাম-এ অনুষ্ঠিত অষ্টম অধিবেশন।

৪৬. প্রাথমিক জামানত নেওয়ার হুকুম

ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ক্ষেত্রবিশেষ মূল্য প্রস্তাবে আগ্রহের প্রমাণস্বরূপ ঠিকাদার হতে প্রাথমিক জামানত নেওয়া হয়। আগ্রহপ্রকাশক অর্থের আলোচনায় এ ধরনের অর্থের শরয়ি হুকুম আলোচনা করেছি। মূল্য প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশের নিশ্চয়তার জন্য যদি অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ না-করা হয়, তা হলে এমন অর্থ নেওয়ার ব্যাপারে কোনো শরয়ি বাধা নেই। এ উপাদানগুলো তখনই পাওয়া যাবে, যখন প্রদত্ত অর্থটি গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে আমানত হিসাবে থাকবে এবং সে যদি অন্য সম্পদের সঙ্গে সেটি মিলিয়ে ফেলে, তা হলে সেটির দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে। জামানতদাতার অনুমতিতে যদি ওই অর্থ দ্বারা কোনো লাভ করে, তা হলে অর্থ দাতা সে লভ্যাংশ পাবে। জামানতদাতা যদি সফল না-হয়, অর্থাৎ, তার প্রস্তাবিত মূল্য গ্রহণ না-করা হয়, তা হলে শরয়ি পদ্ধতিতে অর্জিত লভ্যাংশসহ তার পূর্ণ অর্থ ফেরত দিতে হবে।

মূল্য প্রস্তাবক কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ প্রস্তাবের নির্ধারিত তারিখের আগে উঠিয়ে নিতে চাইলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেটে নিয়ে ফেরত দেওয়ার প্রচলিত যে নিয়ম রয়েছে, সেটি কোনোভাবেই শরিয়তসম্মত নয়। এটা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা। কেননা, ইতঃপূর্বে বিশ্লেষণ করেছি যে, মূল্য প্রস্তাব করা হলো এক পক্ষ থেকে ইজাব করা। ফলে অপর পক্ষ থেকে কবুল করার আগে প্রত্যেক ইজাবকারীর জন্য তার ইজাব প্রত্যাহার করার শরয়ি অধিকার রয়েছে। সুতরাং আগ্রহ প্রকাশক অগ্রিম জামানত থেকে অর্থ কেটে নেওয়ার কোনো শরয়ি কারণ নেই। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে মূল্য প্রস্তাবক তার প্রস্তাব প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে অর্থ কেটে নেওয়ার মাধ্যমে তাকে দণ্ডিত করা কীভাবে জায়েয হতে পারে?

এমনকি আমরা যদি মালেকি মাযহাবের সেসব ফকিহদের মত গ্রহণ করি, যারা নিলামের ক্ষেত্রে প্রস্তাবকের জন্য চুক্তি বাস্তবায়ন করা আবশ্যক হওয়ার মত দিয়েছেন। অপর পক্ষ কবুলের আগে প্রস্তাবক কর্তৃক তার প্রস্তাব প্রত্যাহারের অধিকার স্বীকার করেন না। তাদের আবশ্যক করার এ মতের মূলকথা হলো, বিচারিক দিক থেকে তাকে চুক্তি করতে বাধ্য করা বা তার কারণে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার প্রকৃত ক্ষতিপূরণ দাবি করা। এ ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে অর্থ কেটে নিলে সেটি আর্থিক জরিমানা হবে, যা জায়েয নেই। তবে যারা আর্থিক জরিমানা আরোপকে জায়েয বলেছেন, তাদের মতে কাজি
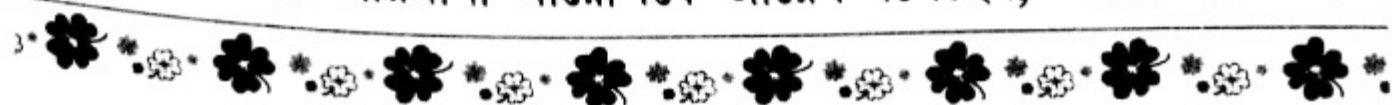
ছাড়া অন্য কারো জন্য এমন শাস্তি আরোপ করা জায়েয নেই। বিশেষ করে মালেকি মাযহাবের ফকিহগণ কেবল সেক্ষেত্রে ইজাবকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন, যেখানে সরাসরি নিলাম ডেকে নিলামের মজলিসে মূল্য প্রস্তাব করা হয়। অথচ স্পষ্টভাবে নিলামের প্রতিটি পদক্ষেপ গোপন টেন্ডারের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। সেখানে এমন দীর্ঘ মেয়াদের পর চুক্তি সম্পন্ন হয় যে ওই মেয়াদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বাজার দর পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সুতরাং মূল্য প্রস্তাবক নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে তার জামানত ওঠাতে চাইলে সেখান থেকে অর্থ কেটে নেওয়া জায়েয নেই। এক্ষেত্রে অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যে, সর্বাবস্থায় জামানত ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক সাব্যস্ত করলে জামানতের কোনো উপকারিতা পাওয়া যাবে না। (তা হলে জামানতের উপকারিতা কী?)

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, বর্ণিত প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত অর্থটি শুধু প্রস্তাবকের আগ্রহের প্রমাণ, ফিকহি পরিভাষায় সেটি কোনো জামানত না। কারণ, জামানতের আগে সে ব্যক্তি ঋণী সাব্যস্ত হতে হয়। শুধু মূল্য প্রস্তাবে অংশ নেওয়া ব্যক্তির উপর পণ্যের মালিকের পক্ষ হতে কোনো ধরনের ঋণ সৃষ্টি হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্ণিত প্রক্রিয়ায় যে ব্যক্তি অর্থ দিচ্ছে, ওই অর্থ মূল্য প্রস্তাবে তার আগ্রহ প্রমাণ করে। কেননা, প্রকৃত চুক্তিতে অংশ গ্রহণের নিয়ত ছাড়া সামান্য সময়ের জন্য হলেও কেউ আর্থিক সুবিধা হতে বঞ্চিত হতে প্রস্তুত হয় না। কাজেই এখানে সে কাঙ্ক্ষিত আগ্রহটি পাওয়া যাচ্ছে। والله تعالى أعلم

৪৭. চূড়ান্ত জামানতের হুকুম

চূড়ান্ত জামানতের বিষয়টি হলো, মূল্য প্রস্তাবকদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি বিজয়ী হয় তার কাছ থেকে চূড়ান্ত জামানত নেওয়া হয়। এটির উদ্দেশ্য হলো, টেন্ডারে বিজয়ী ব্যক্তি চুক্তির আবশ্যকীয় সব প্রক্রিয়াগুলো বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে। অনেকে মনে করেন, এ প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত অর্থটি আরাবুনের অর্থ হিসাবে গণ্য হবে, তবে বিষয়টি এমন নয়। কারণ, হাম্বলি মাযহাবের যেসব ফকিহ আরাবুনকে জায়েয বলেছেন, তারা ওই আরাবুনকে জায়েয বলেছেন, যা ক্রেতা দিয়ে থাকে। টেন্ডারটি যদি আমদানী, পণ্য প্রস্তুত, ভাড়া, সেবা ইত্যাদির বিষয়ে হয়, তা হলে বিক্রেতা প্রস্তাবকের ভূমিকা পালন করে। সঠিক কথা হলো, বিক্রেতা বা ভাড়াদাতার কাছ থেকে জামানতস্বরূপ অর্থ
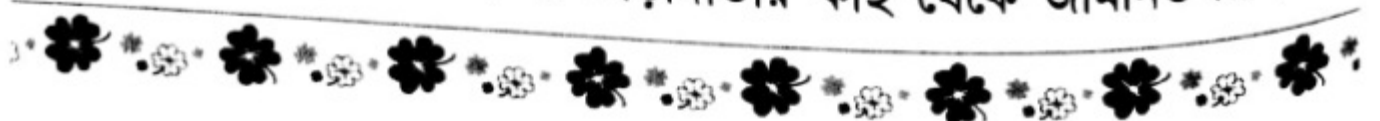
নেওয়ার ব্যাপারে কোনো ফিকহি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তবে বাইয়ে সালামের মধ্যে মুসলিম ইলাইহি থেকে বন্ধক নেওয়ার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেটিকে অনেক ফকিহ জায়েয বলেছেন, আবার অনেকে না-জায়েয বলেছেন। কিন্তু তারপরও সেটি তখনই সম্ভব, যখন চুক্তিটি চূড়ান্ত চুক্তি হবে। যেমন : বাইয়ে সালাম ও অর্ডারের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

আমদানির এগ্রিমেন্টের ব্যাপারে ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সেটি চূড়ান্ত চুক্তি নয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত অর্থ সম্পর্কে সর্বোচ্চ এ কথা বলা যায় যে, সেটি আগ্রহ প্রকাশের প্রমাণ হিসাবে প্রদেয়। তাই প্রাথমিক প্রদেয় জামানত সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, হুবহু এখানেও সেটি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, প্রদত্ত অর্থটি আমানত হিসাবে থাকবে, সেটিকে নিজের সম্পদের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে তার জামানত বহন করতে হবে এবং শরয়ি পদ্ধতিতে সেখান থেকে লাভবান হলে চূড়ান্ত চুক্তির সময় সেটি অর্থদাতাকে ফেরত দিতে হবে। অর্থদাতা তার দায়িত্ব রক্ষা না-করার কারণে অপর পক্ষ আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া ওই অর্থ থেকে টাকা কেটে নেওয়া যাবে না। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিপূরণের চেয়ে বেশি অর্থ নেওয়া যাবে না। সুতরাং তার কারণে ক্ষতি হলে, প্রদত্ত অর্থ এবং প্রকৃত ক্ষতিপূরণের মধ্যে সমন্বয় করে নেওয়া যেতে পারে। নিলামের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপের ব্যাপারে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে–

> طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعا، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.
>
> ‘নিলামে অংশগ্রহণে আগ্রহীদের থেকে জামানত নেওয়া জায়েয আছে। যার প্রস্তাব গৃহীত হয়নি, এমন প্রত্যেকের জামানত ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। যার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তার জামানত এবং মূল্যের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে।’[২৯১]

এ সিদ্ধান্তটি যেহেতু নিলাম সম্পর্কিত ছিল এবং সেখানে ক্রেতা থেকে

---

২৯১. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যা : অষ্টম : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫, ফিকরাহ নং ৪০, সিদ্ধান্ত নং ৭৩ (৮/৪)। ১৪১৪ হিজরি সনে ব্রুনাইয়ের দারুস সালাম-এর অনুষ্ঠিত অষ্টম অধিবেশন।
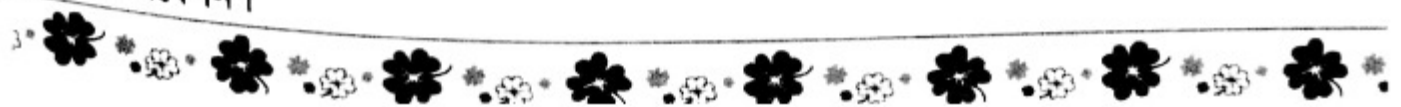
জামানত নেওয়া হয়। সুতরাং সেটিকে আরাবুনের মূলনীতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। কিন্তু টেন্ডারের বিষয়টি অনুরূপ নয়, এতে বিক্রেতা বা ঠিকাদার থেকে জামানত নেওয়া হয়। অতএব, কোনো একজনের সঙ্গে বিক্রয়ের সবগুলো পদক্ষেপ সম্পন্ন করার পর জামানতের সব অর্থ ফেরত দেওয়া আবশ্যক। ওয়াদা ভঙ্গ করা ছাড়া জামানতের অর্থ কেটে নেওয়া যাবে না। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে বলেছি যে, কোনো এক পক্ষ তার ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে অন্য পক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার প্রকৃত ক্ষতিপূরণ হিসাবে জামানতের অর্থ থেকে কেটে নেওয়া জায়েয আছে। সুতরাং তখন ক্ষতি ও জামানতের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। والله تعالى أعلم

৪৮. নিলাম ও টেন্ডারের সমস্যাসমূহ

শরয়ি দিক থেকে যদিও নিলাম ও টেন্ডার জায়েয; তবে অনেক সময় এর সঙ্গে এমন কিছু বিষয় সম্পৃক্ত হয়, যেগুলো চুক্তিকে না-জায়েয করে দেয়। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতীয় কিছু সমস্যা নিচে উল্লেখ করা হলো–

৪৯. না-জায়েয বিষয়ে নিলাম করা

শরিয়তে যেগুলোর লেনদেন জায়েয নেই এমন জিনিসের ব্যাপারে নিলাম বা টেন্ডার করা। যেমন, মদ, শূকর। এ ধরনের জিনিসের চুক্তিতে অংশ নেওয়া জায়েয নেই। এ মূলনীতি অনুযায়ী সরকারি কোষাগারের সুদি বন্ডের (Treasury Bills) নিলাম বা টেন্ডারে অংশ নেওয়া এবং চুক্তি করা জায়েয নেই। কারণ, সরকারি কোষাগারের বন্ডগুলো সুদি বন্ড হয়ে থাকে। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার সেগুলো ইস্যু করে থাকে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর এ বন্ডগুলোর বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার থাকে। যেমন, নির্দিষ্ট মেয়াদ পর এক লক্ষ ডলার দেওয়া হবে। এ বন্ডগুলো তার গায়ের মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক লক্ষ মূল্যের একটি বন্ডকে পঁচানব্বই হাজার ডলারে বিক্রয় করা হয়, যেন সেটি উসুলের তারিখে ক্রেতা এক লক্ষ ডলার উসুল করে পাঁচ হাজার ডলার লাভ করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ ধরনের বন্ডের নিলাম আহ্বান করা হয়। তার গায়ের মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য প্রস্তাবকারীদের মধ্যে যার মূল্য সবচেয়ে বেশি হয়, তার কাছে সেগুলো বিক্রয় করা হয়, যেন ক্রেতা তার ক্রয় মূল্য ও গায়ের মূল্যের পার্থক্যের মাধ্যমে লাভবান হতে পারে।
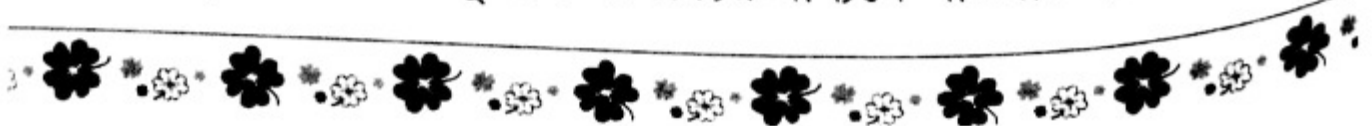
এ প্রক্রিয়ার মধ্যে দুটি সমস্যা রয়েছে। প্রথম সমস্যা হলো, এগুলো নিশ্চিত সুদি ঋণ। দ্বিতীয় সমস্যা হলো, সাধারণত এ বন্ডগুলো ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয় সেকেন্ডারি মার্কেটে সেগুলো বিক্রয় করে লাভ করা। এ প্রক্রিয়ায় বিক্রয় করলে সেটি ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হয়। সুতরাং এ ধরনের নিলামে অংশ নেওয়া জায়েয নেই। ঋণ বিক্রয়ের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ।

৫০. মূল্য ঠিক রাখতে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে "নাজাশ" করা

"নাজাশ" বা জাল প্রস্তাব হচ্ছে, নিজে ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যকে বেশি মূল্যে ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে বলা। হাদিসে এটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাকরুহ বিক্রয়ের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু এখানে যে বিষয়টি আলোচনা করা দরকার তা হলো, ক্রেতামহলকে নিলামে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যদি নাজেশ (জাল প্রস্তাবক) নিয়োগ দেওয়া হয়, তা হলে অনেক প্রচলিত আইন এ প্রক্রিয়াতে বাধা দেয় না। সুইডেনের আইনে এমনটি পাওয়া যায়। আরও কিছু রাষ্ট্রের আইন নাজাশকে নিষিদ্ধ করে না। কিন্তু এটি নিলাম আহ্বানকারীদের দুর্নামের কারণ হয়।[২৯২] ব্রিটিশ আইন ক্ষেত্রবিশেষে নাজাশের অনুমতি দিয়েছে। সে বিশেষ ক্ষেত্রের একটি হলো, জমি বিক্রয় করা। বিক্রেতা সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করে এমন একজনকে নিয়োগ দেয়, যে ব্যক্তি অন্যান্য ক্রেতার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বেশি মূল্য প্রস্তাব করবে।[২৯৩]

ইসলামি শরিয়ত এ ধরনের ধোঁকার সুযোগ দেয় না। এটি নিষিদ্ধকারী হাদিসের উদ্দেশ্য ব্যাপক, যেটি সব অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্ণিত পদ্ধতিতে ধোঁকার উপাদান বিদ্যমান। বিক্রেতা যদি নির্দিষ্ট মূল্য ঠিক রেখে নিজের জন্য মূল্য প্রস্তাবের অধিকার সংরক্ষিত রাখে, তা হলে শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি না-জায়েয। والله تعالى أعلم

বিক্রেতা যদি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ না করে, সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ আইন নাজাশকে নিষিদ্ধ করে। সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, বিক্রেতা যদি কাউকে জাল

---

২৯২. Wikipedia, `Auction' _Collusion.
২৯৩. Wikipedia, `Auction' _Chandelier or Rafier Bidding. It seems that the language of Section 64 (4) & (5) has room for such a practice.
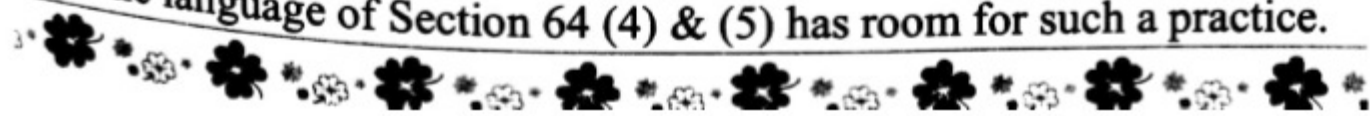
প্রস্তাবক হিসাবে নিয়োগ দেয়, তা হলে যার মূল্য গৃহীত হবে এবং শেষ পর্যায়ে যে ব্যক্তি পণ্যটি ক্রয় করতে পারবে, তার এ অধিকার থাকবে যে, বিক্রেতার বিপক্ষে বিচারকের কাছে মামলা দায়ের করে ধোঁকার কারণে চুক্তি বাতিল করবে।

শরয়ি দৃষ্টিকোণে এ পদ্ধতির হুকুম : সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ এ মত পোষণ করেছেন যে, নাজেশ (জাল প্রস্তাবক) তার কৃতকর্মের কারণে গোনাহগার হবে; কিন্তু সে কারণে চুক্তি বাতিল হবে না। মাকরুহ বিক্রয়ের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ। তবে এক্ষেত্রে চুক্তিটি বাতিল হওয়ার পক্ষে মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের একাধিক বর্ণনা রয়েছে। এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক লোকসান প্রমাণিত (غبن فاحش) হলে ক্রেতার জন্য চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে। শাফেয়ি মাযহাবে চুক্তি ভঙ্গ করার বিষয়টিকে এভাবে শর্তারোপ করা হয়েছে যে, নাজাশটি বিক্রেতার সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে হতে হবে। হানাফি মাযহাবের মূলনীতি হলো, ধোঁকাগ্রস্তের জন্য চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার নেই। তবে হানাফি মাযহাবের পরবর্তী ফকিহগণ ধোঁকা দেওয়ার কারণে ধোঁকাগ্রস্তের জন্য চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকারের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। ধোঁকাগ্রস্তের অধিকারের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ।

৫১. নিলামে অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক সমঝোতা

অনেক এলাকায় এমন প্রচলন আছে যে, নিলামে অংশগ্রহণকারীরা পরস্পর এমন সমঝোতা করে যে, তাদের কেউ নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য প্রস্তাব করবে না। এ ধরনের সমঝোতা পণ্যের মূল্যে স্পষ্ট প্রভাব ফেলে। সেটি এভাবে যে, পণ্যের মূল্য সমঝোতাকারীদের ইচ্ছার বাইরে যেতে পারে না। এ উদ্দেশ্যে তারা একটি দল গঠন করে তার নাম দেয় রিং (Ring)। এ ধরনের সমঝোতা করাকে 'ঘুমপাড়ানো' (Knock out) নাম দেওয়া হয়। যেন বিক্রেতা বা অন্যান্য অংশ গ্রহণকারীদের তারা ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। ব্রিটেনের প্রচলিত আইনে এ ধরনের সমঝোতাকে বৈধ বলা হয়েছে। ব্রিটিশ ও হিন্দুস্তানের আইনে এ বিষয়টি বৈধ হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।[২৯৪] এরপর এ ধরনের সমঝোতা যদি কোনো উপঢৌকন বা বিনিময়ের

---

২৯৪. Pollock & Mulla on Sale of Goods Act, pp. 467, 468.

দ্বারা হয়, তা হলে সেটিকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের আইনে জরিমানাযোগ্য অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।[২৯৫] আইনের এ ধারা থেকে বোঝা যায়, কোনো ধরনের উপঢৌকন বা বিনিময় তথা ঘুষ ছাড়া যদি এ ধরনের সমঝোতা করা হয়, তা হলে আইনের দৃষ্টিতে সেটি নিষিদ্ধ নয়।

নিলামের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমঝোতার ব্যাপারে ইসলামি আইনবেত্তাগণ কোনো বক্তব্য দেননি। তবে তাঁদের মূলনীতির ব্যাপকতা এবং শরিয়তের উদ্দেশ্য থেকে বোঝা যায়, বিক্রেতা বা নিলামে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষতি হলে ইসলাম এ ধরনের সমঝোতার অনুমতি দেয় না। কারণ, লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ত যে বিষয়কে মূল হিসাবে সাব্যস্ত করেছে তা হলো, বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে দরদামের অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে। এ স্বাধীনতার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ হতে হবে। এ কারণে ইসলামি শরিয়ত মজুতদারি (অন্যায্য পন্থায় খাদ্যপণ্য আটকে রাখা), শহরের বাইরে গিয়ে ক্রয় ও কৃষকদের থেকে আগে গিয়ে ক্রয় করাকে নিষিদ্ধ করেছে। মাকরুহ বিক্রয়ের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ। কিছু হাদিসে বর্ণিত অংশবিশেষ থেকেও এ ব্যাপারে দলিল দেওয়া যেতে পারে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– لا تناجشوا 'তোমরা নাজাশ করো না।'[২৯৬] তানাজুশ (تناجش) (বাবে তাফাউল থেকে হওয়ার কারণে) পারস্পরিক নাজাশ হওয়া বোঝায়। অর্থাৎ, একাধিক পক্ষ থেকে নাজাশ হবে। যদিও হাদিসের ব্যাখ্যাকারগণ অন্যভাবে হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন। والله تعالى أعلم

তারপর অনেক সময় এভাবে সমঝোতা করা হয় যে, চুক্তিকৃত সদস্যদের কোনো একজন নির্বাচিত হলে সে অন্যদের সঙ্গে নিলাম করবে। উভয় নিলামের মধ্যকার মূল্যটি চুক্তির সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।[২৯৭] এক্ষেত্রে পূর্বেরটি অপেক্ষা গুরুতর আরও একটি সমস্যা রয়েছে এবং সেটি হলো, উভয় মূল্যের মধ্যকার যে অর্থকে সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, সেটি সমঝোতার ঘুষ হওয়ায় শরয়ি দিক থেকে তা না-জায়েয। বাস্তবতা হলো, পশ্চিমা দেশের অধিকাংশ আইন পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থা নির্ভর করে প্রস্তুত করা, যেগুলোর

---

২৯৫. Auctions (Bidding Agreements) Act 1927, Section-1 (1)

২৯৬. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: অন্যের বিক্রয়ের আগে বিক্রয় করবে না... হাদিস নং ২১৪০।

২৯৭. Wikipedia, `Auction' _Collusion
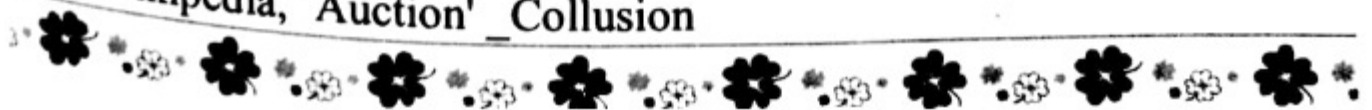
মূলভিত্তি হলো বেশি লাভ অর্জনে মানুষের স্বাধীনতা দেওয়া। তাদের আইন প্রণয়ণ কখনো ব্যাপক ক্ষতি বা অন্য কোনো দিক বিবেচনা করে হয়ে থাকে। আইন প্রণেতাদের সিদ্ধান্ত যে দিকে যায়, তার ওপর নির্ভর করে তারা কোনো পদ্ধতিকে কখনো বৈধ বলেন আবার কখনো অবৈধ বলেন।

বিক্রয়ের রুকন তথা ইজাব-কবুলের আলোচনার পর এখন উভয় পক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলা সঠিকভাবে বলার তৌফিক দিন।

* * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধি-বিধান

- ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ চুক্তির যোগ্য হওয়া
- উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিধান
- উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির শর্ত বহির্ভূত বিধানসমূহ

৫২. প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ চুক্তির যোগ্য হওয়া

বিক্রয়চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উভয় পক্ষ ভালো-মন্দ যাচাইয়ের যোগ্যতাসম্পন্ন ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। সুতরাং অবুঝ বাচ্চা ও মস্তিষ্কবিকৃত ব্যক্তির বিক্রয় সংঘটিত হবে না। বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, মুসলিম ও সর্বাঙ্গ সুস্থ হওয়া শর্ত নয়। উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ।

৫৩. অবুঝ বাচ্চার ক্রয়-বিক্রয়

এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, অবুঝ বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য নয়। তবে বুদ্ধিসম্পন্ন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফি, মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হলো, এমন বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য।[২৯৮] শাফেয়ি মাযহাবের মত হলো, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও সে ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য নয়। ইমাম গাযালি (রহ.) বলেছেন–

---

২৯৮. আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন, আমাদের মতে বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত নয়। এমনকি কোনো বুঝমান শিশু নিজের সম্পদ বিক্রয় করলে তা সংঘটিত হবে এবং তার অভিভাবকের অনুমোদনের ওপর মওকুফ থাকবে। আর প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পর তার অনুমোদনের ওপর মওকুফ থাকবে। আল্লামা দারদির (রহ.) বলেছেন, চুক্তি সহিহ হওয়ার শর্ত হলো, তার চুক্তিকারী তথা বিক্রয়ের চুক্তিকারী বুঝমান হতে হবে। সেটি এভাবে যে, বাচ্চা বুঝমানদের মতো কথা বলবে, তা বোঝবে এবং ভালোভাবে উত্তর দিতে পারবে। সুতরাং বুঝমান না এমন শিশুর বিক্রয় সংঘটিত হবে না। কারণ সে ছোট, বেহুঁশ ও পাগলের মতো। আল্লামা মারদাবি (রহ.) বলেছেন, দ্বিতীয় চুক্তিকারী এমন হতে হবে, যার হস্তক্ষেপ জায়েয। এমন ব্যক্তির উদাহরণ হলো, বুঝমান মুকাল্লাফ... তবে বুঝমান শিশু ও নির্বোধের বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, এক বর্ণনা অনুযায়ী অভিভাবকের অনুমোদনের মাধ্যমে তাদের হস্তক্ষেপ সহিহ। আমাদের ইমামগণ এটি গ্রহণ করেছেন। বাদায়েউস সানায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২১, আদ-দুসুকি আলা শারহি মুখতাসারি খলিল : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩, আল-ইনসাফ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৭।

فتصرفات الصبي والمجنون بإذن الولي ودون إذنه، وبالغبطة والغبينة باطلة.

'অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা এবং পাগলের সব লেনদেন বাতিল বলে গণ্য হবে, তার অভিভাবকের অনুমতিতে হোক বা অনুমতি ছাড়া হোক, ভালো–মন্দ সর্বক্ষেত্রে একই হুকুম।'[২৯৯]

ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন–

يصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء، فيما أذن له الولي فيه، في إحدى الروايتين، وهو قول أبي حنيفة، والأخرى: لا يصح حتى يبلغ، وهو قول الشافعي، لأنه غير مكلف، فأشبه غير المميز، ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصح به التصرف، لخفائه وتزايده تزايدا خفي التدريج، فجعل الشارع له ضابطا، وهو البلوغ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة.

ولنا قول الله تعالى : "وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ" معناه، اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق اختبارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء، وليعلم هل يغبن أو لا، ولأنه عاقل مميز محجور عليه، فيصح تصرفه بإذن وليه، كالعبد، وفارق غير المميز، فإنه لا تحصل له المصلحة بتصرفه لعدم تمييزه ومعرفته، ولا حاجة إلى اختباره، لأنه قد علم حاله.

وقولهم : "إن العقل لا يمكن الإطلاع عليه" قلنا : يعلم ذلك بآثاره وجريان تصرفاته على وفق المصلحة، كما يعلم في حق البالغ، فإن معرفة رشده شرط دفع ماله إليه وصحة تصرفه؛ كذا ههنا. فأما إن تصرف بغير إذن وليه، لم يصح تصرفه. ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة الولي، هو قول أبي حنيفة... وأما غير المميز فلا يصح تصرفه، وإن أذن له الولي فيه،

---

২৯৯. আল-ওয়াসিত, ইমাম গাযালি (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২।

إلا في الشيء اليسير، كما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه اشترى من صبي عصفورا، فأرسله، ذكره ابن أبي موسى.

'দুটি মতের মধ্যে একটি অনুযায়ী বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তার ক্রয়-বিক্রয় সহিহ হবে। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত। দ্বিতীয় মত হলো, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ছাড়া তার ক্রয়-বিক্রয় সহিহ হবে না। এটি ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মত। কারণ, সে শরিয়তের মুকাল্লাফ না হওয়ায় অবুঝের মতো। তা ছাড়া জ্ঞানের জন্য এমন একটি নির্দিষ্ট অবস্থান নির্ধারণ করা অসম্ভব, যে পর্যন্ত পৌঁছলে মানুষের লেনদেন সহিহ হবে। কারণ, সেটি অস্পষ্ট এবং তা বৃদ্ধির বিষয়টিও সূক্ষ্ম অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল। তাই শরিয়ত একটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছে যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। সুতরাং প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার এ কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি পাওয়ার আগ পর্যন্ত কারো ক্ষেত্রে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না।

'আমাদের দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী, 'এতিমরা প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করো। এরপর যদি তাদের জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারো, তা হলে তাদের সম্পদ তাদের কাছে দিয়ে দাও।'[৩০০] আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, তাদের জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষা করো। তাদেরকে ক্রয়-বিক্রয়ের দায়িত্ব দেওয়ার মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করতে হবে যে, তারা ধোঁকাগ্রস্ত হচ্ছে কি না? আর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির ওপর কিছু বিধি-নিষেধ রয়েছে। সুতরাং তার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তার লেনদেন সহিহ হবে। যেমন : দাস। অবুঝ বাচ্চাকে এ হুকুম থেকে ভিন্ন রাখা হয়েছে। কারণ, ভালো-মন্দ না-বোঝা ও তার মধ্যে পার্থক্য করতে না-পারার কারণে তার লেনদেনে কোনো উপকারিতা পাওয়া যায় না। তাকে লেনদেনে স্বাধীনতা দেওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, তার অবস্থা সবার কাছে স্পষ্ট।

৩০০. সুরা নিসা : আয়াত-৬।

তাঁদের বক্তব্য, 'জ্ঞান এমন একটি বিষয়, যেটি জানা অসম্ভব।' এ বক্তব্যের উত্তরে আমরা বলবো, বিভিন্ন লক্ষণ ও তার কাজের উপকারী দিক বিবেচনা করে জ্ঞান সম্পর্কে অবগতি লাভ করা সম্ভব। যেমনটি প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে জানা সম্ভব। কারণ, তার কাছে সম্পদ হস্তান্তর করা এবং তার লেনদেন সহিহ সাব্যস্ত করার জন্য সে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া শর্ত। সুতরাং এখানেও অনুরূপ হুকুম হবে। তবে এমন ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া লেনদেন করলে উক্ত লেনদেন সহিহ হবে না। এমন লেনদেনকে সহিহ সাব্যস্ত করার বিষয়টিকে অভিভাবকের অনুমতির ওপর মওকুফ (মুলতবি) রাখা যেতে পারে। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত। ... অবুঝ বাচ্চাকে তার অভিভাবক অনুমতি দিলেও তার লেনদেন সহিহ হবে না। তবে অল্প জিনিস বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সহিহ হবে। যেমন, হযরত আবু দারদা (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একজন বাচ্চা থেকে একটি পাখি ক্রয় করে সেটি ছেড়ে দেন। হযরত ইবনে আবু মুসা (রহ.) ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।'[৩০১]

ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) যে মত বর্ণনা করেছেন দলিলের দিক থেকে সেটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কারণ, অনেক সময় বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। তার ক্ষেত্রে সমস্যাটি দূর হয় ভালো–মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মতো বুঝের মাধ্যমে। সেইসঙ্গে তার লেনদেনে সম্ভাব্য সমস্যাটিও দূর হয়ে যায় তার লেনদেনকে অভিভাবকের অনুমতির ওপর মওকুফ করার মাধ্যমে। والله تعالى أعلم

এরপর হানাফি, মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের মতে, বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চার লেনদেন তার অভিভাবকের অনুমতির ওপর মওকুফ অবস্থায় কার্যকর হবে। এ হুকুম সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে অভিভাবকের পক্ষ থেকে বাচ্চাকে ব্যাবসায়িক লেনদেনের অনুমতি দেওয়া হয় না। হানাফি মাযহাবে শুধু ক্ষতিকর লেনদেন ছাড়া অন্যান্য সব লেনদেনের ক্ষেত্রে অভিভাবক কর্তৃক বাচ্চাকে অনুমতি দেওয়া জায়েয আছে। যেমন, ঋণ, কাফালাত, দান ইত্যাদির মতো লেনদেন ছাড়া অন্যান্য লেনদেনে অনুমতি দেওয়া। অভিভাবক যদি এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন ছাড়া অন্যান্য লেনদেনের ব্যাপারে বাচ্চাকে

---

৩০১. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৬।

অনুমতি দেয়, তা হলে তার লেনদেনগুলো বিশেষ অনুমতির ওপর মওকুফ থাকবে না। এ সম্পর্কে আল্লামা হাসকাফি (রহ.) বলেছেন–

فإن أذن لهما (أي للصبي والمعتوه) الولي، فهما في شراء وبيع كعبد مأذون في كل أحكامه.

'বাচ্চা ও নির্বোধকে যদি তাদের অভিভাবক লেনদেনের অনুমতি দেয়, তা হলে লেনদেনের সর্বক্ষেত্রে তারা অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের মতো হবে।'[৩০২]

সুতরাং অভিভাবক কর্তৃক পূর্ব থেকে আম অনুমতির ভিত্তিতে কোনো বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চা যদি ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া-নেওয়া অথবা এমন কোনো চুক্তি করে, যেটি লাভ–লোকসানের সম্ভাবনা রাখে, তা হলে এমন বাচ্চা থেকে চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার সময় থেকেই চুক্তিটি সহিহ ও কার্যকর হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ হুকুমকে ব্যাপক রেখেছেন। এমনকি অস্বাভাবিক কম-বেশিতে এমন বাচ্চা লেনদেন করলেও সেটিকে জায়েয বলেছেন। তবে সাহেবাইন (রহ.) এ হুকুমের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, অস্বাভাবিক কম-বেশির ক্ষেত্রে এমন বাচ্চার লেনদেন কার্যকর হবে না।[৩০৩] আর এ মতটিই যে শিশুর জন্য অধিক কল্যাণকর, তা খুবই স্পষ্ট।

এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামি ফিকহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সেসব প্রচলিত আইনের বিরোধ রয়েছে, যেখানে যে কোনো চুক্তির জন্য চুক্তিকারী প্রাপ্ত বয়সের হওয়া শর্ত করা হয়েছে। ব্রিটেন প্রণীত চুক্তি আইনের ১১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'চুক্তির যোগ্য হওয়ার জন্য চুক্তিকারী সে দেশের প্রচলিত আইনে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়া আবশ্যক।' পূর্বেকার ব্রিটিশ আইনে প্রাপ্ত বয়সের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে একুশ বছর। এরপর পারিবারিক আইনের মাধ্যমে সেটিকে সংস্কার করে আঠারো বছরে কমিয়ে আনা হয়েছে। আঠারো বছরের কম বয়সের মানুষ যেহেতু অনেক বিষয়ে চুক্তি করতে বাধ্য হয়, তাই ওই আইনে প্রয়োজনীয় জিনিসের (Necessaries) ক্ষেত্রে আঠারো বছরের কম বয়সের মানুষের জন্য চুক্তি করার অনুমতি দিয়েছে। এ আইনের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে সেখানে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে।[৩০৪]

---

৩০২. আদ-দুররুল মুখতার, আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.)-এর ব্যাখ্যাসহ, অধ্যায়: মা'যুন : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭৩।

৩০৩. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭৩।

৩০৪. Chitty: On Contracts, v. 1. p. 220 para 472 etc.

অভিভাবকের অনুমতির শর্তের মাধ্যমে ফিকহে ইসলামিতে এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। তার কারণ, সব বাচ্চার সব লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা কঠিন। প্রত্যেক বাচ্চার অভিভাবক বাচ্চার অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা রাখেন এবং তার কোন ধরনের চুক্তি করার প্রয়োজন এবং কোনটি ক্ষতিকর সে সম্পর্কেও অভিভাবক অবগত থাকেন।

৫৪. শিশুর বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার বয়স

বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার বয়স অনেক ফকিহ সাত বছর নির্ধারণ করেছেন। যেমনটি আল্লামা হাসকাফি (রহ.) 'আদ-দুররুল মুখতার'-এ বলেছেন এবং আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) 'ফাতাওয়া কারিইল হেদায়া' থেকে উদ্ধৃত করেছেন।[৩০৫] এ কথা স্পষ্ট যে, বয়সের এ বিষয়টি তারা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিম্নের বাণী থেকে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع.

'সাত বছর বয়সে তোমাদের বাচ্চাদের নামাজের নির্দেশ দাও।'[৩০৬]

তবে লেনদেনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার সময়কে নির্দিষ্ট বয়সের সঙ্গে শর্তযুক্ত করেননি। কারণ, বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের অবস্থা ভিন্ন হয়ে থাকে। অনেক বাচ্চা অল্প বয়সেই লেনদেন সম্পর্কে বুঝে ফেলে। আবার অনেকের বুঝতে বেশি সময় লেগে যায়। সুতরাং এ ব্যাপারে মানদণ্ড হলো, চিন্তাশক্তি পরিপূর্ণ হওয়া। নির্দিষ্ট কোনো বয়স কোনো মানদণ্ড নয়। 'আদ-দুররুল মুখতার' কিতাবে বয়স সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, সেটি বাচ্চার ইসলামে দীক্ষিত হওয়া গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) 'আদ-দুররুল মুখতারের' বক্তব্য সম্পর্কে 'ইনায়াহ' কিতাব থেকে উদ্ধৃত করে এভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন যে, বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চা হলো সেই বাচ্চা, যে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। আর এটাও বুঝতে পারে যে, ইসলাম হচ্ছে সঠিক পথ প্রদর্শক এবং তার জন্য উপকারী। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর ব্যাখ্যা করেছেন, যে শিশু ইসলামের গুণাবলি বোঝে সে বুদ্ধিসম্পন্ন। এরপর আল্লামা হাসকাফি (রহ.)

---

৩০৫. রাদ্দুল মুহতার, পরিচ্ছেদ : জানাযার নামাজ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩২১, ফিকরাহ নং ৭৫৫৭।
৩০৬. সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়: নামাজ, হাদিস নং ৪৯৫।

নিজে 'অনুমতি অধ্যায়ে' লেনদেনের ক্ষেত্রে শিশু বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার আলোচনায় নির্দিষ্ট কোনো বয়সের শর্তারোপ করেননি; বরং সেখানে বলেছেন–

(والشرط) لصحة الإذن: (أن يعقلا البيع سالبا للملك) عن البائع، (والشراء جالبا له)، زاد الزيلعي: وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش

'অনুমতি সহিহ হওয়ার শর্ত হলো, লেনদেনকে এভাবে বুঝবে যে, সেটি বিক্রেতার মালিকানা শেষ করে এবং ক্রয় বস্তুকে ক্রেতার মালিকানায় পৌঁছে দেয়। আল্লামা যাইলায়ি (রহ.) আরও বাড়িয়ে বলেছেন, লাভ অর্জন করা এবং কম-বেশি করার ক্ষেত্রে প্রতারণা বুঝতে পারবে।'[৩০৭]

৫৫. লেনদেনের ক্ষেত্রে শিশুকে অনুমতি কে দেবে

হানাফি মাযহাবে লেনদেনের ক্ষেত্রে যারা শিশুকে অনুমতি দেওয়ার অধিকার রাখে, তাদের পর্যায়ক্রমিক তালিকা হলো– পিতা, পিতা মারা যাবার আগে কারো ব্যাপারে অসিয়ত করে গেলে সে ব্যক্তি (وصي), অসিয়তকারীর অসিয়তকৃত ব্যক্তি (وَصِيُّ الْوَصِيِّ), আপন দাদা, দাদার পিতা বা তদূর্ধ্ব দাদা, দাদার অসিয়তকৃত ব্যক্তি, অসিয়তকারীর অসিয়তকৃত ব্যক্তি, স্থানীয় সরকার প্রধান, এরপর কাজি।[৩০৮] হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেন,

ولا ينظر في مال الصبي والمجنون ما داما في الحجر إلا الأب أو وصيه بعده، أو الحاكم عند عدمهما.

'শিশু বা পাগলের লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়ার সময়ে তার পিতা, পিতার অসিয়তকৃত ব্যক্তি এবং তারা না-থাকলে বিচারক ছাড়া অন্য কেউ তাদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।'[৩০৯]

এ ব্যাপারে মালেকি মাযহাব একই ধরনের মত পোষণ করেছে যে, শিশুদের সম্পদের কর্তৃত্ব পিতা বা পিতার অসিয়তকৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে যাবে না। তবে তাঁরা এ কথাও বলেছেন যে, যদি পিতা বা তার অসিয়তকৃত

---

৩০৭. আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: মাযুন : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭৩।
৩০৮. আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায় : মাযুন : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭৩।
৩০৯. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), অধ্যায় : হজর : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫২৬।

ব্যক্তি না-থাকে, তা হলে হাকিম অথবা মুসলিম জনতা তার অভিভাবক হবে।[৩১০] তাঁদের মাযহাবের মূলনীতি অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। সে মূলনীতিটি হলো, মুসলিম ন্যায়- বিচারক না-পাওয়া গেলে অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম জনতা বিচারকের ভূমিকা পালন করবে।

হানাফি ও মালেকি মাযহাবে যেভাবে স্পষ্ট অনুমতি দেওয়া জায়েয আছে, সেভাবে ইঙ্গিতসূচক অনুমতি দেওয়াও জায়েয আছে।[৩১১] সুতরাং বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চার অভিভাবক যদি তাকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখে বাধা না-দেয়, তা হলে তা ইঙ্গিতসূচক অনুমতি হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে অনুমতি দেওয়া ও তার থেকে কাজ নেওয়ার মাঝে পার্থক্য করা আবশ্যক। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন–

لو أمره بشراء شيء بعينه كالطعام والكسوة، لا يكون مأذونا له؛ لأنه استخدام

'যদি শিশুকে নির্দিষ্ট কোনো কিছু ক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়, তা হলে এক্ষেত্রে সে লেনদেনে অনুমতিপ্রাপ্ত হিসাবে সাব্যস্ত হবে না। যেমন, খাবার, কাপড়। কেননা, এটি হচ্ছে তার থেকে সেবা নেওয়া।'[৩১২]

হানাফি মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহের মতে বাচ্চাকে লেনদেনে অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা গ্রহণ করে না। সুতরাং কোনো অভিভাবক যখন নির্দিষ্ট ধরনের জিনিস বিক্রয় করার ব্যাপারে বাচ্চাকে অনুমতি দিয়ে নির্দিষ্ট পণ্য, বাজার অথবা সময়ের সঙ্গে সেটিকে সীমাবদ্ধ করবে, তখন সব ধরনের পণ্যের ব্যাপারেই বাচ্চা আম অনুমতিপ্রাপ্ত হবে। তবে অভিভাবক যদি নতুনভাবে কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করে, তা হলে সেটি ভিন্ন কথা। এমনটি হওয়ার কারণ হলো, হানাফি মাযহাবে লেনদেনে অনুমতি দেওয়ার অর্থ হলো, তার থেকে বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া। বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া এমন একটি বিষয়, যা কোনো ধরনের শর্তযুক্ত হয় না।[৩১৩]

---

৩১০. আশ-শারহুল কাবির, আল্লামা দারদির (রহ.), আল্লামা দুসুকি (রহ.)-এর ব্যাখ্যাসহ, পরিচ্ছেদ : হজরের কারণসমূহ ... খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৯২-২৯৩।

৩১১. আশ-শারহুল কাবির, আল্লামা দারদির (রহ.), আল্লামা দুসুকি (রহ.)-এর ব্যাখ্যাসহ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৯৪।

৩১২. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: মাযুন : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫৮।

৩১৩. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: মাযুন : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫৬।
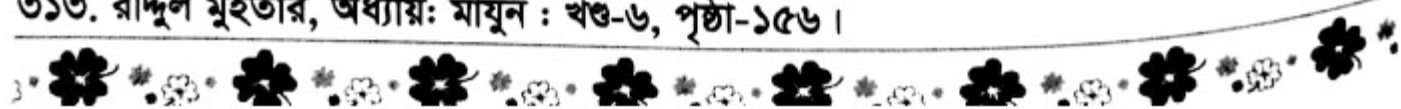
হাম্বলি মাযহাব এবং হানাফি মাযহাবের ইমাম যুফার (রহ.)-এর মতে এ ধরনের অনুমতি শর্তযুক্ত হতে পারে। তাই অভিভাবক যে বিষয়ের লেনদেনের অনুমতি দেবে সেটি ছাড়া অন্য বিষয়ে লেনদেনের ব্যাপারে সে অনুমতিপ্রাপ্ত হবে না। কারণ, তাদের মতে অনুমতি দেওয়ার অর্থ হলো তাকে উকিল বানানো। আর ওকালতের বিষয়টি শর্তযুক্ত হতে পারে। আল্লামা শামসুদ্দিন ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন—

ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه، وفي النوع الذي أمرا به، لأن تصرفه إنما جاز بإذن وليه وسيده، فزال الحجر في قدر ما أذنا فيه دون غيره، كالتوكيل ... وإن عين له نوعا من المال يتجر فيه، لم يكن له أن يتجر في غيره، وبهذا قال الشافعي (يعنى: في العبد) وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتجر في غيره، وينفك عنه الحجر مطلقا، لأن إذنه إطلاق من الحجر وفك له، والإطلاق لا يبعض كبلوغ الصبي.

ولنا أنه متصرف بالإذن من جهة الآدمي، فوجب أن يختص ما أذن له فيه، كالوكيل والمضارب، وما قاله ينتقض بما إذا أذن له في شراء ثوب ليلبسه أو طعام ليأكله، ويخالف البلوغ، فإنه يزول به المعنى الموجب للحجر، فإن البلوغ مظنة كمال العقل الذي يتمكن به من التصرف على وجه المصلحة، وههنا الرق سبب الحجر، وهو موجود، فنظير البلوغ في الصبي العتق للعبد، وإنما يتصرف العبد بالإذن، ألا ترى أن الصبي يستفيد بالبلوغ قبول النكاح بخلاف العبد.

'যে ধরনের লেনদেনে অনুমতি অথবা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটি ছাড়া অন্য সব লেনদেনে তাদের (অর্থাৎ, দাস ও নাবালেগ শিশু) প্রতি নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। কারণ, তাদের অভিভাবক ও পরিচালকের অনুমতিক্রমে তাদের লেনদেন সহিহ হবে। সুতরাং ওকালতের মতো শুধু যে ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেটি থেকে নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়েছে। ... তাদের অনুমতি দেওয়ার সময় যদি নির্দিষ্ট ধরনের মাল নির্ধারণ করে শুধু সেটি কেন্দ্রিক ব্যবসার অনুমতি দিয়ে থাকে, তা হলে তাদের জন্য অন্য মালের

ব্যবসা করা জায়েয হবে না। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) এ মত পোষণ করেছেন। (অর্থাৎ, দাসের ক্ষেত্রে এমন হুকুম প্রযোজ্য হবে) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, এমন ক্ষেত্রে তারা যে ধরনের পণ্যের অনুমতি পেয়েছে সেটি ছাড়া অন্য মালের ব্যবসা করাও তাদের জন্য জায়েয আছে। নির্দিষ্ট প্রকারের মালে অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। কেননা, অনুমতি দেওয়ার অর্থ হলো, তাকে বাধা মুক্ত করা এবং স্বাধীনতা দেওয়া। আর স্বাধীনতা ও শর্তমুক্ত হওয়া এমন বিষয়, যা ভগ্নাংশ হিসাবে কার্যকর হয় না। যেমন, বাচ্চা প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়া কোনো আংশিকতাকে গ্রহণ করে না।

তবে আমাদের দলিল হলো, মানুষের অনুমতিক্রমে সে লেনদেন করার অধিকার রাখে, তাই তাকে যে ধরনের পণ্যের ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হবে, সেটির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকা আবশ্যক। যেমন: উকিল ও 'মুদারিব'-এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর যেক্ষেত্রে তাকে এমন কাপড় ক্রয় করতে অনুমতি দেওয়া হয়, যা সে পরবে কিংবা এমন খাবার ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়, যা সে খাবে– এই মাসআলার মাধ্যমে তাঁর (ইবনে কুদামা রহ.) দাবির খণ্ডন হয়ে যায়। বালেগ হওয়ার বিষয়টি এ মাসআলার বিপরীত। কারণ, তার দ্বারা নিষেধাজ্ঞার মৌলিক বিষয়টিই শেষ হয়ে যায়। কেননা, বালেগ হওয়ার দ্বারা সে এমন পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয়, যার মাধ্যমে ভালো দিক বিবেচনা করে লেনদেন করতে পারে। উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, দাসত্ব এবং তা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বাচ্চা প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়া দাস আযাদ হওয়ার মতো। তবে দাস তার মালিকের অনুমতিক্রমে লেনদেন করতে পারে। আপনি কি এ বিষয়টি লক্ষ করেননি যে, বাচ্চা প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিবাহ কবুল করার অধিকার পেয়ে যায়; কিন্তু দাস এমন অধিকার পায় না।"[৩১৪]

---

৩১৪. আশ-শারহুল কাবির আলা মাতনিল মুকনি, আল-মুগনির সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৩৩-৫৩৪।

শায়েখ মুস্তাফা আয-যারকা (রহ.) এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন[৩১৫] এবং শিশুদের লেনদেন সংক্রান্ত সুবিধাদির ক্ষেত্রে এটিই বেশি যুক্তিযুক্ত।

৫৬. মাতাল ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়

মাতাল দুই প্রকার :

ক. এমন মাতাল, যে তার মাতলামির কারণে কিছুই বোঝে না। এমন ব্যক্তি পাগলের হুকুমে, তার ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হবে না। ইমাম ইবনে রুশদ (রহ.) বলেন–

سكران لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة، فلا خلاف أنه كالمجنون في جميع أحواله، وأقواله فيما بينه وبين الله، وفيما بينه، وبين الناس إلا فيما ذهب وقته من الصلوات

'এমন মাতাল, যে আসমান-জমিন ও নর-নারীর পার্থক্য বোঝে না। তার জন্য সর্বক্ষেত্রে পাগলের বিধান প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। মানুষের সঙ্গে সে যে-সব কথাবার্তা বলবে সেগুলো তার ও আল্লাহর মধ্যকার বিষয় হিসাবে সাব্যস্ত হবে। তবে যেসব নামায কাযা হবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে ভিন্ন হুকুম হবে।'[৩১৬] (সেগুলোর কাযা করতে হবে)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ ধরনের মাতলামির ক্ষেত্রেই মদ্যপানের হদ প্রয়োগ ওয়াজিব বলেছেন। (অর্থাৎ, চারটি মাদক পানীয় ছাড়া অন্য কিছুর কারণে এমন মাতলামি করলে) তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, বর্ণিত অবস্থায় তার লেনদেন সহিহ হবে না। কারণ, মাতলামির সংজ্ঞার ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, শুধু হদ প্রয়োগযোগ্য মাতলামি হওয়াই যথেষ্ট।[৩১৭]

খ. এমন মাতাল, যে তার কথা ও কাজের কিছু বিষয় এলোমেলো করে ফেলে আবার কিছু সঠিকও করে। সে কিছুটা ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারে। এমন ব্যক্তির বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম ইবনে রুশদ (রহ.) বলেছেন–

---

৩১৫. আল-মাদখালুল ফিকহিল আম : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮১০।

৩১৬. আল্লামা হাত্তাব (রহ.) মাওআহিবুল জালিল কিতাবে বর্ণনা করেছেন : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪২।

৩১৭. আত-তাকরির ওয়াত তাহবির, আল্লামা ইবনে আমিরুল হাজ (রহ.) : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৪। রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১২৬।

والثاني : السكران المختلط الذي معه بقية من عقله. فاختلف أهل العلم في أقواله وأفعاله على أربعة أقوال :

أحدها: أنه كالمجنون، فلا يحد، ولا يقتصّ منه، ولا يلزمه بيع، ولا عتق، ولا طلاق، ولا شيء من الأشياء. وهو قول محمد بن عبد الحكم، وأبي يوسف، واختاره الطحاويّ.

والثاني : كالصحيح، لأنّ معه بقية من عقله. وهو قول ابن نافع أنّه يجوز عليه كل ما فعل من بيع أو غيره. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.

والثالث : تلزمه الأفعال، ولا تلزمه الأقوال، فيقتل بمن قتل، ويحد في الزنا والسرقة، ولا يحدّ في القذف، ولا يلزمه طلاق، ولا عتق. وهو قول الليث.

والرابع : تلزمه الجنايات، والعتق، والطلاق، والحدود، ولا يلزمه الإقرارات والعقود. وهو مذهب مالك وعامّة أصحابه. وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب.

'দ্বিতীয় : ভালো-মন্দ মিশ্রণকারী মাতলামি, যার মধ্যে সামান্য বুদ্ধি রয়েছে, তার কথা ও কাজের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম চার ধরনের মত দিয়েছেন :

১. এমন ব্যক্তি পাগলের হুকুমে, তাই তার ওপর হদ প্রয়োগ করা যাবে না এবং তার থেকে কেসাস নেওয়া যাবে না। সেইসঙ্গে তার লেনদেন, আযাদকরণ, তালাক প্রদান ও অন্য কোনো কথাই কার্যকর হবে না। এটি ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল হাকাম ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মত এবং ইমাম তাহাবি (রহ.)-ও এটিকে গ্রহণ করেছেন।

২. এমন ব্যক্তি সুস্থ মানুষের হুকুমে হবে। কারণ, তখনও তার জ্ঞান রয়েছে। এটি ইমাম ইবনে নাফে (রহ.)-এর মত। তার লেনদেন ইত্যাদি সবকিছুই কার্যকর আছে। এটি ইমাম শাফেয়ি[৩১৮] ও আবু হানিফা (রহ.)-এর মত।[৩১৯]

---

৩১৮. ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন, মাতালের ব্যাপারে সহিহ মাযহাব হলো, তার ক্রয়-বিক্রয় এবং উপকারী ও অপকারী সব চুক্তি সহিহ হবে। আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৫৫।

৩. তার কার্যক্রম আইনভাবে কার্যকর হবে, তবে কথাবার্তা কার্যকর হবে না। সুতরাং সে কাউকে হত্যা করলে কিসাস হিসাবে তাকে হত্যা করা হবে এবং জিনা ও চুরি করলে তার ওপর হদ জারি করা হবে। তবে সে অপবাদ দিলে তার ওপর হদ প্রয়োগ করা হবে না এবং তার প্রদেয় তালাক ও আযাদ কার্যকর হবে না। এটি ইমাম লাইস[৩২০] (রহ.)-এর মত।

৪. তার অপরাধ, আযাদকরণ, তালাক প্রদান ও হদ কার্যকর হবে। তবে স্বীকারোক্তি ও লেনদেন কার্যকর হবে না। এটি ইমাম মালেক ও তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুসারীদের মত এবং এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও অধিক সহিহ মত।’[৩২১]

বাস্তবতা হলো, মাতলামির বিভিন্ন স্তর থাকার বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। তাই তার

---

৩১৯. তার অধিকাংশ কথা অনর্থক না হলে হানাফি মাযহাবে তার বিক্রয় সহিহ হবে। আল্লামা ইবনে আমিরুল হাজ (রহ.) বলেছেন, তার অধিকাংশ কথা অনর্থক হওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং তার কথার অর্ধেক ঠিক থাকলে সে মাতালের আওতাভুক্ত হবে না। সুতরাং হদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তার হুকুম হবে সহিহ ব্যক্তির মতো। আত-তাকরির ওয়াত তাহবির : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৪।

৩২০. **ইমাম লাইস** : লাইস ইবনে সা'দ ইবনে আবদুর রাহমান আল-ফাহমি (রহ.)। জন্ম : ৯৪ হিজরিতে। তাঁর সময়ে তিনিই মিশরের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। তিনি ছিলেন তাবে তাবেয়ি। তাঁর উস্তাদগণ: আতা ইবনে আবি রাবাহ, ইবনে আবি মুলাইকা, ইবনে শিহাব যুহরি, আবু যুবায়ের মাক্কি, আবদুর রাহমান ইবনুল কাসেম, হিশাম ইবনে উরওয়া, কাতাদা, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আনসারি (রহ.) প্রমুখ। তাঁর শিষ্যগণ: আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব, সায়িদ ইবনে আবি মারইয়াম, কুতাইবা ইবনে সায়িদ (রহ.) প্রমুখ। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন, ‘ফিকহে ইসলামির ক্ষেত্রে ইমাম মালেকের চেয়েও ইমাম লাইস ইবনে সা'দ বেশি পাণ্ডিত্য রাখতেন। কিন্তু লাইসের ছাত্ররা তাঁর ইলমের প্রচার-প্রসার ঘটাতে পারেনি।’ যাহাবি বলেন, ‘তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন, যাকে নিয়ে পুরো মিশরবাসী গর্ববোধ করত। খলিফা আবু জাফর মানসুর তাঁকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জানান। মিশরের সরকার প্রধান, প্রধান বিচারপতি বা উচ্চপদস্থ যে কেউ প্রতিটি কর্মকাণ্ডে তাঁর পরামর্শ মেনে চলত।’ প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী ছিলেন। দানও করতেন দুহাত ভরে। বর্ণিত আছে, একবার ইমাম মালেক তাঁকে একটি চিনামাটির পাত্রে খেজুর ভর্তি করে হাদিয়া পাঠান। তিনি সেই চিনামাটির পাত্রটি স্বর্ণ দিয়ে ভরে হাদিয়ার প্রত্যুত্তর দেন! তিনি তাঁর ছাত্রদের জন্য প্রচুর দিনার খরচ করে ফালুদা তৈরি করাতেন। তাঁর প্রত্যেক ছাত্রই তা তৃপ্তিভরে খেতে পারত। তিনি ইন্তেকাল করেন ১৭৫ হিজরিতে। মিশরের কারাফা নামক জায়গায় তাঁর কবর রয়েছে। رحمه الله ووفقنا للتأسي به। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৮/১৩৬-১৬৩; সুল্লামুল উসুল, হাজি খলিফা কুস্তুনতিনি : ৩/৪২-৪৩) –সম্পাদক

৩২১. মাওয়াহিবুল জালিল : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪২।

সব স্তরের ওপর একটি আম হুকুম দেওয়া কঠিন। লেনদেনের ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো, সঠিক ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি পাওয়া যাওয়া। সুতরাং যদি এমনটি প্রমাণিত হয় যে, সে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ও তার পরিণতি বুঝে ক্রয়-বিক্রয় করেছে, তা হলে তার লেনদেন সহিহ হবে। পক্ষান্তরে সে যদি দাবি করে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ও তার পরিণতি না-বুঝে ক্রয়-বিক্রয় করেছে, তা হলে তাকে দাবি প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণের ক্ষেত্রে মালেকি মাযহাবে কসমকে যথেষ্ট বলা হয়েছে।[৩২২] হানাফি মাযহাবের মূলনীতি থেকে বোঝা যায় যে, তাকে দলিল দিতে হবে। তবে এমন বিষয়গুলো আদালতের কাছে ন্যস্ত করতে হবে। والله تعالى أعلم

৫৭. কৃত্রিম সত্তার পক্ষ থেকে বিক্রয় করা

বর্তমানে 'কৃত্রিম সত্তা' পরিভাষাটির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।[৩২৩] অনেক সময় এটিকে 'হুকমি সত্তা' বা 'মেনে নেওয়া সত্তা' নামে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের সত্তা থেকে বাস্তবিক কোনো সত্তা বা ব্যক্তি উদ্দেশ্য থাকে না; বরং তার অধিকার ও দায়দায়িত্ব প্রকৃত কিছু সত্তার সমষ্টির ওপর বর্তায়। তাই কোনো কিছুর মালিক হওয়া, অন্যকে মালিক বানানো এবং ঋণ দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে তার ওপর প্রকৃত সত্তার হুকুম প্রয়োগ করা হয়।

'কৃত্রিম সত্তার' এ দর্শনটি মানতিকের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি থেকে সৃষ্ট। সে মূলনীতিটি হলো, ব্যক্তি সমষ্টির কারণে ব্যক্তি ছাড়া ভিন্ন একটি স্বতন্ত্র কৃত্রিম সত্তার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত। এ কৃত্রিম সত্তাটি প্রকৃত সত্তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ দিতে-নিতে পারে। সুতরাং আইন যখন তাকে স্বীকৃতি দেবে, তখন তাকে 'আইনি সত্তা', (juristic person or juristic entity)-ও বলা যাবে। সুতরাং 'কৃত্রিম সত্তা' একটি আম পরিভাষা এবং 'আইনি সত্তা' খাস পরিভাষা।

পূর্বেকার অধিকাংশ ফিকহের কিতাবে যেহেতু এ পরিভাষা সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই, তাই সমকালীন অনেক আলেম মনে করেন যে, শরিয়তে এ ধরনের সত্তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। বাস্তবতা হলো, যদিও এ নাম বা পরিভাষায় ফিকহের কিতাবে কোনো আলোচনা নেই; কিন্তু এমন পরিভাষার

---

৩২২. মাওয়াহিবুল জালিল : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪১-২৪২।

৩২৩. যাকে আরবিতে বলে :الشخصية المعنوية –সম্পাদক
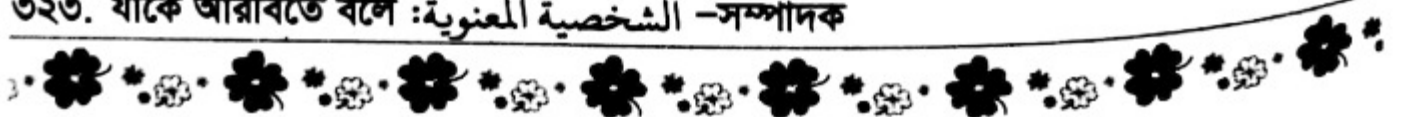
বিষয়টি ফিকহে ইসলামিতে অপরিচিত নয়। সেখানে এ ধরনের সত্তার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

৫৮. বাইতুল মাল একটি কৃত্রিম সত্তা

কৃত্রিম সত্তার প্রথম দৃষ্টান্ত হলো, বাইতুল মাল। কারণ, তা কারো মালিকানাধীন নয়; বরং সেখানে সবার অংশীদারি থাকে। বাইতুল মাল মালিক হয়, অন্যকে মালিক করে এবং ঋণ নিতে-দিতে পারে। ইমাম সারাখসি[৩২৪] (রহ.)-এর বক্তব্য এ বিষয়টি প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন–

وبيت المال يثبت له وعليه حقوق مجهولة.

'বাইতুল মালের জন্য (কোনো কিছু) সাব্যস্ত হতে পারে এবং তার ওপর অনির্দিষ্ট অধিকারও আরোপিত হতে পারে।'[৩২৫]

এখানে বাইতুল মালের জন্য এবং তার বিপক্ষে হক সাব্যস্ত হওয়া বলতে এটি ঋণ দিতে বা নিতে পারে- এই অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ হতে পারে না। আর এই অর্থেই বাইতুল মাল হচ্ছে একটি কৃত্রিম সত্তা।

অন্য জায়গায় ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেছেন–

إذا احتاج الإمام إلى إعطاء المقاتلة، ولا مال في بيت مال الخراج، صرف ذلك من بيت مال الصدقة، وكان دينا على بيت مال الخراج، لأن الصدقة

---

৩২৪. **ইমাম সারাখসি :** মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে (আবু) সাহ্‌ল আবু বকর শামসুল আয়িম্মা আস-সারাখসি (রহ.)। খুরাসানের সারাখ্‌স নামক জায়গায় জন্ম। তাঁর উস্তাদদের শীর্ষে ছিলেন ইমাম শামসুল আয়িম্মা হালওয়ানি (রহ.)। তাঁর শাগরেদগণ: বুরহানুল আয়িম্মা আবদুল আজিজ ইবনে উমর, মাহমুদ ইবনে আবদুল আজিজ আল-আওযাজান্দি, উসমান ইবনে আলি আল-বিকান্দি (রহ.) প্রমুখ। মুজতাহিদ পর্যায়ের ফকিহ ছিলেন। সত্যকথনে ছিলেন নির্ভীক। বহু কালজয়ী কিতাব রচনা করেছেন। যেমন : আল-মাবসুত (ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত এই কিতাবটি তিনি আওযাজান্দের একটি কূপে বন্দি থাকা অবস্থায় সম্পূর্ণ নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে কোনো কিতাব দেখা ছাড়াই লিখিয়েছেন। তিনি কুয়ার ভেতরে থাকতেন আর তাঁর ছাত্ররা কুয়ার উপরে বসে কিতাব লিখতেন), শারহুল জামিয়িল কাবির, শারহুস সিয়ারুল কাবির, উসুলে সারাখসি (এই দুটি কিতাবও তিনি বন্দিকালীন লিখিয়েছেন), শারহু মুখতাসারিত তাহাবি প্রভৃতি। সরকার প্রধানকে নসিহত করার অপরাধে (!) তিনি কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর ফারগানায় বসবাস করতে শুরু করেন। ৪৮৩ হিজরিতে সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। (আল-আ'লাম, যিরিকলি : ৫/৩১৫; আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, আবদুল হাই লাখনোবি, পৃষ্ঠা-১৫৮-১৫৯) –সম্পাদক

৩২৫. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.), অধ্যায়: বাইয়ে সরফ, পরিচ্ছেদ: পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করা : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৩৩।

حق الفقراء والمساكين، فإذا صرف الإمام منها إلى غير ذلك للحاجة، كان ذلك دينا لهم على ما هو حق المصروف إليهم، وهو مال الخراج.

'যোদ্ধাদের অর্থ দেওয়ার জন্য ইমামের যখন অর্থের প্রয়োজন হবে এবং ট্যাক্সের (الخراج) কোষাগারে কোনো অর্থ থাকবে না, তখন সদকার কোষাগার থেকে ব্যয় করতে পারবে। এভাবে নেওয়া অর্থ ট্যাক্সের কোষাগারের ওপর ঋণ হিসাবে থাকবে। কারণ, সদকার কোষাগার হলো, ফকির, মিসকিনদের হক। সুতরাং প্রয়োজনে ইমাম যখন সেটিকে অন্য খাতে ব্যয় করবে, তখন যে খাতে ব্যয় করা হয়েছে তার ওপর সদকার খাতের অধিকারীদের ঋণ থাকবে। আর সে খাতটি হলো, খারাজ বা ট্যাক্সের খাত।'[৩২৬]

'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া'র বর্ণনা এটি অপেক্ষা আরও স্পষ্ট। সেখানে উল্লেখ আছে-

فعلى الإمام أن يجعل بيت المال أربعة، لكل نوع بيتا؛ لأن لكل نوع حكما يختص به، لا يشاركه مال آخر فيه، فإن لم يكن في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه مما فيه مال، فإن استقرض من بيت مال الصدقة على بيت مال الخراج، فإذا أخذ الخراج يقضي المستقرض من الخراج، إلا أن يكون المقاتلة فقراء؛ لأن لهم حظا فيها فلا يصير قرضا، وإن استقرض على بيت مال الصدقات من بيت مال الخراج وصرفه إلى الفقراء، لا يصير قرضا عليهم؛ لأن الخراج له حكم الفيء والغنيمة، وللفقراء حظ فيها، وإنما لا يعطى لهم لاستغنائهم بالصدقات

'রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য জরুরি হলো, বাইতুল মালকে চারভাগে বিভক্ত করা। প্রত্যেক প্রকারের সম্পদের জন্য ভিন্ন কোষাগার করতে হবে। কারণ, প্রত্যেক প্রকারের জন্য বিশেষ হুকুম রয়েছে এবং সে সম্পদকে অন্য সম্পদের সঙ্গে মিলানো যাবে না। কোনো খাতে যদি অর্থ না-থাকে, তা হলে যে খাতে অর্থ আছে ইমাম সেখান থেকে ঋণ নিতে পারবে। সুতরাং সদকার কোষাগার থেকে যদি

---

৩২৬. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.), অধ্যায় : যাকাত, পরিচ্ছেদ : যেসব জিনিসে এক পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করা হয় : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮।

ট্যাক্সের কোষাগারের জন্য ঋণ নেয়, তা হলে ট্যাক্স আদায়ের পর সদকার কোষাগারের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তবে যদি যোদ্ধারা ফকির হয়, তা হলে ঋণ পরিশোধ করতে হবে না। কারণ, সদকার কোষাগারে তাদের অংশ রয়েছে, তাই তাদের জন্য ব্যয় করলে সেটি ঋণ হবে না। যদি ট্যাক্সের কোষাগার থেকে ঋণ নিয়ে ফকিরদের জন্য ব্যয় করে, তা হলে সেটিও ঋণ হবে না। কেননা, ট্যাক্স হলো গনিমত ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের হুকুমে, যেখানে ফকিরদের জন্যও একটি অংশ রয়েছে। তবে সদকা ছাড়া অন্য কাজে তাদেরকে এ প্রক্রিয়ায় অর্থ দেওয়া যাবে না।'[৩২৭]

এ উদ্ধৃতিটি প্রমাণ করে যে, বাইতুল মালের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে এবং সেটি ঋণ দিতে-নিতে পারে। সেইসঙ্গে এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে, সদকার কোষাগারে ফকিরদের মালিকানা রয়েছে। ফকির বা দরিদ্র বলতে নির্দিষ্ট কোনো দলের মালিকানা বোঝানো হয়নি। মালিক হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, অনির্দিষ্টভাবে সব গরিবদের প্রতিনিধি হয়ে কৃত্রিম সত্তা হিসাবে বাইতুল মাল সদকার সম্পদের মালিক হয়।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য উভয় পক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া ও ভালো-মন্দের তফাত করতে পারা শর্ত। অথচ কৃত্রিম সত্তা এমন নয়। সুতরাং সে কীভাবে প্রকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে চুক্তি করবে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার শর্তটি তার ক্ষেত্রে, যে মৌখিকভাবে ইজাব-কবুল বা তাআতির পদ্ধতিতে চুক্তি করে। কৃত্রিম সত্তা যখন চুক্তি করে, তখন তার প্রতিনিধি হিসাবে বাইতুল মালের দায়িত্বশীলগণ এ কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করে। এ প্রক্রিয়াটি এতিমের সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের কার্যক্রমের অনুরূপ। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। সায়িদ বিন মানসুর আবুল আহওয়াস থেকে, তিনি আবু ইসহাক (রহ.)-এর সনদে হযরত বারা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন—

قال لي عمر : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجتُ أخذتُ منه، وإن أيسرتُ رددتُّه، وإن استغنيتُ استعففتُ.

'উমর (রাযি.) আমাকে বললেন, আল্লাহর মালের (বাইতুল মাল) ক্ষেত্রে আমি নিজেকে এতিমের অভিভাবকের স্থলাভিষিক্ত করেছি।

৩২৭. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, অধ্যায়: যাকাত, পরিচ্ছেদ : ৮৭: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯১।

প্রয়োজন হলে সেখান থেকে নিই এবং সামর্থ্য চলে এলে ফেরত দিই। যদি সেখান থেকে না-নিয়ে চলতে পারি, তা হলে নিই না।'[৩২৮]

সুতরাং হযরত উমর (রাযি.) বাইতুল মালকে আল্লাহর মাল সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, সেটি নির্দিষ্ট কারো মালিকানা নয়। সেখানে উম্মতের সবার অধিকার রয়েছে। তাই হুকুমের দিক থেকে বাইতুল মালকে এতিমের মালের মতো মনে করে নিজেকে এতিমের অভিভাবকের স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

৫৯. মসজিদ একটি কৃত্রিম সত্তা

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলোঃ মসজিদ। ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মসজিদ মালিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আল্লামা খারাশি (রহ.) বলেছেন–

يشير بهذا إلى أن الموقوف عليه يشترط فيه، أن يكون أهلا للتملك حكما كالمسجد، أو حسا كالأدمي.

'এখান থেকে বোঝানো হচ্ছে, যাকে ওয়াকফ করা হবে, হুকুমের দিক থেকে সে মালিক হওয়ার যোগ্য হওয়া শর্ত। যেমন, মসজিদ। অথবা প্রকৃতপক্ষে মালিক হতে হবে। যেমন, মানুষ।'[৩২৯]

হুকুমের দিক থেকে মালিক হওয়ার যোগ্য হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই নয় যে, মালিক হওয়ার দিক থেকে সে মানুষের মতো। মালিক হওয়ার একটি আবশ্যকীয় বিষয় হলো, সে ঋণ দেওয়া-নেওয়ার যোগ্য হবে। শাফেয়ি মাযহাবের আল্লামা রমালি (রহ.) বলেছেন–

قال : أوصيت به للمسجد، وإن أراد تمليكه، لما مر في الوقف أنه حر يملك : أي منزل منزلته

'কেউ যদি বলে, এ জিনিসটি মসজিদের জন্য অসিয়ত করছি। এ কথার মাধ্যমে সে যদি মসজিদকে মালিক বানানো উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে, তা হলে সে মসজিদকে মালিক বানাতে পারবে। কেননা,

---

৩২৮. হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) হযরত উমর রা.-এর দারোয়ান ইয়ারফা (রহ.)-এর জীবনীতে এ কথা বলেছেন। আল-ইসাবাহ, তৃতীয় প্রকারঃ ইয়া বর্ণের আলোচনা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৭৩। তবাকাতে ইবনে সাদ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫৬, হযরত উমর (রাযি.)-এর প্রতিনিধিত্বের আলোচনা। তারিখে দিমাশক, আল্লামা ইবনে আসাকির (রহ.), হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর জীবনী : খণ্ড-৪৪, পৃষ্ঠা-২৬৪।

৩২৯. খারাশি আলা মুখতাসারি খলিল : খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৮০।
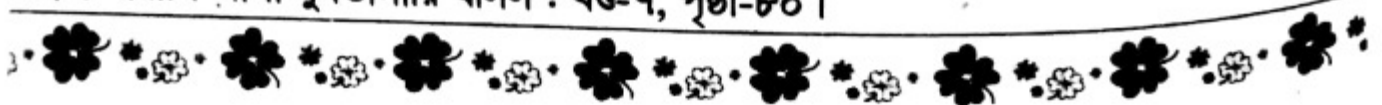
ওয়াকফের আলোচনায় বলা হয়েছে, সেটি স্বাধীন ব্যক্তির মতো মালিক হওয়ার অধিকার রাখে। অর্থাৎ, মসজিদকে ওই ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হচ্ছে।'[৩৩০]

আল্লামা রমালি (রহ.)-এর পক্ষ থেকে এটি স্পষ্ট বক্তব্য যে, মালিক বানানোর ক্ষেত্রে মসজিদের অবস্থান একজন স্বাধীন মানুষের মতো। এটি ছাড়া কৃত্রিম সত্তার অন্য কোনো অর্থ নেই।

অনুরূপভাবে 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া'য় উদ্ধৃত হয়েছে–

ولو قال : وهبت داري للمسجد، أو أعطيتها له، صح، ويكون تمليكا، فيشترط التسليم، كما لو قال : وقفت هذه المائة للمسجد، يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم.

'কেউ যদি বলে, আমার বাড়িটি মসজিদকে দিয়ে দিলাম বা তাকে দান করলাম, তার এই দান সহিহ হবে এবং সেটি মসজিদের মালিকানাধীন হয়ে যাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে সেটি হস্তান্তর করা শর্ত। যেমন, কেউ যদি বলে, এই একশত টাকা মসজিদে ওয়াকফ করলাম, তা হলে মসজিদের দায়িত্বশীলের কাছে হস্তান্তর করলে সেটি মালিক বানানো হিসাবে ওয়াকফ সহিহ হয়ে যাবে।'[৩৩১]

'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া'র অন্য জায়গায় উদ্ধৃত হয়েছে–

إن متولي المسجد إذا اشترى من غلة المسجد دارا أو حانوتا، فهذه الدار أو هذا الحانوت هل تلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد؟ ومعناه أنه هل تصير وقفا ؟ اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى قال الصدر الشهيد : المختار أنها لا تلتحق، ولكن تصير مستغلا للمسجد.

'মসজিদের দায়িত্বশীল যদি মসজিদের অর্থ দিয়ে কোনো বাড়ি বা দোকান ক্রয় করে, তা হলে কি সেগুলো মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত দোকান হিসাবে সাব্যস্ত হবে? এ কথার উদ্দেশ্য হলো, সেগুলো কি ওয়াকফের সম্পদ হবে? এ ব্যাপারে ফকিহগণ

৩৩০. নেহায়াতুল মুহতাজ, অধ্যায়: ওসিয়ত ও আমানত : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৮।
৩৩১. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, অধ্যায়: ওয়াকফ, পরিচ্ছেদ: ১১ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬০।

মতানৈক্য করেছেন। সদরুশ শহিদ (রহ.) বলেছেন, পছন্দনীয় মত হলো, সেগুলো ওয়াকফ হিসাবে বিবেচিত হবে না; কিন্তু মসজিদের জন্য বিনিয়োগকৃত সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে।'[৩৩২]

অন্য জায়গায় আছে–

مال موقوف على سبيل الخير وعلى الفقراء بغير أعيانهم ومال موقوف على المسجد الجامع واجتمعت من غلاتها، ثم نابت الإسلام نائبة مثل حادثة الروم واحتيج إلى النفقة في تلك الحادثة، أما المال الموقوف على المسجد الجامع إن لم تكن للمسجد حاجة للحال فللقاضي أن يصرف في ذلك لكن على وجه القرض فيكون دينا في مال الفيء،

'অনির্দিষ্টভাবে জনকল্যাণ, ফকিরদের ও জামে মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদের উপার্জন জমা করে ইসলাম সেগুলোর অভিভাবক হবে। যেমন, রোমের ঘটনা, যেখানে অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন হয়েছিল। জামে মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত অর্থ যদি মসজিদের প্রয়োজন না হয়, তা হলে কাজি বর্ণিত ঘটনার মতো কোনো খাতে সেটি ব্যয় করতে পারবে; কিন্তু সেটি ঋণ হিসাবে ব্যয় করতে হবে। সুতরাং সেটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওপর ঋণ হিসাবে সাব্যস্ত হবে।'[৩৩৩]

এখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, মসজিদ ঋণ দিতে পারবে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের কোষাগার ঋণী হবে।

৬০. ওয়াক্ফ একটি কৃত্রিম সত্তা

তৃতীয় দৃষ্টান্ত হলো, ওয়াক্ফ। কারণ, সে মালিক হওয়া, মালিকানা প্রদান করা এবং ঋণ দেওয়া-নেওয়ার যোগ্যতা রাখে। ওয়াকফের দায়িত্বশীলের জন্য ওয়াকফের উপার্জিত সম্পদ ব্যয় সম্পর্কিত ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া'র উদ্ধৃতি থেকে এটি স্পষ্ট হয়। সে উদ্ধৃতি এরূপ–

৩৩২. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, অধ্যায়: ওয়াকফ, পরিচ্ছেদ: ৫ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪১৭-৪১৮।
৩৩৩. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, অধ্যায়: ওয়াকফ, পরিচ্ছেদ: ১১ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬৪।

وأما المال الموقوف على الفقراء فهذا على ثلاثة أوجه : ...وفي القسم الثاني يصرف على وجه القرض فيصير دينا في مال الفيء، كذا في الواقعات الحسامية.

'ফকিরদের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদ তিন প্রকার। ...দ্বিতীয় প্রকার হলো, ঋণ হিসাবে সেটিকে ব্যবহার করা যাবে, ফলে সেটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওপর ঋণ হিসাবে থাকবে। 'ওয়াকিআতুল হুসামিয়া' কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত আছে।'[৩৩৪]

অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যে, হানাফি মাযহাবের ফকিহগণ বলেছেন, ওয়াকফের কোনো জিম্মাদারি বা দায়ভার নেই। এ বক্তব্যটি বাহ্যিকভাবে ওয়াকফ কৃত্রিম সত্তা হওয়াকে অস্বীকার করে। তবে ওয়াকফের জিম্মাদারি না-থাকার আলোচনাটি যেখানে করা হয়েছে, আমরা যদি সেই আলোচনার প্রসঙ্গটি লক্ষ করি, তা হলে এটি প্রমাণিত হবে যে, ওয়াকফ থেকে ঋণ নেওয়ার ওপর একটি যৌক্তিক প্রশ্ন হিসাবে তারা এ কথা বলেছেন। তাদের এ প্রশ্নটি হয়েছে কিয়াসের দাবি মোতাবেক; কিন্তু তারপর প্রয়োজনের কারণে বিশেষ শর্তের সঙ্গে ওয়াকফ থেকে ঋণ নেওয়াকে জায়েয বলেছেন। এ কথার উদ্দেশ্য হলো, প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ করে ফুকাহায়ে কেরাম ইস্তিহসান অনুযায়ী ওয়াকফের জিম্মাদারিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'আদ-দুররুল মুখতার' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে–

لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف...

'ওয়াকফের জন্য ঋণ নেওয়া জায়েয নেই; কিন্তু যদি ওয়াকফের উপকারে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তা হলে ঋণ নেওয়া জায়েয আছে।'

এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন–

(قوله : لا تجوز الاستدانة على الوقف) أي إن لم تكن بأمر الواقف، وهذا بخلاف الوصي فإن له أن يشتري لليتيم بنسيئة بلا ضرورة، لأن الدين لا يثبت ابتداء إلا في الذمة واليتيم له ذمة صحيحة، وهو معلوم

৩৩৪. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬৮।
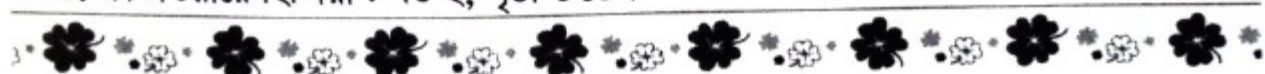
فتتصور مطالبته أما الوقف فلا ذمة له والفقراء، وإن كانت لهم ذمة لكن لكثرتهم لا تتصور مطالبتهم، فلا يثبت إلا على القيم، وما وجب عليه لا يملك قضاء من غلة للفقراء ذكره هلال.

'ওয়াকফের জন্য ঋণ নেওয়া জায়েয নেই। অর্থাৎ, যদি ওয়াকফকারীর অনুমতি ছাড়া হয়, তা হলে জায়েয নেই। তবে অসিয়তের বিষয়টি বিপরীত। প্রয়োজন ছাড়াই সে এতিমের জন্য বাকিতে ক্রয় করতে পারবে। কারণ, প্রাথমিক পর্যায়ে ঋণটি শুধু জিম্মায় ওয়াজিব হয় এবং এতিমের জিম্মা সহিহ জিম্মা। তার জিম্মা নির্দিষ্ট হওয়ায় সেখানে ঋণ উসুলের দাবি করা যায়। ওয়াকফের কোনো জিম্মাদারি নেই। এক্ষেত্রে যদিও ফকিরদের জিম্মাদারি থাকে; কিন্তু তাদের আধিক্যের কারণে নির্দিষ্ট কারো কাছ থেকে ঋণ পরিশোধের দাবি করা যায় না। তাই ওয়াকফের দায়িত্বশীল ছাড়া অন্য কারো ওপর জিম্মাদারি বর্তাবে না। ওয়াকফের ওপর যে ঋণ আরোপ হবে, ফকিরদের সম্পদ থেকে সেটি পরিশোধ করতে পারবে না। আল্লামা হেলাল (রহ.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।'

এটি একটি যৌক্তিক প্রশ্ন, যার দাবি হলো কোনো অবস্থায়ই ওয়াকফের জন্য ঋণ নেওয়া জায়েয নেই। ওয়াকফের দায়িত্বশীল ওয়াকফের জন্য ঋণ নেওয়ার পর ওয়াকফের সম্পদ থেকে সেটি পরিশোধ করাও জায়েয নেই। কিন্তু আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) এ আলোচনার সঙ্গে সংযুক্ত করে বলেছেন-

وهذا هو القياس، لكنه ترك عند الضرورة، كما ذكره أبو الليث، وهو المختار، أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد، تجوز بأمر القاضي إن لم يكن بعيدا عنه.

'এটি হলো কিয়াস, তবে প্রয়োজনে কিয়াসকে বাদ দেওয়া হয়। যেমনটি ইমাম আবুল লাইস[৩৩৫] (রহ.) বলেছেন এবং এটিই

৩৩৫. **ইমাম আবুল লাইস :** নসর বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইবরাহিম আবুল লাইস সমরকন্দি (রহ.)। তিনি ছিলেন একাধারে একজন বরেণ্য ফকিহ, মুহাদ্দিস ও আবেদ-যাহেদ ব্যক্তিত্ব। তাঁর উপাধি ছিল 'ইমামুল হুদা'। ইমাম আবু জাফর হিন্দুওয়ানি বলখি (মৃত. ৩৬২

পছন্দনীয় মত। যখন ঋণ নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না, তখন কাজি অনেক দূরে না থাকলে কাজির অনুমতিক্রমে ঋণ নেওয়া জায়েয আছে।'[৩৩৬]

আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) যে মত পোষণ করেছেন, তার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে পরবর্তীকালের ফকিহগণ প্রয়োজনে শর্তের সঙ্গে ওয়াকফের জন্য ঋণ নেওয়াকে জায়েয বলেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, ওয়াকফের জিম্মাদারি না-থাকার কিয়াসভিত্তিক মত বাদ দিয়ে ওয়াকফের কল্যাণে তার জিম্মাদারিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এরপর অনেক ফকিহ সাধ্যানুযায়ী ওয়াকফের জিম্মাদারি না-থাকার যৌক্তিক দাবি থেকে না বেরিয়ে প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়ায় ওয়াকফের জন্য ঋণ নেওয়াকে জায়েয বলেছেন যে, ওয়াকফের দায়িত্বশীল ঋণ নিয়ে তার সম্পদ থেকেই ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার পর ওয়াকফের সম্পদ থেকে সেটি উসুল করে নেবে। তাদের এ প্রক্রিয়া অনুসরণের সম্ভাব্য কারণ হলো, ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষ হবে ওয়াকফের দায়িত্বশীল, ওয়াকফ কোনো পক্ষের ভূমিকা পালন করবে না। তবে এ প্রক্রিয়ায় গুরুতর দুটি প্রশ্ন রয়েছে :

ক. যদি এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় যে, ওয়াকফের দায়িত্বশীলের জিম্মায় ঋণ থাকবে, ওয়াকফের ওপর কোনো ঋণ থাকবে না, তা হলে ঋণী দায়িত্বশীলকে পদচ্যুত করে অন্য কাউকে নিয়োগ দিলে ব্যাখ্যা অনুযায়ী দ্বিতীয় দায়িত্বশীলের কাছে ঋণ দাবি করা যাবে না। যে ব্যক্তি ঋণ নিয়েছে, সর্বাবস্থায় তার কাছ থেকেই ঋণ আদায় করতে হবে। সে যদি মারা যায়, তা হলে ঋণের জিম্মাদারি তার ওয়ারিশদের ওপর বর্তাবে। আর এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া একেবারেই ভুল।

হি.)-এর কাছে তিনি ইলমে ফিকহ হাসিল করেন, যিনি তাঁর অনুপম ফিকহি দক্ষতার কারণে "আবু হানিফা আস-সগির" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হাদিসের ইলম গ্রহণ করেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন ফযল বিন আনিফ আল-বুখারির কাছে। বহু প্রসিদ্ধ ও কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তিনি। যেমন, তাফসিরুল কুরআনিল কারিম, উমদাতুল আকায়েদ, বুসতানুল আরিফিন, তাম্বিহুল গাফিলিন, উকুবাতু আহলিল কাবাইর, মুখতালিফুর রিওয়ায়াহ, খাযানাতুল ফিকহ, শারহুল জামিয়িস সগির, উয়ূনুল মাসাইল, দাকায়িকুল আখবার, আন-নাওয়াযিল প্রভৃতি। ৩৭৫ মতান্তরে ৩৭৩ হিজরির জুমাদাল উখরা মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৩২২; আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ : পৃষ্ঠা-২২০, আল-আ'লাম লিয যিরিকলি : পৃষ্ঠা-৮, পৃষ্ঠা-২৮; মিফতাহুস সাআ'দাহ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩৯; মু'জামুল মুআল্লিফিন : খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৯১) —সম্পাদক

৩৩৬. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৬৬৬-৬৬৭, ফিকরাহ নং ২১৭৮০।

খ. এ ব্যাপারে সব ফকিহ একমত যে, ওয়াকফের দায়িত্বশীল যখন তার সম্পদ থেকে ওয়াকফের ঋণ পরিশোধ করে দেবে, তখন ওয়াকফের সম্পদ থেকে পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত নিতে পারবে। ওয়াকফের জিম্মাদারি না-থাকার সঙ্গে এ মাসআলার বিরোধ রয়েছে। কারণ, আল্লামা হেলাল (রহ.) যে কিয়াসের কথা বলেছেন (ইতঃপূর্বে আল্লামা ইবনে আবেদিন রহ. থেকে যেটি উদ্ধৃত করেছি) সেখানে স্পষ্টভাষায় এ কথা বলেছেন যে, 'কেবল দায়িত্বশীলের ওপরই ঋণ বর্তাবে। আর তার ওপর যে ঋণ আরোপ হবে, গরিবদের ওয়াকফের সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করতে পারবে না।' সুতরাং সে যখন ওয়াকফের সম্পদ থেকে পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত নিতে পারবে, তখন সেটি ওয়াকফ ফান্ডের দায়িত্বশীলের কাছে ঋণী হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, ওয়াকফের জিম্মাদারি নেই, এ কথাটি ঠিক হলো না।

অনেক ফকিহ এ ধরনের ব্যাখ্যা না-করে সরাসরি ওয়াকফকেই ঋণী সাব্যস্ত করেছেন। 'তানকিহুল ফাতাওয়া আল-হামিদিয়্যাহ'-এর আলোচনা থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সেখানে আছে–

في ناظر على مسجد، وللمسجد وقف، فأذن الناظر لحصري أن يكسو المسجد ويكون ثمن الحصير من رَيع الوقف، ففعل وعُزل الناظر، ثم تولى ناظر، وهو إلى الآن ناظر، والحال أن الناظر الأول لم يتناول من رَيع الوقف شيئا، فهل يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري؛ لأن حقه معلق برَيع الوقف أم يلزم الناظر الأول؟ الجواب للشيخ ناصر الدين اللقاني، يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري ودفعه له من ريع الوقف، ولا يلزم ذلك الناظر الأول، حيث عزل، ووافقه سيدي الجد والشيخ تقي الدين الحنبلي تغمدهم الله تعالى برحمته، فتاوى الشلبي من الوقف.

'এমন মসজিদের দায়িত্বশীল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে মসজিদে ওয়াকফের সম্পদ আছে। তখন দায়িত্বশীল কার্পেটারকে সমস্ত মসজিদের কার্পেটের ব্যবস্থা করতে বলল এবং মসজিদের সম্পদ থেকে তার মূল্য দেওয়ার কথা বলল। এরপর সে দায়িত্বশীলকে পদচ্যুত করে অন্য একজনকে নিয়োগ দেওয়া হলো এবং তখন পর্যন্ত সে বহাল আছে। অন্যদিকে প্রথম দায়িত্বশীল
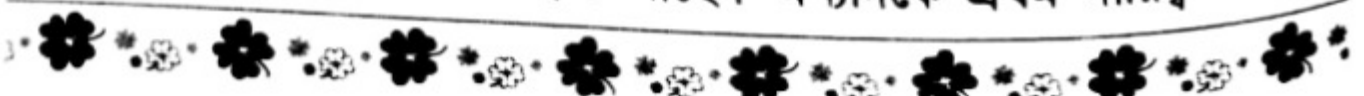
মসজিদের সম্পদ থেকে কার্পেটারকে কিছুই দেয়নি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় দায়িত্বশীলকে কি কার্পেটারের মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা যাবে? কেননা, তার প্রাপ্য মসজিদের সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নাকি প্রথম দায়িত্বশীলের কাছে ঋণের দাবি করা হবে? শাইখ নাসিরুদ্দিন আল্লাকানি (রহ.)-এর উত্তর হলো, দ্বিতীয় দায়িত্বশীলকে কার্পেটারের মূল্য পরিশোধে বাধ্য করতে হবে এবং ওয়াকফের সম্পদ থেকে সেটি পরিশোধ করবে। প্রথম দায়িত্বশীলকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। কারণ, তাকে পদচ্যুত করা হয়েছে। সাইয়েদ জাদ ও তকিউদ্দিন হাম্বলি এ উত্তরের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। (আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়কে রহমতে আবৃত করে নিন।) 'ফাতাওয়ায়ে শিলবি'-এর ওয়াকফ অধ্যায় থেকে গৃহীত।'[৩৩৭]

এটি প্রমাণ করে যে, শুরু থেকেই কার্পেটের মূল্য ওয়াকফের জিম্মায় ছিল। প্রথম দায়িত্বশীল ওয়াকফের প্রতিনিধি হিসাবে চুক্তি করেছিল। তাই যখন দ্বিতীয় দায়িত্বশীল দায়িত্বলাভ করল, তখনও ওয়াকফের জিম্মায় ঋণ বহাল থাকায় সেটি পরিশোধ করা তার ওপর ওয়াজিব। কারণ, ঋণ গ্রহণের সময় সে কোনো পক্ষের ভূমিকা পালন না-করলেও এখন সে ওয়াকফের দায়িত্বশীল।

সারকথা, ওয়াকফ থেকে যে কোনো সময়, যে কোনো অবস্থায় ঋণ নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার অর্থ হলো, তার জিম্মাদারি স্বীকার করা এবং সে কারণে ওয়াকফ ফান্ডের ঋণী সাব্যস্ত হওয়া। এটিই হলো কৃত্রিম সত্তার উদ্দেশ্য।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, কৃত্রিম বা হুকমি সত্তার বিষয়টি যদিও এ নামে বা পরিভাষায় ফিকহি কিতাবে আলোচনা করা হয়নি; (যদিও আল্লামা রমালি (রহ.)-এর বক্তব্যে আলোচিত হয়েছে) কিন্তু অনেক ফিকহি মাসআলায় এর বিষয়বস্তু বিদ্যমান।

সুতরাং যদি কোনো হুকমি সত্তার সঙ্গে চুক্তি করা হয়, তা হলে সে কৃত্রিম বা হুকমি সত্তা হওয়ার কারণে তার পক্ষে তার সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করা সম্ভব নয়। কেননা, তার নিজস্ব কোনো অভিব্যক্তি নেই। কারণ, তার পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদন করছে, সে একজন প্রকৃত সত্তা এবং শরিয়ত ও সামাজিক প্রচলন অনুযায়ী প্রতিনিধি হিসাবে সে গ্রহণযোগ্য সত্তা। তাই

---

৩৩৭ তানকিহুল ফাতাওয়া আল-হামিদিয়্যাহ, অধ্যায়: ওয়াকফ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২২-২২৩।
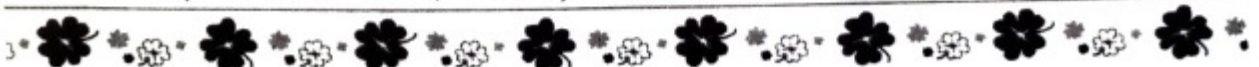
বাইতুল মালের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হলো ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) বা ইমামের প্রতিনিধি। মসজিদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লি অথবা মসজিদের দায়িত্বশীল। তবে তারা সবাই ওই কৃত্রিম সত্তার প্রতিনিধি হিসাবে চুক্তি সম্পাদন করবে। এ কারণে তাদের চুক্তির প্রতিক্রিয়া, অধিকার ও দায়দায়িত্বের সবকিছুই ওই কৃত্রিম সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। চুক্তির দায়িত্ব পালনকারী প্রকৃত সত্তার সঙ্গে এগুলোর কোনোটিই সম্পৃক্ত হবে না। এ বিষয়টি হলো শিশুর অভিভাবকত্বের মতো। যেমনটি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) বলেছেন আর আলোচনার শুরুতে সেটি উদ্ধৃত করেছি।

সমকালীন প্রচলিত আইনে কৃত্রিম সত্তার (الشخصية المعنوية) পরিমাণ বেড়ে গেছে। যেমন: জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (joint stock companies), করপোরেশন (corporations) ইত্যাদি। এসব কৃত্রিম সত্তার পক্ষ থেকে যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের সঙ্গে চুক্তি করলেই সেটি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

৬১. বিশেষ জ্ঞাতব্য

কৃত্রিম সত্তা সম্পর্কে যে আলোচনা করলাম, সেটি ছিল চুক্তি করা, মালিক হওয়া, ঋণ দেওয়া অথবা নেওয়ার হুকুম সম্পর্কিত। প্রচলিত আইন এ ধরনের সত্তাকে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। এমন কৃত্রিম সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, প্রচলিত আইন এ ধরনের সত্তার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য দিয়েছে শরিয়তে তার সবগুলোই গ্রহণযোগ্য; বরং ইসলামি শরিয়তের মূল দর্শন ও বিধানকে সামনে রেখে সেগুলো পর্যালোচনা করা জরুরি। তবে এখানে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই। والله تعالى أعلم

৬২. দাসের বিক্রয়ের হুকুম

বিক্রয়চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য উভয় পক্ষ স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং দাস যদি তার মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়, তা হলে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। ইতঃপূর্বে আলোচিত অনুমতিপ্রাপ্ত শিশুর সব বিধি-বিধান দাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তবে তার বিক্রয় সহিহ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর কোনো মতানৈক্য নেই, যেমনটি বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর লেনদেনের ক্ষেত্রে ছিল। ইমাম শাফেয়ি ও যুফার (রহ.)-এর মতে শিশুর অনুমতির মতো দাসের অনুমতিও শর্তযুক্ত হবে, যেমনটি হাম্বালি মাযহাব ও ইমাম যুফার রহ.-এর মত। ৫৫ নম্বর ধারায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

* * *

অমুসলিমদের ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি-বিধান

৬৩. অমুসলিমদের ক্রয়-বিক্রয়

ক্রয়-বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য উভয় পক্ষ মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং অমুসলিমদের ক্রয়-বিক্রয় সহিহ হবে। চাই সে জিম্মি, হারবি বা মুস্তামিন।[৩৩৮]

তবে অনেক ফকিহ আনুষঙ্গিক কিছু কারণে তাদের সঙ্গে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন। অমুসলিম লেনদেনের যোগ্য না-হওয়ার কারণে নিষেধ করেননি। আনুষঙ্গিক কারণগুলো হলো, মুসলিমদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়া, ইসলামের পবিত্রতা বিনষ্ট হওয়া, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কাফেরদের সহযোগিতা করা অথবা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর রাষ্ট্রের কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করা। এখন এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিন।

৬৪. মুসলিম দাসকে কাফেরের কাছে বিক্রয় করা

মুসলিমদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণে ফুকাহায়ে কেরাম কাফেরদের সঙ্গে যেসব বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন তার একটি হলো, মুসলিম দাসকে কাফেরের কাছে বিক্রয় করা। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে। তবে শরয়ি পদ্ধতিতে বর্তমানে কোনো দাস–দাসী না পাওয়া যাওয়ার কারণে তাদের মাযহাব ও বিস্তারিত দলিল উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন ।

৬৫. অমুসলিমের কাছে কুরআনুল কারিমের কপি বিক্রয় করা

ইসলামের পবিত্রতা বিনষ্ট হওয়ার কারণে ফুকাহায়ে কেরাম যেসব বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে একটি হলো, অমুসলিমদের কাছে কুরআনুল কারিম, তাফসির, হাদিস ও ফিকহের কিতাব বিক্রয় করা। ইমাম

---

৩৩৮. **জিম্মি** : ইসলামি রাষ্ট্রের সেসব অমুসলিম নাগরিক, যারা জিযিয়া দিয়ে বসবাস করে। **হারবি** : ইসলামি রাষ্ট্রের শত্রুরাষ্ট্রের নাগরিক, যে ইসলামি রাষ্ট্রে ভিসা বা অবস্থানের অনুমতি নেয়নি। **মুস্তামিন** : ইসলামি রাষ্ট্রের শত্রুরাষ্ট্রের নাগরিক, যে ইসলামি রাষ্ট্রে ভিসা বা অবস্থানের অনুমতি নিয়েছে। –সম্পাদক
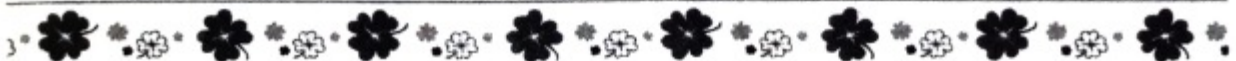
শাফেয়ি (রহ.) বলেন, 'কাফেরের কাছে কুরআনুল কারিম বিক্রয় করলে সেটি বাতিল বিক্রয় হবে।' হাম্বলি মাযহাবেরও এ মত। হানাফি ও মালেকি মাযহাবের ফকিহগণ বলেছেন, বিক্রয় সহিহ হবে, তবে তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, সেটি যেন মালিকানা মুক্ত করে ।'[৩৩৯]

ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেছেন–

وعلى هذا الخلاف : الكافر إذا اشترى مصحفا، لا يصح الشراء عند الشافعي، لأنه يستخف به، فيرجع ذلك إلى إذلال المسلمين، وعندنا يصح شراؤه، لأنه ليس في عين الشراء من إذلال المسلمين شيء، وكلامنا في هذا الفصل أظهر، فالكافر لا يستخف بالمصحف، لأنه يعتقد أنه كلام فصيح وحِكَمُه بالغة، وإن كان لا يعتقد أنه كلام الله عز وجل فلا يستخف به، ثم يجبر ... على بيع المصحف، لأنه لا يعظمه، كما يجب تعظيمه، وإذا ترك في ملكه يمسه وهو نجس، وقال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ –التوبة ٢٨– وقال الله تعالى في القرآن: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ –الواقعة:٧٩– فلهذا يجبر على بيعه من المسلمين.

'এ মতানৈক্য অনুযায়ী কোনো কাফের কুরআনুল কারিম ক্রয় করলে ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মতে বিক্রয় সহিহ হবে না। কারণ, সে কুরআনকে মর্যাদা না-দেওয়ার কারণে মুসলিমদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে। আমাদের মাযহাবে তার ক্রয়চুক্তি সহিহ হবে। কারণ, অমুসলিম কুরআন ক্রয় করলেই মুসলিমদের মর্যাদা বিনষ্ট হয় না। এ ব্যাপারে আমাদের আলোচনায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। সুতরাং (সাধারণভাবে) কোনো অমুসলিম কুরআনের মর্যাদাহানি করবে না। কারণ, সে কুরআনকে আল্লাহর কালাম না হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করলেও সেটি সাহিত্য ও হেকমতপূর্ণ কালাম বলে মনে করতে পারে। তাই সে সেটির মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে

৩৩৯. আল-মুহাযযাব : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৭। আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৮। আল-মাবসুত. ইমাম সারাখসি রহ.,. খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৩৩। আদ-দুসুকি আলা শারহি মুখতাসারি খলিল : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭।
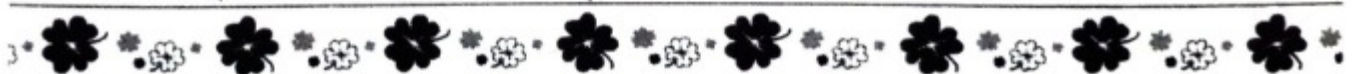
না। তারপরও তাকে সেটি বিক্রয় করে ফেলতে বাধ্য করা হবে। কারণ, সে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারবে না। তার মালিকানায় রেখে দিলে অপবিত্র অবস্থায় সেটি স্পর্শ করবে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক।'[৩৪০] তিনি আরও বলেছেন, 'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।'[৩৪১] এ কারণে অমুসলিমকে মুসলিমের কাছে কুরআন বিক্রয় করতে বাধ্য করা হবে।'

এ ব্যাপারে দলিল হলো হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)-এর হাদিস। হাদিসটি এরূপ–

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআন নিয়ে শত্রুর এলাকায় সফর করতে নিষেধ করেছেন।'[৩৪২]

হাদিসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম মুসলিম (রহ.) এ অংশটি বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন যে,

فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

'শত্রুরা সেটি কেড়ে না-নেওয়ার ব্যাপারে আমি আশ্বস্ত নই।'

সুতরাং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অমুসলিমের হাতে কুরআন যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। অধিকাংশ ফকিহ এর কারণ দর্শিয়েছেন যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের থেকে কুরআনের অমর্যাদার আশঙ্কা করেছেন। তবে ইমাম তাহাবি (রহ.) ভিন্ন একটি কারণের কথা বলেছেন এবং ইমাম সারাখসি (রহ.) সেটি উদ্ধৃত করেছেন। বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেছেন–

تأويل هذا أن يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم، هكذا ذكره محمد. وذكر الطحاوي أن هذا النهي كان في ذلك الوقت لأن المصاحف

---

৩৪০. সুরা তাওবা : আয়াত-২৮।

৩৪১. সুরা ওয়াকিয়া : আয়াত-৭৯।

৩৪২. সহিহ বুখারি, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ: ১২৯, হাদিস নং ২৯৯০। সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: নেতৃত্ব, পরিচ্ছেদ: ২৪, হাদিস নং ৪৯৪৬।
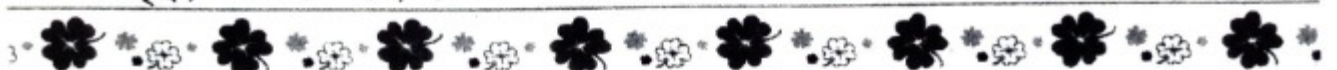
لم تكثر في أيدي المسلمين. وكان لا يؤمن إذا وقعت المصاحف في أيدي العدو أن يفوت شيء من القرآن من أيدي المسلمين، ويؤمن من مثله في زماننا لكثرة المصاحف وكثرة القراء.

قال الطحاوي : ولو وقع مصحف في يدهم لم يستخفوا به لأنهم وإن كانوا لا يقرون بأنه كلام الله فهم يقرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ المعاني فلا يستخفون به، كما لا يستخفون بسائر الكتب. لكن ما ذكره محمد أصح، فإنهم يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين، وقد ظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكة، جعلوا يستنجون بالمصاحف إلى أن قطع الله دابرهم . ولهذا منع الذمي من شرى المصحف، وأجبر على بيعه كما أجبر على بيع العبد المسلم.

‘হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, তার সফরটি প্রভাব প্রতিপত্তিহীন কোনো অশ্বারোহী কাফেলার সঙ্গে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) অনুরূপ বলেছেন। ইমাম তাহাবি (রহ.) বলেন, নিষেধাজ্ঞাটি সে সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, মুসলিমদের হাতে তখন কুরআনের সংখ্যা কম ছিল এবং কাফেরদের হাতে কুরআন গেলে আশঙ্কা করা হতো যে, মুসলিমদের হাত থেকে কুরআনের অংশ হারিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের যুগে কুরআন ও হাফেজদের আধিক্যের কারণে এমন আশঙ্কা নেই। ইমাম তাহাবি (রহ.) বলেছেন, অমুসলিমদের হাতে কুরআন গেলে তারা সেটিকে অমর্যাদা করবে না। কারণ, যদিও তারা সেটিকে আল্লাহর কালাম হিসাবে স্বীকার করে না; কিন্তু এটি স্বীকার করে যে, এটি সবচেয়ে সাহিত্যপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ব্যাপক মর্ম প্রকাশক, তাই তারা সেটির মর্যাদাহানি করবে না। যেমন : তারা অন্যান্য কিতাবের মর্যাদাহানি করে না। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) যেটি বলেছেন, সেটিই বেশি সহিহ। কারণ, মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষের কারণে তারা মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে পারে। ‘কারামেতা’ সম্প্রদায় মক্কার ওপর আধিপত্য বিস্তার করলে এমন ঘটনা ঘটেছিল। তারা কুরআনের পৃষ্ঠা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করত। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। এ কারণে জিম্মিকে

কুরআন ক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর ক্রয় করলেও সেটি বিক্রয় করতে বাধ্য করা হবে। যেমনভাবে সে মুসলিম দাস ক্রয় করলে সেটি বিক্রয় করতে বাধ্য করা হবে।'[৩৪৩]

ফুকাহায়ে কেরামের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়, নিষেধাজ্ঞাটি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে কুরআনের মর্যাদাহানির আশঙ্কা করা হয়। এ কারণে তারা অমুসলিম কর্তৃক কুরআনের মালিক হওয়াকে নিষেধ করেছেন। তারপর শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবে শুধু মালিক হওয়াকেই মর্যাদাহানি সাব্যস্ত করা হয়েছে। হানাফি ও মালেকি মাযহাবে শুধুমাত্র মালিক হওয়াকে মর্যাদাহানি মনে করা হয়নি। তবে তাকে তার মালিকানা ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাদের হাতে কুরআন থাকলে অমর্যাদা হতে পারে। কেননা, তারা কুরআনের যথার্থ মর্যাদা দিতে পারবে না এবং অপবিত্র অবস্থায় সেটি স্পর্শ করবে। তবে বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের ফকিহগণ যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা প্রমাণ করে যে, এ ধরনের আশঙ্কামুক্ত হলে এবং তাদের থেকে ইসলাম গ্রহণের আশা থাকলে তাদের হাতে কুরআন রাখতে বাধা নেই। এ কারণে হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম অমুসলিমকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া জায়েয বলেছেন।[৩৪৪] ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) 'সিয়ারুল কাবির' কিতাবে বলেছেন–

وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم : علمني القرآن، فلا بأس بأن يعلمه. ويفقيه في الدين، لعل الله يقلب قلبه.

'কোনো হারবি বা জিম্মি যদি কোনো মুসলিমকে বলে, আমাকে কুরআন শিখিয়ে দাও, তা হলে তাকে কুরআন বা দীন শিক্ষা দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। হতে পারে যে, এর কারণে আল্লাহ তায়ালা তার দিল পরবর্তন করে দেবেন।'

এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেছেন–

ألا ترى أن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن على المشركين وبه أمر قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ }... وفي حديث

---

৩৪৩. শারহুস সিয়ারিল কাবির, ইমাম সারাখসি (রহ.) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৫, ফিকরাহ নং ২৪৬।

৩৪৪. রাওযাতুত তালিবিন : খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩১১। বুজাইরামি আলা শারহি মানহাজিত তালিবিন, ড. যাকারিয়া আনসারি , খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭। ফাতহুল বারি : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০৭।
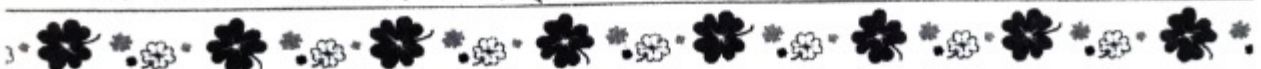
عثمان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : "خير الناس من تعلم القرآن وعلمه" ولم يفصل بين تعليم المسلمين وتعليم الكفار وإذا كان يندب إلى تعليم غير المخاطبين رجاء أن يعملوا به إذا خوطبوا فلأن يندب إلى تعليم المخاطبين رجاء أن يهتدوا به ويعملوا كان أولى .

'আপনি কি লক্ষ করেননি! রাসুল (ﷺ) কাফেরদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে এর নির্দেশও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হে রাসুল! আপনার প্রভু আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন, সেগুলো (মানুষের কাছে) পৌছে দিন।' ...হযরত উসমান (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রাসুল (ﷺ) বলেছেন, সর্বোত্তম মানুষ সে, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।' এই হাদিসে মুসলিম ও অমুসলিমের শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং অসম্বোধিত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করা, সেটির ওপর আমল করার আশায় যখন তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া উত্তম কাজ হলো, তখন হেদায়াত ও আমলের আশায় সম্বোধিত ব্যক্তিদেরকে শিক্ষা দেওয়া আরও উত্তম হবে।'[৩৪৫]

ইমাম তাহাবি (রহ.) বলেছেন–

ذكر محمد عن أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه ولم يذكر خلافا ...روى حماد بن سلمة عن حبيب المعلم قال سألت الحسن أعلم أولاد أهل الذمة القرآن؟ قال نعم أليسوا يقرؤون التوراة والإنجيل وهو من كتاب الله؟! وقال أبو جعفر قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الأية (التوبة). وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي ﷺ مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي ابن سلول فإذا في المجلس عبد الله بن أبي فدعاهم رسول الله ﷺ إلى الله تعالى وعلمهم القرآن.

---

৩৪৫. শারহুস সিয়ারিল কাবির, ইমাম সারাখসি (রহ.) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৫, ফিকরাহ নং ২৪৬।

'ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, হারবি ও জিম্মিকে কুরআন এবং ফিকহ শিক্ষা দেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই এবং এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য উল্লেখ করেননি। ... হযরত হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.) হাবিব মুআল্লিম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত হাসান (রহ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, জিম্মিদের সন্তানদেরকে কি কুরআন শেখাবো? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা কি তাওরাত-ইঞ্জিল পড়ে না, অথচ সেগুলো আল্লাহর কিতাব?[৩৪৬] হযরত আবু জাফর তাহাবি (রহ.) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'কোনো মুশরিক যদি তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তা হলে তাকে আশ্রয় দাও! ফলে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারবে।' শোআইব বিন আবু হামজা ইমাম যুহরি থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসামা বিন যায়েদ তাকে জানিয়েছেন, রাসুল (ﷺ) এমন একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল ছিল। ঘটনাটি ছিল তার ইসলাম গ্রহণের আগের। রাসুল (ﷺ) তাদেরকে দাওয়াত দিলেন এবং কুরআন শেখালেন।'[৩৪৭]

অমুসলিম কর্তৃক কুরআন স্পর্শ করা: গোসল করার পর তাদের জন্য কুরআন স্পর্শ করাকে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) জায়েয বলেছেন।

আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন–

وروي عن أبي يوسف، أنه لا يترك الكافر أن يمس المصحف، لأن الكافر نجس، فيجب تنزيه المصحف عن مسه، وقال محمد : لا بأس به إذا اغتسل؛ لأن المانع هو الحدث وقد زال بالغسل، وإنما بقي نجاسة اعتقاده، وذلك في قلبه لا في يده»

৩৪৬. **লক্ষণীয়** : এখানে হাসান বসরি (রহ.) এ কথা বুঝাননি যে, ইহুদি নাসারাদের কাছে থাকা কিতাবই সেই সত্য ও অবিকৃত তাওরাত-ইঞ্জিল, যা মুসা ও ইসা (আলাইহিমাস সালাম)-এর উপর নাজিল হয়েছিল। কারণ, খোদ কুরআনেই আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, তাওরাত-ইঞ্জিলকে আহলে কিতাবরা বিকৃত করেছে। দ্রষ্টব্য – সুরা: বাকারা, আয়াত-৭৯; সুরা: আলে ইমরান, আয়াত-৭৮; সুরা: মায়েদা, আয়াত-১৩ ও ১৫ প্রভৃতি। –সম্পাদক

৩৪৭. মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯২।
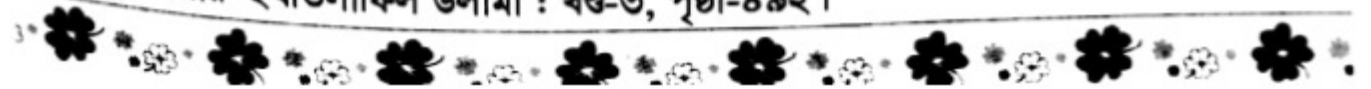
'ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, অমুসলিমকে কুরআন স্পর্শ করতে দেওয়া যাবে না। কারণ, তারা অপবিত্র, তাই তাদের থেকে কুরআনকে পবিত্র রাখতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, অমুসলিম গোসল করার পর কুরআন স্পর্শ করতে পারবে। কারণ, স্পর্শ করার ক্ষেত্রে বাধা হলো নাপাকি, আর গোসল করার মাধ্যমে সেটি দূর হয়ে গেছে। এখন তার বিশ্বাসগত অপবিত্রতা অবশিষ্ট রয়েছে এবং সেটি তার অন্তরের ব্যাপার। তার হাত তো আর নাপাক নয়।'[৩৪৮]

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর এ মতকে হযরত আনাস বিন মালেক (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি সমর্থন করে। সেখানে বর্ণিত আছে–

فلما يئس عمر قال : أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه، ... فقالت أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ، قال : فقام عمر فتوضأ، ثم أخذ الكتاب فقرأ : طه حتى انتهى إلى قوله "إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري"

'উমর (রাযি.) তাঁর বোন থেকে নিরাশ হওয়ার পর বললেন, তোমাদের কাছে যে কিতাব রয়েছে, আমাকে সেটি দাও, আমি সেটি পড়ব।...তখন তার বোন বললেন, আপনি অপবিত্র, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ এ কিতাব স্পর্শ করতে পারে না। অতএব, আপনি গিয়ে গোসল বা অজু করে আসুন। তিনি বললেন, এরপর উমর (রাযি.) গিয়ে অজু করে আসার পর কুরআন নিয়ে সুরা তহা থেকে 'إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي' আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন।'[৩৪৯]

ইবনে সাদ (রহ.) ইসহাক বিন ইউসুফ আযরাক (রহ.)-এর সনদে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবি। তা ছাড়া তিনি কুতুবুস সিত্তাহ-এর

৩৪৮. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, পরিচ্ছেদ: অজুর আদবসমূহ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭। আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৩১। রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৯২, ফিকরাহ নং ১৫৩৪।

৩৪৯. তবাকাতে ইবনে সাদ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪৮।
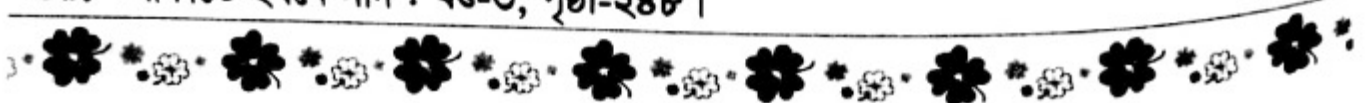
রাবিদের মধ্যে অন্যতম।[৩৫০] তবে ঘটনাটি তিনি কাসেম বিন উসমান বসরি থেকে বর্ণনা করেছেন, যাকে ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) নির্ভরযোগ্য বললেও অন্যান্য মুহাদ্দিস দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।[৩৫১]

আমাদের আলোচনা থেকে যে সারকথা বোঝা যায় তা হলো, যখন কোনো অমুসলিম থেকে ইসলাম আশা করা যায় এবং কুরআনের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত না-করার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায়, তখন তার কাছে কুরআন দেওয়া নিষেধ নয়। এটি ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মত। হানাফি মাযহাবের যে মত উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুসলিমের কাছে কুরআন বিক্রয় করা জায়েয আছে, তবে পরবর্তী সময়ে কোনো মুসলিমের কাছে সেটি বিক্রয় করতে বাধ্য করা হবে। এ মতটি সেসব সাধারণ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে কুরআনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং যেক্ষেত্রে মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায়, সেক্ষেত্রটি এ হুকুমের আওতাভুক্ত হবে না।

উপর্যুক্ত হুকুমটি আরবি কুরআনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কুরআনের অনুবাদ ও তাফসিরের কিতাবকে অনেক ফকিহ আরবি কুরআনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। হাদিস ও তাফসিরের কিতাবের বিক্রয় সহিহ হওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে অনুরূপ মতানৈক্য রয়েছে।[৩৫২] তবে এসব কিতাবের বিষয়টি তুলনামূলক শিথিল। কারণ, অপবিত্র অবস্থায় সেগুলো স্পর্শ করা জায়েয আছে। সুতরাং মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার আশঙ্কা ছাড়া অমুসলিমদের কাছে সেগুলো রাখতে আর কোনো বাধা নেই। তাই এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হলে অমুসলিমকে এসব কিতাবের মালিক হতে নিষেধ করা যাবে না। বিশেষ করে যখন এগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামের ভালো দিকগুলো জেনে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে তাদের থেকে আশা থাকবে, তখন নিষেধ করা যাবে না। والله تعالى أعلم

৬৬. অমুসলিমদের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করা

মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সহায়তা হওয়ার কারণে তাদের কাছে যেসব জিনিস বিক্রয় করা না-জায়েয, তার মধ্যে একটি হলো অস্ত্র। মুসলিমদের

---

৩৫০. তাহযিবুত তাহযিব : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৭।

৩৫১. মিযানুল ইতিদাল, আল্লামা যাহাবি (রহ.), ভ. ৪, পৃষ্ঠা-৫৫০।

৩৫২. শারহুস সিয়ারিল কাবির, ইমাম সারাখসি (রহ.) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৬। আল-ফুরু, আল্লামা ইবনে মুফলিহ রহ.,. খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২। আদ-দুসুকি : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭। রাওযাতুত তালিবিন : খণ্ড-৩,পৃ. ৩৪৪।

বিরুদ্ধে তাদেরকে শক্তিশালী করার মাধ্যম হওয়ায় অমুসলিমদের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সব ফকিহ একমত। তবে বিক্রয় করলে সে চুক্তিটি কি কার্যকর হবে না বাতিল হবে? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, অমুসলিমের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করলে সে চুক্তিটি বাতিল হবে।[৩৫৩] হেদায়া থেকে প্রাপ্ত হানাফি মাযহাবের মত হলো, এক্ষেত্রে বিক্রয় না-জায়েয হলেও সেটি কার্যকর হবে।

হেদায়া কিতাবের বক্তব্যটি এরূপ–

> (ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب، ولا يجهز إليهم)...لأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين، فيمنع من ذلك، وكذا الكراع لما بينا، وكذلك الحديد لأنه أصل السلاح،
>
> 'অমুসলিমদের কাছে অস্ত্র বিক্রয় বা সরবরাহ করা যাবে না। ... কারণ, এর মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সহায়তা করা হয়। তাই তাদের কাছে এগুলো বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া ও লোহা বিক্রয় করা যাবে না। কারণ, লোহা অস্ত্রের মূল উপাদান।'[৩৫৪]

এ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, অমুসলিমদের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করলে বিক্রয় কার্যকর হবে; কিন্তু তারপরও তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রয়ের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। বিক্রয় কার্যকর হয়ে গেলেও অমুসলিমদেরকে ক্রয়কৃত অস্ত্র নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। ইমাম সারাখসি (রহ.) এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন–

> وإذا أراد الحربي المستأمن أن يرجع إلى دار الحرب، لم يُتْرَك أن يخرج معه كراعا وسلاحا أو حديدا أو رقيقا اشتراهم في دار الإسلام، مسلمين أو كفارا، كما لا يترك تجار المسلمين ليحملوا إليهم هذه الأشياء، وهذا لأنهم يتقوون بها على المسلمين.

৩৫৩. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৩৫। আল-ওয়াসিত, ইমাম গাযালি (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৯। আল-ইনসাফ, আল্লামা মারদাবি (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২৭।

৩৫৪. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬০।
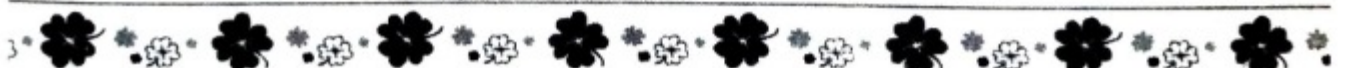
'দারুল ইসলামে ভিসা নিয়ে অবস্থানরত কোনো দারুল হারবের নাগরিক যদি তার দেশে ফিরে যেতে চায়, তা হলে তাকে অস্ত্র, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া, লোহা বা দারুল ইসলাম থেকে ক্রয়কৃত কোনো দাস নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। সে নাগরিক মুসলিম হোক বা অমুসলিম। যেমনভাবে কোনো মুসলিম ব্যবসায়ীকে দারুল হারবে এগুলো নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। এই হুকুমের কারণ হলো, এসব অস্ত্রের মাধ্যমে অমুসলিমরা মুসলিমদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে।'[৩৫৫]

এটি মালেকি মাযহাবেরও মত। আল্লামা মাওওয়াক (রহ.) বলেছেন–

قال مالك : لا يباع من الحربي سلاح ولا سروج ولا نحاس . قاله أبو إسحاق . ومن باع ذلك منهم بيع على من اشتراه على قياس النصراني يشتري المسلم . ابن حبيب : وسواء كانوا في هدنة أو غيرها،

'ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, কোনো অমুসলিমের কাছে অস্ত্র, জিনপোষ বা তামা বিক্রয় করা যাবে না। আবু ইসহাক (রহ.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কোনো খ্রিস্টান কর্তৃক মুসলিম থেকে অস্ত্র ক্রয়ের মাসআলার ওপর কিয়াস করে কেউ অমুসলিমের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করলে সেটি তাকে দ্বিতীয়বার বিক্রয় করতে বাধ্য করা হবে। ইবনে হাবিব (রহ.) অনুরূপ বলেছেন। চাই তাদের এ লেনদেনটি যুদ্ধাবস্থায় বা অন্য কোনো সময়ে হোক।'[৩৫৬]

ইমাম তাহাবি (রহ.) বলেছেন, অস্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম বন্দি বিনিময় করা জায়েয নেই।[৩৫৭] কেননা, এক্ষেত্রে অস্ত্র লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ হলো, মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে তাদেরকে সহায়তা করা। সুতরাং যে কোনো পদ্ধতিতে তাদেরকে অস্ত্র দিলে তা বিক্রয়ের মতোই হবে। তবে লৌহজাত দ্রব্য যদি শুধু অস্ত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত না হয়, তা হলে শাফেয়ি মাযহাবের মতানুযায়ী অমুসলিমদের কাছে এমন লোহা বিক্রয় করা যাবে।[৩৫৮]

---

৩৫৫. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.) : খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৯২।
৩৫৬. আত-তাজ ওয়াল ইকলিল, আল্লামা মাওওয়াক (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৪।
৩৫৭. মুখতাসারু ইখতিলাফিল ফুকাহা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৮১।
৩৫৮. মুগনিল মুহতাজ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০।
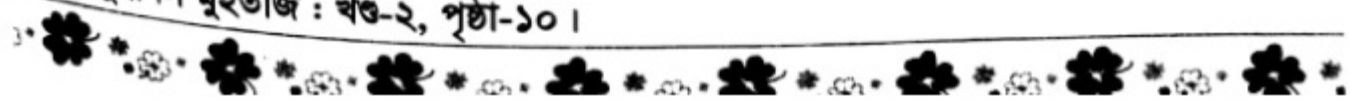
হানাফি মাযহাবের ফকিহগণ বলেছেন, এক্ষেত্রে তাদের কাছে লোহা বিক্রয় করা মাকরুহ হবে।[৩৫৯] সারকথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো অস্ত্রের জন্য ব্যবহার করা হয়, অমুসলিমদের কাছে সেগুলোর বিক্রয় না-জায়েয হওয়ার বিষয়টি অস্ত্র বিক্রয়ের মতো।

ফুকাহায়ে কেরামের কাছে এটি একটি আম হুকুম। ইতঃপূর্বে তাদের লেনদেনটি যুদ্ধ বিরতি ও সন্ধির সময়ে হলেও এই হুকুম প্রযোজ্য। আল্লামা মাওওয়াক (রহ.)-এর উদ্ধৃতিতে এমনটিই উল্লেখ করা হয়েছে এবং হেদায়া গ্রন্থের প্রণেতা এ কথাই বলেছেন। স্পষ্ট কথা হলো, এমন অমুসলিমদের কাছে অস্ত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না, যারা মুসলিমদের ও তাদের উভয়পক্ষের একই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। কারণ, জিম্মিদের থেকে যদি এমন আশঙ্কা না-থাকে যে, অস্ত্র ক্রয় করে তারা মুসলিমদের শত্রুদের কাছে পাঠাবে, তা হলে জিম্মিদের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করা জায়েয আছে।[৩৬০]

এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম যে আলোচনা করেছেন সেখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ সম্পর্কিত হুকুমটি ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং নির্দিষ্টভাবে যে জিনিসগুলো মুসলিমদের বিপক্ষে অমুসলিমদের শক্তিশালী করবে, সেগুলো বিক্রয় করা জায়েয হবে না। যেগুলো এ ধরনের হবে না, সেগুলো বিক্রয় করতে কোনো বাধা নেই। কেননা, অস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধের বিষয়টি অমুসলিমের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলিম বিদ্রোহীদের কাছেও অস্ত্র বিক্রয় করা না-জায়েয। কারণ, অস্ত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে বিদ্রোহীদেরকে নিরিহ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সহায়তা করা হয়। তা ছাড়া মুসলিম ডাকাত বা চোর হলেও তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।[৩৬১] অনুরূপভাবে হুকুমটি শুধু অস্ত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়; বরং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেসব জিনিস অমুসলিমদেরকে সহায়তা ও শক্তি জোগাবে, সেগুলো বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ। এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যুদ্ধ চলা অবস্থায় অমুসলিমদের কাছে খাদ্য বিক্রয় করাও

---

৩৫৯. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৫৪, ফিকরাহ নং ২০৬১৮। বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৪২।

৩৬০. মুগনিল মুহতাজ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০। হাওয়াশি শিরওয়ানি : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩২।

৩৬১. রাদ্দুল মুহতার, পরিচ্ছেদ : বিদ্রোহী : খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৫৩, ফিকরাহ নং ২০৬১৫।

জায়েয নেই। আল্লামা মাওওয়াক (রহ.) বলেছেন–

وأما الطعام فيجوز بيعه منهم في الهدنة، وأما في غير الهدنة فلا .

'খাবারের হুকুম হলো, যুদ্ধ বিরতির অবস্থায় সেটি অমুসলিমদের কাছে বিক্রয় করা জায়েয আছে। যুদ্ধাবস্থায় বিক্রয় করা জায়েয নেই।'[৩৬২]

ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেছেন–

ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك، إلا السلاح والكراع والسبي، سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان ....ثم هذا الحكم إذا لم يحاصروا حصناً من حصونهم، فأما إذا حاصروا حصناً من حصونهم، فلا ينبغي لهم أن يبيعوا من أهل الحصن طعاماً ولا شراباً ولا شيئاً يقويهم على المقام.

'মুসলিম কর্তৃক অমুসলিমের কাছে খাবার, কাপড় ইত্যাদির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রয় করা যাবে। তবে অস্ত্র, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া ও বন্দি বিক্রয় করা যাবে না। চাই তারা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে প্রবেশ করুক বা ভিসা ছাড়া প্রবেশ করুক। ... এ হুকুম সে সময়ের জন্য, যখন মুসলিমরা তাদের কোনো দূর্গ অবরুদ্ধ করে রাখবে না। যদি কোনো দূর্গ অবরুদ্ধ করে রাখে, তা হলে খাবার, পানীয় ও দূর্গে তাদের অবস্থানকে দীর্ঘায়িত করে এমন কোনো কিছু তাদের কাছে বিক্রয় করা যাবে না।'[৩৬৩]

উল্লিখিত বক্তব্যগুলো এ কথা প্রমাণ করে যে, সত্তাগত নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে অমুসলিমদের কাছে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নয়; বরং অবস্থাভেদে ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণের ওপর বিক্রয়ের হুকুম নির্ভরশীল। এমন ক্ষেত্রে বিষয়টি ন্যায় বিচারক শাসকের ওপর ন্যস্ত করা উচিত। والله تعالى أعلم

---

৩৬২. আত-তাজ ওয়াল ইকলিল, আল্লামা মাওওয়াক (রহ.), হাত্তাব (রহ.)-এর কিতাবের টীকায় প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৪।

৩৬৩. শারহুস সিয়ারিল কাবির, ইমাম সারাখসি (রহ.), পরিচ্ছেদঃ অমুসলিম দেশের লোকেদের উপহার : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৪২-১২৪৩, ফিকরাহ নং ২৩৩৩ ও ২৩৩৪।

৬৭. জাযিরাতুল আরবে অমুসলিমদের কাছে জমি বিক্রয় করা

ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে যেসব বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো, ইসলামি রাষ্ট্রের জমি অমুসলিমদের কাছে বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে জাযিরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ) ও অন্যান্য এলাকার জমির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

জাযিরাতুল আরবের হুকুম হলো, শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো অমুসলিমকে সেখানে বসবাস বা দীর্ঘ অবস্থানের সুযোগ দেওয়া জায়েয নেই। এক্ষেত্রে মূল দলিল হলো হযরত উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিস। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلاَ أَتْرُكُ فِيهَا إِلاَّ مُسْلِمًا.

'আমি অবশ্যই ইহুদি, খ্রিস্টানদেরকে জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দেবো। মুসলিম ছাড়া এখানে আর কাউকে রাখব না।'[৩৬৪]

সহিহ সনদে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে; মৃত্যুশয্যায় তিনি এ অসিয়ত করেছেন–

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

'মুশরিকদেরকে আরব উপত্যকা থেকে বের করে দাও।'[৩৬৫]

ইমাম মালেক (রহ.) হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

أَلاَ لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ

'জেনে রেখো! আরব ভূমিতে কখনোই দুটি ধর্ম একসঙ্গে থাকতে পারে না।'[৩৬৬]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) তার মুসনাদে হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৩৬৪. সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়: খারাজ ও যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ ..., পরিচ্ছেদ : আরব দ্বীপ থেকে ইহুদিদেরকে বের করা, হাদিস নং ৩০৩০।

৩৬৫. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: জিহাদ, পরিচ্ছেদ: দূতদের উপহার, হাদিস নং ৩০৫৩।

৩৬৬. মুয়াত্তা মালেক, অধ্যায়: মদিনা থেকে ইহুদিদেরকে বের করা।

ওয়াসাল্লাম)-এর সর্বশেষ কথা ছিল, 'জাযিরাতুল আরবে দুই ধর্ম একসঙ্গে রাখা হবে না।'[৩৬৭]

উপর্যুক্ত হাদিসগুলোর আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম এ সিদ্ধান্তে একমত হয়েছেন যে, অমুসলিমদেরকে জাযিরাতুল আরবে বসবাস বা দীর্ঘ অবস্থানের সুযোগ দেওয়া জায়েয নেই। তবে জাযিরাতুল আরবের উদ্দেশ্য নির্ধারণে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফি ও মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, দৈর্ঘ্য–প্রস্থের দিক থেকে পূর্ণ আরব উপত্যকাই জাযিরাতুল আরব। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে 'আদান আবইয়ান'-এর সীমানা থেকে উপকূলবর্তী ইরাকের এলাকা পর্যন্ত। প্রস্থের দিক থেকে জেদ্দা ও আরব সমুদ্র তীর থেকে শাম পর্যন্ত। সুতরাং ইয়ামান, বাহরাইন ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত পূর্ব এলাকাও জাযিরার অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে খায়বারের এলাকা থেকে পারস্যের সীমানা পর্যন্ত এলাকাও জাযিরার আওতাভুক্ত হবে।[৩৬৮]

শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, জাযিরার উদ্দেশ্য হলো শুধু হিজায ভূখণ্ড।[৩৬৯] সুতরাং ইয়ামান, বাহরাইন ও বর্তমান সময়ে উপসাগরীয় রাষ্ট্র নামে যেসব দেশ পরিচিত, সেগুলো হাদিসের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। এক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) কর্তৃক হযরত আবু উবাইদাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে তাঁরা দলিল দেন। তিনি বলেছেন–

> كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب
>
> 'রাসুল ﷺ-এর শেষ কথা ছিল, হিজায ও নাজরান এলাকার ইহুদিদেরকে জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও।'[৩৭০]

---

৩৬৭. মুসনাদে আহমাদ : খণ্ড-৪৩, পৃষ্ঠা-৩৭১, হাদিস নং ২৬৩৫২। মাজমাউয যাওয়ায়েদ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৮৬, হাদিস নং ৯৬৬১, আল্লামা হাইসামি (রহ.) বলেছেন, ইমাম আহমাদ ও তাবারানি (রহ.) এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনাকারীগণ সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী, তবে ইসহাক (রহ.) সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী নন; কিন্তু তিনি শোনার মাধ্যমে বর্ণনার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

৩৬৮. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩০১। বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১৪। মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮১।

৩৬৯. আল-মুহাযযাব : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৫৭। কাশশাফুল কিনা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৬।

৩৭০. আল্লামা হাইসামি (রহ.) মাজামউয জাওয়াইদ (খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৮৬) কিতাবে বলেছেন, ইমাম আহমাদ (রহ.) দুটি সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। উভয় সূত্রের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য ও উভয়টি মুত্তাসিল। ইমাম আবু ইয়ালা (রহ.) এটি বর্ণনা করেছেন।

জাযিরাতুল আরবের সীমানা নির্ধারণের মতানৈক্য অনুযায়ী অমুসলিমদের বসবাসের নিষিদ্ধ এলাকায় ব্যবসা বা অনুরূপ কোনো কাজের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতিক্রমে সেখানে প্রবেশ করা জায়েয আছে। তবে শাফেয়ি, হাম্বলি ও মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, তাদেরকে এক জায়গায় তিন থেকে চার দিনের বেশি অবস্থানের অনুমতি দেওয়া যাবে না।[৩৭১] কিন্তু অনেকের মত হলো, কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হলে সুস্থ হওয়া অথবা ব্যবসার পণ্য নিয়ে এলে সেগুলো বিক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় অবস্থানের সুযোগ দিতে হবে। অবস্থানের সময় তিন দিন নির্ধারণের পক্ষে হযরত উমর (রাযি.)-এর আমলের মাধ্যমে দলিল দেওয়া হয়। হযরত উমর (রাযি.) তাদেরকে তিনদিন অবস্থানের সুযোগ দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) তার 'মুয়াত্তা' কিতাবে ইমাম মালেক (রহ.) থেকে, তিনি হযরত নাফে (রহ.) থেকে, তিনি হযরত উমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন–

> أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ضَرَبَ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ بِالْمَدِينَةِ إِقَامَةَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ يَتَسَوَّقُونَ، وَيَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يُقِيمُ بَعْدَ ثَلَاثٍ.
>
> 'হযরত উমর (রাযি.) ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজারীদের জন্য তিন দিন মদিনায় অবস্থানের সময় নির্ধারণ করে দেন। সে সময়ের মধ্যে তারা লেনদেন ও প্রয়োজন পূরণ করত। তিন দিনের পর তাদের কেউ মদিনায় অবস্থান করেনি।'[৩৭২]

হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম তাদের অবস্থানের সময়কে তিন দিনে সীমাবদ্ধ করেননি; তবে দীর্ঘ সময় অবস্থানকে নিষিদ্ধ করেছেন। যেটিকে অনেকে এক বছর নির্ধারণ করেছেন।[৩৭৩] তা ছাড়া হযরত উমর (রাযি.)

---

৩৭১. আল-মুবদা, আল্লামা ইবনে মুফলিহ (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৪। নিহায়াতুল মুহতাজ : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৮৬। মাওয়াহিবুল জালিল : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮১।

৩৭২. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.), পরিচ্ছেদঃ আহলে জিম্মাদের মক্কা ও মদিনায় অবস্থান... , পৃষ্ঠা-২৮৪। আত-তালখিস, হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৫৪। তিনি ইমাম মালেক (রহ.)-এর সঙ্গে বর্ণনাটি সংযুক্ত করে বলেছেন, আবু জুরআহ (রহ.) এটিকে সহিহ বলেছেন এবং মুয়াত্তার বর্তমান সংস্করণে আমি সেটি পাইনি। সুনানে বাইহাকি : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৮। ইয়াহইয়া বিন বাকায়ের ইমাম মালেক (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৭৩. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায় : সিয়ার, পরিচ্ছেদঃ জিযইয়াহ : খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৭৬২, ফিকরাহ নং ২০১৭৪।

কর্তৃক তিন দিন নির্ধারণ করার বিষয়টিকে হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম সর্বনিম্ন সময়ের ক্ষেত্রে বলেছেন। আমার উস্তাদ শাইখ উসমানি থানবি[৩৭৪] (রহ.) 'ইলাউস সুনান'[৩৭৫] কিতাবে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। হযরত উমর (রাযি.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তাদেরকে তিন দিন অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। সেখানে এ কথা নেই যে, তিন দিনের বেশি অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হারাম।

এ ছাড়া ভিসা নিয়ে দারুল ইসলামে অমুসলিমদের অবস্থানের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই। তাই এ ধরনের বিষয়গুলো অবস্থা ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। সুতরাং স্থান

---

৩৭৪. **শাইখ উসমানি থানবি :** যফর আহমাদ ইবনে লতিফ উসমানি থানবি (রহ.)। জন্ম : ১৩১০ হিজরি মোতাবেক ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলুম দেওবন্দের কাছে পিত্রালয়ে। তিন বছর বয়সে মাকে হারান। দাদির কাছে প্রতিপালিত হন। আল্লামা খলিল আহমাদ সাহারানপুরি, আল্লামা আশরাফ আলি থানবি সহ তৎকালীন মশহুর উলামায়ে কেরামের কাছে ইলমে দীন হাসিল করেন। তাঁর ইলমি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তাঁর মামা আশরাফ আলি থানবি। কানপুরের মাদরাসায়ে জামিউল উলুমে শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় সাত বছর ছিলেন সেখানে। এরপর চলে যান থানাভবনের ইমদাদুল উলুম মাদরাসায়। সেখানে দরস-তাদরিস চলাকালীন মামা আশরাফ আলি থানবি তাঁকে ফতোয়া প্রদান ও 'ইলাউস সুনান' গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব দেন। প্রায় বিশ বছরে ২১ খণ্ডে বিস্তৃত এই কিতাবটি তিনি লিখে শেষ করেন। এরপর তিনি বার্মার রেঙ্গুনে মাদরাসায়ে মুহাম্মাদিয়ায় শিক্ষকতা করেন। সেখানে প্রায় দুই বছর দাওয়াত, তাবলিগ এবং ওয়াজ-নসিহতে কাটান। সেখান থেকে আবার থানাভবনে এসে ফতোয়া ও গ্রন্থরচনায় হাত দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন তিনি। মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানির সঙ্গে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতৃত্ব দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানি (রহ.) কে পশ্চিম পাকিস্তানে এবং মাওলানা যফর আহমাদ উসমানিকে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পতাকা উড্ডয়ন করতে অনুরোধ জানান। মাওলানা যফর আহমাদ উসমানি বাংলাদেশে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদিস, ফিকহ ও উসুল বিষয়ে অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকায় তিনি প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পান। বাংলাদেশে মাওলানা উসমানি দীর্ঘ আট বছর অতিবাহিত করেন। লেখালেখি, ফতোয়া প্রদান, ওয়াজ-নসিহত ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন এই সময়ে। যেমন, জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা। ইলাউস সুনান ছাড়াও বহু কিতাব তিনি রচনা করেছেন। যেমন, আহকামুল কুরআন, ইমদাদুল আহকাম, কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস, আল-কাওলুল মাতিন ফিল ইখফা বিত তামিন, কাশফুদ দুজা আন ওয়াজহির রিবা প্রভৃতি। শেষ বয়সে তিনি পাকিস্তানের দারুল উলুম ইসলামিয়া, আশরাফাবাদ, টেন্ডু আল্লাহইয়ার-এ সহিহ বুখারির দরস দেন। শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত নাযুক হওয়া সত্ত্বেও তিনি নামায, রোযা, জিকির, তেলাওয়াতে কোনো কমতি করতেন না। ১৩৯৪ হিজরি মোতাবেক ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইলাউস সুনানের ভূমিকা, পৃষ্ঠা-২৪-২৭) —সম্পাদক

৩৭৫. ইলাউস সুনান : খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৫৬১।

কালের পরিবর্তনের কারণে সেটি পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। এ ধরনের বিষয়গুলো জাতীয় রাজনীতি ও স্থান-কালের ওপর ন্যস্ত হয়ে থাকে।

জাযিরাতুল আরব এলাকার সীমানা নির্ধারণের মতানৈক্য অনুযায়ী অমুসলিমরা যেহেতু সেখানে বসবাস করতে পারবে না, তাই যেসব এলাকায় তাদের বসবাস জায়েয নেই, সেসব এলাকার অমুসলিমদের কাছে বাড়ি ও জমি বিক্রয় করা জায়েয আছে কি না?- শাফেয়ি মাযহাবের কিছু কিতাব ছাড়া অন্য কোথাও এ ব্যাপারে স্পষ্ট আলোচনা পাইনি। শাফেয়ি মাযহাবের সেসব কিতাবে দুটি মত উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা খতিব শিরবিনি (রহ.) 'আল-মিনহাজ' কিতাবের–

"ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز"

'কোনো কাফেরকে হিজায এলাকায় বসবাস করতে দেওয়া যাবে না' এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

فلو أراد الكافر أن يتخذ دارا بالحجاز، ولم يسكنها ولم يستوطنها، لم يجز؛ لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه.

'কোনো কাফের যদি হিজায এলাকায় বাড়ি নির্মাণ করতে চায়; তবে সেখানে থাকবে না এবং বসবাস করবে না, তা হলেও তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। কারণ, যেটি ব্যবহার করা হারাম, সেটি নির্মাণ করাও হারাম।'[৩৭৬]

তবে আল্লামা রমালি (রহ.) 'আল-মিনহাজ'-এর এই বক্তব্যের টীকায় লিখেছেন–

وأفهمَ كلامُه جوازَ شراء أرض فيه لم يقم بها، وهو الأوجه، لكن الصواب منعه، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، كالأواني وآلات اللهو، واليه يشير قول الشافعي: ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز داران، وإن رد بأن هذا ليس من ذالك.

'তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, বসবাস করবে না এমন জমি ক্রয় করা জায়েয আছে। এ ব্যাখ্যাটিই বেশি স্পষ্ট। কিন্তু না-জায়েয বলাই সঠিক সিদ্ধান্ত। কারণ, যা ব্যবহার করা হারাম, তা নির্মাণ করাও হারাম। যেমন : বিভিন্ন পাত্র ও বাদ্যযন্ত্র। ইমাম শাফেয়ি

---

৩৭৬. মুগনিল মুহতাজ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪৬।

(রহ.)-এর বক্তব্য এটি প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন, 'জিম্মি হিজাযে বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করতে পারবে না।' যদিও এ কথা বলে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, তা এ প্রসঙ্গে নয়।'[৩৭৭]

আল্লামা হাইতামি (রহ.) এটিকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন–

وأفهمَ كلامُهم أن له شراءَ أرض فيه لم يقم بها، وهو متجه، وان قيل: الصواب منعه، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ويرد بأن هذا ليس من ذاك، كما هو واضح، إذ لا يجر اتخاذ هذا إلى استعماله قطعا.

'তাঁদের বক্তব্য এ কথা বোঝায় যে, কোনো অমুসলিম বসবাসের নিয়ত ছাড়া সেখানে জমি ক্রয় করতে পারবে। এটি একটি সুন্দর ব্যাখ্যা। যদিও বলা হয় যে, এমন অবস্থায় তাদের জন্য জমি ক্রয় করা জায়েয নেই। কারণ, যে জিনিস ব্যবহার করা হারাম, সেটি নির্মাণ করাও হারাম। এ বক্তব্যকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে যে, জমি ক্রয়ের বিষয়টি বসবাসের মতো না-হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। কেননা, জমি ক্রয়ের কারণে তা ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত হয় না।'[৩৭৮]

সারকথা, জাযিরাতুল আরবের সীমানা নিয়ে মতানৈক্য অনুযায়ী কোনো অমুসলিম যদি জাযিরাতুল আরবে বসবাস বা দীর্ঘ সময় অবস্থানের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করতে চায়, তা হলে তাকে সেটি ক্রয় করতে দেওয়া যাবে না। কোনো মুসলিমের জন্য এমন লোকের কাছে জমি বিক্রয় করা জায়েয নেই। তবে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করে। যেমন : ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে, তা হলে এমন ক্ষেত্রে শাফেয়ি মাযহাবের মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, তাদের অনেকে জায়েযকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং অনেকে না-জায়েযকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ দুর্বল বান্দার কাছে যেটি উত্তম মনে হয় তা হলো, (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন) বর্ণিত ক্ষেত্রে যদি এমন আশঙ্কা হয় যে, ক্রেতা যদিও বর্তমানে বসবাসের ইচ্ছে করছে না, তবে পরবর্তী সময়ে সে দীর্ঘ সময় অবস্থান করবে, তা হলে সেখানে না-জায়েযের বিষয়টি নিশ্চিত। পক্ষান্তরে যদি এমন আশঙ্কা না হয়, তা হলে এমন ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ ইমামের কাছে ন্যস্ত করতে হবে। যাতে আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য উপকারী দিকটি প্রকাশ করে দেন। والله تعالى أعلم

---

৩৭৭. নেহায়াতুল মুহতাজ : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৮৫।

৩৭৮. তুহফাতুল মুহতাজ, আল্লামা শিরওয়ানি (রহ.)-এর টীকাসহ : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৮০।

৬৮. অমুসলিমদের কাছে জাযিরাতুল আরবের বাইরের জমি বিক্রয় করা

জাযিরাতুল আরবের বাইরের এলাকার হুকুম হলো, যে কোনো মুসলিম দেশে অমুসলিমদের জন্য বসবাস করা জায়েয আছে। সুতরাং সব ফকিহদের মতে তাদের জন্য এমন এলাকায় বাড়ি বা জমি ক্রয় করা জায়েয আছে। তবে অনেক হানাফি মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরাম শহরে অমুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার আশঙ্কায় সেখানে তাদের বসবাস না-জায়েয বলেছেন। 'আদ-দুররুল মুখতার' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে–
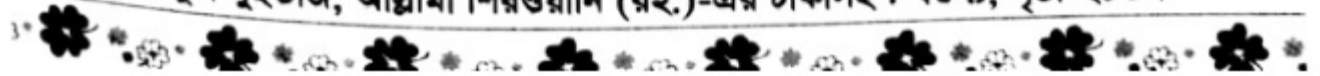
> (الذمي إذا اشترى دارا) أي أراد شراءها في المصر، لا ينبغي أن تباع منه، فلو اشترى، يجبر على بيعها من المسلم، وقيل لا يجبر إلا إذا كثر.
>
> 'কোনো জিম্মি শহরে বাড়ি ক্রয় করতে চাইলে, তার কাছে বিক্রয় করা উচিত না। যদি ক্রয় করে ফেলে, তা হলে কোনো মুসলিমের কাছে সেটি বিক্রয় করতে বাধ্য করতে হবে। অন্য মত হলো, তাদের আধিক্য ছাড়া মুসলিমের কাছে বিক্রয়ে বাধ্য করা যাবে না।'

তবে এ বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন–

> قال السرخسي في شرح السير : فإن مصر الإمام في أراضيهم للمسلمين، كما مصر عمر رضي الله عنه البصرة والكوفة، فاشترى بها أهل الذمة دورا وسكنوا مع المسلمين، لم يمنعوا من ذلك، فإنا قبلنا منهم عقد الذمة، ليقفوا على محاسن الدين، فعسى أن يؤمنوا، واختلاطهم بالمسلمين والسكن معهم يحقق هذا المعنى، وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة الحلواني يقول: هذا إذا قلوا وكان بحيث لا تتعطل جماعات المسلمين ولا تتقلل الجماعة بسكناهم بهذه الصفة فأما إذا كثروا على وجه يؤدي إلى تعطيل بعض الجماعات أو تقليلها منعوا من ذلك، وأمروا أن يسكنوا ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة، وهذا محفوظ عن أبي يوسف في الأمالي.
>
> 'ইমাম সারাখসি (রহ.) শারহুস সিয়ার কিতাবে বলেছেন, কোনো রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর দেশে মুসলিমদের জন্য যদি কোনো শহর প্রস্তুত করেন। যেমন : হযরত উমর (রাযি.) কুফা ও বসরা শহর প্রস্তুত করেছেন, এরপর কোনো জিম্মি সেখানে বাড়ি ক্রয় করে মুসলিমদের সাথে বসবাস করতে থাকে, তা হলে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না। তারা যেন ইসলামের ভালো দিকগুলো জানতে পারে এবং ইমান আনতে পারে, এ উদ্দেশ্যে আমরা তাদের সঙ্গে জিম্মির চুক্তি করেছি। মুসলিমদের সঙ্গে ওঠা-বসা এবং তাদের মধ্যে
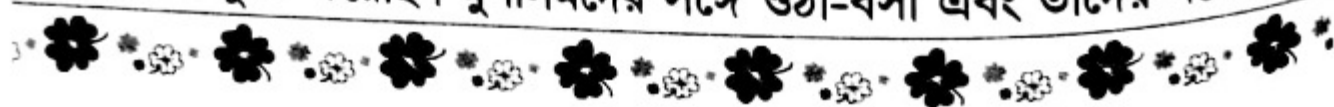
অবস্থানের মাধ্যমে এ বিষয়টি ভালোভাবে কাজ দেবে। আমাদের শাইখ শামসুল আইম্মা হালওয়ানি (রহ.) বলেছেন, যেখানে অমুসলিমদের সংখ্যা কম থাকে এবং মুসলিম জামাতকে অকার্যকর ও তাদেরকে সংখ্যালঘু করে না, সে ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য। তবে যদি অমুসলিমদের সংখ্যা এত বেশি হয়ে যায় যে, তাদের কারণে মুসলিম জামাতের কার্যক্রমে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয় অথবা মুসলিমদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে, তা হলে অমুসলিমদেরকে অবস্থান করতে দেওয়া যাবে না। তাদেরকে এমন এলাকায় বসবাসের নির্দেশ দেওয়া হবে, যেখানে মুসলিম জামাত নেই। এট ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মত, 'আমালি' কিতাবে যা সহিহভাবে প্রমাণিত।'[৩৭৯]

সারকথা, মুসলিম জনবসতি এলাকায় অমুসলিমদের বসবাস এবং বাড়ি ও জমি ক্রয়ের বিষয়টি এভাবে শর্তযুক্ত যে, ইসলাম ও মুসলিমদের গ্রহণযোগ্য কোনো উপকারিতা বাধাগ্রস্ত হতে পারবে না। যেখানেই এমন উপকারিতা বাধাগ্রস্ত হবে, সেখানে অমুসলিমদের বসবাস নিষিদ্ধ করতে হবে। এ কারণে সমকালীন উলামায়ে কেরাম অমুসলিমদের কাছে ফিলিস্তিনের জমি বিক্রয়কে না-জায়েয বলেছেন।[৩৮০] এ ফতোয়া উপেক্ষা করার কারণে এ পবিত্র ভূমিতে ইহুদিবাদি ইসরায়েলদের আগ্রাসন এবং সে কারণে সেখানে বসবাসরত মুসলিমদের ভয়াবহ পরিণতির শিকার হতে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন এবং মুসলিমদের সাহায্য করুন। আমিন।

৬৯. শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা

ক্রয়-বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য ক্রেতা-বিক্রেতা শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা শর্ত নয়। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় সহিহ হবে। ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শের মাধ্যমে সে পণ্য শনাক্ত করবে। অনুরূপভাবে বোধগম্য ইশারার মাধ্যমে বাক-প্রতিবন্ধীর লেনদেন সহিহ হবে। আমাদের জানা মতে এ ধরনের লেনদেন জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই।[৩৮১]

* * *

---

৩৭৯. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায় : সিয়ার, পরিচ্ছেদ : জিযইয়াহ, মতলব, আহলে জিম্মির বাড়ি : খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৭৬৪, ফিকরাহ নং ২০১৭৭।

৩৮০. ইমদাদুল ফাতাওয়া, শাইখ আশরাফ আলি থানবি (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৯।

৩৮১. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৮। রাওযাতুত তালিবিন : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪১। মাওয়াহিবুল জলিল : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২৯। বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২২।

ক্রেতা-বিক্রেতা একাধিক হওয়া সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান

৭০. ক্রেতা-বিক্রেতার একাধিক হওয়া

ক্রয়-বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ ক্রেতা-বিক্রেতা ভিন্ন হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। সুতরাং এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের চুক্তিকারী হওয়া জায়েয নেই। এ বিষয়টি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে একজন এক পক্ষের মূল চুক্তিকারী এবং অপর পক্ষের উকিল হয়। এরপর মূল চুক্তিকারী হিসাবে ইজাব করে এবং উকিল হিসাবে কবুল করে। এরপরের বিষয়টি হলো, এই প্রতিনিধিত্ব (النيابة) কখনো স্বয়ং প্রতিনিধি এবং যার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হচ্ছে, উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়– যেমনঃ উকিল। ওকালাতের চুক্তির কারণে যে তার মুআক্কিলের প্রতিনিধি হয়, আবার কখনো শরয়ি হুকুমের কারণে প্রতিনিধি হয়– যেমনঃ পিতা তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের প্রতিনিধি হয়ে থাকে। আবার কখনো-কখনো প্রতিনিধি নির্ধারণের দায়িত্বশীলের পক্ষ থেকে কাউকে নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে থাকে- যেমনঃ অসিয়তকারী। উপর্যুক্ত সবপ্রকারের জন্য স্বতন্ত্র বিধি-বিধান রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে সামনে আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ।

৭১. উকিল কর্তৃক নিজের জন্য বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করা জায়েয কি না

সব ফকিহের মূলনীতি হলো, উকিল কর্তৃক নিজের জন্য চুক্তি করা এবং ক্রেতা-বিক্রেতার ভূমিকা পালন করা জায়েয নেই। সুতরাং যায়েদ যদি তার কোনো পণ্য বিক্রয়ের জন্য আমরকে উকিল নির্ধারণ করে, উকিল হিসাবে আমর সেটিকে নিজের জন্য ক্রয় করতে পারবে না। সে যদি ওই পণ্যটি ক্রয় করতে চায়, তা হলে তার পক্ষ থেকে ইজাব করার পর যায়েদের পক্ষ থেকে কবুল করা আবশ্যক। এটি চার মাযহাবের ইমামদের সর্বসম্মত মত। তবে না-জায়েয হওয়ার কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা মতানৈক্য করেছেন। হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের আলোচনা থেকে যেটি বুঝা যায় তা হলো, অনেক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধের কারণ হলো, লেনদেনের ক্ষেত্রে একজন উভয় পক্ষের ভূমিকা পালন করতে না-পারা। কারণ, লেনদেনের মধ্যে অধিকার ও দায়-দায়িত্ব চুক্তিকারীর ওপর বর্তায়। লেনদেনে বিপরীতমুখী দায়িত্ব রয়েছে। যেমন : পণ্য হস্তান্তর করা, বুঝে নেওয়া এবং মূল্য উসুল করা। তাই এক ব্যক্তি উভয়
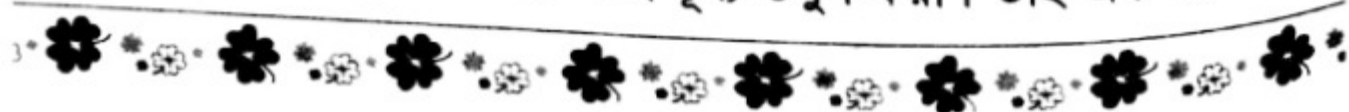
পক্ষের ভূমিকা পালন করলে, নিজে হস্তান্তর করা, বুঝে নেওয়া, মূল্য উসুল করা ও পরিশোধ করা আবশ্যক হয়, আর এমনটি হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী, হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম উকিল কর্তৃক নিজের কাছে পণ্য বিক্রয়কে জায়েয বলেননি; যদিও সে মুআক্কিলের অনুমতি বা বাজার দর অপেক্ষা বেশি মূল্যে ক্রয় করুক।[৩৮২] তবে পূর্বে বলা হয়েছে, উকিল যদি নিজে ক্রয় করতে চায়, তা হলে মুআক্কিলের সঙ্গে তার ইজাব-কবুলের চুক্তি সম্পন্ন হতে হবে। তাই উকিল নির্ধারণকারী (মুআক্কিল) যদি চুক্তি করার অযোগ্য হয় এবং উকিল নিজে ক্রয় করলে কোনো ধরনের অপবাদের আশঙ্কা না থাকে, তা হলে নিজের জন্য ক্রয় করা জায়েয আছে। এ সম্পর্কে পিতা কর্তৃক অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর সম্পদ ক্রয়ের আলোচনায় বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ। এমন ক্ষেত্রে হুকুমের দিক থেকে পিতাকে দুই ব্যক্তি সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং তার নিজের অবস্থান হিসাবে ইজাব হবে এবং অপর পক্ষ হিসাবে কবুল হবে। ফলে হুকুমের দিক থেকে উভয় পক্ষ ভিন্ন হবে।

প্রচলিত ব্রিটিশ আইন এ বিষয়ে হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের মতের পথে চলেছে। 'স্বার্থের সংঘাত' (Conflict of interest) শিরোনামে উকিল কর্তৃক নিজের জন্য পণ্য ক্রয়কে নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং নিজের জন্য বিক্রয় করার ক্ষেত্রে সাধারণ অনুমতি কার্যকর হবে না; বরং নিজের জন্য বিক্রয় করতে প্রয়োজনীয় সব বিবরণ ও শর্ত পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।[৩৮৩] এ ধরনের শর্তারোপ মুআক্কিল থেকে কবুল করার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

মালেকি মাযহাবের অবস্থান : মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের

---

৩৮২. ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেছেন, উকিল যদি নিজের কাছে বা নিজের ছোট বাচ্চার কাছে বিক্রয় করে, তা হলে জায়েয হবে না। মুআক্কিল অনুমতি দিলেও তা জায়েয হবে না। (আল-মাবসুত লিস সারাখসি, অধ্যায়: ওকালত : খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা-৩২) আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি (রহ.) বলেছেন, উকিলকে অনুমতি দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করে তার চেয়ে বেশিতে বিক্রয় করতে নিষেধ করলে উকিল নিজের কাছে বিক্রয় করতে পারবে না। ... কারণ, নিজের জন্য ক্রয় নিষিদ্ধের কারণ না; বরং এক ব্যক্তি থেকে ইজাব-কবুল না হওয়া নিষিদ্ধের কারণ। (তুহফাতুল মুহতাজ, আল্লামা শিরাজি (রহ.)-এর টীকাসহ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩১৮)

৩৮৩. Chitty: On contract, v. 2, p. 52, Ch. 1 (iv), para 2097. ইটালি ও জার্মানির আইনও প্রায় অনুরূপ। সুইচ আইন উকিলের জন্য শর্তহীনভাবে এমন ক্রয়কে বৈধ সাব্যস্ত করেছে। বিস্তারিত জানতে ড. আবদুর রাযযাক সানহুরি (রহ.)-এর 'নযরিয়্যাতুল আকদ' পৃষ্ঠা. ২২৮, ফিকরাহ নং ২২১, দেখুন।

আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধের কারণ হলো অপবাদ। এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের ভূমিকা পালন করা নিষিদ্ধের মূল কারণ নয়। সুতরাং মুআক্কিলের অনুমতি অথবা সব ক্রেতার মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে[৩৮৪] উকিল নিজের জন্য ক্রয় করলে যদি অপবাদের সুযোগ না-থাকে, তা হলে উকিল নিজের জন্য ক্রয় করতে পারবে। আল্লামা দুসুকি (রহ.) বলেছেন–

وحاصله : أن المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبات وبما إذا لم يأذن له ربه في البيع لنفسه، فإن اشترى الوكيل لنفسه بعد تناهي الرغبات أو أذنه الموكل في شرائه لنفسه جاز شراؤه حينئذ، ومثل إذنه له في شرائه، ما لو اشتراه بحضرة ربه؛ لأنه مأذون له حكما.

'সারকথা, নিষিদ্ধের হুকুমটি সে সময়ের সঙ্গে শর্তযুক্ত, যখন সব ক্রেতার প্রস্তাবিত মূল্যের চেয়ে সে বেশি মূল্যে ক্রয় করবে না এবং মুআক্কিল তাকে ক্রয়ের অনুমতি দেবে না। সব ক্রেতার প্রস্তাবিত মূল্যের চেয়ে উকিল যদি বেশি মূল্য দেয় অথবা মুআক্কিল তাকে ক্রয়ের অনুমতি দেয়, সেক্ষেত্রে তার ক্রয় করা জায়েয আছে। ক্রয়ের অনুমতির দৃষ্টান্ত হলো, মুআক্কিলের উপস্থিতিতে ক্রয় করা। কেননা, তখন সে কৃত্রিম অনুমতিপ্রাপ্ত।'[৩৮৫]

হাম্বলি মাযহাবের সিদ্ধান্ত : তাঁদের এক বর্ণনায় হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের অনুরূপ মত রয়েছে। অন্য বর্ণনায় উভয় মতের মধ্যে সমন্বয় করে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি লেনদেনের উভয় পক্ষের ভূমিকা পালন করা জায়েয নেই। তবে যদি উকিল থেকে অপবাদ দূর হয়ে যায়। তা এভাবে যে, ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে সে নিজের জন্য ক্রয় করে, তা হলে অন্যের কাছে বিক্রয়ের ব্যাপারে যাকে উকিল করা হয়েছে সে অন্যকে বিক্রয়ের উকিল বানিয়ে নিজে আসল ক্রেতা হবে, অথবা তার পক্ষ থেকে অন্যকে ক্রয়ের উকিল বানিয়ে মুআক্কিলের পক্ষ থেকে সে বিক্রয় করবে। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন–

من وكل في بيع شيء لم يجز له أن يشتريه من نفسه في إحدى الروايتين،

---

৩৮৪. অর্থাৎ, উকিল যে মূল্যে ক্রয় করতে চাচ্ছে অন্য কেউ তার চেয়ে বেশি মূল্যে ক্রয়ে রাজি হয়নি।

৩৮৫. আদ-দুসুকি আলা শারহি মুখতাসারি খলিল : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮৭।

نقلها مهنأ وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك الوصي ... وحكي عن مالك والأوزاعي جواز ذلك فيهما، والرواية الثانية : عن أحمد يجوز لهما أن يشتريا بشرطين، أحدهما : أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء، والثاني : أن يتولى النداء غيره، قال القاضي : يحتمل أن يكون اشتراط تولي غيره النداء واجبا، ويحتمل أن يكون مستحبا، والأول أشبه بظاهر كلامه، وقال أبو الخطاب : الشرط الثاني أن يولي من يبيع ويكون هو أحد المشترين، فإن قيل فكيف يجوز له دفعها إلى غيره ليبيعها، وهذا توكيل وليس للوكيل التوكيل؟ قلنا : يجوز التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه، والنداء مما لم تجر العادة أن يتولاه أكثر الناس بنفوسهم، وإن وكل إنسانا يشتري له وباعه، هو جاز على هذه الرواية، لأنه إمتثل أمر موكله في البيع، وحصل غرضه من الثمن، فجاز كما لو اشتراها أجنبي.

'যাকে কোনো জিনিস বিক্রয়ের উকিল নির্ধারণ করা হলো, দুই বর্ণনার এক বর্ণনা অনুযায়ী তার জন্য ওই জিনিস ক্রয় করা জায়েয নেই। আল্লামা মুহান্না (রহ.) এ মত নকল করেছেন। এটি শাফেয়ি ও হানাফি মাযহাবের মত। অসিয়তের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। ... ইমাম মালেক ও আওযায়ি (রহ.) থেকে এমন ক্ষেত্রে উকিল কর্তৃক নিজের জন্য বিক্রয় করা জায়েয হওয়ার মত বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় মতটি হলো, দুটি শর্তে তাদের (উকিল ও অসিয়তকৃতের) জন্য এটি ক্রয় করা জায়েয আছে। প্রথম শর্ত : প্রস্তাবিত মূল্য অপেক্ষা তাদের মূল্য বেশি হতে হবে।[৩৮৬] দ্বিতীয় শর্ত: অন্যকে মূল্য হাঁকার দায়িত্ব দেবে। আল্লামা কাজি (রহ.) বলেন, 'অন্যকে মূল্য হাঁকার দায়িত্ব দেওয়ার শর্তটি ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' তাঁর বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা থেকে প্রথমটিই বেশি উপযুক্ত মনে হয়। আল্লামা আবু খাত্তাব (রহ.) বলেন, দ্বিতীয় শর্তটি হলো,

৩৮৬. অর্থাৎ, নিলামের প্রস্তাবিত মূল্য অপেক্ষা বেশি।

কাউকে বিক্রয়ের দায়িত্ব দিয়ে উকিল নিজেই ক্রেতাদের একজন হবে। যদি প্রশ্ন করা হয়, উকিল কর্তৃক অন্যের কাছে পণ্য বিক্রয়ের দায়িত্ব দেওয়া কীভাবে জায়েয হবে? এমন করলে সেটি অন্যকে ওকালতের দায়িত্ব দেওয়া হয়, আর উকিলের জন্য অন্যকে ওকালতের দায়িত্ব দেওয়ার অধিকার নেই। উত্তরে আমরা বলব, যেসব ক্ষেত্রে উকিল নিজে দায়িত্ব পালন করতে পারে না, সেসব ক্ষেত্রে অন্যকে দায়িত্ব দেওয়া জায়েয আছে। পক্ষান্তরে যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য হাঁকার প্রচলন নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেই সেগুলোর মূল্য হাঁকে। সে যদি অন্যকে তার পক্ষ থেকে ক্রয়ের ব্যাপারে উকিল নির্ধারণ করে নিজে বিক্রয় করে, তা হলেও এ বর্ণনা অনুযায়ী জায়েয হবে। কারণ, সে তার মুআক্কিলের আদেশ পালন করেছে এবং মূল্যের ক্ষেত্রে মুআক্কিলের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। সুতরাং অপরিচিত কেউ ক্রয় করলে যেমনভাবে জায়েয হতো, তেমনিভাবে উকিল নিজে ক্রয় করলেও জায়েয হবে।'[৩৮৭]

৭২. পিতা কর্তৃক নিজের জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সম্পদ ক্রয় করা

হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম[৩৮৮] ক্রেতা-বিক্রেতা ভিন্ন হওয়ার শর্ত থেকে পিতা কর্তৃক ন্যায্য মূল্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের সম্পদ ক্রয়ের মাসআলাকে আলাদা রেখেছেন, অথবা সাধারণত মানুষ যে মূল্যের কম-বেশিতে লেনদেন করে থাকে, এমন কম-বেশিতে সন্তানের সম্পদ ক্রয়ের মাসআলাকেও ভিন্ন রেখেছেন। তবে ইমাম যুফার ও হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এ মাসআলার বিরোধিতা করে এমন লেনদেনকে না-জায়েয বলেছেন। কারণ, কিয়াসের দাবি হলো, এক ব্যক্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের ভূমিকা পালন করতে পারে না। কেননা, এমনটি করা অসম্ভব। তবে তিন ইমাম ইস্তিহসানের ভিত্তিতে এমন বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন। তাঁদের ইস্তিহসানের কারণ হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী–

---

৩৮৭. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩৭।

৩৮৮. আসল বক্তব্যে হানাফি মাযহাবের বক্তব্য আসবে। আর শাফেয়ি মাযহাবের বক্তব্য জানতে 'আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব' খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৮০ ও তুহফাতুল মুহতাজ, আল্লামা শিরওয়ানি (রহ.), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩১৮-এর টীকাসহ দেখুন।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

'কল্যাণকর পদ্ধতি ছাড়া এতিমের সম্পদের কাছেও যাবে না।'[৩৮৯]

সাধারণত মানুষ যে ধরনের কম-বেশিতে ক্রয়-বিক্রয় করে, অনেক সময় এমন ক্রয়-বিক্রয় উত্তম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের ভূমিকা পালন করতে না পারার বিষয়টি হলো, অভিভাবক হওয়ার দিক থেকে পিতা পূর্ণ মমতাময়। সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হলেও তার কাজকে বাচ্চার কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। সুতরাং যেন বাচ্চাই প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করছে। ফলে হুকুমের দিক থেকে ক্রেতা-বিক্রেতা ভিন্ন হয়ে গেল। তাই সেটি কোনো অবাস্তবতার দিকে নিয়ে যাবে না। এটি শাফেয়ি মাযহাবেরও মত।[৩৯০]

৭৩. পিতা ছাড়া অন্য কোনো অভিভাবক বা অসিয়তের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের জন্য শিশুর সম্পদ ক্রয় করা

পিতা ছাড়া অন্য অভিভাবক বা অসিয়তের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুকুম হলো, তাদের কেউ যদি শিশুর সম্পদ নিজে ক্রয় করে বা নিজের কাছে বিক্রয় করে, তা হলে সেখানে বাহ্যিক কোনো লাভ না থাকলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিক্রয় করা জায়েয নেই। যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেখানে শিশুর কোনো লাভ থাকে, তা হলে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে বিক্রয় করা জায়েয আছে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতে এমন ক্ষেত্রেও বিক্রয় করা জায়েয নেই এবং শাফেয়ি মাযহাবেরও এমন মত।[৩৯১] ইমাম মুহাম্মাদ ও শাফেয়ি (রহ.)-এর মতে কিয়াসের দাবি হলো, পিতা ও অসিয়তের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উভয়ের জন্যই শিশুর সম্পদ নিজের কাছে বিক্রয় করা না-জায়েয হওয়াই মূল হুকুম। যার কারণ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে উভয় পক্ষের ভূমিকা পালন করা অসম্ভব। তবে পিতার মধ্যে পূর্ণ মায়া-মমতা থাকার কারণে ব্যক্তির দিক থেকে সে একা হলেও সিদ্ধান্ত ও কথার দিক থেকে তাকে ভিন্ন সাব্যস্ত করা হয়েছে।

---

৩৮৯. সূরা আনআম : আয়াত-১৫২।

৩৯০. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২২। হাওয়াশিশ শিরওয়ানি আলা তুহফাতিল মুহতাজ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩১৮।

৩৯১. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২২। হাওয়াশিশ শিরওয়ানি আলা তুহফাতিল মুহতাজ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩১৮।

মায়া-মমতার দিক থেকে অসিয়তের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কখনোই পিতার সমতুল্য হতে পারে না, তাই তার ক্ষেত্রে কিয়াসের মৌলিক হুকুমটি বহাল থাকবে।

ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের দলিল হলো, এতিমের সম্পদে অসিয়তের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির হস্তক্ষেপে যখন বাহ্যিক উপকারিতা থাকবে, তখন সেটি উত্তম পন্থায় এতিমের সম্পদে হস্তক্ষেপের আওতাভুক্ত হওয়ায় সেটিকে কুরআনের বক্তব্যের অনুকূল বলা যাবে। দুটি দিক থেকে অসিয়তের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অপর দুই ব্যক্তির সঙ্গে মিল রয়েছে। একজন হলো, পিতা এবং অন্যজন হলো, উকিল। উকিল হওয়ার দিক থেকে সে একজন অপরিচিত ব্যক্তি। পিতার দিক থেকে সে পিতার অনুমতিপ্রাপ্ত। সুতরাং স্পষ্ট কথা হলো, বাচ্চার প্রতি তার পূর্ণ স্নেহ না থাকলে পিতা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়নি। তাই পিতার সাদৃশ্যের কারণে উপকারিতার ক্ষেত্রে আমরা তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছি। অন্য দিকে উকিলের সাদৃশ্যের কারণে উপকারিতা না-থাকলে তার কর্তৃত্ব রহিত করেছি। এভাবে উভয় সাদৃশ্যের ওপর আমল করার চেষ্টা করা হয়েছে।[৩৯২]

এ ব্যাপারে বিভিন্ন ফিকহি মাযহাবের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সব মাযহাবের মূলনীতি হলো, এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের ভূমিকা পালন করতে পারে না। কারণ, চুক্তিতে উভয় পক্ষ হওয়ার মূল দাবির সঙ্গে তা সাংঘর্ষিক। কিন্তু সকল ফকিহের কাছে এ মূলনীতির বাইরে এমন কিছু মাসআলা রয়েছে, যেখানে মুআক্কিল বা যার প্রতিনিধি হয়েছে, তার উপকার হয়। এখান থেকে যা বুঝা যায় তা হলো, হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের মতটি ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষায় বেশি উপযোগী। والله تعالى أعلم

৭৪. ক্রয় বা বিক্রয়ের মাধ্যমে কোনো একপক্ষ যদি না-জায়েয কাজের নিয়ত করে

কোনো একপক্ষ যদি না-জায়েয কাজের নিয়ত করে এবং অপর পক্ষ যদি সেটি জানতে পারে, তা হলে অনেক ফকিহ সেখানে ক্রয়-বিক্রয়কে না-জায়েয বলেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে হাম্বলি মাযহাব হলো, বিক্রেতা ক্রেতার না-জায়েয উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার পর বিক্রয় করলে সেটি হারাম ও বাতিল বিক্রয় হবে। তাই ক্রেতা পণ্যের এবং বিক্রেতা মূল্যের মালিক হবে না।

---

৩৯২. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২২-৩২৩।

'আল-মুকনি' কিতাবে বলা হয়েছে, 'মদ তৈরির জন্য আঙ্গুর ফল বিক্রয় করলে সেটি বাতিল বিক্রয় হবে।' ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك إما بقوله، واما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، فأما إن كان الأمر محتملا، مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الخل والخمر معا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز، وإذا ثبت التحريم فالبيع باطل.

'বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার না-জায়েয উদ্দেশ্য জানার পর তার কাছে বিক্রয় করলে সেটি হারাম ও বাতিল হবে। জানার পদ্ধতি হলো, ক্রেতার বক্তব্য অথবা নির্দিষ্ট কোনো আলামত দেখে বুঝবে। যদি বিষয়টি বিভিন্ন সম্ভাবনা রাখে, উদাহরণস্বরূপ : এমন ব্যক্তি ক্রয় করল, যার অবস্থা জানা যায় না, অথবা এমন ব্যক্তি ক্রয় করল, যে মদ ও সিরকা উভয়টি প্রস্তুত করে এবং ক্রয়ের সময় সে এমন কথা বলেনি, যার মাধ্যমে তার মদ তৈরির উদ্দেশ্য বুঝা যায়, তা হলে তার কাছে বিক্রয় করা জায়েয আছে। তবে হারাম কাজের উদ্দেশ্য প্রমাণিত হলে বিক্রয় বাতিল সাব্যস্ত হবে।'[৩৯৩]

মালেকি মাযহাবের সিদ্ধান্ত : তাঁদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, এমন বিক্রয় করা হারাম। তবে সেটি সহিহ হিসাবে সম্পন্ন হবে। আল্লামা যুরকানি (রহ.) বলেছেন–

وكذا يمنع أن يباع للحربيين ألة الحرب من سلاح أو كراع أو سرج، وجميع ما يتقوون به على الحرب ... وكذا الدار لمن يتخذها كنيسة، والخشبة لمن يتخذها صليبا، والعنب لمن يعصره خمرا، والنحاس لمن يتخذه ناقوسا، وكل شيئ يعلم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز، كبيع الجارية لأهل الفساد الذين لا غيرة لهم لو يطعمونها من حرام، والمملوك ممن يعلم منه الفساد به.

'অনুরূপভাবে হারবিদের কাছে অস্ত্র, বর্শা ও পিস্তল ইত্যাদি যুদ্ধের

৩৯৩. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৪।

সামগ্রী এবং যুদ্ধে শক্তি যোগায় এমন জিনিস বিক্রয় করা জায়েয নেই। ... অনুরূপভাবে গির্জা তৈরি করতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তির কাছে বাড়ি, ক্রুশ বানানোর জন্য কাঠ, মদ তৈরির জন্য আঙ্গুর, খ্রিস্টানদের বিশেষ চিহ্ন তৈরির জন্য তামা এবং এমন সব জিনিস বিক্রয় করা না-জায়েয, যেগুলোর মাধ্যমে ক্রেতা কোনো না-জায়েয কাজ করতে চায়। যেমন, দীনি মূল্যবোধ নেই এমন খারাপ লোকের কাছে দাসী বিক্রয় করা যারা তাকে হারাম খাবার খাওয়াবে এবং দুষ্কৃতিকারীদের কাছে দাস বিক্রয় করা জায়েয নেই।'[৩৯৪]

আল্লামা দারদির (রহ.) বলেছেন–

ومنع ... بيع مصحف أو جزئه وكتب حديث لكافر كتابي أو غيره، والبيع صحيح على المشهور وإن منع.

'ইহুদি, খ্রিস্টান বা অন্য কোনো অমুসলিমের কাছে কুরআনুল কারিম, বা তার অংশবিশেষ অথবা হাদিসের কিতাব বিক্রয় করা জায়েয নেই। যদিও বিক্রয় করা জায়েয নেই, তবে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী বিক্রয় করলে চুক্তিটি সহিহ হয়ে যাবে।'

এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় আল্লামা সাবি (রহ.) বলেছেন–

وكذا يمنع بيع كل شيئ علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز، كبيع جارية لأهل الفساد، أو مملوك أو بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة أو خشبة لمن يتخذها صليبا أو عنب لمن يعصره خمرا.

'অনুরূপভাবে এমনসব জিনিস বিক্রয় করা না-জায়েয, যেগুলো সম্পর্কে জানা যায় যে, সেটি দিয়ে ক্রেতা কোনো না-জায়েয উদ্দেশ্য নিয়েছে। যেমন, খারাপ লোকের কাছে দাস–দাসী, গির্জা বা উপাসনালয়ের জন্য জমি, ক্রুশ তৈরির জন্য কাঠ অথবা মদ তৈরির জন্য আঙ্গুর বিক্রয় করা।'[৩৯৫]

শাফেয়ি মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, ক্রেতার না-জায়েয উদ্দেশ্য জানার পর তার

---

৩৯৪. শারহুয যুরকানি আলা মুখতাসারি খলিল : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১। মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৪।

৩৯৫. আশ-শারহুস সগির, আল্লামা দারদির (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০।

কাছে বিক্রয় করা মাকরুহ। তবে বিক্রয় করলে সেটি সহিহ হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন–

أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر لم أبطله بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين وأجزته بصحة الظاهر وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع، وكما أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلما لانه قد لا يقتل به ولا أفسد عليه هذا البيع، وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرا ولا أفسد البيع إذا باعه إياه لانه باعه حلالا، وقد يمكن أن لا يجعله خمرا أبدا، وفى صاحب السيف أن لا يقتل به أحدا أبدا.

'আমি যে মূলনীতিটি গ্রহণ করছি তা হলো, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেসব চুক্তি সহিহ সাব্যস্ত হবে, অপবাদ বা লেনদেনকারীর অভ্যন্তরীণ কোনো অভ্যাসের কারণে সেটি বাতিল সাব্যস্ত হবে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সহিহ থাকার কারণে সেটিকে সহিহ সাব্যস্ত করি। যদি তাদের মধ্যে এমন গোপন নিয়ত থাকে যেটি প্রকাশ করলে চুক্তি ফাসেদ হয়ে যাবে, তা হলে তাদের জন্য এমন নিয়ত রাখা মাকরুহ। যেমনভাবে এমন ব্যক্তির জন্য তলোয়ার ক্রয় করা মাকরুহ বলি, যে ওই তলোয়ার দিয়ে কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা রাখে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে, এমন ব্যক্তির কাছে তলোয়ার বিক্রয় করা হারাম নয়। কারণ, অনেক সময় সে ওই তলোয়ার দিয়ে হত্যা করে না। এ কারণে ওই বিক্রয় চুক্তিকে ফাসেদ বলি না। অনুরূপভাবে এমন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করাকে মাকরুহ বলি, যার সম্পর্কে জানা যায় যে, সে মদ তৈরি করবে। তবে এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করলে সেটিকে ফাসেদ বলি না। কারণ, সে হালাল পদ্ধতিতে বিক্রয় করেছে। সেইসঙ্গে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সেটি দিয়ে মদ তৈরি করবে না এবং তলোয়ার ক্রেতা সেটি দিয়ে কখনো কাউকে হত্যা করবে না।'[৩৯৬]

৩৯৬. কিতাবুল উম্ম : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫২।

হানাফি মাযহাবের মত : তাদের মূল বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, যে জিনিসের মাধ্যমে সরাসরি না-জায়েয কাজ হয় এবং যার মাধ্যমে সরাসরি হয় না এ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সরাসরি না-জায়েয কাজ হওয়াকে তাঁরা মাকরুহ বলেছেন। এমন জিনিসের দৃষ্টান্ত হলো, বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র, দুশ্চরিত্র লোকের কাছে দাড়িহীন কম বয়সী গোলাম বিক্রয় করা। পক্ষান্তরে যেগুলোর মাধ্যমে সরাসরি না-জায়েয কাজ হয় না; বরং ক্রেতার পক্ষ থেকে সেখানে আরও কিছু কাজ সংযোজন করতে হয়, এ ধরনের জিনিস বিক্রয়কে তাঁরা জায়েয বলেছেন। যেমন, মদ প্রস্তুতকারকের কাছে আঙ্গুর ও গির্জা নির্মাতার কাছে জমি বিক্রয় করা। এ মূলনীতির ব্যাখ্যায় হানাফি মাযহাবের উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। আমার সম্মানিত পিতা মুফতি মুহাম্মাদ শফি (রহ.) এ ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করে সেখানে হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের সব বক্তব্য জমা করার পর আলোচনার সারকথা বের করেছেন। তাঁর আলোচনাটি বেশ উপকারী হওয়ায় দীর্ঘ হলেও তাঁর বক্তব্য হুবহু উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন–

'আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে আমার কাছে উভয়ের মধ্যকার যে পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, সরাসরি যে জিনিসের মাধ্যমে অন্যায় কাজ হয় সেটি হলো, সরাসরি সহায়তাকারীর কর্মের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ। সেটি এভাবে হবে যে, ওই কর্মকে অন্য কোনো স্বাধীন কর্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে না। এটি তিনভাবে হতে পারে :

ক. অপরাধের সহায়তা করার ইচ্ছে থাকবে। সুতরাং মদ তৈরির উদ্দেশ্যে কেউ আঙ্গুর বা কুকর্মের জন্য কম বয়সী গোলাম বিক্রয় করলে বিক্রেতার নিয়ত ও ইচ্ছা থাকলে বিক্রয়ের কারণেই সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। অনুরূপভাবে মদ বিক্রয়ের জন্য কেউ যদি বাড়ি ভাড়া দেয়, তা হলে তার নিয়তের কারণে অন্য কোনো স্বাধীন কর্তার ক্রিয়া ছাড়াই শুধুমাত্র ভাড়া দেওয়ার কারণে তার অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। যেমনটি 'আল-আশবাহ' ও 'রাদ্দুল মুহতার' কিতাবের 'হজর' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৩৯৭]

---

৩৯৭. রাদ্দুল মুহতার কিতাবের বক্তব্য হলো, এ বক্তব্যের সম্ভাব্য উদ্দেশ্য হলো, মদ প্রস্তুতকরণের উদ্দেশ্যে রস বের করা। কারণ, এ উদ্দেশ্যের কারণে এ কাজটিই গোনাহের কাজ। (রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: হজর, পরিচ্ছেদ: বিক্রয় : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৯২) আল-আশবাহ কিতাবের বক্তব্য হলো, কাজিখান (রহ.) তার ফাতাওয়াগ্রন্থে বলেছেন, মদ তৈরি করে এমন লোকের নিকট রস বিক্রয় করার ক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিক্রয় করলে তা হারাম হবে না। আর যদি

খ. চুক্তির সময়েই অপরাধের বিষয়টি স্পষ্ট করবে। উদাহরণস্বরূপ কেউ বলল, আমার কাছে এই আঙ্গুর বিক্রয় করো, এগুলো দিয়ে মদ তৈরি করব। উত্তরে বিক্রেতা বলল, বিক্রয় করলাম।[৩৯৮] অথবা কেউ বলল, আমার কাছে তোমার বাড়িটি ভাড়া দাও, সেখানে মদ বিক্রয় করব। উত্তরে সে বলল, ভাড়া দিলাম। বর্ণিত ক্ষেত্রে স্পষ্টভাষায় বলার কারণে মূল চুক্তিটি অপরাধ যুক্ত হয়েছে। বিক্রয় বা ভাড়া পরবর্তী সময়ে মদ তৈরি বা বিক্রয়ের প্রতি লক্ষ করা হবে না। এমন সিদ্ধান্ত হওয়ার দলিল হলো, ইমাম সারাখসি (রহ.)-এর 'আল-মাবসুত' কিতাবের ইজারা অধ্যায়ের বক্তব্য। তিনি বলেছেন–

وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز، لأنه معصية، فلا ينعقد العقد عليه، ولا أجر له عندهما، وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز، والشافعي رحمه الله يجوز هذا العقد، لأن العقد يرد على منفعة البيت، ولا يتعين عليه بيع الخمر، فله أن يبيع فيه شيئا آخر، يجوز العقد لهذا، ولكنا نقول تصريحهما بالمقصود، لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه، وما صرحا به معصية.

'মদ বিক্রয়ের জন্য যদি কোনো জিম্মি কোনো মুসলিমের কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নিতে চায়, তা হলে তাকে ভাড়া দেওয়া জায়েয নেই। কারণ, এটি অপরাধ। সুতরাং এক্ষেত্রে ভাড়ার চুক্তি সম্পন্ন হবে না এবং ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে বাড়ির মালিক ভাড়া পাবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী ভাড়া দেওয়া জায়েয আছে। ইমাম শাফেয়ি (রহ.)ও এমন চুক্তিকে জায়েয বলেছেন। কারণ, এখানে চুক্তি হচ্ছে বাড়ির উপকারিতার ওপর এবং ক্রেতার জন্য মদ বিক্রয় করা আবশ্যক নয়। সে ইচ্ছে করলে অন্য কিছু বিক্রয় করতে পারে। সুতরাং এ

মদ তৈরির উদ্দেশ্যে বিক্রয় করে, তা হলে হারাম হবে। (আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, আল্লামা হামাবি (রহ.)-এর টীকাসহ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০২-১০৩, প্রথম ফন, দ্বিতীয় কায়দা: প্রত্যেক জিনিস তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত)

৩৯৮. মদ তৈরির কারখানায় রস রপ্তানির ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কারণ, সেক্ষেত্রে যদিও চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় না যে, তা মদের জন্য ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ওই কোম্পানির কাছে রপ্তানি করা হুকুমের দিক থেকে স্পষ্ট করা। সেটি এভাবে যে, তার উদ্দেশ্য হলো মদ তৈরি করা। والله تعالى أعلم

কারণে চুক্তিটি জায়েয হবে। তবে আমরা বলব, উভয়ের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করার পর অন্য উদ্দেশ্য ধর্তব্য করার সুযোগ নেই। তারা যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছে, সেটিই তো অপরাধ।'[৩৯৯]

আমার মতে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বক্তব্য 'জায়েয আছে' এটি এ কথা আবশ্যক করে না যে, সেটি জায়েয আছে বলে সেখানে গোনাহ হবে না; বরং তার প্রকাশ্য অর্থ হলো, শুধু চুক্তি সহিহ হবে। যেটি 'কিতাবুল আসল'[৪০০]-এর একটি বাক্য : 'সে ভাড়া পাবে' কথাটি প্রমাণ করে।

গ. এমন জিনিস বিক্রয় করা হবে, যেগুলো খারাপ কাজ ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার হয় না, সেটি বিক্রয় বা ভাড়া দেওয়ার সময় অপরাধের বিষয়টি উল্লেখ না-করলেও সেটি অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

সুতরাং উপর্যুক্ত ক্ষেত্রসমূহে শুধু চুক্তি করলেই অপরাধ হবে এবং উভয় পক্ষ গোনাহগার হবে, পরবর্তী সময়ে সেটি ওই কাজে ব্যবহার করুক বা সেখানে অন্য কোনো কারিগরি পরিবর্তন করুক। পরবর্তী সময়ে যদি সেটিকে সে অপরাধের জন্য ব্যবহার করে, সে কারণে ব্যবহারকারী আলাদা একটি গোনাহ করার দায়ে গোনাহগার হবে।

আপনি এ তিনটি কারণকে একটি কারণ হিসাবেও দেখতে পারেন। সেটি হলো, উদ্দেশ্য ও নিয়ত। কারণ, প্রথমটির মধ্যে উদ্দেশ্য থাকার বিষয়টি স্পষ্ট এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির মধ্যে হুকুম ও উহ্যভাবে নিয়ত ও উদ্দেশ্য রয়েছে। ... আর যেগুলোতে এরূপ হবে না, সেগুলোর ক্ষেত্রে শুধু সহায়তা করার কারণে অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে না। একইভাবে আঙ্গুরের রস, বালক, গায়িকা, দুম্বার বর্ধিত নিতম্ব, কবুতর বাজি করা, মদ বিক্রয়, অগ্নিমন্দির বা গির্জা বানানোর জন্য বাড়ি ভাড়া দেওয়ার মতো সব মাসআলা এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ, যেগুলোর মাধ্যমে সরাসরি অপরাধ সংঘটিত হয় না। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, এগুলোতে অপরাধের নিয়ত করা, অপরাধের বিষয়টি উল্লেখ করা এবং সেগুলো অপরাধের কাজে ব্যবহার হওয়ার বিষয়টি নির্দিষ্ট থাকবে না। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী উপর্যুক্ত মাসআলাগুলো প্রকৃত অপরাধে সহায়তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। ...

---

৩৯৯. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.) : খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৩৮।

৪০০. আল্লামা কাসানি (রহ.) 'কিতাবুল আসল' থেকে বর্ণনা করেছেন, মদ বহনের জন্য বহনকারী ভাড়া নিলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী সে পারিশ্রমিক পাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতে পারিশ্রমিক পাবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, অধ্যায়: ইজারা : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪১)

তবে এখানে আরও একটি বিষয় রয়েছে, যেটি সহায়তার সমার্থবোধক। সেটি হলো, কারণ হওয়া। সেটি যদি অপরাধের কারণ হয়, তা হলে হারাম ও মাকরুহের গণ্ডির বাইরে যাবে না।'...

... আমার প্রভু আমার প্রতি যে দয়া করেছেন, তার আলোকে এ মূলনীতির সারকথা হলো, কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী অপরাধের সহায়তা করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন– وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

'গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহায়তা করো না।'[৪০১]

তিনি আরও বলেছেন– فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

'আমি কখনোই অপরাধীদের সহায়তা করব না।'[৪০২]

তবে অপরাধের প্রকৃত সহায়তা হলো, সরাসরি সহায়তাকারীর বিক্রয়ের মাধ্যমে যেখানে অপরাধ সংঘটিত হয়। সুতরাং সহায়তার ইচ্ছা, স্পষ্ট বক্তব্য অথবা উক্ত জিনিসটি অপরাধের জন্য এমনভাবে নির্দিষ্ট হওয়া যে, সেটি ছাড়া উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় না, এ ক্ষেত্রগুলোতে প্রকৃত সহায়তা পাওয়া যায়। যদি সরাসরি ওই জিনিসের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত না-হয়, তা হলে সেটি প্রকৃত সহায়তা হিসাবে গণ্য হবে না। বরং সেটি কারণ হিসাবে গণ্য হবে। যারা এমন ক্ষেত্রকে 'সহায়তা' বলেছেন, সহায়তার একটি প্রকার হওয়ার কারণে তারা রূপক অর্থে বলেছেন। 'আস-সিয়ারুল কাবির' কিতাবে এমনটিই বলা হয়েছে।'[৪০৩]

এরপর কারণ তথা সাবাবটি যদি এমন সাবাব হয়, যেটি অপরাধ ঘটায় এবং

---

৪০১. সুরা মায়েদা : আয়াত-২।

৪০২. সুরা কাসাস : আয়াত-১৭।

৪০৩. তারা যদি বসবাসের জন্য বাড়ি ক্রয় করে তার মধ্যে উপাসনালয়, মন্দির বা এমন আগুনের ঘাট তৈরি করতে চায়, যেখানে তাদের নামাজের উদ্দেশ্যে সবাই সমবেত হবে, তা হলে এমন করতে দেওয়া যাবে না। ... কোনো মুসলিমের জন্য উচিত নয় যে, এ ধরনের কোনো কাজের জন্য তাদের বাড়ি ভাড়া দেবে। কারণ, মুসলিমদের মর্যাদা লুণ্ঠিত হওয়ার কারণে এটি সহযোগিতার আওতাভুক্ত হবে। যদি তাদের কাছে ভাড়া দেওয়ার পর তারা অনুরূপ কিছু শুরু করে, তা হলে বাড়ির মালিক সেগুলো ও অনুরূপ অন্যান্য কাজ করতে নিষেধ করবে। খারাপ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিষেধ করবে। নিষেধের ক্ষেত্রে সে অন্যদের মতো, তবে এ কারণে ভাড়ার চুক্তি বাতিল করবে না। যেমন, কোনো মুসলিমের কাছে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পর মদ পানের জন্য সেখানে মানুষ একত্রিত হলে বা তাতে কোনো নেশাদ্রব্য বিক্রয় করলে ভাড়া বাতিল করতে হয় না। এক্ষেত্রে সে খারাপ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিষেধ করবে, তবে এ কারণে ভাড়ার চুক্তি বাতিল করবে না। (মাতনুস সিয়ারিল কাবির মিন শারহিস সারাখসি : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫৩৭-১৫৩৮, ফিকরাহ নং ৩০২১ ও ৩০২৩)

অপরাধের পথে নিয়ে যায়, তা হলে কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সেটি অপরাধে সহায়তা করার মতোই হারাম হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ

'আল্লাহ ছাড়া যারা অন্যদেরকে প্রভু বলে ডাকে, তাদেরকে গালি দিয়ো না।'[৪০৪]

তিনি বলেছেন– فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

'নারীরা যেন পরপুরুষের সঙ্গে কোমলকণ্ঠে কথা না-বলে।'[৪০৫]

তিনি বলেছেন– وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'তোমরা (নারীরা) পূর্বেকার জাহেলি যুগের মতো চলাফেরা করো না।'[৪০৬]

কারণটি যদি অপরাধের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী এবং আহ্বায়কের ভূমিকা পালন না-করে শুধু অপরাধের পথ দেখিয়ে নিকটবর্তী সাবাব হিসাবে থাকে, তা এভাবে যে, তার মাধ্যমে অপরাধ সংঘটিত করতে কোনো কর্তার ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না, যেমন : বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র, দুশ্চরিত্র কাছে দাড়িবিহীন বালক বিক্রয় করা এবং মদ বিক্রয়, গির্জা, অগ্নিমন্দির ইত্যাদির জন্য বাড়ি ভাড়া দেওয়া। এ ধরনের সাবাবের ক্ষেত্রে বিক্রেতা বা ভাড়াদাতা যদি ক্রেতা বা ভাড়াগ্রহীতার স্পষ্ট বক্তব্য ছাড়া অন্যভাবে তার উদ্দেশ্য জানতে পারে, তা হলে বিক্রয় বা ভাড়া দেওয়া মাকরুহ হবে। পক্ষান্তরে যদি তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে না-জানে, তা হলে বিক্রেতা বা ভাড়াদাতাকে মা'যুর সাব্যস্ত করা হবে। আর যদি ক্রেতা বা ভাড়াগ্রহীতার বক্তব্যের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য জানতে পারে, তা হলে তার কাছে বিক্রয় বা ভাড়া দেওয়া সহায়তা করার মতোই হারাম হবে। সাবাবটি যদি দূরবর্তী সাবাব হয়। তা এভাবে যে, তার মাধ্যমে সরাসরি কোনো অপরাধ সংঘটিত করতে পারে না; বরং তার মধ্যে কোনো ধরনের কারিগরির প্রয়োজন হয়। যেমন, বিদ্রোহীদের কাছে লোহা বা অনুরূপ কিছু বিক্রয় করা। এমন বিক্রয় মাকরুহে তানযিহি হবে।'[৪০৭]

আলোচনাটি অতি স্পষ্ট হওয়ায় সেটির দীর্ঘ উদ্ধৃতি করেছি। অনেক সময় এ ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনা গরমিল মনে হলেও এ আলোচনার মাধ্যমে সেগুলোর সঠিক অবস্থান নির্ণয় হয়ে যায়।

---

৪০৪. সুরা আনআম : আয়াত-১০৯।

৪০৫. সুরা আহযাব : আয়াত-৩২।

৪০৬. সুরা আহযাব : আয়াত-৩৩।

৪০৭. জাওয়াহিরুল ফিকহ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৭।
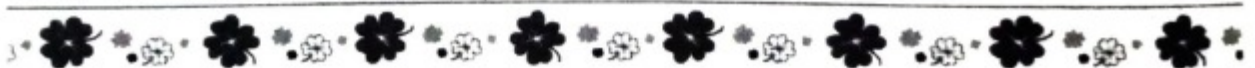
এখান থেকে সারকথা বের করা যায় যে, বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির কোনো একটির মাধ্যমে যদি কেউ অপরাধের সহায়তা করতে চায়, তা হলে তার সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করা হারাম হবে ও সেটি সংঘটিত হবে না এবং বিক্রেতা গোনাহগার হবে। তবে অপরাধে সহায়তা করার ইচ্ছে না-করলেও বিক্রয়টি যদি অপরাধের সাবাব (কারণ) হয়, তা হলে সেটি হারাম হবে না। কিন্তু সাবাবটি যদি অপরাধ সংঘটনে মূল ভূমিকা পালন করে, তা হলে হারাম হবে। আর অপরাধ সংঘটনে মূল ভূমিকা পালন না-করে যদি নিকটবর্তী সাবাব হয়। তা এভাবে যে, পণ্যকে আসল অবস্থায় রেখে কোনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়া অপরাধে ব্যবহার করা হয়, তা হলে সেটি বিক্রয় করা মাকরুহে তাহরিমি হবে। এমনটি না-হলে মাকরুহে তানযিহি হবে।

এ আলোচনা থেকে সুদি ব্যাংকের জন্য বাড়ি নির্মাণ বা ভাড়া দেওয়ার হুকুম জানা যায়। বিক্রেতা যদি সুদি কাজে সহায়তার ইচ্ছে করে অথবা মূল চুক্তির মধ্যে স্পষ্ট করে যে, সেটি সুদি কাজে ব্যবহৃত হবে, তা হলে বিক্রয় হারাম ও বাতিল হবে। এ কথা স্পষ্ট যে, বিক্রেতা বা ভাড়াদাতা যখন কোনো ব্যাংকের শাখার জন্য বিক্রয় বা ভাড়া দেওয়ার চুক্তি করবে, তখন সেটি সুদি কাজের জন্য ব্যবহারের ব্যাপারে স্পষ্ট করারই নামান্তর বলে গণ্য হবে। তবে যদি ব্যাংকের অন্য কোনো কাজ বা উদ্দেশ্যে বিক্রয় করে থাকে, যেমন : গুদাম বা অন্য কোনো কাজের জন্য, তা হলে সেটি এ হুকুমের আওতাভুক্ত হবে না এবং অপরাধের জন্য নিকটতম সাবাব হবে না। সুতরাং এমন ক্ষেত্রগুলো মাকরুহে তানযিহির সঙ্গে জায়েয হওয়া উচিত।

সুদি ব্যাংকের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। এটির মাধ্যমে যদি সুদের সহায়তা করার ইচ্ছে করে অথবা প্রোগ্রামটি শুধু সুদি কাজে বা হারাম কাজে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে তার চুক্তি করা হারাম ও বাতিল হবে। তবে যদি সহায়তা করার ইচ্ছা না-থাকে অথবা সেটি শুধু হারাম কাজে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট না-থাকে, তা হলে মাকরুহে তানযিহির সঙ্গে চুক্তি সহিহ হয়ে যাবে। এ আলোচনার ওপর নির্ভর করে এ ধরনের আধুনিক অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। والله تعالى أعلم পণ্যের শর্তের আলোচনায় এ সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা আসবে-ইনশাআল্লাহ।

ক্রেতা-বিক্রেতার বিধি-বিধানের মধ্যে সে মাসআলাটিও অন্তর্ভুক্ত হবে, যেখানে কোনো পক্ষের হারাম উপার্জনের ইচ্ছা থাকে। তবে এ বিষয়ের বিধি-বিধান বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। ফাসেদ বিক্রয়ের আলোচনার পর স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব-ইনশাআল্লাহ।

* * *
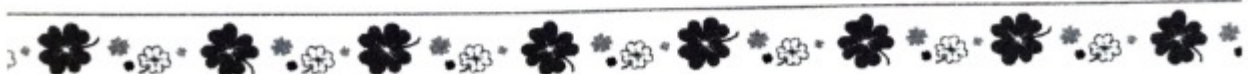
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান

৭৫. উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি

বিক্রয় জায়েয হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

'হে ইমানদারগণ! অন্যায়ভাবে তোমরা একে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ নিতে পারবে।'[৪০৮]

হযরত আবু সায়িদ খুদরি (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

'বিক্রয় তো কেবল সন্তুষ্টিতে হয়ে থাকে।'[৪০৯]

হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)- থেকে বর্ণিত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لَا يُتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ

'সন্তুষ্টি ছাড়া কোনো বিক্রয় থেকে যেন কখনোই পৃথক না-হয়।'[৪১০]

হযরত আবু হাররা রাকাশি তার চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু

---

৪০৮. সুরা নিসা : আয়াত-২৯।

৪০৯. সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকি (রহ.), অধ্যায়ঃ বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ অনন্যোপায় ব্যক্তির বিক্রয় : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭।

৪১০. সুনানে তিরমিযি, অধ্যায়ঃ বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ ২৬, হাদিস নং ১২৪৮, ইমাম তিরমিযি (রহ.) বলেছেন, এটি গরিব হাদিস।
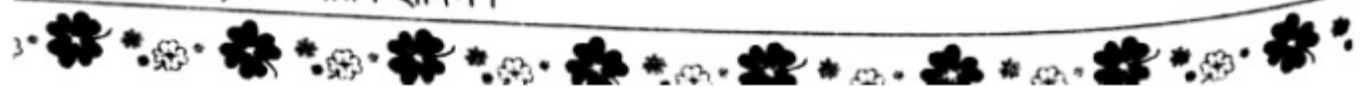
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

'কোনো মুসলিমের সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ ভক্ষণ করা হালাল নয়।'[৪১১]

হযরত আবু হুমাইদ সায়েদি (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল (ﷺ) বলেছেন–

لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

'কারো জন্য তার ভাইয়ের সন্তুষ্টি ছাড়া তার লাঠিও নেওয়া জায়েয নেই।'[৪১২]

যেসব কারণে কোনো এক পক্ষের সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না সেগুলো হলো, বাধ্য করা, অনন্যোপায় হওয়া, প্রতারিত হওয়া, 'তাদলিস' (গোপন করা), ভুল করা এবং উপহাস করে বিক্রয় করা। এখন সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে এগুলোর প্রত্যেকটির বিধি-বিধান আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলা সঠিকভাবে বলার তৌফিক দিন।

৭৬. বাধ্যকরণ ও বিক্রয়ে এর কার্যকারিতা

বাধ্যকৃত ব্যক্তির সন্তুষ্টি না-পাওয়া যাওয়ার কারণে কোনো ইমামের মতেই তার বিক্রয় জায়েয নেই। হাদিসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ইমাম বাইহাকি (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لاَ يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولاَ يَشْتَرِ مِنْ ذِي ضَغْطَةِ سُلْطَانٍ شَيْئًا.

'হজ ও উমরাকারী অথবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ছাড়া অন্য কারো জন্য সমুদ্রে সফর করা উচিত নয়। রাষ্ট্রীয় চাপে থাকা ব্যক্তির কাছ থেকেও কিছু ক্রয় উচিত নয়।'[৪১৩]

---

৪১১. মুসনাদে আবু ইয়ালা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪০, হাদিস নং ১৫৭০। আল্লামা হাইসামি (রহ.) এই হাদিসের আলোচনায় বলেছেন, আবু ইয়ালা (রহ.) এটি বর্ণনা করেছেন। আবু হাররাহকে ইমাম আবু দাউদ নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তবে ইবনে মায়িন (রহ.) দুর্বল বলেছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ : ছিনতাই... : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭২, হাদিস নং ৬৮৬৬)

৪১২. সহিহ ইবনে হিব্বান, অধ্যায়: জিনায়াত, হাদিস নং ৫৯৭৮।

৪১৩. আস-সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকি (রহ.), পরিচ্ছেদ : অনন্যোপায় ব্যক্তির বিক্রয় : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৮

হাদিসটির সনদে বশির বিন মুসলিম কিন্দি নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) তার সম্পর্কে বলেন, 'ইমাম বুখারি (রহ.) বলেছেন, তার বর্ণিত হাদিস সহিহ নয়।' 'আত-তাহযিব'[৪১৪] কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ আছে। তবে হাদিসটির শেষাংশটি একটি প্রসিদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে সমর্থিত। সে প্রসিদ্ধ হাদিসটি হলো–

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

'আল্লাহ তাআলা আমার উম্মত থেকে ভুল-ভ্রান্তি এবং বাধ্য হওয়ার বিষয়গুলোকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'[৪১৫]

আরেকটি প্রসিদ্ধ হাদিস হলো–

لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

'কোনো মুসলিমের সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ ভক্ষণ করা হালাল নয়।'[৪১৬]

এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, অন্যায়ভাবে বাধ্য-হওয়া ব্যক্তির বিক্রয় জায়েয নেই। এক্ষেত্রে অনন্যোপায় হয়ে বাধ্য হওয়া এবং সাধারণভাবে বাধ্য হওয়ার একই হুকুম। আল্লামা হাসকাফি (রহ.) বলেছেন–

لأن الإكراه الملجئ وغير الملجئ يعدمان الرضا، والرضا شرط لصحة هذه العقود.

'কেননা, নিরুপায় হয়ে বাধ্য হওয়া এবং সাধারণ কোনো কারণে

---

৪১৪. তাহযিবুত তাহযিব : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৬৭।

৪১৫. সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: তালাক, পরিচ্ছেদ: বাধ্য হওয়া ও ভুলে যাওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে, হাদিস নং ২০৪৫। আল্লামা বুসিরি (রহ.) মিসবাহুয যুজাজাহ কিতাবে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সনদটি মুনকাতি না হলে সহিহ হতো। তবে তা মুনকাতি হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। আল্লামা মিযযি (রহ.) 'আল-আতরাফ' কিতাবে বলেছেন–

رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس.

ওয়ালিদ বিন মুসলিমের কারণে সনদটি মুনকাতি হওয়া অসম্ভব না। কারণ, সে অনেক তাদলিস করত। (মিসবাহুয যুজাজাহ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১২৬)

৪১৬. মুসনাদে আবু ইয়ালা, মাজমাউয যাওয়ায়েদ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭২। ইতঃপূর্বে এ হাদিসে আল্লামা হাইসামি (রহ.) -এর টীকা উল্লেখ করা হয়েছে।
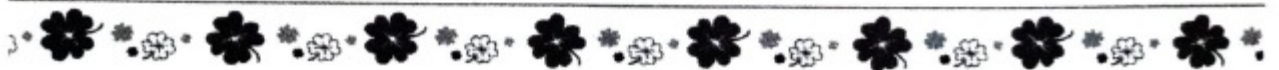
বাধ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির সন্তুষ্টি থাকে না। এ ধরনের চুক্তিগুলো সহিহ হওয়ার জন্য ব্যক্তির সন্তুষ্টি থাকা শর্ত।'[৪১৭]

ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন–

ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعه. هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة يصح ويقف على إجازة المالك في حال اختياره.

'ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, অন্যায়ভাবে বাধ্য ব্যক্তির বিক্রয় সহিহ নয়। এটি আমাদের মাযহাব এবং ইমাম মালেক, আহমাদ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহও এ কথা বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন, তার বিক্রয় সহিহ হবে, তবে এখতিয়ার ফিরে পাবার পর মালিকের অনুমতির ওপর তা নির্ভরশীল থাকবে।'[৪১৮]

বাস্তবতা হলো, হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বাধ্য ব্যক্তির বিক্রয়কে ফাসেদে মওকুফ বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন–

وأفاد في المنار وشرحه أنه ينعقد فاسدا، لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ، وأنه بالإجازة يصح، ويزول الفساد، وبه علم أن الموقوف على الإجازة صحته، فصح كونه فاسدا موقوفا، وظهر أن الموقوف منه فاسد كبيع المكره، ومنه صحيح كبيع عبد أو صبي محجورين.

'আল-মানার' ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে, সন্তুষ্টি না-পাওয়ার কারণে সেটি ফাসেদ অবস্থায় কার্যকর হবে। কেননা, সন্তুষ্টি পাওয়া বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হওয়ার শর্ত। মালিকের অনুমতির মাধ্যমে ফাসাদ দূর হয়ে সেটি সহিহ হয়ে যাবে। সুতরাং এখান থেকে বুঝা গেল, বিক্রয় চুক্তিটি সহিহ হওয়া অনুমতির ওপর মওকুফ ছিল। তাই ফাসেদে মওকুফ অবস্থায় চুক্তি সম্পন্ন হওয়া সহিহ আছে। এখান থেকে আরও বুঝা গেল, মওকুফ বিক্রয়ের কিছু ফাসেদ

৪১৭. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বাধ্য করা : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩০।

৪১৮. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৬১।
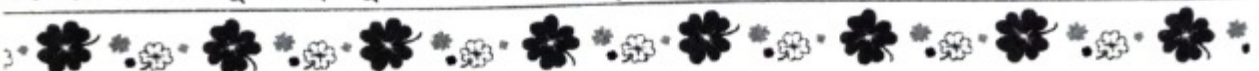
হয়। যেমন : বাধ্য ব্যক্তির বিক্রয়। আর কিছু সহিহ হয়। যেমন : অনুমতিহীন দাস ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর বিক্রয়।'[৪১৯]

হানাফি মাযহাবে এমন বিক্রয় বাতিল না-হয়ে ফাসেদ হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, ক্রেতা সেটি কজা করে নিলে তার মালিক হয়ে যাবে এবং যেসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ বাতিল করা যায় না, তার পক্ষ থেকে এমনসব হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে। যেমন, কোনো দাসকে আযাদ বা মুদাব্বার করা কিংবা কোনো দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ করা। তবে যেসব হস্তক্ষেপ বাতিল করা যায়, সেগুলো সহিহ হবে না। যেমন, বিক্রয়, দান ও সদকা করা। মওকুফ হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, বাধ্য ব্যক্তির অনুমতিক্রমে সেটি জায়েয ও কার্যকর লেনদেনে পরিণত হবে। চাই অনুমতিটি মৌখিক বা কর্মের মাধ্যমে হোক। যেমন, মূল্য গ্রহণ, পণ্য হস্তান্তর করা। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, এখতিয়ার প্রাপ্তির পর তার অনুমতি পেতে হবে।[৪২০]

৭৭. যে বাধ্যকরণ বিক্রয়চুক্তি ফাসেদ করে দেয়

ইতঃপূর্বে বলেছি, যেসব বাধ্যকরণ সন্তুষ্টির অনুপস্থিতি ঘটিয়ে চুক্তি বাতিল করে, সেগুলোর ক্ষেত্রে অনন্যোপায় হয়ে বাধ্য হওয়া এবং সাধারণভাবে বাধ্য হওয়া উভয়ই সমান। আল্লামা কাসানি (রহ.) অনন্যোপায়ে বাধ্য হওয়া (পরিপূর্ণ বাধ্য) ও সাধারণভাবে বাধ্য হওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعا كالقتل والقطع والضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو قل الضرب أو كثر ... وهذا النوع يسمى إكراها تاما، ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار وهو الحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف، وليس فيه تقدير لازم سوى أن يلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء أعني الحبس والقيد والضرب، وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراها ناقصا.

'বাধ্য হওয়ার একটি প্রকার এমন, যেটি স্বভাবগতভাবেই কাউকে

---

৪১৯. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৪-১৫, ফিকরাহ নং ২২১৭৮।

৪২০. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বাধ্য করা : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩০-১৩১।
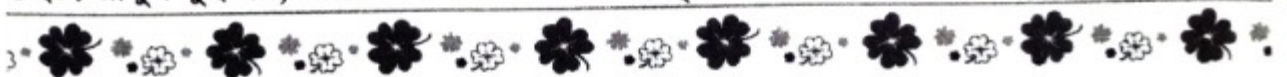
নিরুপায় করে দেয়। যেমন, হত্যা বা অঙ্গহানির হুমকি অথবা এমন প্রহারের হুমকির সম্মুখীন হওয়া, যার কারণে জীবন বা কোনো অঙ্গ নাশের আশঙ্কা হয়, প্রহার যতই কম বা বেশি হোক। এ প্রকারের বাধ্য হওয়াকে পরিপূর্ণ বাধ্য হওয়া বলা হয়। বাধ্য হওয়ার আরও একটি প্রকার রয়েছে, যেটি অনন্যোপায় হওয়া বোঝায় না। যেমন : কেউ তাকে বাধা দেওয়া, বন্দি করা বা এমন প্রহার, যার কারণে জীবন বা অঙ্গহানির আশঙ্কা হয় না। এই কাজগুলো অর্থাৎ, বাধা দেওয়া, বন্দি ও প্রহারের কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া ছাড়া এক্ষেত্রে চূড়ান্ত কোনো সীমারেখা নেই। বাধ্যকরণের এ প্রকারকে অসম্পূর্ণ বাধ্যকরণ বলা হয়।'[৪২১]

হানাফি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবে সন্তান, পিতা বা কোনো মাহরামের পক্ষ থেকে শাস্তি দেওয়ার হুমকিকে বাধ্যকরণের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, তাদের শাসনের কারণে ব্যক্তি এমনভাবে সন্ত্রস্ত হয়, যার কারণে সন্তুষ্টি থাকে না। মালেকি মাযহাবে এটিকে শুধুমাত্র পিতা ও সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তবে অন্যান্য আত্মীয়দেরকে এ হুকুমের আওতাভুক্ত করা হয়নি।[৪২২]

---

৪২১. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, অধ্যায়: বাধ্য করা : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৮৪।

৪২২. আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) মাবসুত কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেছেন, ইস্তিহসানের দাবি হলো, পিতার পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া বাধ্য হিসাবে সাব্যস্ত হবে। আল্লামা তুরি (রহ.) বলেছেন, ইস্তিহসান অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য মত হলো, পিতা-মাতা বা সন্তানের বাধ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লামা কুহিস্তানি (রহ.) আরও বাড়িয়ে বলেছেন, মাহরামদের পক্ষ থেকে বাধ্য করলেও সেটি বাধ্যের আওতাভুক্ত হবে। এ বক্তব্যকে তিনি মাবসুতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। (রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বাধ্য করা : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩০) ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন, যদি সন্তানকে কষ্ট দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়, তা হলে সে ব্যাপারে বলা হয়েছে তা বাধ্য হিসাবে গণ্য হবে না। কারণ, ক্ষতিটি অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে। তবে এমন বিষয় বাধ্য হিসাবে গণ্য হওয়া বেশি যুক্তিসঙ্গত। (আল-মুগনি, অধ্যায়: তালাক : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৬২) তুহফাতুল মুহতাজ ও তার টীকার বক্তব্য প্রমাণ করে, রক্তের সম্পর্কিয় কেউ, বা বন্ধু ও প্রয়োজনীয় সেবকের হত্যার মাধ্যমে হুকমি হতে পারে। অনুরূপভাবে তালাকের ক্ষেত্রে আক্রান্ত করা সন্তুষ্ট নষ্ট করার ক্ষেত্রে বাধ্য হিসাবে সাব্যস্ত হবে। (তুহফাতুল মুহতাজ, আল্লামা শিরওয়ানি (রহ.)-এর টীকাসহ : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৭) আল্লামা দারদির (রহ.) বলেছেন, অথবা সন্তান হত্যা করা, পরবর্তী প্রজন্মের সন্তান হলেও, অনুরূপভাবে বাধ্য ছেলে হলে তাকে কষ্ট দেওয়া বা তার সম্পদ কেড়ে নেওয়া বা নষ্ট করার হুকমির মাধ্যমে বাধ্য সাব্যস্ত হবে। এরপর বলেছেন, অনেক ফকিহের মতে পিতাকে হত্যার হুমকি বাধ্য হিসাবে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু অন্যদের হত্যার হুমকি বাধ্য হিসাবে সাব্যস্ত হবে না। (আশ-শারহুল কাবির, আল্লামা দুসুকি (রহ.)-এর টীকাসহ, অধ্যায়: তালাক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৮)
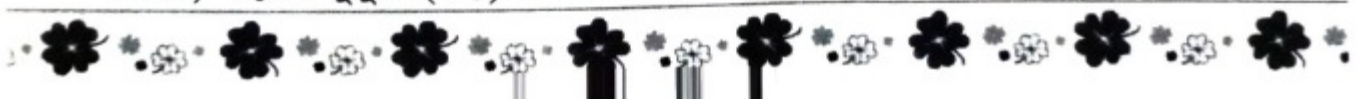
অনুরূপভাবে সম্পদ ধ্বংসের হুমকির মাধ্যমেও বাধ্যকরণ সংঘটিত হয়। আল্লামা হাসকাফি (রহ.) বাধ্যকরণ সংঘটিত হওয়ার শর্তের আলোচনায় বলেছেন–

كون الشيء المكره به متلفاً نفساً، أو عضواً، أو موجباً غمّاً يُعدِم الرضا.

'বাধ্যকৃত বিষয়টি জীবননাশ, অঙ্গহানি অথবা এমন আশঙ্কা সৃষ্টিকারী হতে পারে, যার কারণে সন্তুষ্ট পাওয়া যায় না।'

'জীবননাশের' ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন, সেটি হাকিকি (বাস্তবিক) বা হুকমি (কৃত্রিমভাবে) হতে পারে। হুকমির উদাহরণ হলো, সব সম্পদ নষ্ট করে দেওয়া। কেননা, সম্পদ জীবনের অংশ। "যাহেদি" কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত আছে।'[৪২৩] এরপর তিনি বাধ্যকরণ সংক্রান্ত অধ্যায়ের শেষে অনেক ফকিহ থেকে এ ব্যাপারে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, বাধ্যকরণের বিষয়টি সংঘটিত হওয়ার জন্য সব সম্পদ নষ্ট হওয়া শর্ত নয়; বরং কিছু সম্পদ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাই যথেষ্ট। যদিও এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের দ্বিমত রয়েছে।[৪২৪] শাফেয়ি মাযহাবের ইবনে হাজার হাইতামি[৪২৫] (রহ.) বলেছেন–

إنّ إتلاف بعض المال يكفي لتحقق الإكراه، إلا إذا كان مالاً يسيراً، مثل خمسة دراهم للموسر.

৪২৩. আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বাধ্য করা : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৯।

৪২৪. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪২।

৪২৫. **ইবনে হাজার হাইতামি :** আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে হাজার আল-হাইতামি আশ-শাফেয়ি (রহ.)। জন্ম : ৯০৯ হিজরিতে মিশরে। এতিম অবস্থায় এক দাদার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। জামিয়া আযহারে পড়াশোনা করেন। তাফসির, হাদিস, কালামশাস্ত্র, ফিকহ ও ফতোয়ায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। বয়স বিশ বছর হওয়ার আগেই তিনি ফতোয়া ও দরস প্রদানের অনুমোদন লাভ করেন। তাঁর উস্তাদগণ: যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ আনসারি, শামসুদ্দিন হাত্তাবি, শিহাবুদ্দিন রমালি, নাসিরুদ্দিন লাকানি (রহ.) প্রমুখ। তাঁর শাগরিদগণ: আবদুল কাদের ফাকিহি, মুহাম্মাদ তাহের হিন্দি, মোল্লা আলি কারি, আবু বকর শানওয়ানি (রহ.) প্রমুখ। বহু মূল্যবান কিতাব তিনি রচনা করেছেন। যেমন, তুহফাতুল মুহতাজ শারহু মিনহাজিন নববি, আয-যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, আল-খাইরাতুল হিসান ফি তারজামাতি আবি হানিফা আন-নুমান প্রভৃতি। হিজরি ৯৭৩ বা ৯৭৪ সালে মক্কায় তিনি ইন্তেকাল করেন। (শাযারাতুয যাহাব : ১০/৫৪১; আল-আ'লাম : ১/২৩৪-২৩৫; আরাউ ইবনে হাজার, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আজিজ আশ-শায়ে, পৃ. ৫০) –সম্পাদক

'বাধ্যকরণ সংঘটিত হওয়ার জন্য কিছু সম্পদ নষ্ট হওয়াই যথেষ্ট। তবে একেবারে সামান্য সম্পদ হলে সেটিকে বাধ্য সাব্যস্ত করা যাবে না। যেমন, ধনী ব্যক্তির ক্ষেত্রে পাঁচ দিরহামের সম্পদ নষ্ট হওয়া।'[৪২৬]

হাম্বলি মাযহাবের ইবনে মুফলিহ (রহ.) এ কথাটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, 'অথবা এ পরিমাণ সম্পদ নিয়ে নিল, যার কারণে তার ক্ষতি হয়।'[৪২৭] এ বক্তব্যটি খুবই সুন্দর। কারণ, বাধ্যকরণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ক্ষতির কারণে মানুষের সন্তুষ্টি নষ্ট হয়। বিশেষ করে যেসব লেনদেন সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল, সেগুলোর ক্ষেত্রে এটি বেশি উপযুক্ত।

অনেক ফকিহ বলেছেন, বাধ্যকারী যদি অন্যকে এভাবে হুমকি দেয় যে, তাকে বিচারকের কাছে নিয়ে যাবে, তা হলে অনেক ক্ষেত্রে এটি বাধ্য করণের আওতাভুক্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ : বিচারক যদি এমন জালেম হয়, যার কাছে অভিযোগ করলে শাস্তি দেয়।[৪২৮]

আল্লামা হাসকাফি (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত বাধ্যকরণের যেসব সুরত (প্রকার) উল্লেখ করলাম তার সারকথা হলো, যেসব হুমকি ব্যক্তিকে এমনভাবে সন্ত্রস্ত করে, যার কারণে সন্তুষ্টি থাকে না, বিক্রয় বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি বাধ্য হিসাবে ধর্তব্য হবে। তবে এটি এমন একটি বিষয়, অনেক সময় যা বিচারকের কাছে ন্যস্ত করতে হয়। والله تعالى أعلم

৭৮. অযৌক্তিক প্রভাব (Undue Influence) এবং চুক্তির ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা

ব্রিটিশ আইন 'অবিশ্বাসযোগ্য প্রভাব' বা 'অযৌক্তিক প্রভাব' (Undue Influence) নামে বাধ্যকরণের ভিন্ন একটি পদ্ধতি সংযোজন করেছে। এটি আলোচিত বাধ্যকরণের চেয়ে নিম্নস্তরের এক ধরনের বাধ্যকরণ। এর উদ্দেশ্য হলো, লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্য নিজ অবস্থানকে ব্যবহার করা। লেনদেনের ব্যাপারে ব্যক্তির অবস্থান (বা পদ-পদবি) ব্যবহারের ক্ষেত্র হলো: মানুষ তার

---

৪২৬. তুহফাতুল মুহতাজ, আল্লামা শিরওয়ানি (রহ.)-এর টীকাসহ, অধ্যায় : তালাক : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৭

৪২৭. কিতাবুল ফুরু, তালাক অধ্যায়ের শুরুর দিকে। খণ্ড: ৫। পৃষ্ঠা-৩৭।

৪২৮. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বাধ্য করা।

নিম্নস্তরের কারো সঙ্গে লেনদেন করার সময় পারস্পরিক পদমর্যাদা ও অবস্থান ব্যবহার করা। যেমন, পিতা সন্তানের ওপর, শিক্ষক ছাত্রের ওপর, পির মুরিদের ওপর অথবা নেতৃবৃন্দ জনতার ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং যখন প্রমাণিত হবে যে, নিচের ব্যক্তি ওপরের চাপে লেনদেন করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন, নিচের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবান ব্যক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে না-পেরে প্রকৃতপক্ষে সন্তুষ্ট না-থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গে লেনদেন করতে বাধ্য হয়েছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আইন এগুলোকে সন্তুষ্টি না-পাওয়া সাব্যস্ত করে চুক্তি বাতিলের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে।[৪২৯]

তবে ড. আবদুর রাযযাক সানহুরি ফ্রান্সের নাগরিক আইনের ১১১৪ নম্বর ধারা উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'শিষ্টাচার জনিত প্রভাব' নামক বিষয়টি চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য যে সন্তুষ্টি অপরিহার্য, তার বিরোধী হিসাবে ফরাসি আইনে স্বীকৃত নয়। সুতরাং এ ধরনের প্রভাব থাকলেও চুক্তি সহিহ হবে।[৪৩০]

তবে ইসলামি শরিয়তের আইনবিদগণ চুক্তি সহিহ হওয়ার শর্তের আলোচনায় এ ধরনের প্রভাবেরর হুকুম বয়ান করেননি। কারণ, ইসলামি শরিয়ত ধর্মীয় (ديانة) ও বিচারিক (قضاء) বিধি-বিধানে পার্থক্য করেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি তার সঙ্গে চুক্তি করতে ইচ্ছুক নয়, এমন ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে তার সঙ্গে লেনদেন করা জায়েয নেই। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রক্রিয়ায় গৃহীত অর্থ নেওয়া হালাল হবে না। কেননা, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

'কোনো মুসলিমের সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ গ্রহণ করা হালাল নয়।'[৪৩১]

অতএব, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো কিছু হালাল হওয়া বাহ্যিক সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং তার জন্য দাতার আন্তরিক সন্তুষ্টি থাকা আবশ্যক। তবে অন্তরের সন্তুষ্টি থাকা না-থাকা এমন একটি অস্পষ্ট বিষয়, বিচারিকভাবে

---

৪২৯. Contract Act 1872, section 14 & 16.

৪৩০. নযরিয়াতুল আকদ, অধ্যায়: বাধ্য করা, পৃষ্ঠা-৪২২-৪২৩, ফিকরাহ নং ৪০৪।

৪৩১. মুসনাদে আহমাদ, ইমাম তাবারানি (রহ.)-এর মুজামুল কাবির ও আওসাত, মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। মাজমাউয যাওয়ায়েদ, অধ্যায় : বিক্রয়, পরিচ্ছেদ : ছিনতাই... : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭২।

যেটি প্রমাণ করা বা নাকচ করা খুবই কঠিন। ব্রিটিশ আদালতের অনেক বিচারে বাস্তবে এমন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।[৪৩২] এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম আন্তরিক না-হওয়াকে বিচারের ক্ষেত্রে শর্তহীনভাবে অসন্তুষ্টি বলে উল্লেখ করেননি; বরং তার সঙ্গে যদি বাধ্যকরণ (আমাদের উল্লেখকৃত ব্যাপক অর্থে), প্রতারিত হওয়া, অস্বাভাবিকভাবে লোকসান হওয়া, প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হওয়া (যার বিবরণ সামনে আসবে) অথবা কল্যাণকামিতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক (Conflict of Interest) কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া– যেমনটি ইতঃপূর্বে এতিমের অভিভাবক সংশ্লিষ্ট আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে–এ ধরনের কোনো বিষয় সংযুক্ত হয়, তা হলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। আর 'অযৌক্তিক প্রভাব' (যেটি কোনো এক পক্ষের অসন্তুষ্টি সাব্যস্ত করে) প্রমাণের বিষয়টি যেহেতু খুব কঠিন, তাই ব্রিটিশ আইন সেটি প্রমাণের (Onus of proof) দায়িত্ব দিয়েছে অভিযুক্তের ওপর। (ব্রিটিশ চুক্তি আইনের ১৬ নম্বর ধারায় এটি রয়েছে) অযৌক্তিক প্রভাবমুক্ত চুক্তি হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত করেছে। এ কথার উদ্দেশ্য হলো, যখনই কোনো প্রভাবশালী তার চেয়ে নিচের কারো সঙ্গে লেনদেন করবে, তখনই ধরে নেওয়া হবে যে, অপরপক্ষ আন্তরিকতা ছাড়াই চুক্তি করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি এটি প্রমাণ না-করবে যে, কোনো ধরনের প্রভাব বা ক্ষমতায় প্রভাবিত হওয়া ছাড়া সে চুক্তি করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল থাকবে। তারপরও অভিযুক্তের ওপর অভিযোগ সংঘটিত না-হওয়ার বিষয়টি প্রমাণের দায়িত্ব দেওয়া মূল নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। মূলনীতিটি হলো, যে সীমালঙ্ঘনের দাবি করবে তাকেই প্রমাণ করতে হবে, অভিযুক্ত প্রমাণ করবে না। যেমনটি বাধ্যকরণের ক্ষেত্রে বাধ্য হওয়ার দাবিদারকে প্রমাণ করতে হয়; অভিযুক্তের উপর প্রমাণের দায়িত্ব থাকে না। সুতরাং যদি এক্ষেত্রে বাধ্যকরণ, প্রতারিত হওয়া, প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হওয়া, অস্বাভাবিকভাবে লোকসান হওয়া কিংবা কল্যাণকামিতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া বিষয়ক কোনো কিছু না-ঘটে, তা হলে শুধুমাত্র একপক্ষ অপর পক্ষের পিতা, শিক্ষক অথবা নেতা হওয়া অসন্তুষ্টি সাব্যস্ত করবে না। অসন্তুষ্টির জন্য বর্ণিত বিষয়ের কোনো একটি প্রমাণিত হতে হবে।

---

৪৩২. Chitty On Contracs, P. 207, para 444.

৭৯. প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং বিক্রয়ে তার প্রভাব

সন্তুষ্টি বিনষ্টকারী কারণসমূহের একটি হলো, পরিস্থিতির প্রতিকূলতা। এ ব্যাপারে হযরত আলি (রাযি.) থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন–

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، (وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) (البقرة : ٢٣٧)... وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ.

"অচিরেই এমন এক 'কামড়ানো-যুগ' আসবে, যখন ধনীরা তাদের হাতের জিনিস কামড়ে ধরে পড়ে থাকবে। অথচ তাদেরকে এমন আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলা (তাদেরকে) বলেছেন, "তোমরা পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ করতে ভুলে যেয়ো না।" প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তিদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করা হবে। অথচ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরুপায় ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।"[৪৩৩]

তবে হাদিসটির সনদে একজন 'মাজহুল' রাবি রয়েছে। আল্লামা খাত্তাবি (রহ.) এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন, 'তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ এ ধরনের বিক্রয়কে মাকরুহ বলেছেন।'[৪৩৪]

অনন্যোপায় ব্যক্তির সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় বলতে উদ্দেশ্য হলো, কেউ এমন পরিস্থিতিতে কোনো জিনিস ক্রয় বা বিক্রয় করতে বাধ্য হলো, যেটি না-করলে তার জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ তীব্র ক্ষুধার শিকার এবং বেশি মূল্যে কোনো কিছু ক্রয় বা কম মূল্যে তার কোনো সম্পদ বিক্রয় করা ছাড়া ক্ষুধা নিবারণের কোনো পথ পাচ্ছে না। তাই নিজ বা পরিবারের ক্ষুধা নিবারণের জন্য এমনটি করছে।

বর্ণিত ব্যক্তির মতো কেউ যদি অনন্যোপায় হয়ে অস্বাভাবিক কম বা বেশি

---

৪৩৩. সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায় : বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ অনন্যোপায় ব্যক্তির বিক্রয়, হাদিস নং ৩৩৮২।

অর্থাৎ, নিরুপায় ব্যক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধে তার সঙ্গে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন। –অনুবাদক

৪৩৪. মাআলিমুস সুনান, আল্লামা খাত্তাবি (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৭।

মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, তা হলে হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মতানুযায়ী সেটি ফাসেদ বিক্রয় হবে। যদি ন্যায্য মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, তা হলে সেটি সহিহ হবে। আল্লামা সুগদি (রহ.) ফাসেদ বিক্রয়ের আলোচনায় বলেছেন–
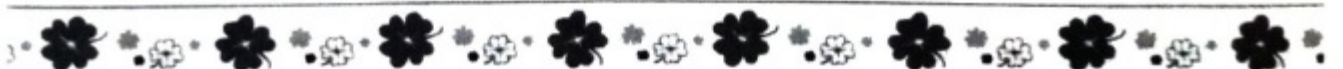
> والثاني عشر بيع المضطر، وهو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيره، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنه بكثير، وكذلك الشراء منه.
>
> 'দ্বাদশ: প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তির বিক্রয় ফাসেদ হবে। সেটি হলো, কেউ খাবার, পানীয় অথবা পোশাক ইত্যাদি জিনিসের মুখাপেক্ষী হলো এবং বিক্রেতা সেগুলোর ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি মূল্য ছাড়া বিক্রয় করতে রাজি হচ্ছে না। এমন ব্যক্তি থেকে ক্রয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে।'[৪৩৫]

আল্লামা হাসকাফি (রহ.) বলেন, 'নিরুপায় ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ।'[৪৩৬]

আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন, 'তার থেকে ক্রয় করা' এ কথার উদ্দেশ্য হলো, প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তি থেকে ক্রয় করা। সেটি এভাবে যে, সে কোনো জিনিস বিক্রয়ে বাধ্য হলো এবং ক্রেতা ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অনেক কম মূল্য ছাড়া তার থেকে ক্রয়ে আগ্রহী নয়।[৪৩৭]

সুতরাং লেনদেন ফাসেদ হওয়া সে অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেখানে নিরুপায় ব্যক্তি অস্বাভাবিক কম বা বেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, বর্ণিত নিরুপায় অবস্থায় কোনো কিছু ক্রয় করলে প্রয়োজন পূরণে সেটি ব্যবহার করা জায়েয আছে। তবে তাকে শুধু ন্যায্য মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আল্লামা থানবি (রহ.) 'ইলাউস সুনান'[৪৩৮] কিতাবে অনুরূপ বলেছেন। তবে হানাফি মাযহাবে এটিকে বিক্রয় সহিহ হওয়ার হুকুম হিসাবে গণ্য করা হবে না; বরং প্রয়োজনে ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয়কৃত জিনিস

---

৪৩৫. আন-নুকাত ফিল ফাতাওয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৬৮।

৪৩৬. আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৫৬৯।

৪৩৭. আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: ফাসেদ বিক্রয় : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৫৬৯, ফিকরাহ নং ২৩৩৩৩।

৪৩৮. ইলাউস সুনান, পরিচ্ছেদ: অনন্যোপায় ব্যক্তির বিক্রয় : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২১৭।

ব্যবহারের হুকুম মনে করা হবে। তাই সেটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে শুধু বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

'ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়া'র একটি বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে, অনন্যোপায় ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় সহিহ। সে বক্তব্যটি হলো–

> طالبوه بمال باطل، وأكره على أدائه، فباع جاريته بلا إكراه على البيع جاز البيع، لأنه غير متعين لأدائه، وهذه عادة الظلمة إذا صادروا رجلا أن يتحكموا بالمال، ولا يذكروا بيع شيء من ماله، والحيلة له فيه أن يقول: من أين أعطي ولا مال لي؟ فإذا قال الظالم: بع جاريتك فقد صار مكرها على بيع الجارية، فلا ينفذ بيعه.

> 'কারো কাছে বাতিল পণ্যের মূল্য চেয়ে সেটি পরিশোধে বাধ্য করা হলো। এরপর কোনো ধরনের চাপ ছাড়া সে তার দাসী বিক্রয় করল, তা হলে এ বিক্রয় জায়েয হবে। কারণ, মূল্য পরিশোধে নির্দিষ্টভাবে সেটি বিক্রয় করা জরুরি ছিল না। এটি জালেমদের অভ্যাস। তারা যখন কারো সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ইচ্ছে করে, তখন তার কোনো সম্পদ বিক্রয়ের কথা না-বলে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে। এ ক্ষেত্রে হিলার পদ্ধতি হলো, ঋণী বলে, আমি কোথা থেকে তোমাকে অর্থ দেব, আমার তো কোনো অর্থ নেই? এ কথার পর জালেম বলে, তোমার দাসী বিক্রয় করো। এ প্রক্রিয়ায় সে দাসী বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। তাই বিক্রয়টি তখন কার্যকর হয় না।'[৪৩৯]

এখান থেকে বুঝা গেল, প্রথম অবস্থায় সে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে এবং বিক্রয়টি সহিহ হয়েছে। এ কারণে বাধ্যকারী জালেমের পক্ষ থেকে বিক্রয়ের আদেশের বিষয়টি সংঘটিত হয়ে হিলা অবলম্বন করা হয়েছে, ফলে বাধ্যকরণ পাওয়া গেছে। যেটি আরও একটি বিষয় প্রমাণ করে যে, ফাসেদ হলো বাধ্য ব্যক্তির বিক্রয়, অনন্যোপায়ের বিক্রয় নয়। কিন্তু আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) এ মাসআলাটি অনন্যোপায় ব্যক্তি কর্তৃক ন্যায্য মূল্যে কিছু বিক্রয়ে বাধ্য ব্যক্তির আলোচনায় বর্ণনা করেছেন। ফলে সে সময় বিক্রয়টি সহিহ

---

৪৩৯. ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়া, অধ্যায়: যাকাত, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ার সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৮।

সাব্যস্ত হবে। তা ছাড়া বিক্রয়চুক্তি তখনই ফাসেদ গণ্য হবে, যখন অস্বাভাবিক কম-বেশিতে লেনদেন হবে। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৪৪০]

এ বিষয়ে শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের মত হানাফি মাযহাবের অনুরূপ। ইমাম নববি (রহ.) অনন্যোপায় ব্যক্তি কর্তৃক খাবার ক্রয়ের আলোচনায় বলেছেন–

> فان كان المقدر ثمن المثل، فالبيع صحيح، ... وإن كان أكثر من ثمن المثل، والتزمه، ففيما يلزمه أوجه (أصحها) عند القاضى أبي الطيب يلزمه المسمى لانه التزمه بعقد لازم (وأصحها) عند الروياني لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان لانه كالمكره (والثالث) وهو اختيار الماوردى ان كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته والا فلا قال أصحابنا وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب عليه القيمة بلا خلاف

> ‘নির্ধারিত মূল্যটি যদি ন্যায্য মূল্য হয়, তা হলে বিক্রয় সহিহ হবে। ...আর যদি ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা বেশি হয় এবং সেটিই নির্ধারণ করা হয়, সেক্ষেত্রে একাধিক মত রয়েছে। যার মধ্যে কাজি আবু তায়্যিব (রহ.)-এর কাছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো, নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কারণ, কার্যকর একটি চুক্তির মাধ্যমে সেটি নির্ধারণ করা হয়েছে। ইমাম রুইয়ানি[৪৪১] (রহ.)-এর কাছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো, ওই সময় এবং ওই এলাকার ন্যায্য মূল্য ছাড়া আর কিছুই পরিশোধ করতে হবে না। কারণ, সে বাধ্যকৃত ব্যক্তির মতো হয়েছে। তৃতীয় মত- এটি ইমাম মাওয়ারদি[৪৪২] (রহ.)-এরও পছন্দনীয়– মত হলো : অনন্যোপায়

---

৪৪০. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: ফাসেদ বিক্রয় : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৫৬৯।

৪৪১. **ইমাম রুইয়ানি :** আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আর-রুইয়ানি আত-তাবারি (রহ.)। শাফেয়ি মাযহাবের প্রখ্যাত ফকিহ ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব : আল-জুরজানিয়্যাত। ইন্তেকাল করেছেন ৪৫০ হিজরিতে। (আল-আ'লাম, যিরিকলি : ১/২১৩) –সম্পাদক

৪২২. **ইমাম মাওয়ারদি :** আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাবিব আবুল হাসান আল-মাওয়ারদি আল-বসরি (রহ.)। জন্ম: ৩৬৪ হিজরি, ইরাকের বসরা নগরীতে। পরে তিনি বাগদাদের অধিবাসী

ব্যক্তির স্বচ্ছলতার কারণে বর্ধিত অংশটি যদি তার জন্য কষ্টকর না-হয়, তা হলে সেটি পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় পরিশোধ করতে হবে না। আমাদের ফকিহগণ বলেছেন, অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য উচিত হলো, ফাসেদ বিক্রয়ের মাধ্যমে কোনো কিছু ক্রয় করে নেওয়ার ক্ষেত্রে হিলা অবলম্বন করা। যেন কোনো ধরনের মতানৈক্য ছাড়াই তার ওপর বাজার মূল্য ওয়াজিব হয়।'[৪৪৩]

ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন–

وإن اشتراه بأكثر من ثمن مثله لم يلزمه إلا ثمن مثله لأنه صار مستحقا له بقيمته، ويلزمه عوضه في كل موضع أخذه فإن كان معه في الحال وإلا لزمه في ذمته

'যদি ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে ক্রয় করে থাকে, তা হলে সেটি পরিশোধ করা আবশ্যক হবে না। তবে ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করলে সে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কেননা, মূল্যের বিনিময়ে সে পণ্যটি পেয়েছে। যেভাবেই পণ্য গ্রহণ করুক, তার বিনিময় দেওয়া আবশ্যক হবে। সুতরাং তার কাছে যদি নগদ অর্থ থাকে, তা হলে নগদে পরিশোধ করবে, অন্যথায় তার জিম্মায় ওয়াজিব থাকবে।'[৪৪৪]

হন। তাঁর উস্তাদগণ: মুহাম্মাদ ইবনে আদি আল-মিনকারি, মুহাম্মাদ ইবনে মুআল্লা, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল (রহ.) প্রমুখ। তাঁর শাগরেদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন খতিব আবু বকর আল-বাগদাদি (রহ.)। তিনি ছিলেন শাফেয়ি মাযহাবের খ্যাতনামা ফকিহ। আব্বাসি খলিফা আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহ তাঁকে প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি বা তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ গোলাপজল (ماء الورد) বিক্রি করতেন বলে তাঁকে মাওয়ারদি বলা হয়। মাওয়ারদি নামে আরও কয়েকজন আলেম প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। প্রচুর বিখ্যাত গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। যেমন, আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ দীন, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আল-হাবি (ফিকহে শাফেয়ি বিষয়ে লিখিত বিশখণ্ডেরও বেশি কলেবরে বিস্তৃত), নাসিহাতুল মুলুক, তাসহিলুন নযর ফি সিয়াসাতিল হুকুমাত, কানুনুল ওযারাহ ওয়া সিয়াসাতুল মুল্ক ইত্যাদি। তিনি ৪৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। (আল-আ'লাম, যিরিকলি : ৪/৩২৭; আল-আনসাব, সামআনি : ৫/১৮১; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৮/৬৪-৬৮) –সম্পাদক

৪৪৩. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, অধ্যায়: খাবার সম্পর্কে : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৬।

৪৪৪. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), অধ্যায়: শিকার ও জবাই : খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৮০।

মালেকি মাযহাবের সিদ্ধান্তও এমনই বোঝা যায়। ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) বলেছেন–

> وأما من اضطره الحق إلى بيع متاعه، أو اضطرته الحاجة والفاقة، فلا بأس بالشراء منه بما يجوز التبائع به.
>
> 'কোনো ঋণ, প্রয়োজন বা দরিদ্রতা যখন কাউকে কিছু বিক্রয়ে বাধ্য করে, তখন প্রচলিত মূল্যে তার থেকে ওই পণ্য ক্রয়ে কোনো সমস্যা নেই।'[৪৪৫]

সুতরাং তার বক্তব্যের 'প্রচলিত মূল্যে' কথাটি প্রমাণ করে যে, যদি অস্বাভাবিক কম-বেশি মূল্যে লেনদেন হয়, তা হলে সেটি জায়েয হবে না।

এরপর ফুকাহায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। তবে হুকুমটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। ইতঃপূর্বে হানাফি মাযহাবের বাস্তবায়ন-পদ্ধতির আলোচনায় বলেছি যে, অনন্যোপায় ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ। তবে ক্রেতার জন্য ক্রয়কৃত পণ্য নেওয়া হালাল হবে। মূল্যের ক্ষেত্রে বাজার দর পরিশোধ করতে হবে, নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। শাফেয়ি মাযহাবের অনেক ফকিহ মাসআলাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিক্রয়টি সহিহ হবে। তবে অনন্যোপায় ব্যক্তিকে ন্যায্য মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কারণ, বিক্রেতার জন্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা ওয়াজিব। আবার তাদের অনেকে হানাফি মাযহাবের মতো বাস্তবায়ন-পদ্ধতি অবলম্বন করে বলেছেন যে, চুক্তিটি কার্যকর হবে না। তবে অনন্যোপায় হওয়ার কারণে সেটি ন্যায্য মূল্যে নেওয়া হালাল হবে। সুতরাং ক্রেতাকে ন্যায্য মূল্য ছাড়া আর কিছুই পরিশোধ করতে হবে না। ইতঃপূর্বে ইবনে কুদামা (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে এটিই বোঝা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই ভালো জানেন।

৮০. দরিদ্রতা বা ঋণ পরিশোধের জন্য বিক্রয় করলে তার হুকুম

যেসব ক্ষেত্রে নিজ বা পরিবারের জীবননাশের আশঙ্কা হয় না, তবে ঋণ পরিশোধ বা দরিদ্রতার কারণে তার সম্পদ বিক্রয় করতে বাধ্য হয়,

---

৪৪৫. আল-কাফি, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.), পরিচ্ছেদ: কাদের বিক্রয় ও হস্তক্ষেপ বৈধ...,পৃষ্ঠা-৩৬১।
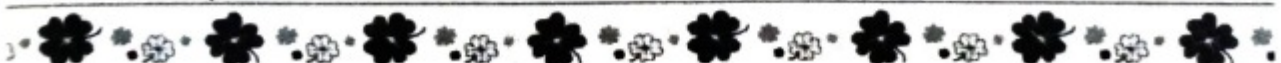
পরিভাষায় এ ধরনের লোকদেরকে অনন্যোপায় বলা হয় না। সুতরাং তারা যেসব বিক্রয় করবে, সেগুলো অস্বাভাবিক কম-বেশিতে হলেও সহিহ বলে সাব্যস্ত হবে। তবে যারা এ ধরনের অমানবিক লেনদেন করবে, তাদের জন্য এটি মাকরুহ হবে। আল্লামা খাত্তাবি (রহ.) বলেছেন–

بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد، (يعني : عند الشافعية، وينعقد عند الحنفية فاسدا موقوفا، كما سبق) والوجه الأخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين والمروئة، أن لا يبايع على هذا الوجه، وأن لا يفتات عليه بماله، ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة، حتى يكون له فيه بلاغ، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه، جاز في الحكم ولم يفسخ، وفي إسناد الحديث (يعني حديث علي رضي الله تعالى عنه) رجل مجهول لا ندري من هو، إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه.

'অনন্যোপায় ব্যক্তির বিক্রয়টি দুটি অবস্থায় হয়ে থাকে। একটি হলো, তার ওপর চাপ থাকার কারণে সে অনন্যোপায় হবে। এভাবে বিক্রয় করলে সেটি ফাসেদ হবে এবং কার্যকর হবে না। (অর্থাৎ, শাফেয়ি মাযহাব অনুযায়ী। হানাফি মাযহাবে মওকুফ অবস্থায় কার্যকর হবে। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।) দ্বিতীয়: পারিবারিক ব্যয় বহন অথবা ঋণ পরিশোধের জন্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয়ে প্রয়োজনে তার মালিকানাধীন কোনো সম্পদ কম মূল্যে বিক্রয় করা। ধর্মীয় ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অবস্থায় তার থেকে ক্রয় করা এবং তার সম্পদ কুক্ষিগত করা উচিত নয়। তবে এমন ব্যক্তির সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে সহায়তা ও ঋণ দেওয়া উচিত। যেন সেগুলোর মাধ্যমে সে চাপমুক্ত হতে পারে। তারপরও যদি প্রয়োজনের তাগিদে এভাবে বিক্রয় করে, তা হলে হুকুমের দিক থেকে সেটি জায়েয হবে এবং সেটিকে প্রত্যাহার করতে হবে না। হাদিসটির (হযরত আলি রাযি.

থেকে বর্ণিত হাদিস) সনদে একজন অপরিচিত লোক রয়েছে। আমরা তার পরিচয় জানি না। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ এভাবে বিক্রয় করাকে মাকরুহ সাব্যস্ত করেছেন।'[৪৪৬]

আমাদের উস্তাদ শাইখ উসমানি থানবি (রহ.) এই বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর বলেছেন–

ففيه : أن الوجه الثاني ليس من بيع المضطر، بل بيع المحتاج، فإن المضطر شرعا إنما هو الخائف على نفسه، فلا يلحق به إلا من هو مثله لا من هو دونه، وإنما كره عامة أهل العلم بيع مثل هذا المحتاج، لحق الدين والمروئة، لا لكونه في حكم المضطر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

'সুতরাং আলোচিত বক্তব্যের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনন্যোপায় ব্যক্তির বিক্রয় নয়; বরং সেটি হলো অভাবী ব্যক্তির বিক্রয়। কেননা, শরয়ি দৃষ্টিতে কেবল সে ব্যক্তি অনন্যোপায় হিসাবে সাব্যস্ত হবে, যে জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকে। এটি সমপর্যায় বা নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তি থেকে হতে পারে না। তা ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম এমন মুখাপেক্ষী ব্যক্তির বিক্রয় মাকরুহ সাব্যস্ত করার কারণ হলো, সেখানে ধর্মীয় ও মানবিক বিষয় সম্পৃক্ত রয়েছে। অনন্যোপায়ের হুকুমে হওয়ার কারণে মাকরুহ বলেননি। والله تعالى أعلم'[৪৪৭]

৮১. প্রতারণা ও বিক্রয়ে এর প্রভাব

সন্তুষ্টি বিনষ্টকারী তৃতীয় বিষয়টি হলো প্রতারণা। অর্থাৎ, কোনো একপক্ষ থেকে প্রতারণা করা। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের পরিভাষায় প্রতারণা কথার মাধ্যমে হলে তাকে "তাগরির", আর কাজের মাধ্যমে হলে তাকে "তাদলিস" বলে অভিহিত করা হয়।

৮২. 'তাগরির' ও এর প্রকারভেদ

'তাগরির' হলো কোনো একপক্ষ থেকে এমন বর্ণনা দেওয়া, যার ওপর অপর পক্ষের চুক্তি করার বিষয়টি নির্ভর করার পর বর্ণনাটি মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

---

৪৪৬. মাআলিমুস সুনান, আল্লামা খাত্তাবি (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৭।

৪৪৭. ইলাউস সুনান : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২১৪-২১৫।
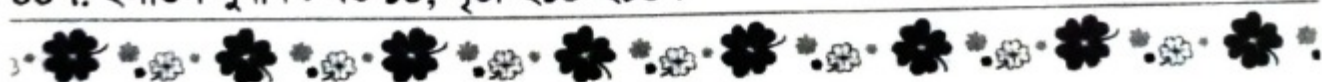
এটি ব্রিটিশ আইনের 'Misrepresentation'-এর অনুরূপ। এটি তিন প্রকারে বিভক্ত :

১. পণ্যের জাত বর্ণনায় ধোঁকা দেওয়া। সেটি এভাবে যে, অলঙ্কার বিক্রেতা বলল, এটি স্বর্ণের অলঙ্কার। এরপর দেখা গেল সেটি স্বর্ণের প্রলেপযুক্ত রুপার অলঙ্কার। এ ধরনের ধোঁকার ক্ষেত্রে বিক্রয়টি বাতিল সাব্যস্ত হবে।[৪৪৮]

২. পণ্যের গুণগত মান বর্ণনায় ধোঁকা দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ : কোনো গাড়ি বিক্রেতা বলল, এটি নতুন অথবা নির্দিষ্ট দেশের তৈরি। এরপর তার বর্ণনার বিপরীত পাওয়া গেল। অনুরূপভাবে কোনো পণ্যের ওপর লিখে রাখল, এটি জাপানের তৈরি। এরপর দেখা গেল সেটি দেশীয় কোম্পানির তৈরি, অথবা পণ্যের ওপর মিথ্যা কোনো ব্র্যান্ডের নাম লিখে রাখল। এ ধরনের ক্ষেত্রে সঠিক গুণ না-পাওয়ার কারণে ক্রেতার জন্য খিয়ারের হুকুম প্রযোজ্য হবে। কারণ, বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যের নির্দিষ্ট গুণাগুণ বর্ণনা করা এবং তার ওপর ক্রেতার ক্রয়ে সম্মত হওয়ার বিষয়টি পণ্যটি ওই গুণের শর্তযুক্ত হওয়ার হুকুমে। যখন পণ্যের নির্দিষ্ট গুণাগুণ বলা হবে, তখন ওই গুণ না-থাকলে ক্রেতার জন্য চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে। খিয়ারের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ।

৩. পণ্যের বাজার দর বলার ক্ষেত্রে ধোঁকার আশ্রয় নেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, বিক্রেতা বলল, এ পণ্যটির বাজার দর এক হাজার টাকা। এরপর দেখা গেল তার বাজার দর পাঁচশত টাকা, অথবা ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, এটির বাজার দর পাঁচশত টাকা। এ কথা অনুযায়ী সেটিকে পাঁচশত টাকায় ক্রয় করার পর বিক্রেতা জানতে পারল যে, সেটির বাজার দর এক হাজার টাকা। এ ধরনের ধোঁকার ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার সকল বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। খিয়ারের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ।

ধোঁকার মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে চার ইমাম একমত, খিয়ারের অধ্যায়ে যে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ। তবে কিছু শাখাগত

---

৪৪৮. আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেছেন, কেউ কোনো দাসী ক্রয়ের পর যদি তাকে দাস হিসাবে পায়, তা হলে পণ্য না-থাকার কারণে বিক্রয় বাতিল হবে। (ফাতহুল কাদির, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: ফাসেদ বিক্রয় : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬৬-৬৭)
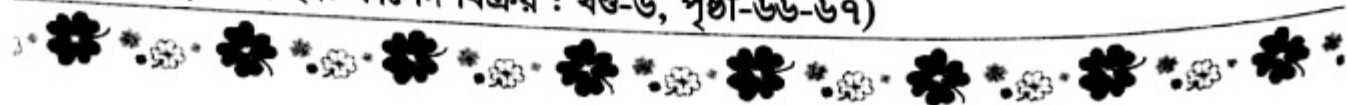
মাসআলার ক্ষেত্রে হাম্বলি মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে সেগুলোকে ধোঁকার আওতাভুক্ত করেছে। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন–

ولو قال البائع : أُعْطِيْتُ بهذه السلعةِ كذا وكذا، فصدقه المشتري واشتراها بذلك، ثم بان كاذبا، فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار أيضا، لأنه في معنى النجش.

‘বিক্রেতা যদি বলে, ‘এই পণ্যটির বিনিময়ে আমাকে এত মূল্য পরিশোধ করতে হলেও আমি তোমার কাছে এটি এই মূল্যে বিক্রয় করলাম।’ ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করে সেটি ক্রয় করার পর জানা গেল বিক্রেতা মিথ্যা বলেছে। এমন ক্ষেত্রে বিক্রয় সহিহ হবে এবং ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে। কারণ, সেটি নাজাশের মতো হয়েছে।’[৪৪৯]

তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, বিক্রেতা মিথ্যা দাবি করেছিল যে, সে এই মূল্যে পণ্যটি ক্রয় করেছে। পরে জানা গেল যে, সে উল্লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় করেছে। এ-ক্ষেত্রে হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, ক্রেতা চুক্তি বাতিল করার অধিকার রাখবে। বিক্রয়টি যদি মুরাবাহার ভিত্তিতে না-হয়ে দরদামের (بيع المساومة) মাধ্যমে হয়ে থাকে, তা হলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অন্যান্য ফকিহ বলেন, বিক্রয়টি যদি মুরাবাহার পদ্ধতিতে হয় এবং বিক্রেতা তার ব্যয়ের পরিমাণ বলার ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তা হলে ক্রেতার খিয়ার থাকবে। কারণ, মুরাবাহার বিক্রয়টি আমানত বিক্রয়ের একটি প্রকার। মুরাবাহার আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ। মুরাবাহার বিক্রয়টি ব্যয় ও লাভের ওপর নির্ভর করে হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যয়ের পরিমাণ বলার ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া মানে বিক্রেতার পক্ষ থেকে ধোঁকা দেওয়া।[৪৫০] পক্ষান্তরে দরদামের মাধ্যমে বিক্রয়ের বিষয়টি হলো, সেটি বিক্রেতার ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে সংঘটিত হয় না। সুতরাং দরদামের মাধ্যমে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার ব্যয়ের বিষয়টি

৪৪৯. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭৮।

৪৫০. রাদ্দুল মুহতার, পরিচ্ছেদ : মুরাবাহা ওয়াত তাওলিয়া : খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৩৭, ফিকরাহ নং ২৪০৯৬।

একটি অতিরিক্ত বিষয়, বিক্রয়ের জন্য সেটি জানা জরুরি নয়। অতএব, সেক্ষেত্রে ক্রেতার কোনো খিয়ার থাকবে না। কারণ, বিক্রেতার ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে বিক্রয় করা হয়নি।

৮৩. কাজের মাধ্যমে প্রতারণা

কাজের মাধ্যমে ধোঁকা দেওয়া, যেটিকে "التدليس" (গোপন করা) নামে অভিহিত করা হয়। আল্লামা দারদির (রহ.) সেটিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন–

هو أن يفعل البائع فعلا في المبيع يظن به كمالا، وليس كذلك.

'বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যের মধ্যে এমন কারসাজি করা, যার মাধ্যমে সেটিকে পূর্ণাঙ্গ মনে হয়, অথচ বাস্তবে সেটি অনুরূপ নয়।'[৪৫১]

এ ধরনের ধোঁকার একটি হলো, পুরাতন কাপড়কে নতুন বোঝানোর উদ্দেশ্যে রং করা। এটির ওপর কিয়াস করে বলা যায়, নতুন গাড়ির বিক্রেতা কোনো পুরাতন গাড়িকে গোপনে নতুন গাড়ির মধ্যে রেখে দেওয়া ধোঁকার আওতাভুক্ত। এটিকে ব্রিটিশ আইনে 'Fraud'-বলা হয়। এ ধরনের ধোঁকা যদি মূল্য অস্বাভাবিক কম-বেশি হওয়া অথবা পণ্যের কাঙ্ক্ষিত গুণের অনুপস্থিতি হয়, তা হলে তার হুকুম ধোঁকার হুকুমের অনুরূপ। সে হুকুমটি হলো, ক্রেতার পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকারও সাব্যস্ত হতে পারে। সেটি এভাবে যে, পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের মধ্যকার মূল্যের ব্যবধানটি বিক্রেতার কাছ থেকে উসুল করা হবে। খিয়ারের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ।

৮৪. ভুল এবং চুক্তিতে এর প্রভাব

প্রচলিত আইন প্রণেতাগণ সন্তুষ্টি বিনষ্টকারী কারণসমূহের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি (Mistake)-কে একটি কারণ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। ধোঁকা (التغرير) বা গোপন করার (التدليس)[৪৫২] সঙ্গে এ দিক থেকে ভুলের পার্থক্য রয়েছে যে, কোনো একপক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা প্রতারণার মাধ্যমে ধোঁকা

৪৫১. আশ-শারহুল কাবির, আল্লামা দুসুকি (রহ.)-এর টীকাসহ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১১৫।

৪৫২. Chitty: On Contract, Chapter 5, & Contract Law, by Neil Andrews, Chapter ১০. নযরিয়াতুল আকদ, ড. আবদুর রাযযাক, পৃষ্ঠা-৩৪৯।

সংঘটিত হয়। আর ভুল হলো কোনো একপক্ষ বা উভয় পক্ষের ভুল বুঝাবুঝি হওয়া। ভুলের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বা প্রতারণা উদ্দেশ্য থাকে না।

ভুল ও এর শাখাসমূহ যেহেতু বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, তাই ফুকাহায়ে কেরাম এর জন্য কোনো স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রচনা করেননি। তবে বিভিন্ন জায়গায় ভুলের অনেক শাখাগত মাসআলা আলোচনা করেছেন। আবার কখনো অন্য পরিচ্ছেদে বিক্ষিপ্ত মূলনীতির বর্ণনা দিয়েই শেষ করেছেন, যেগুলো থেকে স্পষ্টভাবে ভুলের হুকুম দেওয়া সম্ভব। সামনের আলোচনায় ভুলের শাখাগত মাসআলার বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দিন।

৮৫. প্রথম : চুক্তির শব্দপ্রয়োগে ভুল

চুক্তির শব্দে এভাবে ভুল হতে পারে যে, ভুলবশত চুক্তিকারীর মুখ থেকে বিক্রয় শব্দ বেরিয়ে গেল অথবা তার মুখ থেকে এমন কোনো শব্দ বেরিয়ে গেল, যেটিকে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্নকারী শব্দ হিসাবে গণ্য করা হয় না। আল্লামা ইবনে আমিরুল হাজ[৪৫৩] (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এর সুরত হলো, কেউ সুবহানাল্লাহ বলার ইচ্ছে করল; কিন্তু তার মুখ থেকে 'এটি এক হাজার টাকায় তোমার কাছে বিক্রয় করলাম' এ কথাটি বেরিয়ে গেল। তার কথা বেরিয়ে আসামাত্র অপর পক্ষ সেটিকে কবুল করল এবং বিক্রেতা তার ভুলের বিষয়টি স্বীকার করল। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, এ সম্পর্কে হানাফি মাযহাবের ইমামদের থেকে কোনো মত বর্ণিত হয়নি। তবে এমন ক্ষেত্রে চুক্তি ফাসেদ হওয়া উচিত এবং কব্জা করার পর ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে। কারণ, বিক্রেতার ইচ্ছাতেই চুক্তির বাক্যটি বেরিয়েছে। তবে তার সন্তুষ্টি না-থাকার কারণে সেটি বাধ্যকৃত ব্যক্তির হুকুমে হবে। তারপর আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) এ ধরনের বিক্রয়কে উপহাসের বিক্রয়ের মতো হুকুম দেওয়ার

---

৪৫৩. **আল্লামা ইবনে আমিরুল হাজ :** মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে আলি আল-হালাবি আল-হানাফি (রহ.)। ইবনে আমিরুল হাজ, ইবনে আমির হাজ ও ইবনুল মুওয়াক্কাত নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম : ৮২৫ হিজরি সিরিয়ার হালাব (আলেপ্পো) শহরে। তাঁর উস্তাদে খাস ছিলেন আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.)। তাঁর কাছেই তিনি ইলমে ফিকহের সনদ লাভ করেন। বহু কিতাবের রচয়িতা ছিলেন। যেমন, আত-তাকরির ওয়াত তাহবির, হালবাতুল মুজাল্লি শারহু মুনইয়াতুল মুসাল্লি প্রভৃতি। তিনি ৮৭৯ হিজরির রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। (আল-আ'লাম, যিরিকলি : ৭/৪৯) –সম্পাদক

মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং পণ্য কব্জা করার পরও ক্রেতা তার মালিক হবে না।[৪৫৪] এ প্রাধান্যটি মূল বিক্রয় বাতিল করা বৈ কিছু নয়।

শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, এ ধরনের ভুলের বিক্রয়গুলো কোনোভাবেই কার্যকর হবে না। আল্লামা খতিব শিরবিনি (রহ.) বলেছেন–

ولا بد أن يقصد بلفظ البيع معنى البيع، كما في نظيره في الطلاق، فلو لم يقصده أصلا، كمن سبق لسانه إليه أو قصده لا لمعناه، كمن لقن أعجميا ما لا يعرف مدلوله لم ينعقد.

'বিক্রয়ের শব্দের মাধ্যমে বিক্রয় উদ্দেশ্য নেওয়া আবশ্যক। যেমন : তালাকের ক্ষেত্র। সুতরাং কেউ যদি আসলেই বিক্রয়ের উদ্দেশ্য না-নেয়। উদাহরণস্বরূপ, অনিচ্ছাকৃত কারো মুখ থেকে বিক্রয়ের কথা বেরিয়ে গেল অথবা বিক্রয় ছাড়া অন্য অর্থ উদ্দেশ্য নিল। যেমন : কেউ এমন ভাষায় অনারবিকে সম্বোধন করল, সম্বোধিত ব্যক্তি যার উদ্দেশ্য বোঝে না। এমন ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পন্ন হবে না।'[৪৫৫]

মালেকি ও শাফেয়ি মাযহাবও অনুরূপ বোঝা যায়। তাঁদের মতানুযায়ী এমন ক্ষেত্রে বিক্রয় সংঘটিত হবে না। কারণ, বিক্রয়, দান ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে মালিকানা পরিবর্তনের উপকরণসমূহের জন্য শর্ত হলো, সামর্থ থাকা, সেটি জানা এবং ইচ্ছে থাকা। আল্লামা কারাফি (রহ.) এমনটি উল্লেখ করে বলেছেন–

فمن باع وهو لا يعلم أن هذا اللفظ أو هذا التصرف يوجب انتقال الملك لكونه عجميا أو طارئا على بلاد الإسلام، لا يلزمه بيع.

'কেউ যদি এ অবস্থায় বিক্রয় করে যে, সে বিক্রয়ের শব্দ অথবা তার সেই হস্তক্ষেপ মালিকানা পরিবর্তনকারী হিসাবে জানে না। কারণ, সে অনারবি অথবা দারুল ইসলামে নতুন এসেছে, তা হলে তার ক্ষেত্রে বিক্রয়টি কার্যকর হবে না।'[৪৫৬]

---

৪৫৪. আত-তাকরির ওয়াত তাহবির, আল্লামা ইবনে আমিরুল হাজ (রহ.), প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ উপ-পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় প্রবন্ধ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৫-২০৬।

৪৫৫. মুগনিল মুহতাজ, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭। নেহায়াতুল মুহতাজ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৩।

৪৫৬. আল-ফুরুক, আল্লামা কারাফি (রহ.), ২৬ নম্বর ফরক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬২-১৬৩। নেহায়াতুল মুহতাজ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৩।

হাম্বলি মাযহাবে এ ধরনের ভুল সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো আলোচনা পাইনি। তবে তাঁরা এ কথা বলেছেন যে, বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি পাওয়া শর্ত। সে সন্তুষ্টি হলো নিজ ইচ্ছায় চুক্তি করা।[৪৫৭] তাঁদের এ বক্তব্য থেকে এমনটি অনুমান করাই যায় যে, ভুলকারীর বিক্রয়কে তারা বাতিল সাব্যস্ত করেছেন।[৪৫৮]

কেউ যদি এমন হয় যে, ওই এলাকার ভাষা ও বিক্রয়ের অর্থই বোঝে না, তা হলে তার বিষয়টি দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করা যেতে পারে। তবে কেউ যদি এমন দাবি করে যে, সে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য বোঝে; কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে তার মুখ থেকে এ কথাগুলো বেরিয়ে গেছে, তা হলে এমন দাবি প্রমাণ করা যথেষ্ট কঠিন। এ কারণে আল্লামা ইবনে আমিরুল হাজ (রহ.) শর্ত করেছেন যে, অপর পক্ষ এ কথা সত্যায়ন করতে হবে যে, সে তার কথার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য নেয়নি। তিনি বলেছেন–

إذ لا يمكن إثباته إلا بهذا الطريق.

'যেহেতু এ পদ্ধতি ছাড়া সেটি প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই।'[৪৫৯]

৮৬. দ্বিতীয় : পণ্য বিদ্যমান থাকা নিয়ে ভুল

পণ্য বিদ্যমান থাকা নিয়ে এভাবে ভুল হয় যে, পণ্য উপস্থিত আছে– এ বিশ্বাসে বিক্রয়চুক্তি করার পর দেখা গেল, পণ্য উপস্থিত নেই। উদাহরণস্বরূপ, যায়েদের গুদামে থাকা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য বিক্রয় করল। বিক্রয়ের আগে ক্রেতা পণ্য দেখেছে। এরপর যখন গুদাম খোলা হলো তখন দেখা গেল, বিক্রয়ের আগেই সেগুলো নষ্ট বা চুরি হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হওয়ার বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট।

৮৭. তৃতীয় : বস্তুটি ক্রেতার মালিকানাধীন নয় মনে করে পণ্য ক্রয় করা

ক্রেতার মালিকানাধীন নয় মনে করে পণ্য ক্রয় করার উদাহরণ হলো, যায়েদ এ কথা মনে করে আমর থেকে জমি ক্রয় করল যে, সেটি আমরের মালিকানাধীন। এরপর প্রমাণিত হলো যে, সেটি যায়েদেরই মালিকানাধীন

---

৪৫৭. কাশশাফুল কিনা' : ৩/১৩৯।

৪৫৮. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ : খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা-১৫৬-১৫৭।

৪৫৯. আত-তাকরির ওয়াত তাহবির : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৬।

জমি –যেমন, মিরাসসূত্রে ওই জমি পেয়েছে; কিন্তু ক্রয়ের সময় যায়েদ সেটি জানতে পারেনি– প্রচলিত আইনের বিধান হলো, এ ধরনের ভুলের কারণে বিক্রয় বাতিল হবে।[৪৬০] ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরনের ভুলের হুকুম বর্ণনা না-করার সম্ভাব্য কারণ হলো, বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য তাঁরা পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানায় থাকার শর্তের ওপর ক্ষান্ত করেছেন। সুতরাং যখন প্রমাণিত হবে যে, পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানা নয়, তখন বিক্রয়টি বাতিল হবে।

৮৮. চতুর্থ : পণ্যের মালিকানায় অন্যকোনো হকদার বের হওয়া

পণ্যের মালিকানায় অংশীদার বের হওয়ার উদাহরণ হলো, যায়েদ এ কথা মনে করে আমর থেকে কিছু ক্রয় করল যে, আমরই সেটির মালিক। এরপর দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, সেটির প্রকৃত মালিক হলো খালেদ, আমর নয়। ফুকাহায়ে কেরাম হকদার বের হওয়া (استحقاق) সম্পর্কিত আলোচনায় এ নিয়ে বিস্তারিত বিধি-বিধান আলোচনা করেছেন। হানাফি মাযহাবের পছন্দনীয় মত হলো, শুধু হকদার বের হওয়ার কারণে এ ধরনের বিক্রয় বাতিল হবে না; বরং অংশীদার তথা আসল মালিক কব্জা করা এবং বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে অর্থ ফেরত দেওয়া পর্যন্ত আসল মালিকের অনুমতির ওপর বিক্রয়টি মওকুফ থাকবে। আসল মালিক যদি অনুমতি দিয়ে দেয়, তা হলে ক্রেতা মালিকানা অর্জন করবে এবং আসল মালিক বিক্রেতা থেকে মূল্য ফেরত নেবে। তবে যদি অনুমতি না-দেয়, তা হলে বিক্রয় বাতিল হবে এবং আসল মালিক ক্রেতা থেকে পণ্য ও ক্রেতা বিক্রেতা থেকে মূল্য ফেরত নেবে।[৪৬১]

মালেকি মাযহাবের সিদ্ধান্তও অনুরূপ। কারণ, অন্যের সম্পদ বিক্রয়ের বিষয়টি মওকুফ হওয়ার ক্ষেত্রে তারা হানাফি মাযহাবের সঙ্গে একমত। এ মতের পক্ষে 'মুদাওওয়ানাতুল কুবরা' কিতাবের একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে দলিল দেওয়া হয়। সেটি হলো, দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ভাড়া দেওয়া জমির হকদার বের হলে বাকি সময়ের জন্য অংশীদারের এই এখতিয়ার থাকে যে, সে চাইলে বাকি সময়ের জন্য ভাড়া বহাল রাখবে নাকি বাতিল করবে।[৪৬২]

---

৪৬০. Chitty: On Contacts, para 283.

৪৬১. রাদ্দুল মুহতার, পরিচ্ছেদঃ অংশীদার বের হওয়া : খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২৯৫-২৯৬, ফিকরাহ নং ২৪৫২৭।

৪৬২. আল-মুদাওওয়ানাতুল কুবরা, অধ্যায়ঃ অংশীদার বের হওয়া : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯২।
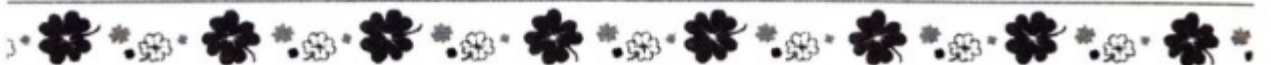
শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, অন্যের সম্পদ বিক্রয় করলে সেটি মৌলিকভাবেই বাতিল। মওকুফ বিক্রয়ের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ। সুতরাং হকদারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হওয়া বেশি যুক্তিসঙ্গত। والله تعالى أعلم

৮৯. পঞ্চম : পণ্য চিনতে ভুল করা

পণ্য চিনতে ভুলের বিষয়টি হলো, পণ্যের জাত বা বিক্রয়-নির্ভরশীল মৌলিক গুণ অথবা পরিমাণে ভুল করা। উদাহরণস্বরূপ, এ বিশ্বাসে লেনদেন করল যে, পণ্যটি অমুক জাতের। এরপর দেখা গেল সেটি অন্য জাতের। যেমন, পাথর মনে করে কিছু ক্রয়ের পর দেখে সেটি কাচ, অথবা কাপড় মনে করে কিছু ক্রয়ের পর দেখে সেটি প্লাস্টিক। অনুরূপভাবে পণ্যের জাত এক হওয়ার পর ক্রেতার কাঙ্ক্ষিত গুণগতমানের তুলনায় যদি পণ্যের মানে বিরাট পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন, কেউ জাপানের তৈরি কাপড় মনে করে ক্রয় করার পর দেখে সেটি দেশীয়। উভয় পক্ষ থেকে এমন ভুল হলে প্রচলিত আইনে সেটি 'সমষ্টিগত ভুল' (Mutual mistake) বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি একপক্ষ থেকে ভুল হয়, তা হলে তাকে 'একক ভুল' (Unilateral Mistake) বলা হয়। প্রচলিত আইন এ ব্যাপারে একমত যে, সামষ্টিক ভুল সন্তুষ্টির অনুপস্থিতি ঘটায়, তাই সেটির কারণে চুক্তি বাতিল হবে।[৪৬৩]

৯০. সমষ্টিগত ভুল (Mutual Mistake)

সমষ্টিগত অজ্ঞতা (যার কারণে সমষ্টিগত ভুল হয়) সম্পর্কে হাদিসের সবচেয়ে সামঞ্জস্যশীল বক্তব্য হলো, একটি চমৎকার ঘটনা। পূর্বেকার উম্মতের আলোচনায় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম (রহ.) হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا

---

৪৬৩. নযরিয়াতুল আকদ. ড. আবদুর রাযযাক, পৃষ্ঠা-৩৭৮। Chitty: On Contacts, para 275.
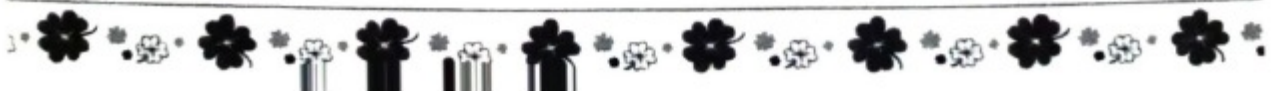
بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا

'একজন অন্যের জমি ক্রয় করল। এরপর ক্রেতা ক্রয়কৃত জমিতে একটি স্বর্ণের কলস পেল। তারপর জমির ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আমার থেকে আপনার স্বর্ণ নিয়ে নিন। আপনার থেকে জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। অন্যদিকে জমি বিক্রেতা বলল, আমি তো জমি ও জমির মধ্যের সবকিছু বিক্রয় করেছি। এরপর উভয়ে একজনের কাছে বিচার দাবি করল। বিচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বললেন, তোমাদের কি কোনো সন্তান আছে? উত্তরে একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অপরজন বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। বিচারক বললেন, ছেলেকে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে উপহার হিসাবে তাদেরকে এ সম্পদ দিয়ে দাও।'[৪৬৪]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেছেন, হযরত ইসহাক বিন বিশর (রহ.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, ক্রেতা তার জমিতে যে সম্পদ পেয়েছিল সেটি ছিল জমিনে পুঁতে রাখা ধনভাণ্ডার (كنز مدفون)। তবে বিক্রেতা বলেছিল, 'আমি পুঁতে রাখিনি এবং সে সম্পর্কে কিছু জানিও না।'[৪৬৫]

ক্রেতা-বিক্রেতার ধর্মীয় মূল্যবোধ, খোদাভীতি ও তাকওয়ার ব্যাপারে ঘটনাটি একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ওই সম্পদের মালিকানা নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের বিবাদ হয়নি; বরং একে অন্যকে মালিকানা প্রদানের মতো বিরল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে। ক্রেতা জমিনে পাওয়া অতিরিক্ত সম্পদ বিক্রেতার কাছে দিলে বিক্রেতা সেটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত একজনের বিচারের সম্মুখীন হয়েছে এবং তিনি এমন বিচার করেছেন, যা উভয়ের জন্য উপকারী। তবে এ হাদিসের অধীনে ফুকাহায়ে কেরাম এ মাসআলার মূলনীতি বর্ণনা করেছেন এবং বিক্রয়ের হুকুম অনুযায়ী কে ওই সম্পদের মালিক হবে, সেটি উল্লেখ করেছেন। অন্যভাষায় বললে, উভয়ের মধ্যে যদি বিবাদ হয়

---

৪৬৪. সহিহ বুখারি, মানাকিব অধ্যায়ের আগে, হাদিস নং ৩৪৭২।

৪৬৫. ফাতহুল বারি, অধ্যায়: নবিদের ঘটনাবলি : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫১৯।
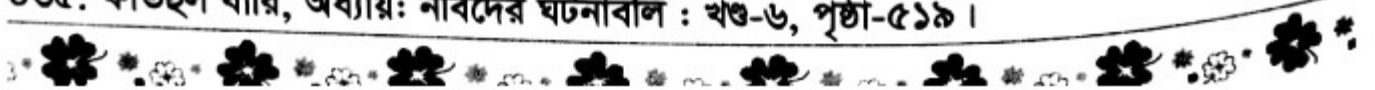
এবং বিক্রেতা দাবি করে যে, সে জমি বিক্রয়ের সময় তার মধ্যে কি আছে সে সম্পর্কে জানত না, সে যদি জানত, তা হলে জমির দাম বাড়িয়ে দিত; অন্যদিকে ক্রেতা বিক্রেতার এ দাবি অস্বীকার করে, এক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মালিক কে হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (রহ.) বলেছেন–

حكى المازري خلافا عندهم فيما إذا ابتاع أرضا، فوجد فيها شيئا مدفونا، هل يكون ذلك للبائع أو للمشتري، فإن كان من أنواع الأرض كالحجارة والعمد والرخام، فهو للمشتري، وإن كان كالذهب والفضة، فإن كان من دفين الجاهلية فهو ركاز، وإن كان من دفين المسلمين، فهو لقطة... وقال ابن التين: فإن كان من دفائن الإسلام، فهو لقطة، وإن كان من دفائن الجاهلية، فقال مالك: هو للبائع، وخالفه ابن القاسم، فقال: إن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها، وقول مالك أحسن، لأن من ملك أرضا باختطاط، ملك ما في باطنها، وليس جهله به حين البيع يسقط ملكه فيه.

'আল্লামা মাযারি (রহ.) এ মাসআলাতে তাঁদের (ফুকাহায়ে কেরামের) মধ্যে মতানৈক্য বর্ণনা করেছেন যে, কোনো জমি বিক্রয় করার পর সেখানে পুঁতে-রাখা কিছু পাওয়া গেলে সেটি বিক্রেতা পাবে না কি ক্রেতা পাবে– প্রাপ্ত জিনিসটি যদি মাটি জাতীয় হয়। যেমন: পাথর, ছোট টুকরো অথবা মার্বেল পাথর ইত্যাদি, তা হলে সেটি ক্রেতা পাবে। আর যদি স্বর্ণ-রুপা জাতীয় হয়, তা হলে দেখতে হবে সেটি জাহেলি যুগের, না কি ইসলামি যুগের? জাহেলি যুগের হলে সেটি রিকাযের হুকুমে হবে। আর যদি ইসলামি যুগের হয়, তা হলে লুকতার হুকুমে হবে। ... আল্লামা ইবনুত তিন (রহ.) বলেছেন, প্রাপ্ত সম্পদ যদি ইসলামি যুগের পুঁতে-রাখা বস্তু হয়, তা হলে সেটি লুকতার হুকুমে হবে। আর যদি জাহেলি যুগের পুঁতে-রাখা বস্তু হয়, তা হলে তার ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, সেটি বিক্রেতা পাবে। আল্লামা ইবনুল কাসেম (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.)-এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন,
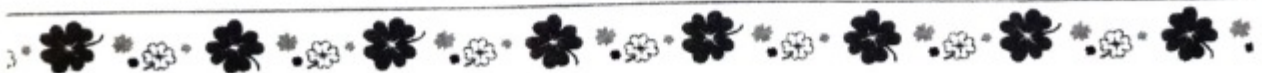
জমির ভেতরের জিনিস তার বাইরের জিনিসের মতোই। তবে ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতটি বেশি বাস্তব সম্মত। কেননা, যে ব্যক্তি জমির সীমানার মালিক হয়েছে, সে তার মধ্যের সব জিনিসেরই মালিক হয়েছে। তা ছাড়া বিক্রয়ের সময় ওই জিনিস সম্পর্কে না জানা তার মালিকানা রহিত করে না।'

আল্লামা উব্বি[৪৬৬] (রহ.) বলেছেন—

قلت: وعلى أنه ركاز، فقال ابن القاسم: هو للمشتري، وقال مالك: هو للبائع، وصوبه اللخمي، وما ذكر من أنه لقطة كان الشيخ يقول: إنما هو للبائع، والخلاف فيما يكون للمشتري أو للبائع إنما هو فيما يوجد من الركاز، وكانت نزلت في دار رجل يقال له: القباطي، توفي، فبيعت الدار، فوجد المشتري فيها بوقالا مملوأ ذهبا، فحكم القاضي عمر بن عبد الرفيع به لورثة البائع، أشهد على حكمه بذلك الشيخ وغيره من أكابر العدول، وكان الشيخ يصوب حكمه بذلك، والأقرب، والله أعلم، أن ما كان من دفن الإسلام في القديم فهو لقطة،وإن كان دفنه فيما قرب من الزمان فهو للبائع أو الورثة، وللقرائن في ذلك مدخل، وكان هذا القباطي مات فجأة قتيلا لم يوص، وجعل ذلك من القرائن الدالة على أن المال له.

---

৪৬৬. **আল্লামা উব্বি :** মুহাম্মাদ ইবনে খালফাহ ইবনে উমর আল-উব্বি আল-মালেকি (রহ.)। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও ফকিহ। তিউনিসিয়ার 'উব্বাহ' নামক এলাকার দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে উব্বি বলা হয়। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে: ইকমালু ইকমালিল মু'লিম (শারহু মুসলিম, সাতখণ্ডে। এতে তিনি সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার আল্লামা মাযারি, কাজি ইয়ায, কুরতুবি এবং ইমাম নববি রহ.-এর করা ব্যাখ্যাসমূহের সমন্বয় করেছেন। পাশাপাশি নিজের শায়েখ আল্লামা ইবনে আরাফা'র মতও উল্লেখ করেছেন), শারহুল মুদাওওয়ানাহ, তাফসিরুল কুরআনিল আযিম প্রভৃতি। তিনি ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.)-এর সামসময়িক ছিলেন। তিনি আল্লামা উব্বি (রহ.) কে মাগরিবের (পশ্চিম আফ্রিকা) শীর্ষস্থানীয় আলেম হিসাবে প্রশংসা করেছেন। তিনি ৮২৭ হিজরি মোতাবেক ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসিয়ায় ইন্তেকাল করেন। (আল-আ'লাম : ৬/১১৫; তারাজিমুল মুআল্লিফিন আত-তিউনিসিয়্যিন) –সম্পাদক

'সেটি রিকায হিসাবে গণ্য করার বিবেচনায়– ইবনুল কাসেম (রহ.) বলেছেন, সেটি ক্রেতা পাবে। ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, বিক্রেতা পাবে। আল্লামা লাখমি (রহ.) এটিকে সহিহ বলেছেন। সেটি লুকতা হওয়ার ব্যাপারে যে মত বর্ণনা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে শাইখ[৪৬৭] (ইবনে আরাফা) বলেছেন, সেটি বিক্রেতা পাবে। বিক্রেতা বা ক্রেতার পাওয়ার ব্যাপারে যে মতানৈক্য রয়েছে সেটি রিকায হিসাবে পাওয়া সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কুবাতি নামক জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে তিনি থাকতেন। লোকটি মারা গেলে তার বাড়িটি বিক্রয় করা হয়। ক্রেতা সেখানে স্বর্ণ ভর্তি একটি হাঁড়ি পায়। এ ঘটনায় কাজি উমর বিন আবদুর রাফি প্রাপ্ত স্বর্ণ বিক্রেতার ওয়ারিশদের মালিকানার পক্ষে রায় দিয়েছেন। তার এ রায়ের প্রতি শাইখ ও অন্যান্য আকাবির উলামায়ে কেরাম সমর্থন জানিয়েছেন। শাইখ তার এ সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেছেন। তবে আমার মত হলো,-আল্লাহই সর্বজ্ঞ- ইসলামি যুগে দীর্ঘদিন আগের দাফনকৃত কিছু পাওয়া গেলে সেটি লুকতার হুকুমে হবে। তবে যদি কাছাকাছি সময়ের দাফনকৃত হয়, তা হলে বিক্রেতা বা তার ওয়ারিশগণ পাবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন নিদর্শন বা আলামতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ওই কুবাতি নামক লোকটি হঠাৎ মারা গিয়েছিল, তাই কোনো অসিয়ত করতে পারেনি। তবে এক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদ তার মালিকানা হওয়ার পক্ষে বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া হয়েছিল।'[৪৬৮]

এ উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, পণ্যের মধ্যে মূল্যবান কোনো বিষয় থাকলে সেটি থেকে বিক্রেতার মালিকানা রহিত হয় না। এ বিষয়টি সমষ্টিগত ভুলের নিকটতম দৃষ্টান্ত। কারণ, জমিনে ধনভাণ্ডার থাকার বিষয়টি কোনো পক্ষই জানতে পারে না; তারপরও সেখান থেকে বিক্রেতার মালিকানা রহিত হয়নি; বরং চুক্তি না-করা প্রোথিত সম্পদে (كنز) বিক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই ফকিহগণ সে পদ্ধতির কোনো হুকুম বর্ণনা করেননি,

---

৪৬৭. আল্লামা ইবনে আরাফা (রহ.)। –সম্পাদক

৪৬৮. শারহুল উব্বি আলা সহিহ মুসলিম, (ইকমালু ইকমালিল মুলিম) অধ্যায়ঃ বিচার : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯

যেখানে বিক্রেতা এ দাবিতে চুক্তি বাতিল করতে চায় যে, সে যদি প্রোথিত সম্পর্কে জানত, তা হলে মূল্য বাড়িয়ে বলত। কারণ, প্রাপ্ত সম্পদ তাকে দিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। জমি বিক্রয় জমি জাতীয় ছাড়া অন্যান্য জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে না। সুতরাং সেখানে যদি জমির সমজাতীয় কিছু পাওয়া যায়। যেমন: পাথর বা মার্বেল, তা হলে সেগুলো জমি বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হবে। কারণ, জমি তার সমজাতীয় জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং তার মধ্যের জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। চাই ক্রেতা-বিক্রেতার সেটি জানা থাকুক বা না থাকুক।

মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যে এমন তথ্য পাওয়া যায়, যেটি সমষ্টিগত ভুলের ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হওয়া প্রমাণ করে। আল্লামা হাত্তাব (রহ.) ইবনে রুশদ (রহ.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন–

من اشترى ياقوتة، وهو يظنها حجرا، ولا يعرفها البائع، ولا المبتاع، فيجدها على ذلك، أو يشتري القرط يظنه ذهبا فيجده نحاسا أن البيع يرد في الوجهين، وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يسم أحدهما الشيء بغير اسمه، وإنما سماه باسم يصلح له على كل حال.

'যে ব্যক্তি পাথর মনে করে ইয়াকুত ক্রয় করল এবং ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ বিষয়টি বুঝতে পারল না। এরপর ক্রেতা সেটিকে ইয়াকুত পাথর হিসাবে পেল, অথবা স্বর্ণের কানের দুল মনে করে ক্রয় করার পর দেখে সেটি তামার দুল, উভয় ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হবে। এ মতানৈক্যের হুকুম সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন কোনো পক্ষ একটিকে অন্য নামে ব্যক্ত করবে না;[৪৬৯] বরং এমন নামে ব্যক্ত করেছে, যে নামটি সবসময় তার জন্য ব্যবহার হয়।'[৪৭০]

হানাফি মাযহাবের মূলনীতি হলো, যদি পণ্যের জাত নির্ধারণে ভুল হয়। যেমন, সিরকা বিক্রয় করার পর দেখা গেল সেটি গুড়, তা হলে বিক্রয় বাতিল হবে। তবে ইমাম কারখি (রহ.)-এর মতে, বাতিল না-হয়ে ফাসেদ হবে। তবে যদি পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণে ভুল হয়। যেমন : খাসি ছাগল বিক্রয়

৪৬৯. কারণ, অন্য নামে অভিহিত করলে তা ধোঁকার আওতাভুক্ত হবে, ভুলের মধ্যে থাকবে না।
৪৭০. মাওয়াহিবুল জালিল : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৬৬।
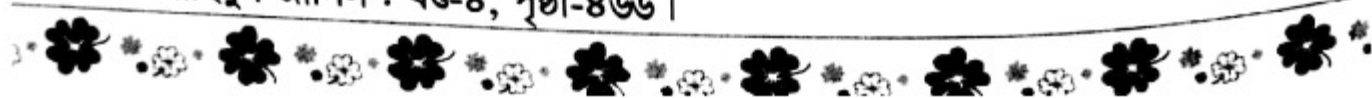
করার পর দেখা গেল সেটি খাসি ছাগল না, মাদি ছাগল।[৪৭১] এমন ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য সেটি নেওয়া বা না-নেওয়ার এখতিয়ার থাকবে।[৪৭২]

হানাফি মাযহাবে অনুরূপ আরও একটি মূলনীতি হলো, যদি ইশারা ও নাম উল্লেখের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি পণ্যের নাম বলে অন্যটির প্রতি ইশারা করল, এমন ক্ষেত্রে নাম গ্রহণযোগ্য হবে, ইশারা গ্রহণযোগ্য হবে না। সেটি এভাবে যে, ইশারাকৃত পণ্যটি যদি হুবহু নাম উল্লেখকৃত পণ্য হয়, তা হলে বিক্রয় সহিহ হবে। আর যদি ভিন্ন পণ্য এবং ভিন্ন জাতের হয়, তা হলে বাতিল হবে। পক্ষান্তরে যদি বর্ণিত গুণ ছাড়া ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হয়, তা হলে ক্রেতার খিয়ারে কবুল থাকবে।

৯১. একপক্ষীয় ভুল (Unilateral Mistake)

ভুলটি যদি একপক্ষীয় ভুল হয়। সেটি এভাবে যে, এক পক্ষের ধারণায় ভুল হয়েছে, অন্য পক্ষের কোনো ভুল হয়নি, এক্ষেত্রে আমরা সব শাখাগত মাসআলাকে অন্তর্ভুক্তকারী কোনো মূলনীতি পেশ করতে পারব না; বরং মানুষের লেনদেন যেসব পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল, সেগুলোর হুকুম অনুযায়ী হবে। এ ধরনের অনেক ভুলের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, একপক্ষীয় ভুল বিক্রয় সহিহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। একপক্ষ থেকে ভুল হওয়ার কারণে সে পণ্য চিনতে ভুল করলেও চুক্তিটি সহিহ হিসাবে বিবেচিত হবে। আল্লামা হাত্তাব (রহ.) আল্লামা আশহাব (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন–

سئل مالك عمن باع مصلى، فقال المشتري : أتدري ما هذا المصلى ؟ هي – والله خزٌّ – فقال البائع: ما علمت أنه خز، ولو علمته ما بعته بهذا الثمن. قال مالك: هو للمشتري، ولا شيء للبائع لو شاء استبرأه قبل بيعه.

---

৪৭১. কারণ, হানাফি মাযহাবে পশুর ক্ষেত্রে নর-নারী হওয়া গুণ হিসাবে স্বীকৃত। হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, বিক্রেতা যদি বলে, এত টাকায় তোমার কাছে এ খচ্চরটি বিক্রয় করছি। ক্রেতা বলল, আমি ক্রয় করলাম। এরপর দেখা গেল ইশারাকৃত প্রাণীটি ঘোড়া বা গাধা, তা হলে বিক্রয় সহিহ হবে না। একই ধরনের মাসআলা হলো, ক্রেতা বলল এত টাকায় তোমার কাছে এ উটটি বিক্রয় করছি, পরে দেখা গেল তা উটনী, তা হলে পণ্য অজানা হওয়ার কারণে বিক্রয় সহিহ হবে না। (কাশশাফুল কিনা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৪) সুতরাং তাঁদের কাছে পশুর লিঙ্গ পরিবর্তন হওয়া মূলসত্তা (বা জাত) পরিবর্তনের মতো হবে।

৪৭২. তাবয়িনুল হাকায়িক, আল্লামা যাইলায়ি (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮০-৩৮১।

'ইমাম মালেক (রহ.) কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যিনি জায়নামাজ বিক্রয় করেছেন। ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আপনি কি জানেন, এটি কিসের তৈরি জায়নামাজ? আল্লাহর কসম! এটি রেশমের তৈরি। এ কথা শোনার পর বিক্রেতা বলল, এটি রেশমের হওয়ার বিষয়টি আমি জানি না। আমি যদি জানতাম, তা হলে এ মূল্যে বিক্রয় করতাম না। এমন ক্ষেত্রে ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, পণ্যটি ক্রেতাই পেয়ে যাবে, বিক্রেতার কিছু করার থাকবে না। বিক্রেতা চাইলে বিক্রয়ের আগে সেটি যাচাই করতে পারত।'[৪৭৩]

শাফেয়ি মাযহাবের আল্লামা কালয়ুবি (রহ.) বলেছেন–

لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة فالعقد صحيح، إن لم يصرح بلفظ الجوهرة، وإلا فالعقد باطل، وحكى عن شيخه صحة العقد وثبوت الخيار، قال: وفيه نظر.

'মুক্তা মনে করে কাচ ক্রয় করলে সে চুক্তি সহিহ হবে। চুক্তিতে যদি মুক্তার কথা না-বলে, তা হলে সহিহ হবে। আর যদি মুক্তার কথা বলে, তা হলে চুক্তিটি বাতিল হবে। এমন চুক্তি সহিহ হওয়ার পর সেটি নেওয়া বা না-নেওয়ার এখতিয়ার থাকার ব্যাপারে তার শাইখ থেকে মত রয়েছে। তিনি বলেন, এই মতটি প্রশ্নবিদ্ধ।'[৪৭৪]

তবে এক্ষেত্রে এমন কিছু চুক্তি রয়েছে, যেখানে একক ভুল চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। তবে চুক্তি বাতিল হওয়ার জন্য শর্ত হলো, অপর পক্ষ কর্তৃক তার ভুলের ব্যাপারটি স্বীকার করতে হবে। এ ধরনের চুক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনি[৪৭৫] (রহ.)-এর মুরাবাহার আলোচনায়।

---

৪৭৩. মাওয়াহিবুল জলিল : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৬৬।

৪৭৪. হাশিয়াতুল কালয়ুবি আলা শারহিল জালাল মাহাল্লি আলাল মিনহাজ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৪। আল-মাজমু : খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৩৪-৩৩৫।

৪৭৫. **ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি** : আবদুল মালেক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আল-জুওয়াইনি আশ-শাফেয়ি (রহ.)। ইমামুল হারামাইন নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম : ইরানের নিশাপুর প্রদেশের জুওয়াইন নামক এলাকায় ৪১৯ হিজরিতে। ইলমে ফিকহে তাঁর যুগে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি বাগদাদ সফর করেন। সেখান থেকে মক্কায়। হারাম শরিফে তিনি চার বছর অবস্থান করেন। তারপর যান মদিনা মুনাওয়ারায়। সেখানে দরস-তাদরিস ও ফতোয়া
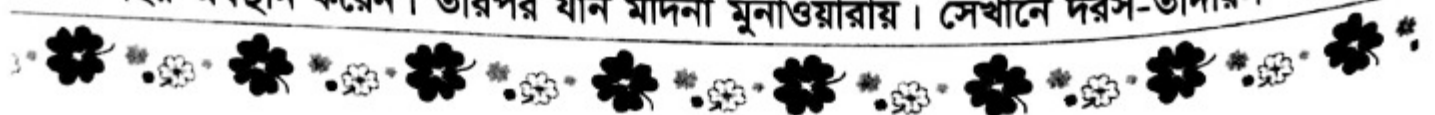
তিনি বলেছেন–

فأما إذا قال البائع: قد غلطت إذ ذكرت المائة (يعني ذكرت أني اشتريت هذه السلعة بمائة، وأربحك عليه) فإني كنت اشتريت بمائة وخمسين، فإن صدقه المشتري في ذلك وثبت الغلط بتوافقهما، فالذي ذكره الجمهور من الأصحاب : أنا نتبيّن فسخَ العقد من أصله ... فأما إذا لم يعترف المشتري بما ادعاه البائع، فقال البائع: قد كنت اشتريت بمائة وخمسين، وغلطت بذكر المائة، فلا يرجع إلى قول البائع.

'বিক্রেতা যদি দাবি করে, একশত টাকা বলার ক্ষেত্রে আমি ভুল করেছি। (অর্থাৎ, এ পণ্যটি একশত টাকায় ক্রয় করেছি এবং তার ওপর লাভের ভিত্তিতে তোমার কাছে বিক্রয় করেছি) কারণ, সেটিকে একশত পঞ্চাশ টাকায় ক্রয় করেছি। ক্রেতা যদি তার কথাটি সত্যায়ন করে এবং উভয়ের সম্মতিতে ভুলের ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়, তা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের বক্তব্য থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, মৌলিকভাবে চুক্তিটি বাতিল হবে। ... ক্রেতা যদি বিক্রেতার দাবি অস্বীকার করে, তথা বিক্রেতা বলে, পণ্যটি একশত পঞ্চাশ টাকায় ক্রয় করেছি; কিন্তু একশত টাকা বলে ভুল করেছি। এক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা মানা হবে না।'[৪৭৬]

প্রদানে লিপ্ত থাকেন। হাজারো মানুষ তাঁর থেকে উপকৃত হয়। সেই সময় থেকেই তাঁর লকব হয়ে যায়–ইমামুল হারামাইন। তাঁর এবং অন্যান্য আশআরি আলেমদের বিরুদ্ধে তৎকালীন সেলজুক সরকার প্রধানের কাছে মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়। যে কারণে তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। একই কারণে ইমাম বাইহাকি, কুশাইরি প্রমুখ নিশাপুরের বহু উলামায়ে কেরাম দেশত্যাগে বাধ্য হন। প্রবাস জীবন কাটিয়ে তিনি স্বদেশে ফেরেন এবং সেসময়কার শ্রেষ্ঠ আলেম হিসাবে বরিত হন। তিনি অত্যন্ত তাহকিক সহকারে কিতাব রচনা করতেন। বহু কিতাবের রচয়িতা ছিলেন তিনি। যেমন, গিয়াসুল উমাম, আল-বুরহান ফি উসুলিল ফিকহ, আল-ওয়ারাকাত ফি উসুলিল ফিকহ, আল-ইরশাদ ফিল ইতিকাদ প্রভৃতি। ৪৭৮ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। (তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ আল-কুবরা : ৫/১৬৫; গিয়াসুল উমাম, মুকাদ্দিমা, তাহকিক: ড. মুস্তাফা হালিমি) –সম্পাদক

৪৭৬. নিহায়াতুল মাতালিব ফি দিরায়াতিল মাযহাব, ইমাম জুওয়াইনি (রহ.), পরিচ্ছেদ : মুরাবাহা : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯৯-৩০০।
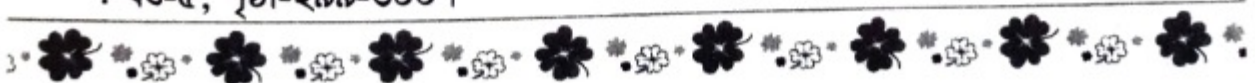
এ আলোচনার আগে ইমাম জুওয়াইনি (রহ.) বলেছেন, বিক্রেতা যদি পূর্বে উল্লেখ করা পদ্ধতির বিপরীত কোনো পদ্ধতিতে ভুল করে। সেটি এভাবে যে, সে বলল, এ পণ্যটি একশত পঞ্চাশ টাকায় ক্রয় করেছি। এরপর জানা গেল সে ভুল করেছে। মূলত একশত টাকায় ক্রয় করেছে। এক্ষেত্রে চুক্তি সহিহ হবে এবং পণ্যের মূল্য থেকে পঞ্চাশ টাকা ও তার অংশের লভ্যাংশ দিতে হবে।'[৪৭৭]

এসব শাখাগত মাসআলা থেকে বোঝা যায়, সব লেনদেন ও সব অবস্থার ভুলের জন্য ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা সহজ নয়। এক্ষেত্রে অনুসৃত মূলনীতি হলো, সন্তুষ্টির ওপর ভুলের প্রভাব, ভুলের কারণে যে ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাণ জানা ও ভুলের দায়ভার কে বহন করবে সেটি নির্ধারণ করা। এ বিষয়গুলো চুক্তি ও অবস্থার ভিন্নতার কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মূলনীতি না-বলারসম্ভাব্য কারণ এটিই। বিভিন্ন অধ্যায়ে ও শাখাগত মাসআলার আলোচনায় তাঁরা এ ধরনের ভুলের হুকুম আলোচনা করেছেন। কারণ, প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র হুকুম রয়েছে। যেটিকে সর্বাবস্থায় সব শাখাগত মাসআলার ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এ ধরনের বিষয়গুলো বিচারকের কাছে ছেড়ে দেওয়া উচিত। বিচারক প্রত্যেক বিষয় বিবেচনা করে মূলনীতি ও উত্তম পন্থা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেবেন।

একক ভুলের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত রয়েছে। ব্রিটিশ আইনের মূলনীতি হলো, শুধু সমষ্টিগত ভুলকে (Mutual Mistake) সন্তুষ্টির পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে। সাধারণ অবস্থায় চুক্তি সহিহ না-হওয়ার ক্ষেত্রে একক ভুল (Unilateral Mistake) কোনো প্রভাব ফেলবে না। একক ভুল (Unilateral Mistake) হলেও চুক্তি সহিহ হবে। তারা বলেছে, কেউ যদি স্বর্ণের আংটি মনে করে কোনো আংটি ক্রয় করে। বিক্রেতা স্বর্ণ-রুপা কোনোটির কথা না বলেই আংটিটি বিক্রয় করে। এরপর ক্রেতা জানতে পারে যে, সেটি রুপার আংটি। এক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে না।[৪৭৮]

ফরাসি আইনে একক ভুলকে সেক্ষেত্রে চুক্তি ফাসেদকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে,

---

৪৭৭. নিহায়াতুল মাতালিব : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯৮-২৯৯।

৪৭৮. Chitty: On Contracts, v. 1. p. 126, Chapter 5, para 272. এ মূলনীতি ছাড়াও তার ২৮৯ নম্বর ধারা ও তার পরবর্তী অন্যান্য ধারায় এমন কিছু বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে এক পক্ষের ভুলকে সন্তুষ্টি না থাকা প্রমাণিত করে।
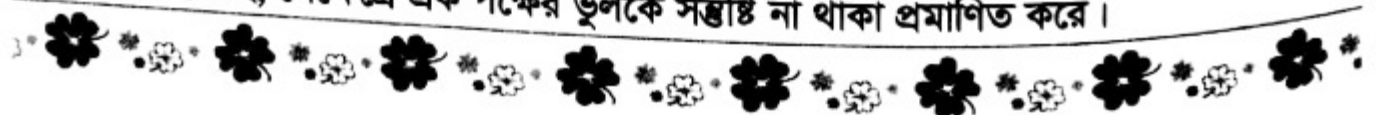
যেক্ষেত্রে অপর পক্ষ জানতে পারে যে, তার সঙ্গে চুক্তিকারী ভুল ধারণায় ছিল এবং সে সেটি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করেনি।[৪৭৯]

৯২. নকল ও উপহাসের বিক্রয়

সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না, এ ধরনের একটি বিক্রয় হলো নকল বিক্রয়। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.)-এর বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী এ ধরনের বিক্রয়ের সারকথা হলো, সরকার বা অন্য কেউ তার মালিকানাধীন সম্পদ নিয়ে নেওয়ার আশঙ্কায় অন্যের সঙ্গে এমন চুক্তি করে যে, সে বলবে, আমি তার থেকে ক্রয় করেছি। এভাবে তার সম্পদ রক্ষা হবে এবং তাদের কারোরই প্রকৃত বিক্রয় উদ্দেশ্য থাকবে না।'[৪৮০] অনেকে নকল ও উপহাসের বিক্রয়ের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করেছেন যে, উপহাসকারীর জন্য অনন্যোপায় হওয়া না হওয়া উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। নকল বিক্রয়টি শুধু অনন্যোপায়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন–

> والأظهر أنهما سواء في الاصطلاح كما قال فخر الإسلام : التلجئة هي الهزل.
>
> 'স্পষ্ট কথা হলো, পরিভাষার ক্ষেত্রে উভয়টি সমান। যেমন, আল্লামা ফখরুল ইসলাম (রহ.) বলেছেন, নকল বিক্রয়টিই উপহাসের বিক্রয়।'[৪৮১]

সারকথা, নকল অথবা উপহাসের বিক্রয়ের পারিভাষিক উদ্দেশ্য হলো, উভয় পক্ষ এমন পূর্বচুক্তির ভিত্তিতে চুক্তি করবে যে, এটির মাধ্যমে তারা প্রকৃত বিক্রয় উদ্দেশ্য নিচ্ছে না। বিশেষ কোনো কারণে অন্যকে বিক্রয় বোঝানোর উদ্দেশ্যে তারা বিক্রয়চুক্তি করছে।

নকল বিক্রয়ের হুকুম হলো, চুক্তি করার আগে যদি উভয় পক্ষ এমন সমঝোতা করে যে, তারা যে চুক্তি করবে সেটি কৃত্রিম ও উদ্দেশ্যহীন চুক্তি হবে, এমন সমঝোতার পর বিক্রয়চুক্তি করলে সেটি বাতিল ও অসংঘটিত চুক্তি হিসাবে সাব্যস্ত হবে। কারণ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা বিক্রয়ের শব্দ ব্যবহার করেছে, তবে অন্তরে বিক্রয় উদ্দেশ্য নেয়নি। সুতরাং তাদের চুক্তিতে

---

৪৭৯. নাযরিয়্যাতুল আকদ, ড. আবদুর রাযযাক , পৃষ্ঠা-৩৮৩-৩৮৫।

৪৮০. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭৯।

৪৮১. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫৭৩।

বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য শর্তকৃত সন্তুষ্টিটি পাওয়া যায়নি। যাহেরুর রেওয়ায়াত অনুযায়ী এটি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত। সাহেবাইন রহ.ও এই মত পোষণ করেন।[৪৮২] সেইসঙ্গে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাবও এটি।[৪৮৩]
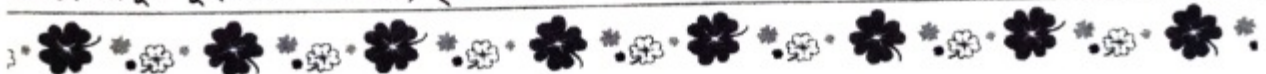
এমন ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন, বিক্রয় সংঘটিত হবে। কারণ, গোপনে তারা যে সমঝোতা করেছে সেটির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই; বরং চুক্তির সময় তারা যেটি বলেছে সেটিই গ্রহণযোগ্য হবে। চুক্তির সব শর্ত সাপেক্ষে তারা সহিহ চুক্তি করেছে। সুতরাং পূর্বের শর্ত এখানে কোনো প্রভাব ফেলবে না।[৪৮৪]

মালেকি মাযহাবে এ ব্যাপারে এমন কোনো হুকুম পাইনি যেখানে চুক্তি করার আগে উভয় পক্ষ সমঝোতা করে যে, তারা যে চুক্তি করবে সেটি উপহাস/নকল চুক্তি হবে। তবে তারা এমন মাসআলার হুকুম বর্ণনা করেছেন, যেখানে একপক্ষ দাবি করে যে, সে চুক্তি করার ইচ্ছে করেনি। সে যা কিছু বলেছে তা উপহাস/নকল ছিল। তাদের এ মাসআলা থেকে বোঝা যায়, অতীতকাল ও বর্তমানকালসূচক শব্দের মাধ্যমে সংঘটিত চুক্তির মধ্যে তারা পার্থক্য করেছে। তারা বলেছে, চুক্তিটি যদি অতীতকালসূচক শব্দের মাধ্যমে হয়, সেক্ষেত্রে এক পক্ষের উপহাস/নকল হওয়ার দাবি গ্রহণ করা হবে না। সে কসম করলেও তার দাবি মানা হবে না। তবে যদি বর্তমানকালসূচক শব্দের মাধ্যমে চুক্তি করে থাকে, তা হলে কসম করলে উপহাসের ব্যাপারে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে।[৪৮৫]

---

৪৮২. সাহেবাইন : ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহিমাহুমাল্লাহ)-কে একসঙ্গে বুঝানোর জন্যে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। –সম্পাদক

৪৮৩. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮৯। আল-ফুরু, আল্লামা ইবনে মুফলিহ (রহ.) : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭৬।

৪৮৪. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৩৪।

৪৮৫. শারহুদ দারদির-এ বলা হয়েছে, ইবনুল কাসেম (রহ.)-এর অভিমতও এমন। তিনি অতীত ও বর্তমান সূচক শব্দের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আল্লামা দুসুকি (রহ.) এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি বিক্রয় আবশ্যক হওয়ার মত দিয়েছেন। সে যদি এমন কসম করে যে, সে সন্তুষ্ট ছিল না, তা হলেও কার্যকর হবে। 'বর্তমান' শব্দের উদ্দেশ্য হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত এ ওয়াদা না-করবে যে, সে বিক্রয়ের ইচ্ছে করেনি এবং সে বিক্রয়ের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। (আদ-দুসুকি, পরিচ্ছেদ: সন্তুষ্টি প্রমাণ করে এমন কাজের মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২-৫। হাশিয়াতুল আদাবি আলা কিফায়াতিত তালেব, পরিচ্ছেদ : বিয়ে : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১। আল-ফাওয়াকিহুল দেওয়ানি, পরিচ্ছেদ: বিয়ের বিধানসমূহ : খণ্ড-২, ৪)
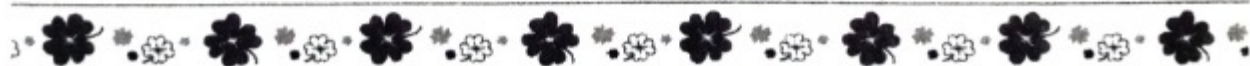
মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম 'সাক্ষী ধার নেওয়া' (شهادة الاسترعاء) শিরোনামে নকল বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন, যার ব্যাখ্যা হচ্ছে, সাক্ষীর আহ্বায়ক সাক্ষীদাতার কাছে গোপনে এ মর্মে পত্র লিখবে যে, তার জীবন বা সম্পদের ভয়ে সে এমন পন্থা অবলম্বন করছে। তার ভয় দূর হওয়ার পর সে এটি প্রত্যাহার করে নেবে। এমন চুক্তির ওপর নির্ভর করে 'ধার নেওয়া সাক্ষী' সাক্ষ্য দিল। মানুষের অনন্যোপায় হওয়ার বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ধার নেওয়া সাক্ষীর মাধ্যমে বিচার করাকে মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম জায়েয বলেছেন। যেমন : তালাক, ওয়াকফ, দান, বিয়ে ও অনুরূপ ক্ষেত্রসমূহ। আল্লামা ইবনে ফারহুন (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, তালাক, আটকে রাখা বা দানের মতো সৌজন্যমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সাক্ষী ধার নেওয়া জায়েয আছে। তবে সে এগুলো করতে বাধ্য নয়। তাদের এই মতের পক্ষে বিশেষ কোনো কারণ জানা যায় না। তবে নিচের বক্তব্য থেকে এতটুকু বোঝা যায় যে, অনন্যোপায় হয়ে এরূপ করাকে জায়েয বলেছেন। যেমন : কেউ সাক্ষী রাখল যে, 'আমি যদি তালাক দেই, তা হলে সেটি অমুকের ভয়ের কারণে তালাক দেবো', অথবা তালাকের ব্যাপারে এমন কসম করল যে, 'আমি সাক্ষী রাখছি যে, যদি তালাকের কসম করি, তা হলে সেটি বাধ্য বা অনুরূপ কোনো কারণে করব।' এ বক্তব্য এবং এর সঙ্গে ইতঃপূর্বে যা উল্লেখ করেছি তার কোথাও সাক্ষী কর্তৃক উক্ত কারণ জানাকে শর্ত করা হয়নি।

তবে আল্লামা ইবনে ফারহুন (রহ.) বলেছেন–

> لا يجوز الاسترعاء في البيوع، مثل أن يشهد قبل البيع أنه راجع في البيع، وأن بيعه لامر يتوقعه، لأن المبايعة خلاف ما تطوع به، وقد أخذ البائع فيه ثمنا، وفي ذلك حق للمبتاع، إلا أن يعرف الشهود الاكراه على البيع، أو الاخافة، فيجوز الاسترعاء إذا انعقد قبل البيع، وتضمن العقد شهادة من يعرف الاخافة والتوقع الذي ذكره.

'বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষী ধার নেওয়া জায়েয নেই। উদাহরণস্বরূপ, বিক্রয়ের আগে কেউ সাক্ষী রাখল যে, বিক্রয় প্রত্যাহার করবে। কোনো একটি আশঙ্কার কারণে সে বিক্রয় করছে। কেননা, ক্রয়-বিক্রয় সৌজন্যমূলক লেনদেনের বিপরীত। সেখানে বিক্রেতা মূল্য গ্রহণ করে এবং ক্রেতার জন্য পণ্যের অধিকার সৃষ্টি হয়। তবে সাক্ষী কর্তৃক বিক্রেতার বাধ্য হওয়া বা আশঙ্কার বিষয়টি জানতে

> পারলে বিক্রয়ের আগে সাক্ষী ধার নেওয়া জায়েয আছে। এ চুক্তিগুলো এমন সাক্ষীকে শামিল করে, যে সাক্ষী ভীতিপ্রদর্শন বা বাধ্যকরণের কারণ জানে।'[৪৮৬]

এর সারকথা হলো, বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। যদিও চুক্তির আগে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখে যে, তারা বাস্তবে চুক্তি করছে না। এমনকি বাধ্য হয়ে এমন করার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া এবং সাক্ষীদাতা সে সম্পর্কে জেনে সাক্ষী দিলেও চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। সম্ভবত তারা এ ধরনের বিক্রয়কে বাধ্য হয়ে বিক্রয়ের আওতাভুক্ত করেছে, নকল বিক্রয়ের আওতাভুক্ত করেনি। তবে আল্লামা ইবনে ফারহুন (রহ.) বিক্রয়চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য যে কারণ বর্ণনা করেছেন যে, তার সঙ্গে ক্রেতার অধিকার সম্পৃক্ত হয়েছে এবং সে মূল্য দিয়েছে। তার এ কারণটি প্রমাণ করে, উভয় পক্ষ যদি এমন সমঝোতা করে যে, তারা বাস্তবিক বিক্রয় উদ্দেশ্য না-নিয়ে নকল বিক্রয় করছে, তা হলে সে বিক্রয়ের সঙ্গে ক্রেতার অধিকার সম্পৃক্ত হবে না। তবে যে ইল্লতের কারণে ধার নেওয়া সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হয় না, এক্ষেত্রে সেটি পাওয়া যাচ্ছে না। والله تعالى أعلم

কৃত্রিম বিক্রয় সহিহ না-হওয়ার ক্ষেত্রে হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবের দলিল হলো, এ ধরনের বিক্রয়ে সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনুল কারিমের ভাষ্য অনুযায়ী বিক্রয়চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য সন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকা শর্ত। সুতরাং সন্তুষ্টি ছাড়া বিক্রয়চুক্তি সহিহ হবে না। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে, যখন প্রমাণিত হবে যে, তারা পূর্ব সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি করেছে। যদি বিক্রয়ের পর বলে, আমরা নকল চুক্তির মাধ্যমে বাস্তব চুক্তি বুঝিয়েছিলাম, তা হলে বিক্রয় সহিহ হবে এবং নকল চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। উভয় পক্ষ যদি এ ব্যাপারে একমত হয় যে, বিক্রয়ের সময় তাদের কারো কাছেই বাস্তব বা নকলের কিছুই ছিল না অথবা নকল চুক্তি করা বা না-করার ব্যাপারে তারা দ্বিমত পোষণ করে, তা হলে উভয় অবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী চুক্তি কার্যকর হয়ে যাবে। তবে সাহেবাইন এ মতের সঙ্গে একমত হননি। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইজাব কার্যকর রাখাকে বেশি ভালো মনে করেছেন। কারণ, ইজাব হলো বিক্রয়ের মৌলিক বিষয়। আর সাহেবাইন সমঝোতাকে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। তবে কোনো কারণে সমঝোতার বিপরীত কিছু পাওয়া গেলে, সে অবস্থায় চুক্তি কার্যকর বলেছেন।

---

৪৮৬. তাবসিরাতুল হুক্কাম, আল্লামা ইবনে ফারহুন (রহ.) : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫-৬।

এ হুকুম সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে মূল বিক্রয়চুক্তিতে কৃত্রিমতা থাকে। অনেক সময় মূল চুক্তিতে কৃত্রিমতা না-রেখে শুধু মূল্যের মধ্যে রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক হাজার টাকায় বাস্তব চুক্তি করার ব্যাপারে একমত হয়ে দুই হাজার টাকা মূল্য প্রকাশের ব্যাপারে সমঝোতা করে। এরপর সমঝোতা ঠিক রেখে সে অনুযায়ী দুই হাজার টাকায় চুক্তি করে। এমন ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে দুই হাজার টাকাই মূল্য হিসাবে সাব্যস্ত হবে এবং পূর্বচুক্তির কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। কারণ, মূল চুক্তির ব্যাপারে তারা ইচ্ছুক এবং সমঝোতার কারণে চুক্তিটিকে ফাসেদ করে দিচ্ছে। সুতরাং সে কারণে চুক্তি ফাসেদ হবে। অতএব, এমন বিপরীতমুখী অবস্থার সময় গুণ অপেক্ষা মূলনীতির ওপর আমল করা উত্তম। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতে এ বিষয়টি মূল চুক্তির সমঝোতার অনুরূপ। অর্থাৎ, এক হাজার টাকায় চূড়ান্ত চুক্তি হবে। তবে চুক্তির সময় যদি পূর্ব সমঝোতা প্রত্যাহারের ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হয়, তা হলে দুই হাজার টাকায় চূড়ান্ত চুক্তি হবে।

অনেক সময় মূল্যের জাত নির্ধারণের মধ্যে কৃত্রিম হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, উভয় পক্ষ একশত দিনারের ব্যাপারে সমঝোতা করল। অথচ তার আসল মূল্য হলো একশত দিরহাম, অথবা এর বিপরীত সমঝোতা করল। এমন ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় চুক্তির সময় উল্লিখিত মূল্যে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। পূর্ব সমঝোতার প্রতি লক্ষ করা হবে না। যদিও সেটির ওপর চুক্তি করা বা সেটিকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারে সমঝোতা করা হোক অথবা চুক্তির সময় তাদের মনে এ ধরনের কোনোটিই না-থাকে।

এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পূর্ব সমঝোতা গ্রহণযোগ্য না-করার মূলনীতির ওপর রয়েছেন। সাহেবাইন মূল্য ও মূল্যের প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাদের পক্ষ থেকে এই পার্থক্য করার কারণ হলো, মূল্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি সহিহ রেখে সমঝোতার ওপর আমল করা সম্ভব। তবে মূল্যের প্রকারের ক্ষেত্রে এমনটি অসম্ভব। কারণ, বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করতে হলে বিনিময় উল্লেখ ছাড়া সেটি সহিহ হবে না। আর পূর্ব সমঝোতাকে যদি গ্রহণ করা হয়, তা হলে বিনিময় হবে একশত দিনার। অথচ চুক্তির সময় সেটি উল্লেখ করা হয়নি। চুক্তির সময় উল্লেখ করা হয়েছে একশত দিরহাম। কাজেই এটি বিনিময় নয়। তবে মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে সমঝোতার বিষয়টি অনুরূপ নয়। সেখানে সমঝোতাকে ঠিক রেখে বিক্রয়চুক্তি সহিহ
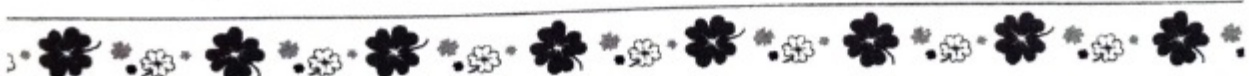
সাব্যস্ত করা সম্ভব। সেটি এভাবে যে, দুই হাজারের মধ্যে থাকা এক হাজারে চুক্তি সম্পন্ন হবে।[৪৮৭]

৯৩. বেনামি চুক্তি

বাধ্য হয়ে বিক্রয়ের যে হুকুম বর্ণনা করেছি সেটি প্রচলিত আইনের 'দেখানো চুক্তির' (Ostensible Contracts) অনুরূপ। আমাদের দেশে এ ধরনের চুক্তিকে 'বেনামি চুক্তি' বলে। এ পদ্ধতির ব্যাখ্যা হলো, আসল ক্রেতা ছাড়া অন্যের নামে জমি ক্রয় করা। প্রচলিত রেজিস্টারে ওই ভিন্ন নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়। কর ও অন্যান্য প্রয়োজনে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে ব্যক্তিই আসল ক্রেতা হয়, যে মূল্য পরিশোধ করে। অনেক প্রচলিত আইনে এ ধরনের লেনদেনকে দেখানো চুক্তি হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়। উভয় পক্ষের কাছে যেহেতু গোপন চুক্তিটিই প্রকৃত চুক্তি, তাই ড. আবদুর রাযযাক সানহুরি বলেছেন–

> أما بالنسبة للمتعاقدين والورثة، فالعقد الصوري لا وجود له، والعقد الحقيقي هو الذي يسري في حقهم بقدر ما تتوافر فيه شروط الصحة، ونحن في هذا إنما نطبق مبدأ سلطان الإرادة، فالمتعاقدان قد أرادا العقد المستتر، لا العقد الظاهر، فيلتزمان بما أراده، لا بما لم يريداه، وهذا يتفق مع ما تقتضي به المادة ١٣٢١ من القانون المدني الفرنسي من أن العقود المستترة لا تنتج أثرها إلا فيما بين المتعاقدين، وقد استقر الفقه القضاء في فرنسا على ذلك، كما أن الفقه والقضاء في مصر قد سلما بالمبدأ أيضا دون نص، لاتفاقه مع القواعد العامة.

'তবে চুক্তির উভয় পক্ষ ও ওয়ারিশদের ক্ষেত্রে দেখানো চুক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রকৃত চুক্তি সেটি, যেটি বিক্রয়চুক্তি সহিহ হওয়ার শর্ত অনুপাতে তাদের অধিকারভুক্ত হয়। এ ব্যাপারে

---

৪৮৭. মানার কিতাবের শরাহ ইফাযাতুল আনওয়ার এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.), নাসামাতুল আসহার কিতাবের সারসংক্ষেপ, দ্বিতীয় প্রকার, পৃষ্ঠা-২৬৪। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) রাদ্দুল মুহতার কিতাবে তার কিছু আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন : খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫৭৩।

আমরা ইচ্ছার কর্তৃত্বের দর্শনকেই কার্যকর সাব্যস্ত করছি। সুতরাং উভয় পক্ষ গোপন চুক্তিটিকেই মূল চুক্তি সাব্যস্ত করতে চাচ্ছে, প্রকাশ্যটিকে নয়। তাই তাদের পূর্বের ইচ্ছাটি তাদের জন্য আবশ্যক হবে, পরের কথাটি আবশ্যক হবে না। ফ্রান্সের নগরিক আইনের ১৩২১ নম্বর ধারার সঙ্গে এ সিদ্ধান্তের মিল রয়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে, গোপন চুক্তিটি শুধু ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষেত্রে কাজে আসবে। ফ্রান্সের বিচার ও রায়ের ক্ষেত্রে এটি অনুসরণ করা হয়েছে। যেমনভাবে মিশরের বিচার ও রায়ের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য উল্লেখ ছাড়াই এ দর্শনকে ঠিক রাখা হয়েছে। কারণ, সাধারণ মূলনীতিসমূহের সঙ্গে এর মিল রয়েছে।'[৪৮৮]

আমাদের দেশের (পাকিস্তানের) প্রচলিত আইনও অনুরূপ। মূল্যদাতাকেই প্রকৃত ক্রেতা সাব্যস্ত করা হয়। তবে দৃশ্যপটে যার নামে রেজিস্ট্রি করা হয়, আইনি প্রক্রিয়া সম্পাদনার জন্য তাকে আসল মালিকের আস্থাভাজন ও উকিল সাব্যস্ত করা হয়। এ কারণে এ পদ্ধতিগুলোকে ট্রাস্ট আইনের (Trusts Act) ৮২ নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য আইনে প্রকৃত ক্রেতার জন্য এমন সুযোগ রাখা হয়েছে যে, দৃশ্যপটে যার নামে চুক্তি করা হয়েছে সে কৃত্রিম মালিক এবং সে নিজে প্রকৃত মালিক এ বিষয়টি প্রমাণ করবে।[৪৮৯] ব্রিটিশ আইন দৃশ্যপটের মালিক (Otensibb Dwnir) স্বীকৃতি দিয়েছে, যার নামে জমি রেজিস্ট্রি করা হবে, কিন্তু সে প্রকৃত মালিক নয়। উপমহাদেশে প্রচলিত মালিকানা পরিবর্তন আইনের ৪১ নম্বর ধারায় 'Transfer of Property Act 1882' নামে বিষয়টি রয়েছে এবং এটি ব্রিটিশ আইন-নির্ভর।'

এর ওপর নির্ভর করে ভারতীয় উপমহাদেশের উলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন যে, কারো নামে জমি রেজিস্ট্রি করলেই সে প্রকৃত মালিক হওয়া হয়ে যাবে না। সুতরাং কেউ যদি অন্যের নামে জমি ক্রয় করে, কিন্তু যার নামে ক্রয় করেছে সে মূল্য পরিশোধ না-করে প্রথম ব্যক্তি মূল্য পরিশোধ করে, তা হলে শুধু রেজিস্ট্রি করার কারণে এমন উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না যে, আসল মালিক তাকে জমি দান করেছে।[৪৯০]

---

৪৮৮. নযরিয়াতুল আকদ, ড. আবদুর রাযযাক, পৃষ্ঠা-৮৩৫-৮৩৬, ফিকরাহ নং ৭৫৬।

৪৮৯. See 57th Report of the Law Commission of India on Benami Transactions 1973, para 2.4, 2.5, 2.11.

৪৯০. ইমদাদুল ফাতাওয়া, শাইখ হাকিমুল উম্মত থানবি (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১৪-৪১৫, প্রশ্ন নং ৪১৯।

৯৪. "ইযআন" চুক্তি
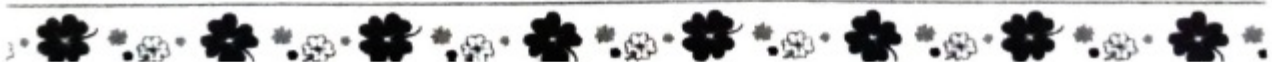
বর্তমান যুগে "ইযআন" বা আনুগত্যসুলভ চুক্তি নামে একটি পরিভাষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ চুক্তির উদ্দেশ্য সেসব চুক্তি, যেখানে শুধু একপক্ষ নির্দিষ্ট শর্তারোপ করে। অপর পক্ষের দরদাম, যাচাই বা শর্ত পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ থাকে না; বরং লেনদেনে সম্মত হলে শর্তগুলো রক্ষা করা আবশ্যক হয়। সুতরাং তার পক্ষ থেকে লেনদেন করা বা বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এ ধরনের চুক্তিকে ইযআন বা আনুগত্যসুলভ চুক্তি নামে নামকরণের কারণ হলো, সেখানে একপক্ষ অপর পক্ষের কাছে নত হয়ে তার সব শর্ত মেনে নেয়। এ চুক্তিটি হলো বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোল, পণ্য বহনের জন্য ট্রেন, ক্রেন, কুরিয়ার ইত্যাদির ক্ষেত্রে চুক্তি করার মতো। এ ধরনের চুক্তির শর্ত ও মূল্য ইত্যাদি প্রস্তাবকারীর পক্ষ থেকে নির্ধারিত থাকে। প্রস্তাবকারীর সঙ্গে চুক্তি করতে হলে শর্ত মেনে চুক্তি করতে হয়, অথবা চুক্তি পরিহার করতে হয়।

এ ধরনের চুক্তিতে যেহেতু দরদাম ও কম-বেশি করার সুযোগ থাকে না, তাই অনেক সময় মনে হয়, এগুলো সন্তুষ্টির সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং বাধ্য হয়ে বিক্রয়ের সদৃশ, তাই সেটি না-জায়েয হওয়ার কথা। তবে বাস্তবতা হলো, এগুলো বাধ্য হয়ে বিক্রয় করা প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, যাকে বাধ্য করা হয় তার জন্য বাধ্যকারীর শর্ত অনুযায়ী চুক্তি করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না এবং চুক্তি না-করারও কোনো সুযোগ থাকে না। কিন্তু ইযআন চুক্তির ক্ষেত্রে কাউকে চুক্তি করতে বাধ্য করা হয় না। প্রত্যেকের জন্য চুক্তি করা বা না-করার এখতিয়ার থাকে। তবে চুক্তি করতে চাইলে অপর পক্ষ থেকে আরোপিত নির্দিষ্ট শর্তের সঙ্গে চুক্তি করতে হয়। ইযআন বিক্রয়ের এ পদ্ধতিটি সেসব বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, যেখানে পণ্যের জন্য এমন নির্দিষ্ট মূল্য রাখা হয়, যার কমে সেটি বিক্রয় করা হবে না। ক্রেতাকে বলা হয়, 'হয়তো এ মূল্যে ক্রয় করো, নয়তো ছেড়ে দাও।' এ প্রক্রিয়ার পর কেউ ওই লেনদেনে অংশ নিলে তার ব্যাপারে এ কথা বলা যায় না যে, তার সন্তুষ্টি ছাড়া বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

তবে বাজারে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা এবং ন্যায়সঙ্গত শর্তসাপেক্ষে সংঘটিত লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ আপত্তি ছাড়াই এ প্রক্রিয়াটির সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে যেসব লেদদেনের সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপঃ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পণ্য স্থানান্তরের উপকরণ। এক হিসাবে
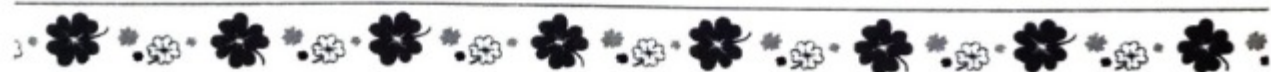
যদিও এসব লেনদেন পরিহার করা সম্ভব। কিন্তু জনগণের জন্য এগুলো এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। কারণ, এ ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসের বিকল্প নেই। আর যেসব প্রতিষ্ঠান এ ধরনের প্রস্তাব করে, তাদের হাতে সেগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সুতরাং এ ধরনের লেনদেনে আরোপিত শর্তগুলো যদি ন্যায়সঙ্গত হয় এবং কষ্টসাধ্য না-হয়, তা হলে এগুলো জায়েয হতে কোনো বাধা নেই। আরোপিত শর্তগুলো যদি কষ্টসাধ্য হয়, তা হলে জনগণের কল্যাণে দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে সেখানে হস্তক্ষেপ করা উচিত। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত অনন্যোপায় এবং বাধ্য হয়ে অস্বাভাবিক কম-বেশিতে বিক্রয়ের হুকুমসমূহ এখানে প্রযোজ্য হবে। বাজারদর নির্ধারণের বিষয়ে সামনে আলোচিত বিষয়গুলোও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আন্তর্জাতিক ইসলামি ফিক্‌হ বোর্ড (مجمع الفقه الاسلامي)-এর সিদ্ধান্তে এ বিষয়গুলো প্রকাশ করা হয়েছে। সে গুলো হলো–

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) في الفترة من ٨ إلى ١٣ ذو القعدة ١٤٢٣ ه الموافق ١١–كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٣ م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود الإذعان) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

١. عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:

أ. تعلق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام ... الخ.

ب. احتكار –أي سيطرة– الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.

ج. انفراد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه دون أن يكون للطرف الآخر حق في مناقشتها أو إلغاء شيئ منها أو تعديله.

د. صدور الإيجاب (العرض) موجها إلى الجمهور،موحدا في تفاصيله وشروطه وعلى نحو مستمر.

٢. يبرم عقد الإذعان بتلاقي وارتباط الإيجاب والقبول الحكميين (التقديريين) وهما كل ما يدل عرفا على تراضي طرفيه وتوافق إرادتيهما على إنشائه وفقا للشروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب، من غير اشتراط لفظ أو كتابة أو شكل محدد.

٣. نظرا لاحتمال تحكم الطرف المسيطر في الأسعار والشروط التي يمليها في عقود الإذعان، وتعسفه الذي يفضي إلى الإضرار بعموم الناس، فإنه يجب شرعا خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداء (أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس) من أجل إقرار ما هو عادل منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن، وفقا لما تقضي به العدالة شرعا.

٤. تنقسم عقود الإذعان في النظر الفقهي إلى قسمين:

أحدهما: ما كان الثمن فيه عادلا، ولم تتضمن شروطه ظلما بالطرف المذعن، فهو صحيح شرعا، ملزما لطرفيه، وليس للدولة أو للقضاء حق التدخّل في شأنه بأي إلغاء أو تعديل، لانتفاء الموجب الشرعي لذلك، إذ الطرف المسيطر للسلعة أو المنفعة باذل لها، غير ممتنع عن بيعها لطالبها بالثمن الواجب عليه شرعا، وهو عوض المثل (أو مع غبن يسير، باعتباره معفوا عنه شرعا، لعسر التحرُّز عنه في عقود المعاوضات المالية، وتعارف الناس على التسامح فيه) ولأن مبايعة المضطر ببدل عادل صحيحة باتفاق أهل العلم.

والثاني: ما انطوي على ظلم بالطرف المذعن، لأن الثمن فيه غير عادل (أي فيه غبن فاحش) أو تضمن شروطا تَعَسُّفِيَّة ضارة به، فهذا يجب تدخُّل الدولة في شأنه ابتداء (قبل طرحه للتعامل به) وذلك بالتسعير الجبري العادل، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو

المنفعة بتخفيض السعر المتغالي فيه إلى ثمن المثل، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة، بما يحقق العدل بين طرفيه استنادا إلى :

أ. أنه يجب على الدولة (ولي الأمر) شرعا دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعة أو منفعة ضرورية لعامة الناس، عند امتناعه عن بيعها لهم بالثمن العادل (عوض المثل) بالتسعير الجبري العادل، الذي يكفل رعاية الحقين: حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي المحتكر في الاسعار أو الشروط، وحق المحتكر بإعطائه البدل العادل.

ب. أن في هذا التسعير تقديما للمصلحة العامة-وهي مصلحة المضطرين إلى السلع أو المنافع في أن يشتروها بالثمن العادل-على المصلحة الخاصة وهي مصلحة المحتكر الظالم بامتناعه عن بيعها لهم إلا بربح فاحش أو شروط جائرة، إذ من الثابت المقرر في القواعد الفقهية أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وأنه يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام.

٥. يفرق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:

الاولى: أن لا يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة بفئة من الناس إلى المنتج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، نظرا لكونه من السلع أو المنافع الترفيهية التي يمكن الاستغناء عنها، أو كان هناك ضرورة أو حاجة غير متعينة إليه، لوجود مثيل أو بديل له متوفر في السوق بسعر عادل، فإن من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالثمن الذي يتراضى مع المشتري عليه، وليس للدولة أو للقضاء حق التدخل بالتسعير عليه فيه، إذ الأصل في صحة العقود التراضي، وموجبها ما أوجبه العاقدان على أنفسهما به، ولأن اختصاص صاحب الوكالة بالمنتج واحتكاره له (بالمعنى اللغوي للاحتكار) جائز شرعا، حيث إن من حقه بيع ما يملك بالثمن الذي يرضى به، ولا يتضمن ظلما أو إضرارا بعامة الناس، ولا يجوز التسعير عليه فيه.

والثانية: أن يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة متعينة بمتعلق الوكالة
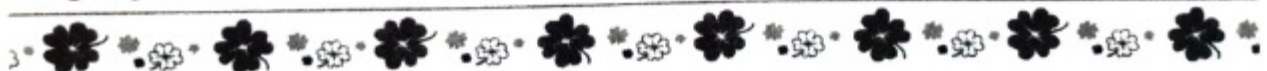
الحصرية، وأن يكون الوكيل باذلا بثمن عادل، لا يتضمن غبنا فاحشا أو تحكما ظالما، وعندئذ فلا يجوز تدخُّل الدولة بالتسعير عليه، لأن اختصاصه واحتكاره المنتج تصرُّف مشروع في ملكه، لا ظلم فيه لأحد، ولا إضرار بالناس المحتاجين إليه، فلا يتعرض له فيه.

والثالثة: أن يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة او خاصة متعينة بمتعلق الوكالة الحصرية، والوكيل ممتنع عن بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائرة، ففي هذه الحال يجب على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم عن المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل. والله تعالى أعلم.

'১৪২৩ হিজরি সনের ৮-১৩ জিলকদ মোতাবেক ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ১১-১৬ জানুয়ারিতে কাতারের দোহা শহরে আন্তর্জাতিক মাজমাউল ফিকহিল ইসলামির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ অধিবেশন :

'ইযআন' চুক্তি সম্পর্কে একাডেমি পর্ষদের কাছে উত্থাপিত আলোচনা এবং সেগুলোর পক্ষে-বিপক্ষের পর্যালোচনা শোনার পর একাডেমি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে–

১. লেনদেনের জন্য ইযআন চুক্তিটি পশ্চিমা বাণিজ্যনীতির একটি আধুনিক পরিভাষা। এ চুক্তিতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য ও শর্তসমূহ থাকে–

ক. চুক্তিটি এমন পণ্য বা সেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যার প্রতি সবাই মুখাপেক্ষী এবং তাদের পক্ষে সেটি এড়িয়ে চলা অসম্ভব। যেমন, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, মোবাইল, ডাক ব্যবস্থা ও পরিবহন ইত্যাদি।

খ. নিয়ন্ত্রণ, তথা ইজাবকারীর পক্ষ থেকে ওই পণ্য, উপকারিতা বা সেবাকে আইন বা কার্যক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, অথবা কমপক্ষে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যা সেখানে আগ্রহী হওয়ার পরিধিকে সীমিত করে দেয়।

গ. চুক্তির বিশদ বিবরণ ও শর্তারোপের ক্ষেত্রে ইজাবকারী একক ভূমিকা রাখে। সেগুলো পর্যালোচনা, কোনো একটি বাদ দেওয়া বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অপর পক্ষের কোনো অধিকার থাকে না।

ঘ. জনসাধারণের উদ্দেশ্যে মূল্য প্রস্তাব করা হয়ে থাকে। তার বিশদ বিবরণ, শর্তসমূহ ও অন্যান্য বিষয় সবার জন্য একই রকম হয়ে থাকে।

২. কৃত্রিমভাবে ইজাব-কবুলের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ইযআন চুক্তি সম্পন্ন হয়। সে ইজাব-কবুল হলো, ইজাবকারীর পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত বিশদ
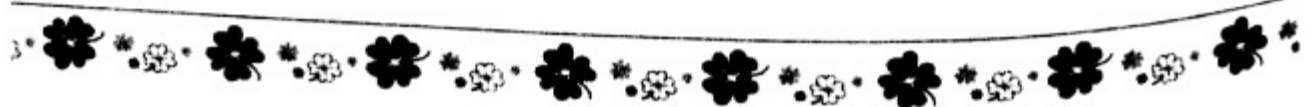
বিবরণ ও শর্ত অনুযায়ী কোনো ধরনের মৌখিক, লিখিত বা নির্ধারিত কোনো পদ্ধতি ছাড়াই সামাজিক প্রচলনে উভয়ের সন্তুষ্টি ও লেনদেনে আগ্রহী প্রমাণ করে এমন প্রক্রিয়া।

৩. ইযআন চুক্তি লিখিত শর্ত ও মূল্যের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারীর একক প্রভাবের সম্ভাবনা ও তার কারণে জনসাধারণের ক্ষতিসাধনযোগ্য ক্ষমতার অপপ্রয়োগের প্রতি লক্ষ করে শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যক হলো, প্রাথমিক পর্যায়ে সব অনুগত চুক্তির শর্তগুলো রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধায়নে করা। (জনসম্মুখে প্রস্তাবের আগেই এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা) শরয়ি দিক থেকে সাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে যেন প্রস্তাবিত শর্তের উপযুক্ততা নির্ণয় করা হয় এবং জনসাধারণের পক্ষে অন্যায্য শর্ত পরিবর্তন বা বাদ দেওয়া হয়।

৪. ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে ইযআন চুক্তি দুভাগে বিভক্ত :

প্রথম : যে চুক্তির প্রস্তাবিত মূল্যটি ন্যায়সঙ্গত এবং তার শর্তের মধ্যে এমন কিছু থাকে না, যাতে জনসাধারণের ওপর জুলুম হয়। এ ধরনের চুক্তিগুলো শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সহিহ এবং উভয় পক্ষের জন্য সেটি বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। শরয়ি দৃষ্টিকোণে কোনো নিষিদ্ধ কারণ না-থাকায় রাষ্ট্র বা আদালতের পক্ষ থেকে কোনো শর্ত বাতিল বা পরিবর্তনে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। কেননা, পণ্য বা সেবা নিয়ন্ত্রক তার অধিকার প্রয়োগ করেছে এবং শরয়ি ন্যায্য মূল্যে ওই পণ্য বা সেবা ক্রয়ে কাউকে বাধা দিচ্ছে না। আর শরয়ি মূল্য হলো তার ন্যায্য মূল্য। (ন্যায্য মূল্যে সামান্য কম-বেশি হলেও সেটি গ্রহণযোগ্য। কারণ, শরিয়তে সেটি ক্ষমাযোগ্য। কেননা, আর্থিক বিনিময় চুক্তিতে এ ধরনের কম-বেশি থেকে বেঁচে থাকা কঠিন এবং জনগণের মধ্যে এ ধরনের কম-বেশি মেনে নেওয়ার প্রচলন থাকায় সেটি ক্ষমাযোগ্য) তা ছাড়া উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত বিনিময়ে অনন্যোপায় ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেন করা সহিহ।

দ্বিতীয় : চুক্তির বিষয়বস্তু জনগণের ওপর জুলুম হবে। কারণ, তার মূল্যটি ন্যায়সঙ্গত নয়। (অর্থাৎ, সেখানে অস্বাভাবিক কম-বেশি করা হয়েছে) অথবা তার শর্তে ক্ষতিকর বিষয় থাকবে। এ ধরনের চুক্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ, জনসম্মুখে প্রস্তাব পেশ করার আগেই সেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকতে হবে। এমন ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করতে হবে, যেটি সেসব পণ্য বা সেবার জন্য নিরুপায় জনসাধারণ থেকে জুলুম ও ক্ষতি দূর করে। ফলে সে
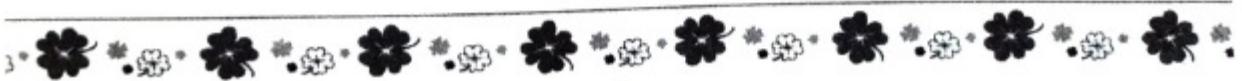
পণ্য বা সেবার মূল্য কমিয়ে ন্যায্য মূল্যে আনতে হবে অথবা এমনভাবে অন্যায় শর্তসমূহ পরিবর্তন বা বাদ দিতে হবে, যেন উভয় পক্ষের মধ্যে সমতা রক্ষা হয়। এভাবে হস্তক্ষেপ করার দলিল নিচে দেওয়া হলো–

ক. শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের ওপর ওয়াজিব হলো, জনসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের অবৈধ মজুতদারি প্রতিহত করা। তারা যখন ন্যায্যমূল্যে জনসাধারণের কাছে পণ্য বিক্রয় করবে না, তখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উভয় পক্ষের অধিকারের প্রতি লক্ষ রেখে মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া জরুরি। জনসাধারণের অধিকার রক্ষার পদ্ধতি হবে, মূল্য নির্ধারণ বা শর্তের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন প্রতিহত করা। মজুতদারের অধিকার রক্ষার পদ্ধতি হবে, তাকে ন্যায্যমূল্য দেওয়া।

খ. জনকল্যাণে ভূমিকা রাখবে এমনভাবে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। সে পদ্ধতিটি হলো, পণ্য বা সেবার প্রতি যাদের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, এমন ব্যক্তিরা ন্যায্যমূল্যে সেগুলো ক্রয় করার মাধ্যমে উপকৃত হবে। বিশেষ উপকারিতা হলো, অস্বাভাবিক কম-বেশি বা অন্যায় শর্ত ছাড়া বিক্রয়ে রাজি নয় এমন জালেম মজুতদারকে সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার উপকারিতা। কারণ, সর্বজনস্বীকৃত ফিকহি মূলনীতি রয়েছে–

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

'বিশেষ উপকারিতা অপেক্ষা ব্যাপক উপকারিতা অগ্রগণ্য।' তা ছাড়া অন্য মূলনীতি হলো– يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام

'ব্যাপক ক্ষতি প্রতিহত করতে বিশেষ ক্ষতি মেনে নেওয়া হয়।'

৫. আমদানির জন্য এজেন্সির ওকালত সমূহের মধ্যে তিন দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে–

প্রথম : এজেন্সিভিত্তিক ওকালত-সম্পর্কিত প্রোডাক্টটি সকলের বা বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু নয়। বরং, সেগুলো এমন পণ্য বা ভোগযোগ্য উপকরণ, যেটি পরিহার করা সম্ভব, অথবা সেটি প্রয়োজনীয় হলেও একমাত্র নয়। কারণ, স্বাভাবিকভাবে বাজারে তার অনুরূপ বা বিকল্প পাওয়া যায়। কেননা, আমদানিকারী উকিলের অধিকার হলো, ক্রেতার সন্তুষ্টি অনুযায়ী যে কোনো মূল্যে সেটি বিক্রয় করবে। এক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে রাষ্ট্র বা আদালতের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। যেহেতু চুক্তি সহিহ হওয়ার মূল মানদণ্ড হলো উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি এবং সে সন্তুষ্টির মানদণ্ড

হলো, উভয় পক্ষ নিজেদের ওপর যেটি আবশ্যক করবে সেই মূল্য। তা ছাড়া কোনো প্রোডাক্টের উকিলকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া এবং মজুতদারি (মজুতদারির আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী) করার সুযোগ দেওয়া শরয়িভাবে জায়েয। সেটি এভাবে যে, জনসাধারণের ওপর জুলুম ও ক্ষতি করা ছাড়া তার মালিকানাধীন পণ্যকে ইচ্ছেমতো বিক্রয় করতে পারবে। এরূপ করলে সেখানে মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া জায়েয নেই।

দ্বিতীয় : এজেন্সি ওকালতভিত্তিক পণ্যটি ব্যাপকভাবে প্রয়োজনীয় অথবা বিকল্পহীন বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু হবে। উকিল ন্যায্যমূল্যে সেটি বিক্রয় করে এবং কোনো ধরনের জুলুম বা অস্বাভাবিক কম-বেশি করে না। এক্ষেত্রেও মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ করা জায়েয নেই। কারণ, তাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া এবং মজুতদারির অধিকার দেওয়া এমন একটি শরয়ি অধিকার, যার মধ্যে কারো প্রতি জুলুম করা হচ্ছে না এবং নিরুপায় জনসাধারণেরও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সেখানে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

তৃতীয় : এজেন্সি ওকালতনির্ভর পণ্যটি জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্পহীন প্রয়োজনীয় বস্তু হবে এবং উকিল অস্বাভাবিক কম-বেশি বা অন্যায় শর্ত ছাড়া সেগুলো বিক্রয় করবে না। এক্ষেত্রে নিরুপায় জনসাধারণ থেকে জুলুম প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে উকিলের ওপর বাধ্যতামূলক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ওয়াজিব। والله تعالى أعلم[৪৯১]

* * *

৪৯১. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, প্রবন্ধঃ ইয়আন চুক্তি, পৃষ্ঠা-৪১৫-৪১৮, সিদ্ধান্ত নং ১৩২ (৬/১৪)।
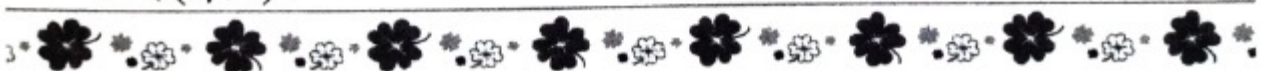
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যেসব ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার সন্তুষ্টি শর্ত নয়

৯৫. যেসব ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার সন্তুষ্টি শর্ত নয়

বিক্রয় সহিহ ও কার্যকর হওয়ার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকা সব মাযহাবেরই একটি মৌলিক নীতি। তবে কিছু ক্ষেত্র এ মৌলনীতির বাইরে রয়েছে। সেগুলোকে নিম্নোক্ত প্রকারে বিভক্ত করা যায় :

১. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাধ্যকরণপূর্বক ক্রয় করা।

২. যুদ্ধ চলাকালীন সেনাপ্রধান কর্তৃক মুসলিমদের প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করা।

৩. রাষ্ট্র কর্তৃক মজুতদারদেরকে মজুতকৃত পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য করা।

৪. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য করা।

৫. শুফআর হকদারের কাছে বিক্রয় করা।

নিচের পরিচ্ছেদগুলোতে এই ব্যতিক্রম মাসআলাগুলোর আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলা বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপনের তৌফিক দিন।

৯৬. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাধ্যকরণপূর্বক ক্রয় করা

জনকল্যাণ বা সাধারণের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ক্রয় জায়েয হওয়ার পক্ষে ইমাম তিরমিযি (রহ.) কর্তৃক হযরত উকবা বিন আমের (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেওয়া হয়। তিনি বলেছেন–

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلاَ هُمْ يُضَيِّفُونَا، وَلاَ هُمْ يُؤَدُّونَ، مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الحَقِّ وَلاَ نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَبَوْا إِلاَّ أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهًا فَخُذُوا

'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা এমন সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করি, যারা আমাদের মেহমানদারি করে না।
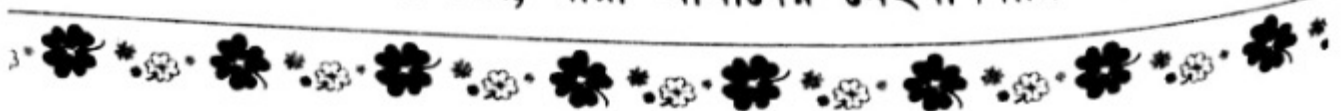
তাদের ওপর আমাদের যে হক রয়েছে সেগুলো আদায় করে না এবং তাদের থেকে আমরা সেগুলো নিই না। এ কথার পর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, জোরপূর্বক নেওয়া ছাড়া যদি দিতে রাজি না-হয়, তা হলে জোরপূর্বক নিয়ে নেবে।'

ইমাম তিরমিযি (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا، هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا.

'এ হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, তারা যুদ্ধে যাওয়ার সময় ওই সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যেত। আর মূল্য দিয়ে ক্রয় করবে এমন কোনো খাবারও পেত না। এমন অবস্থা সম্পর্কে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, জোরপূর্বক নেওয়া ছাড়া তারা যদি বিক্রয় করতে রাজি না হয়, তা হলে জোরপূর্বক নেবে। অনেক হাদিসে অনুরূপ ব্যাখ্যার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনিও অনুরূপ নির্দেশ দিতেন।'[৪৯২]

আল্লামা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

الإجازة لهم أن يأخذوا بالقيمة كرها، وتوجيه الحديث أن الكفار كانوا إذا نزل المسلمون أغلقوا دكاكينهم، وتركوا المبايعة إضرارا بالمسلمين، فلما راى المسلمون ذلك شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يضيفوننا، ولا شكاية في ذلك، لأن الضيافة تبرع وإكرام، وليس حقا ثابتا، إنما الشكوي أنهم لا يؤدون إلينا بحق هو الشراء

---

৪৯২. সুনানে তিরমিযি, অধ্যায়: সিয়ার, পরিচ্ছেদ: আহলে জিম্মার কোন কোন সম্পদ হালাল, হাদিস নং ১৫৮৯, ইমাম তিরমিযি (রহ.) এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, এটি হাসান হাদিস।
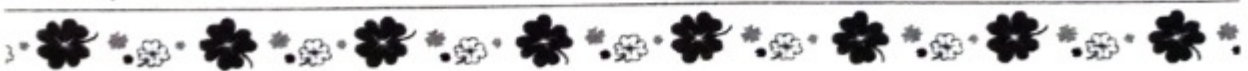
والإيتاء بالقيمة، فكأنهم ذكروا في كلامهم الطرق الثلاث المحتملة للأخذ، وهو الأخذ بالقيمة، أو الأخذ بغير قيمة جبرا منا، أو إكراما منهم، أما الأول: فلأنهم لا يبايعوننا، وأما الثاني: فلأنك يا رسول الله منعتنا أن نأخذ مال الغير بغير حق، وهو المعنى بقولهم "ولا نحن نأخذ منهم"، وأما الثالث: "فلأنهم لا يضيفوننا"

'মুসলিমদের এমন অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যে, মূল্যের বিনিময়ে তাদের থেকে জোরপূর্বক নেবে। হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, মুসলিমরা যখন কাফেরদের এলাকায় যেত, তখন তাদের দোকান বন্ধ করে দিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে লেনদেন করত না। মুসলিমরা এ অবস্থা দেখার পর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অভিযোগ করল যে, তারা আমাদের মেহমানদারি করে না। মূলত এ ব্যাপারে তাদের কোনো অভিযোগ ছিল না। কারণ, মেহমানদারি করা সৌজন্য ও সম্মানমূলক, এটি তাদের প্রাপ্য নয়; বরং অভিযোগ ছিল যে, তারা আমাদেরকে আমাদের হক দেয় না, তথা ন্যায্যমূল্যে লেনদেন করে না। সুতরাং তারা তাদের বক্তব্যে প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়ার সম্ভাব্য তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো, বাজার দরে ক্রয় করা, মূল্য না দিয়ে জোরপূর্বক নেওয়া, অথবা তাদের থেকে সম্মানজনক পদ্ধতিতে নেওয়া। প্রথমটি হলো, তারা আমাদের কাছে বিক্রয় করে না। দ্বিতীয়টি হলো, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তো আমাদেরকে অন্যায়ভাবে নিতে নিষেধ করেছেন। 'আমরা তাদের থেকে নিই না' এ বক্তব্য থেকে এটি বোঝানো হয়েছে। তৃতীয়টি হলো, তারা আমাদের মেহমানদারিও করে না।'[৪৯৩]

এ কারণে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের থেকে জোরপূর্বক ক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন।

কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি (রহ.) এ হাদিস থেকে মাসআলা বের করে

---

৪৯৩. আল-কাওকাবুদ দুররি : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১৯। (ভারতের সাহরানপুর থেকে প্রকাশিত)
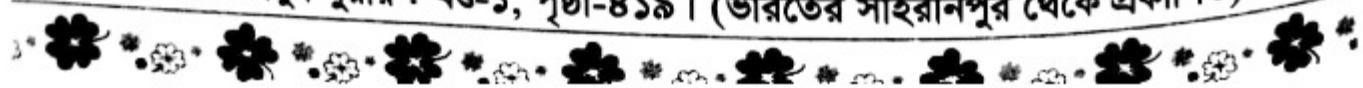
বলেছেন—

وكذالك إذا نزلت بالناس مخمصة وعند بعضهم طعام، لزمهم البيع منهم، فإن أبوا أجبروا عليه.

'অনুরূপভাবে মানুষ যখন চূড়ান্ত ক্ষুধার শিকার হবে এবং তাদের কারো কাছে খাদ্য থাকার পরও সে যদি বিক্রয়ে অস্বীকৃতি জানায়, তা হলে তাকে বিক্রয় করতে বাধ্য করতে হবে।'[৪৯৪]

এ হাদিস ছাড়া বিক্রয়ে বাধ্য করার ব্যাপারে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আর কোনো মৌখিক বা আমলি হাদিস আমরা পাইনি। তবে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, মুসলিম জনসাধারণের অনিবার্য প্রয়োজনে জোরপূর্বক ক্রয় করা জায়েয আছে।

এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিপরীতমুখী দুটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। প্রথম ঘটনাটি হলো, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর শাসনামলে মসজিদে নববি প্রশস্ত করার ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো হযরত উমর ও উসমান (রাযি.)-এর শাসনামলে মসজিদে হারাম প্রশস্ত করার ঘটনা।

প্রথম ঘটনাটি হযরত উমর ও আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযি.)-এর মধ্যকার মতানৈক্যের ঘটনা। ইমাম বাইহাকি (রহ.) ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এখানে সেটি উল্লেখ করা হলো—

لَمَّا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَزِيدَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَقَعَتْ زِيَادَتُهُ عَلَى دَارِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَيُعَوِّضَهُ مِنْهَا فَأَبَى وَقَالَ قَطِيعَةُ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَاخْتَلَفَا فَجَعَلاَ بَيْنَهُمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَتَيَاهُ فِي مَنْزِلِهِ وَكَانَ يُسَمَّي سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَرَ لَهُمَا بِوِسَادَةٍ فَأُلْقِيَتْ لَهُمَا فَجَلَسَا عَلَيْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَكَرَ عُمَرُ مَا أَرَادَ

৪৯৪. আরিযাতুল আহওয়াযি : খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৮৭। (মিশর থেকে প্রকাশিত)
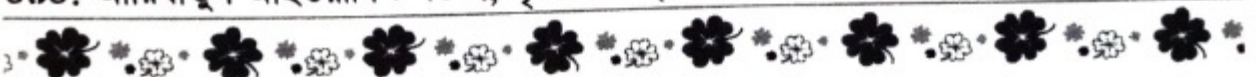
وَذَكَرَ الْعَبَّاسُ قَطِيعَةَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ أُبَيٌّ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ عَبْدَهُ وَنَبِيَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَنْ يَبْنِيَ لَهُ بَيْتًا قَالَ : أَيْ رَبِّ وَأَيْنَ هَذَا الْبَيْتُ قَالَ : حَيْثُ تَرَى الْمَلَكَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فَرَآهُ عَلَى الصَّخْرَةِ وَإِذَا مَا هُنَاكَ يَوْمَئِذٍ أَنْدَرٌ لِغُلَامٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتَاهُ دَاوُدُ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَبْنِيَ هَذَا الْمَكَانَ بَيْتًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ الْفَتَى : آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنِّي بِغَيْرِ رِضَايَ قَالَ : لاَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ فِي يَدِكَ خَزَائِنَ الأَرْضِ فَأَرْضِهِ فَأَتَاهُ دَاوُدَ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ بِرِضَاكَ فَلَكَ بِهَا قِنْطَارٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ يَا دَاوُدُ هِيَ خَيْرٌ أَمِ الْقِنْطَارُ؟ قَالَ : بَلْ هِيَ خَيْرٌ قَالَ فَأَرْضِنِي قَالَ : فَلَكَ بِهَا ثَلَاثُ قَنَاطِيرَ قَالَ : فَلَمْ يَزَلْ يُشَدِّدْ عَلَى دَاوُدَ حَتَّى رَضِيَ مِنْهُ بِتِسْعِ قَنَاطِيرَ قَالَ الْعَبَّاسُ: اللَّهُمَّ لاَ آخُذُ لَهَا ثَوَابًا وَقَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَقَبِلَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُ فَأَدْخَلَهَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم.

وَفِيْ رِوَايَةِ أُخْرَى: فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَلَيْسَ قَدْ قَضَيْتَ لِيْ بِهَا وَصَارَتْ لِيْ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّيْ أَشْهَدُكَ أَنِّيْ قَدْ جَعَلْتُهَا لِله.

'হযরত উমর (রাযি.) যখন মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করতে চাইলেন, তখন হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের বাড়িতে বর্ধিত অংশ পড়ল। তাই উমর (রাযি.) বিনিময় দিয়ে সেটিকে মসজিদে নববির অন্তর্ভুক্ত করে নিতে চাইলেন। হযরত আব্বাস (রাযি.) এ প্রস্তাব অস্বীকার করে বললেন, এটি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রাপ্য অংশ। এ ব্যাপারে উভয়ে মতানৈক্য করার পর হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযি.) কে তাদের সালিশ সিদ্ধান্তদাতা নির্ধারণ করে তার কাছে আসেন। তাকে 'সাইয়েদুল মুসলিমিন' বলা হতো। তিনি তাদের জন্য চাদর বিছানোর নির্দেশ দিলে তাদের জন্য চাদর বিছানো হলো। তার সামনে তারা দুজন বসলেন। এরপর হযরত উমর (রাযি.) তার

ইচ্ছার কথা বললেন। আর হযরত আব্বাস (রাযি.) বললেন, এটি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অংশ। এরপর হযরত উবাই (রাযি.) বললেন, আল্লাহ তাআলা তার বান্দা ও নবি হযরত দাউদ আ. কে আল্লাহর জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের নির্দেশ দিলে তিনি বললেন, হে প্রভু! কোথায় বাড়ি নির্মাণ করব? আল্লাহ তাআলা বললেন, বাদশাহকে যেখানে তলোয়ার ফেলতে দেখবে।' এরপর তিনি দেখলেন যে, সেটি একটি পাথরের ওপর পড়েছে এবং সেটি বনি ইসরাইলের একটি ছেলের জমি। এরপর হযরত দাউদ আ. তার কাছে এসে বললেন, এ জায়গায় মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন ওই ছেলে বলল, আমার সন্তুষ্টি ছাড়াই কি আল্লাহ আপনাকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন? উত্তরে হযরত দাউদ আ. বললেন, না। এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আ.-এর প্রতি ওহি নাযিল করলেন, 'আমি তোমাকে ভূগর্ভের ধনভাণ্ডার দান করেছি, অতএব তুমি তাকে রাজি করিয়ে দাও।' ওহি নাযিলের পর হযরত দাউদ আ. তার কাছে গিয়ে বললেন, তোমাকে রাজি করানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ জমির বিনিময়ে তুমি স্বর্ণের স্তূপ পাবে। এ কথা শুনে সে বলল, আমি কবুল করলাম। এরপর জিজ্ঞেস করল, হে দাউদ! এ জমি উত্তম না কি স্বর্ণের স্তূপ? দাউদ আ. বললেন, জমি উত্তম। এ কথা শুনে সে বলল, তা হলে আমাকে (আরও স্বর্ণ দিয়ে) রাজি করুন। এ কথার পর দাউদ আ. বললেন, এ জমির বিনিময়ে তুমি স্বর্ণের তিনটি স্তূপ পাবে। হযরত উবাই (রাযি.) বললেন, সে ছেলেটি দাউদ আ.-এর সঙ্গে দরদাম করতে করতে নয়টি স্বর্ণের স্তূপের বিনিময়ে রাজি হয়। এ কথা শোনার পর হযরত আব্বাস (রাযি.) বললেন, হায় আল্লাহ! আমি বিনিময় নিবো না, বরং তার বিনিময়ে সাওয়াব নিবো। মুসলিমদের জন্য এটি সদকা করে দিলাম। এরপর হযরত উমর (রাযি.) সেটি কবুল করে মসজিদে নববির অন্তর্ভুক্ত করেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আব্বাস (রহ.) বললেন, আপনি কি সেটিকে আমাকে দিয়ে দেননি এবং সেটি কি আমার নয়? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। হযরত আব্বাস (রাযি.) বললেন,
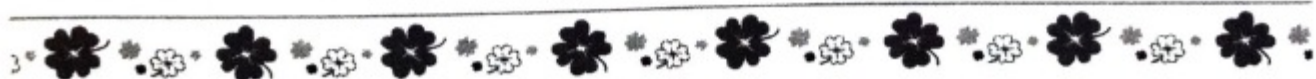
আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, সেটি আল্লাহর জন্য দান করে দিলাম।'[৪৯৫]

হযরত ইবনে সাদ (রহ.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবু জার রাযি. ও অন্য দুজন সাহাবি সম্মিলিতভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারা হযরত দাউদ আ.-এর এ ঘটনাটি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছেন।[৪৯৬]

দ্বিতীয় ঘটনাটি ইমাম আবুল ওয়ালিদ আযরাকি (রহ.) খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে মসজিদে হারাম সম্প্রসারিত করার ঘটনায় এভাবে বর্ণনা করেছেন–

حدثنا أبو الوليد قال : أخبرني جدي، قال : أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال : كان المسجد الحرام ليس عليه جدرات محاطة، إنما كانت الدور محدقة به من كل جانب، غير أن بين الدور أبوابا يدخل منها الناس من كل نواحيه فضاق على الناس، فاشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دورا فهدمها، وهدم على من قرب من المسجد وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن، وتمنع من البيع، فوضعت أثمانها في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد، ثم أحاط عليه جدارا قصيرا، وقال لهم عمر : إنما نزلتم على الكعبة فهو فناؤها، ولم تنزل الكعبة عليكم، ثم كثر الناس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه فوسع المسجد، واشترى من قوم، وأبى آخرون أن يبيعوا، فهدم عليهم فصيحوا به فدعاهم، فقال : إنما جرأكم على حلمي عنكم، فقد فعل بكم عمر هذا فلم يصح به أحد، فاحتذيت على مثاله، فصيحتم بي، ثم أمر بهم إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فتركهم.

'আবুল ওয়ালিদ বলেন আমার দাদা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুসলিম বিন খালেদ ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা

---

৪৯৫. আস-সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকি (রহ.), অধ্যায়: উপহার : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৬৮।

৪৯৬. আত-তবাকাতুল কুবরা, দ্বিতীয় তবাকা, হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রা.-এর জীবনী : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯-২০।
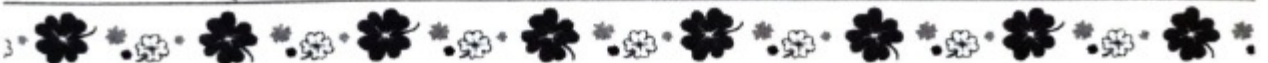
করেছেন। তিনি বলেন, মসজিদে হারামে পরিবেষ্টনকারী কোনো দেয়াল ছিল না, চারদিক থেকে ভাঙা দেয়াল ছিল। তবে দেয়ালের চারপাশে দরজা ছিল, যেগুলো দিয়ে মানুষ প্রবেশ করত। এরপর মসজিদে হারাম মানুষের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তাই হযরত উমর (রাযি.) কিছু বাড়ি ক্রয় করে সেগুলো ও তার পাশে থাকা মসজিদের দেয়াল ভেঙে দিলেন। অনেক বাড়ির মালিক মূল্য নিয়ে বিক্রয় করতে অস্বীকৃতি জানালেন, ফলে তাদের বাড়ির মূল্য কাবার কোষাগারে রেখে দেওয়া হলো এবং পরবর্তীতে তারা সেটি নিয়ে নিল। এরপর সেগুলোর ওপর ছোট দেয়াল দিলে উমর (রাযি.) তাদেরকে বললেন, তোমরা কাবার কাছে এসেছ তাই এগুলো কাবার আঙ্গিনা হবে। কাবা তোমাদের কাছে আসেনি। এরপর হযরত উসমন (রাযি.)-এর যুগে মানুষ বেড়ে গেলে তিনি মসজিদে হারাম প্রশস্ত করলেন এবং বিভিন্ন লোক থেকে জায়গা ক্রয় করে নিলেন। তবে অনেকে বিক্রয় করতে অস্বীকার করলে তাদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হলো এবং তারা চিৎকার করতে লাগলো। তারপর হযরত উসমান (রাযি.) তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের প্রতি আমার ধৈর্যের কারণে তোমাদের এমন সাহস হয়েছে। হযরত উমর (রাযি.) অনুরূপ করেছিলেন; কিন্তু তখন কেউ কোনো আওয়াজ তোলেনি। আমি তার অনুকরণ করেছি আর তোমরা আমার বিপক্ষে আওয়াজ তুলছো! এরপর তাদেরকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ বিন খালেদ বিন উসায়িদ (রহ.) তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করলে তাদেরকে ছেড়ে দেন।'[৪৯৭]

আল্লামা তকিউদ্দিন ফাসি (রহ.) আল্লামা আযরাকি (রহ.) এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেছেন, হিজরি সতেরো সনে হযরত উমর (রাযি.)-এর শাসনামলে প্রশস্ত করা হয়। আর হিজরি ছাব্বিশ সনে হযরত উসমান (রাযি.)-এর শাসনামলে প্রশস্ত করার ঘটনা ঘটে।[৪৯৮]

এখানে যে প্রশ্নটি হয় তা হলো, হযরত উমর (রাযি.) মসজিদে নববি প্রশস্ত

---

৪৯৭. আখবারু মক্কা, আল্লামা আযরাকি (রহ.) : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫। (মাকতাবাতুস সাকাফাতিদ দীনিয়া)

৪৯৮. শিফাউল গারাম বি আখবারিল বালাদিল হারাম, আল্লামা ফাস (রহ.) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৪।
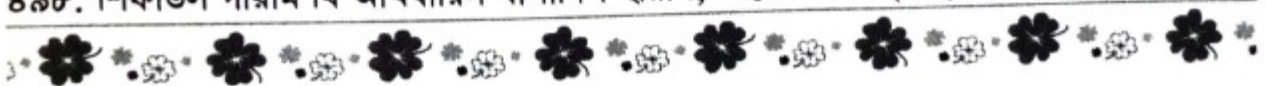
করার ঘটনায় হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযি.)-এর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করেছিলেন। কারণ, তার পক্ষে হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর ওপর বিক্রয় করতে চাপ সৃষ্টি করা জায়েয ছিল না। সুতরাং মসজিদে হারাম প্রশস্ত করার সময় তিনি মানুষদের থেকে কীভাবে জোরপূর্বক বাড়ি ক্রয় করলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, অন্যান্য জমি অপেক্ষা মক্কার জমির একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কেননা, মসজিদে হারাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ

'সেখানকার স্থানীয় ও মুসাফির সবার ক্ষেত্রে সমান।'[৪৯৯]

এ কথার ওপর নির্ভর করে ফুকাহায়ে কেরামের একটি বড় জামাত এ মত পোষণ করেছেন যে, মক্কার জমি কারো মালিকানাধীন হতে পারে না। সুতরাং সেটি ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নেই। এ আয়াতের ওপর আমল করার উদ্দেশ্যে হযরত উমর (রাযি.) মক্কাবাসীকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, হাজিদের বাধা দিতে তাদের বাড়ির দরজা বন্ধ রাখবে না। অপরদিকে হাজিদেরকে এমন অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যে বাড়ি বা জায়গা খালি পাবে সেখানেই অবস্থান করবে।[৫০০]

এ কারণে মসজিদে হারাম প্রশস্ত করার সময় যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের তিনি এ কথার মাধ্যমে জবাব দিয়েছিলেন যে, 'তোমরা কাবার কাছে এসেছো, তাই এগুলো কাবার আঙ্গিনা হবে, কাবা তোমাদের কাছে আসেনি।' ইতঃপূর্বে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং তিনি মনে করতেন যে, মক্কার জমিগুলো কাবার প্রয়োজনে ওয়াকফকৃত। আর এখানে যারা বাড়ি নির্মাণ করেছে, তারা ওয়াকফকৃত জমিতে নির্মাণ করেছে। ফলে ওয়াকফের তত্ত্বধায়ক ওয়াকফের উপকারিতার জন্য যখনই চাইবেন তখনই তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া জায়েয আছে। অতএব, এসব বাড়ির মালিককে যে মূল্য দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল তাদের নির্মিত বাড়ির মূল্য, জমির মূল্য নয়। হযরত উমর (রাযি.)-এর আমলের ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যাটি আমাদের উস্তাদ আল্লামা উসমানি (রহ.)-এর 'ইলাউস সুনান' কিতাবে গ্রহণ করা হয়েছে।[৫০১]

---

৪৯৯. সুরা হজ : আয়াত-২৫।

৫০০. কিতাবুল আমওয়াল, আল্লামা আবু উবায়েদ (রহ.), পৃষ্ঠা-৭২।

৫০১. ইলাউস সুনান : খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২০৩-২০৪।
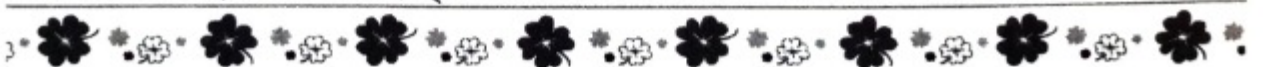
এক্ষেত্রে অন্য একটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সেটি হলো, হযরত উকবা বিন আমের (রাযি.)-এর হাদিসের মাধ্যমে জনসাধারণের অনিবার্য প্রয়োজনের সময় জোরপূর্বক ক্রয় করা জায়েয হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। মসজিদে নববি সম্প্রসারণের সময় হযরত ওমর রাযি. এ ধরনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। অন্য দিকে হযরত আব্বাস (রাযি.) এমন প্রয়োজন অনুভব করেননি, যে প্রয়োজনের কারণে জমির মালিককে বিক্রয় করতে বাধ্য করা যায়। তবে পরে হযরত আব্বাস রাযি. হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযি.) এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন এবং সে সিদ্ধান্তে তিনি সন্তুষ্টও হন। এমনও বলা যেতে পারে যে, হযরত আব্বাস (রাযি.) যদিও মসজিদে নববির প্রয়োজনের বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে শাসকদের পক্ষ থেকে জোরপূর্বক সাধারণ মানুষের সম্পদ ক্রয় করে নেওয়ার ব্যাপারে এটিকে দৃষ্টান্ত বানানোর আশঙ্কা করছিলেন। এ কারণে হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযি.)-এর সিদ্ধান্তের পর বিনিময় ছাড়া মসজিদে নববির জন্য জমি দিতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

মসজিদে হারাম সম্প্রসারণের প্রয়োজনটি এত স্পষ্ট যে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, শুধু আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্যেই মসজিদে হারামের ভিত্তিস্থাপন করা হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম আ. কে বলেছিলেন–

طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

> 'আমার ঘরকে তাওয়াফ, অবস্থান ও রুকু–সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো।'[৫০২]

মসজিদে হারামের সীমানা যদি তাওয়াফ ও অবস্থানকারীদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়, তা হলে তাদের জন্য ভিন্ন মসজিদ নির্মাণ করা অসম্ভব। কেননা, পবিত্র কাবার কোনো বিকল্প নেই।

এ ঘটনা দুটির প্রতি লক্ষ করলে যে ফলাফল বের হয় তা হলো, সাধারণ অবস্থায় জোরপূর্বক বিক্রয় করানো জায়েয নেই। তবে সাধারণ মানুষের অনিবার্য প্রয়োজনের সময় জোরপূর্বক বিক্রয় করানো জায়েয আছে। ফুকাহায়ে কেরাম এ মূলনীতির ওপর আমল করেছেন। আল্লামা হাসকাফি

৫০২. সুরা বাকারা : আয়াত-১২৫।

(রহ.) বলেছেন–

(تؤخذ أرض) ودار وحانوت (بجنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة كرها) درر وعمادية

'মানুষের জন্য মসজিদ সংকীর্ণ হলে বাজারদরে জোরপূর্বক তার আশপাশের বাড়ি ও দোকান ক্রয় করে নেয়া যাবে। দুরার ও ইমাদিয়্যাহ কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত আছে।'[৫০৩]

এ বক্তব্যের নিচে আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন–

لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة، وزادوا في المسجد الحرام، بحر عن الزيلعي، قال في نور العين : ولعل الأخذ كرها ليس في كل مسجد ضاق، بل الظاهر، أن يختص بما لم يكن في البلد مسجد آخر، إذ لو كان فيه مسجد آخر، يمكن دفع الضرورة بالذهاب إليه، نعم فيه حرج، لكن الأخذ كرها أشد حرجا منه، ويؤيد ما ذكرنا فعل الصحابة، إذ لا مسجد في مكة سوى الحرام ا ه.

'যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে, যখন মসজিদে হারামের সীমানা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তখন অনেক জমির মালিককে ন্যায্যমূল্য দিয়ে জোরপূর্বক তাদের থেকে জমি নিয়ে মসজিদে হারামের সীমানা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আল্লামা যাইলায়ি (রহ.) থেকে 'আল-বাহরুর রায়েক' কিতাবে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। 'নুরুল আইন' কিতাবে বলা হয়েছে, প্রত্যেক সংকীর্ণ মসজিদের জন্য জোরপূর্বক জমি নেওয়া যাবে না; বরং ওই এলাকায় অন্য মসজিদ না থাকলেই কেবল জোরপূর্বক জমি নেওয়া যাবে। কেননা, অন্য মসজিদ থাকলে সেখানে গিয়ে ইবাদত করার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তবে হ্যাঁ, অন্য মসজিদে যাওয়ার বিষয়টি কষ্টসাধ্য; কিন্তু জোরপূর্বক নেওয়ার বিষয়টি তার

---

৫০৩. আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৪৯৬।

চেয়ে গুরুতর বিষয়। আমাদের মতের পক্ষে দলিল হলো সাহাবায়ে কেরামের আমল। কারণ, মসজিদে হারাম ছাড়া মক্কায় আর কোনো মসজিদ ছিল না।'[৫০৪]

মালেকি মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ আল্লামা মাওওয়াক (রহ.) বলেছেন–

ويكره الناس السلطان على بيعها إذا احتاج الناس إليها لجامعهم الذي فيه الخطبة، وكذلك الطريق إليها، لا إلى المساجد التي لا خطبة فيها، والطرق التي في القبائل لأقوام.

'জুমআর নামাজ হয় এমন মসজিদের জন্য জায়গার প্রয়োজন হলে শাসক মানুষদেরকে জমি বিক্রয় করতে বাধ্য করতে পারবেন। অনুরূপভাবে জুমআর নামাজ হয় এমন মসজিদের রাস্তার জন্য প্রয়োজন হলেও জমি বিক্রয় করতে বাধ্য করা যাবে। তবে জুমআর নামাজ হয় না, এমন মসজিদ অথবা বিভিন্ন গোত্রের যাতায়াতের রাস্তার জন্য জমি বিক্রয় করতে বাধ্য করা যাবে না।'[৫০৫]

তবে ব্যবসায় সংক্রান্ত অধ্যায়ে তিনি বলেছেন–

قال سحنون : يجبر ذو أرض تلاصق طريقا هدها نهر لا ممر للناس إلا فيها، على بيع طريق منها لهم بثمن يدفعه الإمام من بيت المال.

'ইমাম সুহনুন (রহ.) বলেছেন, যে রাস্তা নদীতে গিয়ে পৌঁছেছে এবং সেটি ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নেই, (এমন রাস্তার জমির প্রয়োজন হলে) তার পাশের জমির মালিককে জমি বিক্রয়ে বাধ্য করা যাবে এবং শাসক বাইতুল মাল থেকে তার মূল্য পরিশোধ করবেন।'[৫০৬]

অনুরূপভাবে হানাফি মাযহাবের ফকিহ কাজি খান (রহ.) বলেছেন, অন্যান্য রাস্তার প্রয়োজন হলেও তার ক্ষেত্রে এ হুকুমটি প্রযোজ্য হবে। তিনি

---

৫০৪. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়ঃ ওয়াকফ, মাতলব, মসজিদের জায়গা রাস্তা বানানো : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৪৯৬-৪৯৭, ফিকরাহ নং ২১৪৯৪।

৫০৫. আত-তাজ ওয়াল ইকলিল, হাত্তাবের টীকায় প্রকাশিত সংস্করণ, অধ্যায়ঃ ওয়াকফ : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪২

৫০৬. আত-তাজ ওয়াল ইকলিল, আল্লামা মাওওয়াক (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫২।
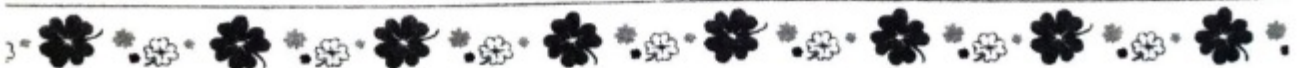
বলেছেন–

وللسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة.

'রাস্তার প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রপ্রধান কারো মালিকানা জমিকে রাস্তা বানাতে পারেন।'[৫০৭]

আল্লামা কারাফি (রহ.) বলেছেন–

قال العبدي : يجبر الإنسان على بيع ماله في سبع مسائل : مجاور المسجد إذا ضاق يجبر من جاوره على البيع والماء للخائف من العطش، فإن تعذر الثمن، أجبر بغير ثمن، ومن انهارت بئر جاره، وعليها زرع، بغير ثمن، وقيل بالثمن، والمحتكر يجبر على بيع طعامه، وجار الطريق إذا أفسدها السيل يؤخذ مكانها بالقيمة من جار الساقية، وصاحب الفران في قرن الجبل، إذا احتاج الناس إليه، ليخلصهم، وصاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان، فإن لم يدفعها له جبر الناس، فإنه يجبر هو دفعا لأعظم الضررين.

'সাতটি মাসআলায় মানুষকে তার সম্পদ বিক্রয় করতে বাধ্য করা যাবে:

১. মসজিদের রাস্তা সংকীর্ণ হলে তার পাশের জমির মালিককে জমি বিক্রয়ে বাধ্য করা যাবে। ২. পিপাসার কারণে জীবননাশের আশঙ্কা হলে পানি বিক্রয় করতে বাধ্য করা যাবে। এমন ক্ষেত্রে যদি মূল্য দেওয়া অসম্ভব হয়, তা হলে মূল্য ছাড়া পানি দিতে বাধ্য করা যাবে। ৩. নদীর পাশে থাকা কূপের পাশের ক্ষেতের জন্য মূল্য ছাড়া পানি দিতে বাধ্য করা যাবে। অন্য মত হলো, মূল্যের বিনিময়ে পানি দিতে বাধ্য করা যাবে। ৪. মজুতদারকে খাবার বিক্রয়ে বাধ্য করা যাবে। ৫. বন্যার কারণে রাস্তা নষ্ট হলে তার পাশের মালিককে রাস্তার জন্য জমি বিক্রয়ে বাধ্য করা যাবে।

---

৫০৭. ফাতাওয়ায়ে কাজিখান, অধ্যায়: যাকাত, পরিচ্ছেদ: পরিত্যক্ত জমি চাষ করা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৬।
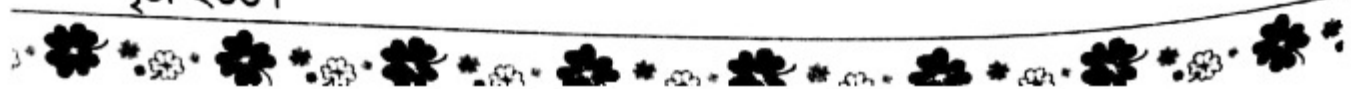
কাছের প্রতিবেশীকে তার বাড়ির মূল্য দিয়ে নিয়ে নেওয়া যাবে। ৬. আশ্রয়ের জন্য মানুষ পাহাড়ে উঠতে চাইলে পাহাড়ের উপত্যকার মালিককে আরোহণের উপকরণ বিক্রয় করতে বাধ্য করা যাবে। ৭. শাসকের ঘোড়া বা দাসীর প্রয়োজন হলে তার মালিককে সেটি বিক্রয় করতে বাধ্য করা যাবে। জনগণ যদি স্বেচ্ছায় সেগুলো না দেয়, তা হলে শাসক তাদেরকে বাধ্য করতে পারবেন। কারণ, বড় সমস্যা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শাসক জনগণকে বাধ্য করার অধিকার রাখেন।'[৫০৮]

উসমানি খেলাফতের সময় রচিত 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়া' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

لدى الحاجة يؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة بامر السلطان، ويلحق بالطريق، ولكن لا يؤخذ من يده ما لم يؤد له الثمن.

'প্রয়োজনের সময় শাসকের নির্দেশে কারো মালিকানাধীন জমি নিয়ে সেটিকে রাস্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে। তবে তাকে মূল্য দেওয়ার আগে তার সম্পদ নেওয়া যাবে না।'[৫০৯]

৯৭. যুদ্ধ চলাকালীন সেনাপ্রধান কর্তৃক মুসলিমদের প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করা

ইতঃপূর্বে হযরত উকবা বিন আমের (রাযি.)-এর হাদিস বর্ণনা করেছি। যেখানে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলিম সেনা প্রধান কর্তৃক সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার জোরপূর্বক ক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। এ হাদিসের ওপর নির্ভর করে খাবার ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এ প্রক্রিয়ায় ক্রয় করাকে ফুকাহায়ে কেরাম জায়েয বলেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) 'আস-সিয়ারুল কাবির' কিতাবে বলেছেন–

وإن أبى أن يعطيه الفرس، ولم يجد الإمام بدا من أن يأخذ الفرس منه، فيدفعه إلى الرسول لضرورة جائت للمسلمين. فلا بأس بأن يإخذه منه كرها.

---

৫০৮. আয-যাখিরাহ, আল্লামা কারাফি (রহ.), অধ্যায়: ওয়াকফ : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩১।

৫০৯. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়া, ধারা নং ১২১৬।

'ঘোড়ার মালিক যদি ঘোড়া দিতে অস্বীকার করে এবং শাসক মুসলিমদের প্রয়োজনে দূতকে ঘোড়া দেওয়ার জন্য তার থেকে ঘোড়া নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় না পায়, তা হলে জোরপূর্বক তার থেকে ঘোড়া ক্রয় করতে পারবে।'

ইমাম সারাখসি (রহ.) এ বক্তব্যের মাধ্যমে তার কারণ দর্শিয়েছেন–

لأنه نصب ناظرا، وعند الضرورة يجوز له أن يأخذ مال الغير بشرط الضمان.

'কেননা, তাকে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার শর্তে প্রয়োজনের সময় তার পক্ষ থেকে অন্যের সম্পদ নেওয়া জায়েয আছে।'[৫১০]

৯৮. রাষ্ট্র কর্তৃক পণ্যদ্রব্য মজুদকারীদের মজুদকৃত পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য করা

ব্যবসায়ীরা জনগণের প্রয়োজনীয় খাবার অন্যায্যভাবে গুদামজাত করে রাখলে সেগুলো বিক্রয়ে বাধ্য করা জায়েয আছে। হানাফি মাযহাবের ফকিহ আল্লামা মাওসিলি (রহ.) বলেছেন–

وإذا رفع إلى القاضي حال المحتكر، بأمره ببيع ما يفضل عن قوته وعياله، فإن امتنع باع عليه، لأنه في مقدار قوته وعياله غير محتكر، ويترك قوتهم على اعتبار السعة، وقيل: إذا رفع إليه أول مرة نهاه عن الاحتكار، فإن رفع إليه ثانيا، حبسه وعزره بما يرى، زجرا له ودفعا للضرر عن الناس، قال محمد: أجبر المحتكرين على بيع ما احتكروا ولا أسعر، ويقال له: بع كما يبيع الناس، وبزيادة يتغابن في مثلها، ولا أتركه يبيع بأكثر...وقد قال أصحابنا: إذا خاف الإمام على أهل مصر الضياع والهلاك، أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم، فإذا وجدوا ردوا مثله، وليس هذا حجرا، إنما هو للضرورة كما في المخمصة.

'বিচারকের কাছে অন্যায্যভাবে পণ্য মজুদাকারীর মামলা উত্থাপিত

---

৫১০. শারহুস সিয়ারিল কাবির, পরিচ্ছেদ: ঘোড়ার জন্য দুই অংশ, উপঅনুচ্ছেদ: অংশের শর্তে ঘোড়া দেওয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৯৪।

হলে তার ও তার পরিবারের খাবার রেখে অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপারে তিনি তাকে নির্দেশ দেবেন। সে যদি বিক্রয় না করে, তা হলে তার পক্ষ থেকে জোরপূর্বক বিক্রয় করে দেওয়া হবে। কারণ, তার ও তার পরিবারের প্রয়োজনীয় খাবারের ক্ষেত্রে সে মজুদকারী হিসাবে সাব্যস্ত নয়। ফলে তার অবস্থা বিবেচনা করে তার প্রয়োজনীয় খাবার রাখা হবে। অন্য একটি মত হলো, প্রথমবার কাজির কাছে এমন ব্যক্তির বিচার দিলে তাকে তিনি জুমতদারি করতে নিষেধ করবেন। দ্বিতীয়বার তাকে বিচারের সম্মুখীন করা হলে তাকে বন্দি করা হবে এবং বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তাকে সতর্ক করা এবং মানুষের সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে এমনটি করা হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেছেন, মজুদদারদেরকে মজুদকৃত পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য করবো, তবে কোনো মূল্য নির্দিষ্ট করবো না। মজুদকারীকে বলা হবে, সাধারণ মানুষের মতো এবং তাদের মধ্যে যে পরিমাণ কম-বেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করে, তুমিও সেভাবে বিক্রয় করো। তবে অধিক কম-বেশি মূল্যে বিক্রয়ের ব্যাপারে আমি তাকে সুযোগ দেবো না। ... আমাদের ইমামগণ বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান যখন দেশবাসীর প্রাণনাশের আশঙ্কা করবে, তখন মজুদদারদের সম্পদ নিয়ে জনগণের মাঝে বণ্টন করে দেবে। পরবর্তী সময়ে অনুরূপ পণ্য পাওয়া গেলে তাদেরকে সেগুলো ফেরত দেবে। এটি তাদের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা নয়; বরং প্রয়োজনের কারণে অনুরূপ করা হবে। যেমনভাবে ক্ষুধার কারণে অনন্যোপায় হওয়ার ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে।'[৫১১]

আল্লামা মারদাবি (রহ.) বলেছেন–

ويجبر المحتكر على بيعه، كما يبيع الناس. فإن أبى وخيف التلف، فرقه الإمام ويردون مثله. قال في الفروع: ويتوجه قيمته. قلت: وهو قوي. وكذا سلاح لحاجة. قاله الشيخ تقي الدين. قلت : وأولى .

'মুজদদারকে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক নিয়মে বিক্রয় করতে

৫১১. আল-ইখতিয়ার লি তালিলিল মুখতার, অধ্যায়: কারাহিয়াত, পরিচ্ছেদ: ইহতিকার করা : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬১।
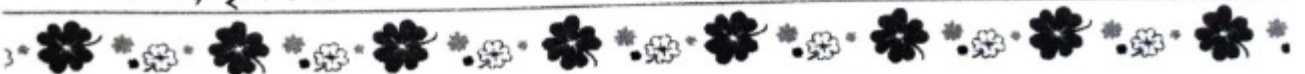
বাধ্য করা হবে। সে যদি এভাবে বিক্রয় করতে অস্বীকার করে এবং যেসব পণ্য ধ্বংসের আশঙ্কা হয়, তা হলে রাষ্ট্রপ্রধান সেগুলোকে মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেবেন এবং মালিককে অনুরূপ পণ্য ফেরত দেবেন। 'ফুরু' কিতাবে বলা হয়েছে, তাকে বাজারদর ফেরত দেওয়া হবে। আমার মতে এটিই শক্তিশালী মত। অস্ত্রের প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ করা হবে। শাইখ তকিউদ্দিন (রহ.) এ কথা বলেছেন। আমার মতে অস্ত্রের বিষয়টি আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত।'[৫১২]

হাফিযুল হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেছেন–

يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع، لما في ذلك من صلاح الناس،

'দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বগতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে এমন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা জায়েয আছে, যা মজুদকারীর প্রয়োজনীয় খাদ্য ছাড়া অবশিষ্ট খাদ্য বিক্রয়ে বাধ্য করে। কারণ, এরূপ করার মধ্যে জনগণের উপকার রয়েছে।'[৫১৩]

শাফেয়ি মাযহাবের আল্লামা শিরওয়ানি (রহ.) বলেছেন–

قال الأذرعي : أجمع العلماء على أن من عنده طعام، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أنه يجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم، وممن نقل الإجماع النووي.

'আল্লামা আযরুয়ি (রহ.) বলেছেন, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত যে, যার কাছে খাবার থাকবে এবং জনগণ খাবারের জন্য অনন্যোপায় হবে এবং অন্য কোনো খাবার পাওয়া যাবে না, এমন ক্ষেত্রে জণগণের সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে তাকে ওই খাবার বিক্রয়ে বাধ্য করা যাবে। এ ব্যাপারে যারা ইজমার কথা বর্ণনা করেছেন, তাদের একজন হলেন ইমাম নববি (রহ.)।'[৫১৪]

---

৫১২. আল-ইনসাফ, আল্লামা মারদাবি (রহ.), বিক্রয়ের শর্তের পরিচ্ছেদের আগে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৯।

৫১৩. ফাতহুল বারি, অধ্যায়: জিহাদ, বাহনে পাথেয় ওঠানোর পরিচ্ছেদের আগে : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩০, ২৯৮২ নম্বর হাদিসের আলোচনায়।

৫১৪. হাওয়াশিশ শিরওয়ানি আলা তুহফাতিল মুহতাজ, পরিচ্ছেদ: নিষিদ্ধ বিক্রয় সম্পর্কে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১৮।
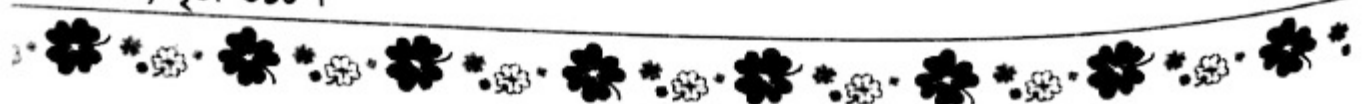
৯৯. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য করা

সমানে 'স্বাধীন ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ' শিরোনামে এ বিষয়টির আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ। স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মূল্য নির্ধারণ করা এবং ব্যবসায়ীদেরকে বাধ্য করা জায়েয নেই। তবে বিশেষ অবস্থায় এমন বাধ্যবাধকতা আরোপ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ এমন মূল্যে তাদের পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য হয়, যে মূল্যে বিক্রয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকে না। কিন্তু উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি থাকার মূলনীতির বিপরীত হওয়ার পরও এ ধরনের বিক্রয় জায়েয হবে। এ সম্পর্কিত শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহু তাআলা।

তবে মালিকের সন্তুষ্টির বাইরে বিক্রয় জায়েয হওয়ার বিষয়টি প্রয়োজনের (জরুরত) সময় জায়েয আছে, অথবা এমন ব্যাপক চাহিদার ক্ষেত্রে জায়েয, যেটি প্রয়োজনের অনুরূপ হয়। প্রয়োজন তথা 'জরুরত'কে ফুকাহায়ে কেরাম এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন–

> بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس، بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يُبيح تناول المحرّم.
>
> 'এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যে, নিষিদ্ধ জিনিসটি না নিলে মারা যাবে বা মারা যাওয়ার উপক্রম হবে। যেমন, খাবার ও পরিধানের জন্য এমন অনন্যোপায় হওয়া যে, ক্ষুধা অবস্থায় থাকলে মারা যাবে অথবা বস্ত্র ছাড়া থাকলে তার অঙ্গহানী হবে। এমন পরিস্থিতিতে নিষিদ্ধ জিনিস ব্যবহার বৈধ হয়ে যায়।'[৫১৫]

ড. ওয়াহবাহ যুহাইলি (হাফিযাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য থেকে 'হাজত' এর সংজ্ঞা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন–

> أن يكون الإنسان في حالة من الجهد والمشقة، التي لا تؤدي إلى الهلاك، إذا لم يتناول المحرّم شرعا.

---

৫১৫. আল-মানসুর ফিল কাওয়াইদ, আল্লামা যারকাশি (রহ.) , খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৯। আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, আল্লামা হামাবি (রহ.)-এর টীকাসহ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫২।
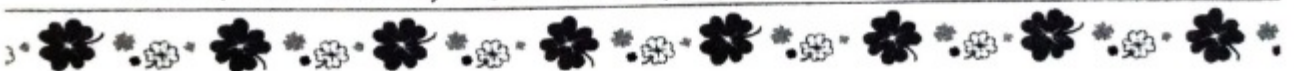
'হাজত হলো, মানুষ এমন কষ্ট ও সমস্যার সম্মুখীন হওয়া যে, শরয়ি হারাম জিনিস ব্যবহার না-করলে সে মারা যাবে না।'[৫১৬]

আল্লামা হামাবি (রহ.) এমন হাজতের হুকুম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

هذا لا يُبيح الحرام، ويُبيح الفطر في الصوم.

'হাজত হারাম জিনিস ব্যবহার বৈধ করে না। তবে রোযা ভাঙা বৈধ করে।'[৫১৭]

কিন্তু এটি হলো একক হাজতের হুকুম। তবে হাজতটি যদি সমষ্টিগত হয়, তা হলে সেটি জরুরতের স্থলাভিষিক্ত হবে। এ কারণে ফুকাহায়ে কেরামের এ উক্তিটি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে–

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس.

'ব্যাপক হাজতটি একক জরুরতের স্থলাভিষিক্ত।'[৫১৮]

এ ব্যাপারে কুরআনুল কারিমের আয়াত, সুন্নতে নববি, সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও ফুকাহায়ে কেরামের মত থেকে বোঝা যায় যে, শরিয়তে ইসলামি চুক্তির ক্ষেত্রে সন্তুষ্টির বিষয়টিকে চূড়ান্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। জরুরত ও ব্যাপক হাজতের কারণে সংকীর্ণতার শিকার হয়ে জোরপূর্বক বিক্রয় করা ছাড়া আর কোনো সমাধান না-পেয়েই সেটিকে জায়েয বলেছে। তারপরও এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে যে, যাকে বিক্রয় করতে বাধ্য করা হচ্ছে, তার পণ্যের বাজারদর পরিশোধ করার পর বা পণ্য নেওয়ার সময় মূল্য পরিশোধ করেই তার পণ্য নেওয়া জায়েয হবে। এ সম্পর্কে 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়া' কিতাবের বক্তব্য ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তাকে মূল্য পরিশোধ করার আগে তার মালিকানাধীন জিনিস নেওয়া জায়েয হবে না।'[৫১৯] অতএব, এ ধরনের মূলনীতি বহির্ভূত মাসআলার ব্যাপারে প্রকৃত হাজতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ সম্পর্কে ড. ফাতহি দুরাইনি যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটি খুবই সুন্দর। তিনি বলেছেন–

---

৫১৬. নাযরিয়্যাতুয যরুরাতিশ শারইয়্যাহ, ড. ওয়াহবাহ আয-যুহাইলি, পৃষ্ঠা-২৪৭। (১৪০২ হিজরি সনে বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

৫১৭. শারহুল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, আল্লামা হামাবি (রহ.) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫২।

৫১৮. আল-মানসুর ফিল কাওয়ায়িদ, আল্লামা যারকাশি (রহ.) , খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪।

৫১৯. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়া, ধারা নং ১২১৬।

يجب أن يلاحظ أن تطبيق أحكام الاحتكار على التجارة والناس في الظروف الاستثنائية يحتاج إلى حذر واحتياط شديدين، إذ ليس العبرة بمعرفة القواعد الاصولية والفقهية في موضوع فحسب، بل بتطبيقها بدقة وخبرة... فمن الذي يقدر أن الحالة قد وصلت بالناس إلى درجة المشقة والحرج الذي يقتضي تطبيق احكام الإحتكار؟... كل ذلك موكل إلى الخُبراء المختصين المؤمنين، إلا كان الظلم ومصادرة حريات الناس في أملاكهم ومقدراتهم دون مبرر شرعي، وهو محرّم.

'এ ব্যাপারে লক্ষ রাখা আবশ্যক যে, মূলনীতি বহির্ভূত ক্ষেত্রসমূহে ব্যবসায়ী ও জনগণের ওপর মজুদদারির বিধি-বিধান প্রয়োগে খুব সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। কারণ, এক্ষেত্রে উসুল ও ফিকহি মূলনীতি জানা মূল বিষয় নয়; বরং দক্ষতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে সেগুলো বাস্তবায়ন করাই মূল বিষয়। ...সুতরাং কে নির্ধারণ করবে যে, মানুষের পরিস্থিতি ও কষ্ট এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যা মজুদদারির বিধি-বিধান প্রয়োগের দাবি রাখে? ... এ বিষয়গুলো নির্ণয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে ইমানদার বিশেষজ্ঞদেরকে। অন্যথায় কোনো ধরনের শরয়ি কারণ ছাড়াই মানুষের প্রতি জুলুম ও তাদের সম্পদ জব্দ করার বিষয়টি চির স্বাধীন হয়ে যাবে। অথচ এগুলোর সবই হারাম।'[৫২০]

১০০. জোরপূর্বক ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ত ও প্রচলিত আইনের পার্থক্য

মানব রচিত অধিকাংশ আইনে রাষ্ট্রের জন্য জোরপূর্বক ক্রয় ও ভাড়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে ইসলামি শরিয়ত অপেক্ষা প্রচলিত আইনে

---

৫২০. আল-মুযাক্কিরাত ফিল ইহতেকার, ড. ফাতহি দুরাইনি , পৃষ্ঠা-১৩৫। ড. আব্দুস সালাম উবাদি 'আল-মুলকিয়াহ ফিশ শরিয়াতিল ইসলামিয়া' দ্বিতীয় প্রকার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪৮-১৪৯-এর টীকায় এমন বর্ণনা করেছেন।

ড. ফাতহি দুরাইনি ইসলামি ফিকহের আলোকে মুজদদারির পূর্ণাঙ্গ বিধি-বিধান আলোচনা করেছেন এবং তাঁর রচিত 'বুহুসুন মুকারানাতুন ফিল ফিকহিল ইসলামি ওয়া উসুলুহু' কিতাবে তা প্রকাশ করেছেন। দামেশকের 'মুআসসাতুর রিসালা' কিতাবটি প্রকাশ করেছে। সেখানকার ১/৪৮৫ নম্বর ধারা দ্রষ্টব্য।

রাষ্ট্রকে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ইসলামি শরিয়ত ও প্রচলিত আইনের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোতে চিহ্নিত করা যায় :

১. ইসলামি শরিয়ত শুধু জরুরত বা ব্যাপক হাজতে (الحاجة العامة) জোরপূর্বক ক্রয় করা জায়েয করেছে। হাজত সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সব উপকরণ বাস্তবায়িত হওয়ার পরই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু প্রচলিত অধিকাংশ আইন যে কোনো হাজতে জোরপূর্বক ক্রয়ের অনুমতি দিয়েছে। হাজতকে ব্যাপক হওয়া বা অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে শর্তযুক্ত করেনি। এমনকি অনেক আইনে রয়েছে, অংশীদারভিত্তিক যে কোনো কোম্পানির প্রয়োজনে জোরপূর্বক জমি ক্রয় করা যাবে।[৫২১] এমন আইন প্রণয়নের সম্ভাব্য উদ্দেশ্য হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অংশীদারভিত্তিক কোম্পানিগুলো এমন বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেগুলো রাষ্ট্রের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, লৌহ ও অন্যান্য শিল্প কারখানা। জোরপূর্বক ক্রয় করা ছাড়া এসব কোম্পানির প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া সহজ নয়। এমন পরিস্থিতিতে জোরপূর্বক ক্রয় বৈধ হতে পারে। তবে আইনে জোরপূর্বক ক্রয়কে কোনো ধরনের শর্তারোপ না-করে যে কোনো ব্যবসায়ী কোম্পানির প্রয়োজনে জোরপূর্বক ক্রয়কে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এ কারণে ধনীদের কল্যাণে সাধারণ মানুষের জমি দখলে এ আইনকে পুঁজি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জোরপূর্বক বিল্ডিং ও বাড়ি ভাড়া নেওয়ার বিষয়েও একটি আইন রয়েছে।[৫২২] অনেকে সরকারি চাকুরিজীবী ও মন্ত্রিদের বসবাসের উদ্দেশ্যে এ আইনকে মূল পুঁজি বানিয়েছে।

২. ইসলামি শরিয়ত অপরিহার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জোরপূর্বক ক্রয়কে এ শর্তে জায়েয বলেছে যে, মালিককে ক্রয়ের দিনের বাজারদর পরিশোধ করতে হবে। আমাদের দেশের প্রচলিত আইনে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেদিন ঘোষণা করা হবে যে, রাষ্ট্র অমুক জমি ক্রয় করতে চাইছে, সে দিনের মূল্য হিসাব করা হয়।[৫২৩] অথচ এ ঘোষণা ও বাস্তবে ক্রয়ের দিনের মধ্যে অনেক প্রক্রিয়া থাকে, অনেক ক্ষেত্রে এ সময়ের মধ্যে জমি

৫২১. The Land Acquisition Act 1894 Sec.4. ব্রিটিশ আইন থেকে এটি গ্রহণ করা হয়েছে। আর এটিই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত।

৫২২. The Requisitioned Land (Continuance of Powers) Ordinance, 1969.

৫২৩. The Land Acquisition Act 1894 Sec. 11.

বা বাড়ির মূল্য বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে রাষ্ট্র কোনো বাড়ি ভাড়া নিতে চাইলে এবং দীর্ঘদিন তার ব্যবহারে থাকার পর ক্রয় করতে চাইলে সে ব্যাপারে অনেক আইনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ভাড়া নেওয়ার দিনের মূল্য অপেক্ষা জোরপূর্বক ক্রয়ের দিনের বাজারদর বেশি হলে মালিক বাজারদর পাবে না; বরং জোরপূর্বক ভাড়া নেওয়ার দিনের বাজারদরের চেয়ে কিছু বেশি দেওয়া হবে। সে মূল্যটি ক্রয়ের দিনের বাজারদর অপেক্ষা অনেক কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৫২৪]

৩. রাষ্ট্রপক্ষ জোরপূর্বক যা ক্রয় করবে তার মালিককে তৎক্ষণাৎ বা তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির মতো (দ্রুত সময়ের মধ্যে) মূল্য পরিশোধ করা ছাড়া সেগুলো ব্যবহার করা জায়েয নেই। মানব রচিত অনেক আইন মূল্য পরিশোধের জন্য এমন দীর্ঘ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেছে, যা খুব দীর্ঘ এবং তাতে আসল মালিককে অনেক কষ্টের শিকার হতে হয়।

১০১. শুফআর হকদারের কাছে বিক্রয় করা

'সন্তুষ্টি ছাড়া লেনদেন সহিহ হবে না'-এ মূলনীতি বহির্ভূত একটি মাসআলা হলো শুফআর মাসআলা। কারণ, বিক্রয়ের মূলনীতি হলো, উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির সঙ্গে যখন আনুষঙ্গিক শর্ত অনুযায়ী চুক্তি সম্পন্ন হবে, তখন অন্য কারো জন্য তাদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা বা এ দাবি করার অধিকার থাকবে না যে, ক্রয়ের ব্যাপারে সে অগ্রাধিকারী। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত এ মূলনীতি থেকে শুফআর বিধি-বিধানকে ভিন্ন রেখে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিক্রেতার অংশীদারের জন্য ক্রয়ের অগ্রাধিকারী সাব্যস্ত করেছে। হানাফি মাযহাবে প্রতিবেশীর জন্যও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি বাইরের কারো কাছে জমি বিক্রয় করে, তা হলে বিক্রেতার অংশীদারের এ দাবি করার অধিকার থাকবে যে, ক্রয়ের ব্যাপারে সে অগ্রাধিকারী। সুতরাং তার দাবিটি যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তা হলে প্রথম ক্রেতা যে মূল্যে ক্রয় করেছে সে ওই মূল্যেই তার কাছ থেকে ক্রয় করবে। এ ব্যাপারে প্রথম ক্রেতা রাজি থাকুক বা না-থাকুক সেটি লক্ষণীয় নয়। এ অধিকারকে শুফআ নামে অভিহিত করা হয়।

হক্কে শুফআ প্রমাণের ক্ষেত্রে মূল দলিল হলো হযরত জাবের (রাযি.)-এর

---

৫২৪. The Reqisitioned Land (Continuance of Powers) Act 1947. Sec. 6 (2).
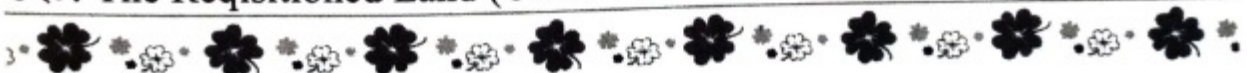
বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস। তিনি বলেছেন–

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ

'জমি বা খেজুর বাগানে যার অংশীদারিত্ব রয়েছে, তার জন্য অংশীদারের অনুমতি ছাড়া সেটি বিক্রয় করা জায়েয নেই। অংশীদার রাজি থাকলে নিজে ক্রয় করবে, আর যদি রাজি না-হয়, তা হলে ক্রয় করবে না।'[৫২৫]

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারি (রহ.) জাবের রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন–

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.

'অবণ্টিত জমির ক্ষেত্রে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুফআর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সুতরাং যখন সীমানা নির্ধারিত হবে, রাস্তা ভিন্ন করা হবে, তখন শুফআ দাবি করা যাবে না।'[৫২৬]

শুফআ অনুমোদনের রহস্য হলো, অনেক সময় অংশীদারি জমিতে ভিন্ন লোকের অনুপ্রবেশের কারণে শরিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা এখানে শুফআর সব বিধি-বিধান আলোচনা করব না। কেননা, ফিকহি কিতাবসমূহ তার জন্য লেনদেনের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছে। তবে বিক্রয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত শুফআর মৌলিক কিছু বিধি-বিধান ও প্রচলিত আইনে যাকে শুফআ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করব। সে পার্থক্যগুলো নিম্নোক্ত পয়েন্টে উল্লেখ করছি :

১. শুধু বাড়ি ও জমির মতো স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেই শুফআ প্রমাণিত। যেমন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস এ বিষয়টি প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন–

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ

---

৫২৫. সহিহ মুসলিম, পরিচ্ছেদ: শুফআ, হাদিস নং ৪০৯৭।

৫২৬. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: শুফআ, হাদিস নং ২২৫৭।

'জমি বা খেজুর বাগানে যার অংশীদারিত্ব রয়েছে।'

ইমাম বাযযার (রহ.) হযরত আবু যুবাইয়ের থেকে জাবের-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ

'জমি ও বাগান ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্রে শুফআ নেই।'[৫২৭]

এটি চার মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মত। তবে ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) ও কিছু আহলে যাওয়াহের এ মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারা সব ধরনের অংশীদারি বস্তুর মধ্যে শুফআর বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন। চায় সেটি স্থাবর সম্পত্তি হোক বা না-হোক। ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) কিছু তাবেয়ি থেকে অনুরূপ মত বর্ণনা করেছেন।[৫২৮]

২. মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব হলো, শুধু পণ্যের অংশীদারের জন্য শুফআর অধিকার রয়েছে। হানাফি মাযহাব হলো, তিন শ্রেণীর জন্য শুফআর অধিকার রয়েছে। ১. পণ্যের অংশীদার। ২. পণ্যের হকের অংশীদার। যেমন : পানির নালা, রাস্তা। ৩. পণ্যের সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিবেশী। প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণীর ওপর অগ্রাধিকার পাবে। দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণীর ওপর অগ্রাধিকার পাবে। হযরত ইবনে সিরিন, ইবনে শুবরুমাহ, সাওরি, ইবনে আবি লাইলা ও আতিরাহ (রহ.) থেকেও এমন মত বর্ণিত আছে।[৫২৯] 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' কিতাবে উভয় পক্ষের বিস্তারিত দলিল আলোচনা করেছি।[৫৩০]

৩. শুফআ যেহেতু কিয়াস বহির্ভূতভাবে প্রমাণিত, তাই শুধু হাদিসে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহের মধ্যেই সেটি সীমাবদ্ধ থাকবে। হাদিসে বর্ণিত ক্ষেত্রের বাইরে সেটি প্রয়োগ করা জায়েয হবে না। এ কারণে বিভিন্ন দেশের

---

৫২৭. আত-তালখিসুল হাবির : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৫, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেছেন, হাদিসটির সনদ জায়্যিদ।

৫২৮. আল-মুহাল্লা, ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৮৬। নাইলুল আওতার, আল্লামা শাওকানি (রহ.), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮১।

৫২৯. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬১। নাইলুল আওতার : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮১।

৫৩০. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১৫-৪১৬।
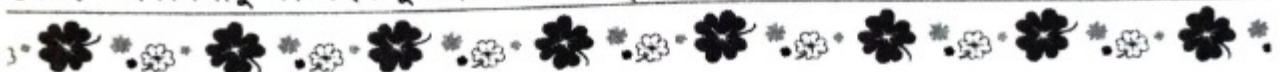
আইনে ভাড়াগ্রহীতা অথবা বর্গাচাষীর জন্য শুফআর বিধান রেখে যে আইন করা হয়েছে, সেটি ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী নয়।[৫৩১]

৪. হানাফি ও হাম্বলি মাযহাব হলো, শুফআর অধিকারটি তৎক্ষণাৎ অধিকার হিসাবে সাব্যস্ত। যার উদ্দেশ্য হলো, শুফআর দাবিদারকে বিক্রয়ের সংবাদ জানামাত্র শুফআর দাবি করতে হবে। বিক্রয়ের সংবাদ জানার পর যদি শুফআর দাবি করতে বিলম্ব করে, তা হলে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। শাফেয়ি মাযহাবেও এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে। শাফেয়ি মাযহাবের দ্বিতীয় মত হলো, বিক্রয়ের সংবাদ জানার পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত শুফআর অধিকার বহাল থাকবে। ইমাম মালেক (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, এক বছর পর্যন্ত শুফআর অধিকার বহাল থাকবে। তার থেকে আরও একটি মত রয়েছে যে, এ পরিমাণ সময় অতীত হওয়ার পর শুফআ বাতিল হবে, যে সময়ে বোঝা যায় সে তার দাবি ছেড়ে দিয়েছে।[৫৩২]

হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, তিনটি দাবির মাধ্যমে শুফআ সাব্যস্ত হবে। একটি হলো, তাৎক্ষণিক দাবি। সেটি হলো, শুফআর দাবিদার বিক্রয় সম্পর্কে জানামাত্র বলবে, আমি শুফআ দাবি করছি। দ্বিতীয়টি হলো, সাক্ষীর মাধ্যমে দাবি করা। সেটি হলো, তার শুফআ দাবি করার ব্যাপারে দুইজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। তৃতীয়টি হলো, মামলার মাধ্যমে দাবি করা। সেটি হলো, কাজির কাছে গিয়ে শুফআর দাবি করবে। হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবে তাৎক্ষণিক দাবিতে বিলম্ব করলে শুফআ বাতিল হবে। এ ব্যাপারে তাদের পক্ষে দলিল হলো হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদিস। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

---

৫৩১. পাকিস্তানের আইনে শরিক ও প্রতিবেশী ছাড়াও অন্যদের জন্য শুফআর আধিকার দিয়ে আইন করার পর উচ্চ আদালতের শরয়ি কাউন্সিলে সেটি পাঠানো হয় এবং আমি তখন সেখানকার বিচারক ছিলাম। শরিয়তে ইসলামির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে আমরা তা বাতিল করেছিলাম। এ ব্যাপারে বিস্তারিত রায় প্রকাশ করা হয়। আমার পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিচারিক সিদ্ধান্তগুলোতে সেটি পাওয়া যাবে। বর্তমানে উর্দুভাষায় 'আদালতি ফয়সালে' নামে সেটি প্রকাশিত হয়েছে, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৩।

৫৩২. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭৭। আল-মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত, ইমাম ইবনে রুশদ (রহ.) : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭০।

اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ.

'শুফআ হলো রশির গিট খোলার মতো।'[৫৩৩]

ফুকাহায়ে কেরাম হাদিসটিকে ইবনে বাইলামানি নামক একজন বর্ণনাকারীর কারণে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। তবে কাজি শুরাইহ[৫৩৪] (রহ.)-এর উক্তির মাধ্যমে হাদিসটি সমর্থিত। তিনি বলেছেন–

إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا.

'একমাত্র তাৎক্ষণিক দাবিদারই শুফআ পাবে।' ইমাম আবদুর রাযযাক (রহ.) তার 'মুসান্নাফ' কিতাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৫৩৫] ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন, তাৎক্ষণিক শুফআ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি ইবনে শুবরুমাহ, বাত্তি, আওযায়ি, আবু হানিফা, আনবারি রহ.-এর মত এবং ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এরও একটি মত।[৫৩৬] ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন, এটি ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর নতুন মত। তিনি বলেছেন, 'নতুন কিতাবসমূহের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, তৎক্ষণাৎ দাবির মাধ্যমে শুফআ প্রাপ্ত হবে।'[৫৩৭] এ মতের প্রতি উপর্যুক্ত উলামায়ে

---

৫৩৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : শুফআ, পরিচ্ছেদ : শুফআর দাবি করা, হাদিস নং ২৫০০।

৫৩৪. **কাজি শুরাইহ :** শুরাইহ ইবনুল হারিস ইবনে কায়েস ইবনুল জাহ্‌ম আবু উমাইয়া আল-কিন্দি (রহ.)। ইসলামের প্রথম শতকের অন্যতম মশহুর বিচারপতি ছিলেন। ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায়ই তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। তবে তিনি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। তাই কোনো-কোনো ইতিহাসবিদ তাঁকে সাহাবি বলে ফেলেন। আবু বকর (রাযি.)-এর শাসনামলে তিনি ইয়েমেন থেকে আগমন করেন। তাঁর উস্তাদগণ: উমর, আলি, আবদুর রাহমান ইবনে আবু বকর (রাযি.) প্রমুখ থেকে তিনি হাদিস শুনেছেন। তাঁর ছাত্রগণ: কায়েস ইবনে আবি হাযেম, আমের আশ-শা'বি, ইবরাহিম আন-নাখায়ি, মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহ.) প্রমুখ। উমর, উসমান ও মুআবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহুম)-এর শাসনামলে তিনি কুফার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সময় তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যহতি চেয়ে নেন। ইয়াহইয়া ইবনে মায়িন (রহ.) বলেছেন, 'হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।' আলি (রাযি.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'তুমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ বিচারক।' কুফায় ৭৮ হিজরি মোতাবেক ৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। (আল-আ'লাম : ৩/১৬১) –সম্পাদক

৫৩৫. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৮৩, হাদিস নং ১৪৪০৬।

৫৩৬. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭৭।

৫৩৭. রাওযাতুত তালিবিন : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৭।
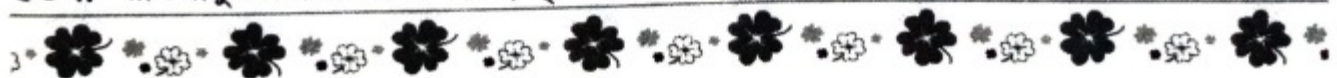
কেরামের একমত হওয়া এটি প্রমাণ করে যে, বর্ণিত হাদিস ও উক্তিটি তাদের কাছে মূলনীতি হিসাবে গৃহীত।

তাৎক্ষণিকভাবে দাবি উত্থাপনের শর্ত করার উদ্দেশ্য হলো, শুফআর দাবিদারের মালিকানা বৃদ্ধি করার জন্য শুফআ বৈধ করা হয়নি; বরং তার ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বৈধ হয়েছে। আর ক্ষতি এমন একটি বিষয়, যাকে নির্দিষ্ট নীতির আওতায় আনা যায় না। তাই শরিয়তের পক্ষ থেকে এটিকে ক্ষতির আলামত নির্ধারণ করা হয়েছে যে, শুফআর দাবিদার অন্যের কাছে বিক্রয় সহ্য করবে না। এটি বোঝা যায় বিক্রয়ের সংবাদ জানামাত্র সেটির প্রতিবাদ করার দ্বারা। কেননা, এটি প্রমাণ করে যে, অন্যের কাছে বিক্রয় করলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৫. শুফআর অধিকার প্রমাণিত হওয়ার পর শুফআর দাবিদার প্রথম ক্রেতা থেকে সেটি ক্রয় করে নেবে। কাজেই প্রথম ক্রেতা শুফআর দাবিদারের ক্ষেত্রে বিক্রেতার ভূমিকা পালন করবে। ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেছেন–

وإذا أخذ الشفيع الدار من المشتري، فعهدته وضمان ماله على المشتري، لأنه يتملك الدار عليه، ويدفع الثمن إليه، فهو في حقه بمنزلة البائع مع المشتري.

'শুফআর দাবিদার যখন ক্রেতা থেকে বাড়ি নেবে, তখন তার সব দায়ভার ও অর্থের জামানত ক্রেতার ওপর বর্তাবে। কারণ, তার কাছ থেকে বাড়ির মালিকানা পেয়েছে এবং তাকে মূল্য পরিশোধ করেছে। সুতরাং অন্যান্য বিক্রেতার মতো সেও বিক্রেতার ভূমিকা পালন করবে।'[৫৩৮]

প্রথম ক্রেতা যদি পণ্যটি কব্জা করে থাকে, তা হলে শুফআর দাবিদার তার থেকে পণ্য নিয়ে তাকে মূল্য পরিশোধ করবে, এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে ইমাম সারাখসি (রহ.) ইবনে আবি লাইলা (রহ.) থেকে ভিন্ন মত বর্ণনা করেছেন। আর প্রথম ক্রেতা যদি পণ্য কব্জা না-করে এবং শুফআর দাবিদার বিক্রেতা থেকে পণ্য নিতে আগ্রহী হয়, তা হলে সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

---

৫৩৮. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.) : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১০১।

হানাফি মাযহাবের যাহেরুর রেওয়ায়াত হলো, শুফআর দাবিদার বিক্রেতা থেকেই নেবে এবং তার সব দায়ভার ও অর্থের জামানত বিক্রেতার ওপর বর্তাবে। কেমন যেন প্রাথমিক অবস্থায়ই সে বিক্রেতা থেকে ক্রয় করেছে। কেননা, শরিয়ত শুফআর অধিকারকে প্রথম ক্রেতার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। অতএব, শুফআর হকদার যখন বিক্রেতা থেকে পণ্য কব্জা করবে, তখন প্রথম ক্রেতার কব্জা করার অধিকারটি রহিত হয়ে যাবে। কব্জা করার আগে পণ্য নষ্ট হয়ে গেলে যেমন চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, তেমনিভাবে এটি প্রথম ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যকার বিক্রয়কেও বাতিল করে দেবে। সুতরাং বিক্রেতা থেকে শুফআর হকদার পণ্য নেওয়াকে তাদের মধ্যকার বিক্রয় সাব্যস্ত করা হবে। তাই তার সব দায়ভার বিক্রেতার ওপর বর্তাবে।[৫৩৯]

ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন, পণ্যটি যদি প্রথম ক্রেতার কব্জায় থাকে, তা হলে শুফআর হকদার তার থেকে নেবে। আর যদি বিক্রেতার কব্জায় থাকে, তা হলে বিক্রেতা থেকে নেবে। তবে মাযহাবের কিয়াসের দাবি হলো, বিক্রেতা থেকে নেওয়া ক্রেতার থেকে নেওয়ার হুকুমে। কারণ, প্রথম বিক্রয়ের হুকুম অনুযায়ী জমিটি ক্রেতার মালিকানাধীন সম্পদ। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) এভাবে তার কারণ দর্শিয়েছেন যে, 'কেননা, জমির ক্ষেত্রে কব্জা করার আগেই চুক্তি আবশ্যক সাব্যস্ত হয় এবং পণ্যটি ক্রেতার মালিকানা ও জিম্মাদারিভুক্ত হয়ে যায়। চুক্তি করামাত্রই ক্রেতার পক্ষ থেকে সেখানে হস্তক্ষেপ করা জায়েয হয়ে যায়। সুতরাং এটা ক্রেতার কব্জা করার মতোই হয়ে গেছে।' তবে তিনি এরপর ইমাম শাফেয়ি (রহ.) থেকে দুইটি কারণের একটি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'শুফআর হকদার বিক্রেতা থেকে নিতে পারবে না। বিচারক ক্রেতাকে কব্জা করতে বাধ্য করবে এবং সে কব্জা করার পর শুফআর হকদার তার থেকে নেবে। কারণ, শুফআর হকদার ক্রেতার মালিকানাধীন একটি অংশ ক্রয় করছে। সুতরাং অন্যের কাছ থেকে সেটি কব্জা করতে পারবে না। এ মূলনীতির ওপর নির্ভর করে তাঁরা এ কথা বলেছেন যে, 'কব্জা করার আগে বিক্রয় সম্পন্ন হয় না।'[৫৪০]

১০২. প্রচলিত আইনে শুফআ

৬. আমাদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো, শুফআর দাবিদারের ক্ষতি প্রতিহত

---

৫৩৯. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.) : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১০১-১০২।

৫৪০. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭৫-৪৭৬।
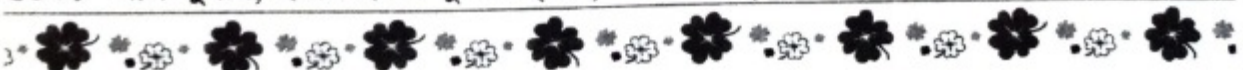
করার উদ্দেশ্যে মূলনীতির বিপরীতে ইসলামি শরিয়ত শুফআর বৈধতা দিয়েছে। শুফআর বৈধতা দেওয়ার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তার দাবিদার শুধু নিজের মালিকানা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সন্তুষ্টচিত্তে দুইজন লেনদেনকারীর মধ্যকার বিক্রয়ের ধারা বন্ধ করে দেবে। প্রচলিত আইনে "Pre-emption" বলে যে শুফআ বোঝানো হয়েছে, তার উদ্দেশ্য শরিয়তে ইসলামির উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। প্রচলিত আইনে "Pre-emption" নামক শুফআকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আইনে পরিত্যক্ত জমি চাষাবাদকারীদেরকে সেগুলো ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাদের আইন অনুযায়ী পরিত্যক্ত জমিকে রাষ্ট্রের মালিকানা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই কেউ সেটি চাষাবাদ করলে শুধু চাষাবাদের কারণে ওই জমির মালিক হবে না। চাষাবাদ করার পরও সেটি রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে এবং রাষ্ট্র সেটি বিক্রয়ের অধিকার রাখবে। এক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়ম হলো, নিলামের মাধ্যমে এগুলো বিক্রয় করা হয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ ধরনের জমি বিক্রয় করতে চাইলে সে সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের আইন রয়েছে যে, নিলাম আহ্বান করার আগেই চাষাবাদকারীর কাছে বিক্রয়ের প্রস্তাব দিতে হবে। চাষাবাদকারীরা যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত মূল্যে ওই জমি ক্রয়ে রাজি হয়, তা হলে তারা সে জমির মালিক হবে। আইন-স্বীকৃত এ অধিকারকে "Pre-emption"[৫৪১] নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় এ আইনকেই শুফআ বলা হয়। তবে বাস্তবতা হলো, ফিকহে ইসলামিতে যেটিকে শুফআ বলা হয়েছে, এটি সেই শুফআ নয়। এটি হলো, অধিকারী জমির প্রতিবেশী বা অংশীদার হওয়া ছাড়াই রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হওয়া।

শরিয়তে ইসলামিতে পরিত্যক্ত জমি রাষ্ট্র বা অন্য কারো মালিকানাধীন নয়; বরং যারা সেটি চাষাবাদ করবে, তারাই সেটির মালিক হবে। শরিয়তে ইসলামি রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্রয় করা ছাড়াই চাষাবাদকারীদেরকে পরিত্যক্ত জমির মালিকানা দিয়েছে। এ অধিকার দেওয়া হয়েছে একটি প্রসিদ্ধ হাদিসের ওপর নির্ভর করে। হাদিসটি হলো–

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

---

৫৪১. The Pre-emption Act of 1841. See also The Shorter Oxford Dictionary on Historical Principles, V. 2, P. 1653.
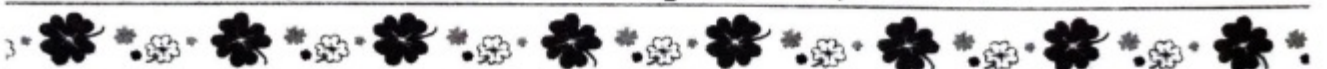
'যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত জমি চাষ করবে, সে ওই জমির মালিক হবে।'[৫৪২]

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ মূলনীতিটি রাষ্ট্রের পতিত জমি চাষাবাদযোগ্য করার জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী এবং ন্যায়সঙ্গত। কেননা, উপর্যুক্ত (মানব রচিত) আইন পরিত্যক্ত জমির মালিক হওয়ার আগে দুইবার তাদের অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করতে বাধ্য করেছে। প্রথম বিনিয়োগ হলো, সেটি চাষ করার সময়। দ্বিতীয় বিনিয়োগ হলো, রাষ্ট্রের কাছ থেকে সেটি ক্রয়ের সময়।

এ ব্যাপারে ব্রিটিশ জাতীয় আইনে (Common Law) ভিন্ন একটি পরিভাষা রয়েছে, যাকে "Pre-emption" বলা হয়। এ আইনটি হলো, রাষ্ট্রপ্রধান তার পারিবারিক প্রয়োজনে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রেতা থেকে ক্রয় করতে পারবেন এবং অন্য ক্রেতা অপেক্ষা তার অগ্রাধিকার থাকবে।[৫৪৩]

অনেক রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক আইন ভিন্ন দেশে রপ্তানি করতে ইচ্ছুক ক্রেতাদের বিপরীতে রাষ্ট্রকে শুফআর অধিকার "Pre-emption" দিয়েছে। সুতরাং এ আইনে সে পণ্যকে ওই দেশের জনগণের কাছে বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয়েছে।[৫৪৪]

শুফআর আধুনিক পরিভাষা হলো, ব্রিটিশ আইন কর্তৃক অংশীদারি কোম্পানিকে প্রদেয় অধিকার। সেটি হলো, কোম্পানি যদি নতুন শেয়ার ইস্যু অথবা ট্রেজারি শেয়ার (Treasury Shares) বিক্রয় করতে চায়, তা হলে আইন অনুযায়ী প্রথমে পুরাতন শেয়ার হোল্ডারদের কাছে প্রস্তাব করতে হবে। নতুন শেয়ার নেওয়া বা ট্রেজারি শেয়ার (Treasury Shares) ক্রয়ের ক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার পাবে।[৫৪৫]

ফিকহে ইসলামি অনুযায়ী এটি শুফআর অধিকার নয়। কারণ, এটি যদি শেয়ার হোল্ডারদেরকে একে অন্যের শরিক মেনে নেওয়া হয়, তা হলে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রত্যেকটি শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ অধিকার দেওয়া আবশ্যক হবে। যদিও সেটি এককভাবে বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রত্যেক শেয়ার

---

৫৪২. সুনানে তিরমিযি, অধ্যায়: আহকাম, পরিচ্ছেদ নং ৩৮, হাদিস নং ১৩৭৮। ইমাম তিরমিযি (রহ.) বলেছেন, এটি হাসান গরিব হাদিস।

৫৪৩. Corpus Juris Secondum, V. LXXII, P. 478, and Black's Law Dictionary, P.1060.

৫৪৪. Black's Law Dictionary, P. 1060, `Pre-emption'

৫৪৫. Companies Act 2006, Section 561.

বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আইন এমন অধিকার দেয় না। শুধু নতুন শেয়ার ইস্যু বা কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা হওয়া হিসাবে তার মালিকানাধীন ট্রেজারি শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই এ অধিকার দিয়ে থাকে।

১০৩. শেয়ারে শুফআর হক সাব্যস্ত হওয়া

প্রশ্ন : এ ক্ষেত্রে শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুফআর হক থাকবে কি না?

উত্তর: সমকালীন উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেয়ারকে যদি কোম্পানির সম্পত্তির (Asset) অংশবিশেষ সাব্যস্ত করা হয়, তা হলে সে সম্পদ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের সমষ্টিতে রয়েছে। অনেক সময় স্থাবর সম্পদ অপেক্ষা অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মতানুযায়ী তার মধ্যে শুফআর অধিকার থাকবে না। মালেকি মাযহাবের অনেক ফকিহ বলেছেন, যদি এমন জমি বিক্রয় করা হয়, যার মধ্যে দাস-দাসী, চাক্কি, কূপ ও তার সরঞ্জাম ইত্যাদি থাকে, তা হলে ইমাম সুহনুন (রহ.)-এর এক মতানুযায়ী এগুলোর মধ্যেই শুফআ জারি হবে। তার অন্য মত হলো, এগুলোর মধ্যে শুফআ জারি হবে না।[৫৪৬] তবে যারা শুফআ জায়েযের পক্ষে মত দিয়েছে, তারা এ কারণে জায়েয বলেছে যে, দাস-দাসী, চাক্কি ও অন্যান্য জিনিস জমির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে আসল উদ্দেশ্য হলো, জমি বিক্রয় করা। শেয়ারের ক্ষেত্রে এমনটি বলা যায় না। কারণ, কোম্পানির বিভিন্ন ধরনের সম্পদ থাকে এবং সব সময় তার অস্থাবর সম্পদ স্থাবর সম্পদের অনুগামী হয় না।

তবে ব্যবসায়ী মহলে এমন প্রচলন রয়েছে যে, অতিমূল্যবান বস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ব্যবসার জায়গা অথবা শেয়ার বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার ওপর এ শর্তারোপ করে যে, সে যদি পরবর্তী সময়ে বিক্রয় করতে চায়, তা হলে জনসাধারণের কাছে প্রস্তাব করার আগে বিক্রেতার কাছে প্রস্তাব করবে। শর্তকৃত এ অধিকারকে 'অপ্রত্যাখ্যাত অগ্রাধিকার' (The right of first refusal) নামে নামকরণ করা হয়। সুতরাং প্রশ্ন হলো, এ ধরনের শর্ত করা জায়েয কি না? ফিকহি মূলনীতি থেকে বোঝা যায় যে, এটি বিক্রয়চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক শর্ত, তাই বিক্রয়ের মধ্যে এ ধরনের শর্ত করা

৫৪৬. আল-মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭৯। আয-যাখিরাহ, ইমাম কারাফি (রহ.) : খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩০০। আল-কাফি, ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.), পৃষ্ঠা-৪৩৭।

জায়েয নেই। এমনকি হাম্বলি মাযহাবের যেসব ফকিহ বিক্রয়ে একটি শর্তারোপ করা জায়েয বলেছেন, তাঁদের কাছেও এমন শর্ত জায়েয নেই। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন–

وإن شرط في المبيع : إن هو باعه، فالبائع أحق به بالثمن، فروى المروذي عنه (أي : عن الإمام أحمد) أنه قال : في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم : لا شرطان في بيع، يعني : أنه فاسد، لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يعطيه إياه بالثمن الأول، فهما شرطان في بيع، نهي عنهما، ولأنه ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره، إذا أعطاه ثمنه، فهو كما لو شرط أن لا يبيعه، إلا من فلان أو أن لا يبيعه أصلا، وروى عنه إسماعيل بن سعيد البيع جائز ... ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في رواية المروذي على فساد الشرط، وفي رواية إسماعيل بن سعيد على جواز البيع، فيكون البيع صحيحا والشرط فاسدا.

'বিক্রয়ের মধ্যে যদি এমন শর্তারোপ করে যে, ক্রেতা সেটি বিক্রয় করলে বিক্রেতা পূর্বের মূল্যে ক্রয়ে অগ্রাধিকারী হবে। আল্লামা মাররুযি (রহ.) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'বিক্রয়ের মধ্যে দুটি শর্ত করা বৈধ নয়'-রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ হাদিসের আলোচনায় ইমাম আহমাদ (রহ.) উক্ত মাসআলার আলোচনায় বলেছেন। অর্থাৎ, বিক্রয় ফাসেদ হবে। কেননা, সে এ শর্ত করেছে যে, তার কাছে বিক্রয় করবে এবং পূর্বের মূল্যে বিক্রয় করবে। সুতরাং বিক্রয়ের মধ্যে দুটি শর্ত করা হলো এবং এমন শর্তারোপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তা ছাড়া এটি বিক্রয়চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ, বিক্রেতা এ শর্ত করেছে যে, সে মূল্য দিতে পারলে অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারবে না। অতএব, এটি সে শর্তের মতো, যেখানে শর্ত করে যে, অমুক ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারবে না, অথবা কারো কাছেই বিক্রয় করতে পারবে না। ইমাম আহমাদ (রহ.) হতে ইসমাইল বিন সাইদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, বিক্রয়টি জায়েয হবে। ... আল্লামা মাররুযি (রহ.)-এর বর্ণনা

> অনুযায়ী ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মতকে শর্ত ফাসেদ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর ইসমাইল বিন সাইদ (রহ.)-এর বর্ণনাকে প্রয়োগ করা হবে জায়েযের ক্ষেত্রে, তা হলে বিক্রয় সহিহ হবে এবং শর্তটি ফাসেদ হবে।'[৫৪৭]

হানাফি ও মালেকি মাযহাবের মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরাম 'বাইয়ে ওয়াফা' সম্পর্কে যে মত পোষণ করেছেন যে, মূল চুক্তির মধ্যে যদি 'বাইয়ে ওয়াফা'র শর্তারোপ না-করে শর্তহীন বিক্রয়চুক্তি করে। এরপর ভিন্নভাবে বিক্রেতাকে শর্ত দেয় যে, বিক্রেতা মূল্য নিয়ে এলে ক্রেতা তার পণ্য ফেরত দেবে। 'বাইয়ে ওয়াফা'র আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অনুরূপভাবে এখানে যদি শর্তহীন বিক্রয় করার পর ক্রেতা এমন ওয়াদা করে যে, সে ওই পণ্যটি বিক্রয় করতে চাইলে প্রথমে বিক্রেতার কাছে প্রস্তাব করবে, তা হলে এমন পদ্ধতিতে নিষিদ্ধ কোনো কারণ না-থাকার বিষয়টি স্পষ্ট। والله تعالى أعلم

* * *

---

৫৪৭. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), পরিচ্ছেদঃ গাছ ও ফল বিক্রয় করা : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১২-২১৩।

তৃতীয় অধ্যায়

বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য পণ্য ও মূল্য সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং উভয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শর্তাবলি

- বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য পণ্যের ওপর আরোপিত শর্তাবলি
- বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য মূল্যের ওপর আরোপিত শর্তাবলি
- মূল্য পরিশোধের বিভিন্ন পদ্ধতি
- মুদ্রা নির্দিষ্ট করার বিধি-বিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য পণ্যের ওপর আরোপিত শর্তাবলি সম্পর্কে

১০৪. বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য পণ্যের ওপর আরোপিত শর্তসমূহ

আমরা প্রথমে পণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ আলোচনা করব। সেসব শর্তের কিছু হলো, চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার শর্ত এবং কিছু হলো চুক্তি সহিহ হওয়ার শর্ত। যার উদ্দেশ্য হলো, এসব শর্তের কোনো একটি না-থাকলে হানাফি মাযহাব অনুযায়ী ফাসেদ অবস্থায় বিক্রয় সংঘটিত হবে। স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে ফাসেদ বিক্রয়ের বিধি-বিধান আলোচনার মতো প্রত্যেক শর্ত সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ।

১০৫. প্রথম শর্ত : পণ্য "মাল" হওয়া

প্রথম শর্ত : পণ্যটি ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় 'মাল' হওয়া। এটি বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার শর্ত। সুতরাং মাল নয় এমন জিনিসের বিক্রয় সংঘটিত হবে না; বরং বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। এটি ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। তবে মালের সংজ্ঞার ব্যাপারে তাদের বিভিন্ন বক্তব্যে রয়েছে। তাঁদের অনেকে মালকে মূল্যবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে উপকারিতা ও নিরেট স্বত্বকে মাল থেকে বাদ দিয়েছেন। হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে এমনটি বোঝা যায়। আল্লামা হাসকাফি (রহ.) 'মুলতাকাল আবহুর' কিতাবের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

المراد بالمال عين يجري فيه التنافس والابتذال.

> 'মাল' বলতে উদ্দেশ্য হলো, এমন বস্তু যার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সেটি ব্যবহার করা যায়।'[৫৪৮]

ইতঃপূর্বে বিক্রয়ের সংজ্ঞায় বলেছি, মালের সংজ্ঞায় সেটি বস্তু হওয়ার এ বক্তব্যটি যদিও অন্য কোথাও এত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না; কিন্তু হানাফি

---

৫৪৮. আদ-দুররুল মুনতাকা, মাজমাউল আনহুর কিতাবের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪।
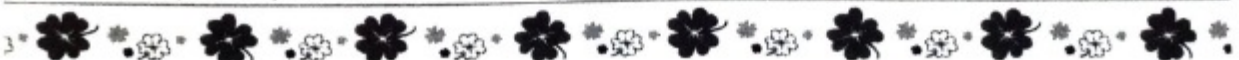
মাযহাবের মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরামদের বক্তব্য এবং সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায়, মালের সংজ্ঞায় বস্তু হওয়ার বিষয়টি তাদের কাছে বিবেচ্য। এ বিষয়টি লক্ষ করে শাইখ মুস্তাফা আয-যারকা (রহ.) এভাবে মালের সংজ্ঞা দিয়েছেন–

هو كل عين ذات قيمة مادّية بين الناس.

'মাল হলো, মানুষের কাছে সত্তাগতভাবে মূল্যবিশিষ্ট হিসাবে স্বীকৃত বস্তু।'[৫৪৯]

শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এমনভাবে মালের সংজ্ঞা দিয়েছেন, যা বস্তু ও স্থায়ী উপকারিতা অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি (রহ.) বিক্রয়ের সংজ্ঞায় বলেছেন–

عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة،

'বিক্রয় হলো, কোনো বস্তুর মালিকানা বা স্থায়ী উপকারিতা সাব্যস্ত করণের জন্য ভবিষ্যৎ শর্ত অনুযায়ী মালকে মালের সঙ্গে বিনিময় চুক্তি করা।'[৫৫০]

আল্লামা শাতেরি (রহ.) বলেছেন–

البيع لغة : مقابلة شيء بشيء، وشرعا : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد، كما في بيع حق الممر، ووضع الأخشاب على الجدار، وحق البناء على السطح

'বিক্রয়ের আভিধানিক অর্থ হলো, বস্তুর সঙ্গে বস্তু বিনিময় করা। পারিভাষিক অর্থ হলো, এমন একটি আর্থিক বিনিময়চুক্তি, যা কোনো বস্তুর মালিকানা বা স্থায়ী উপকারিতার মালিকানা সাব্যস্ত করে। যেমন, চলাচলের রাস্তা বিক্রয় করা, দেয়ালের ওপর ঘরের কড়িকাঠ রাখার স্বত্ব বিক্রয় করা, ছাদের ওপর কামরা তৈরির স্বত্ব বিক্রয় করা।'[৫৫১]

---

৫৪৯. আল-মাদখালুল ফিকহিল আম : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১১৮।

৫৫০. তোহফাতুল মুহতাজ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৫।

৫৫১. আল-ইয়াকুতুন নাফিস ফি মাযহাবি ইবনে ইদরিস, পৃষ্ঠা-৭৪।

আল্লামা বুহুতি (রহ.) বিক্রয়ের সংজ্ঞায় বলেছেন–

> مبادلة عين مالية ... أو منفعة مباحة مطلقا، بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر كممر دار أو بقعة تحفر بئرا، بأحدهما، أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا ... فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب أو بممر في دار، أو بيع نحو ممر في دار بكتاب، أو ممر في دار أخرى.
>
> 'বিক্রয় বলা হয় মূল্যবিশিষ্ট বস্তু ...অথবা সাধারণ বৈধ উপকারিতার বিনিময়কে। সেটি এভাবে যে, তার বৈধতা বিশেষ কোনো অবস্থার সঙ্গে নির্দিষ্ট হবে না– যেমন, বাড়ির রাস্তা অথবা কূপ খননযোগ্য জমি– কোনো একটিকে অন্যটির সঙ্গে বিনিময় করা। অর্থাৎ, মূল্যবিশিষ্ট বস্তু অথবা সাধারণ উপকারিতার কোনো একটিকে অন্যটির সঙ্গে বিনিময় করা। সুতরাং এ সংজ্ঞাটি কিতাবের বিনিময়ে কিতাব, কিতাবের বিনিময়ে বাড়ির রাস্তা, রাস্তার বিনিময়ে কিতাব, অথবা এক বাড়ির রাস্তার বিনিময়ে অন্য বাড়ির রাস্তা বিক্রয়ের মাসআলাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।'[৫৫২]

মালেকি মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, তাদের একাধিক কিতাবে যদিও বিক্রয়ের সংজ্ঞা থেকে উপকারিতাকে বাদ দেওয়া হয়েছে;[৫৫৩] তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, উপকারিতা বলতে তাদের উদ্দেশ্য হলো অস্থায়ী উপকারিতা। কারণ, তারা উপরে বা ছাদে কামরা নির্মাণের স্বত্ব, দেয়ালের ওপর কড়িকাঠ রাখার স্বত্ব ও পানি নেওয়ার স্বত্ব বিক্রয় জায়েয বলেছেন।[৫৫৪] এখান থেকে বোঝা যায়, তাদের কাছে স্থায়ী উপকারিতাও সেসব মালের আওতাভুক্ত, যেগুলো বিক্রয় করা জায়েয আছে।

* * *

---

৫৫২. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪০।

৫৫৩. দেখুন : আদ-দুসুকি আলা শারহি মুখাতাসারি খলিল : ৩/২; মাওয়াহিবুল জালিল লিল হাত্তাব : ৪/২২৫; মিনাহুল জালিল, মুহাম্মাদ উলাইশ : ২/৪৬০।

৫৫৪. দুসুকি : ৩/১৪; মাওয়াহিবুল জালিল : ৪/২৭৬; আত-তাজ ওয়াল ইকলিল লিল মাওওয়াক : ৪/২৭৫।
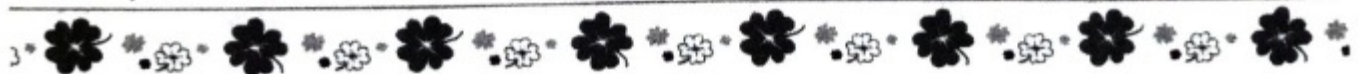
স্বত্ব বিক্রয়ের বিধি-বিধান

১০৬. স্বত্ব বিক্রয় করা

হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বিক্রয় জায়েয হওয়ার জন্য যদিও পণ্যটি বস্তু হওয়ার শর্তারোপ করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, নিরেট স্বত্ব (اَلْحُقُوْقُ الْمُجَرَّدَة) বিক্রয় করা জায়েয নেই। তবে এ মাসআলা থেকে এমন কিছু স্বত্বকে ভিন্ন রেখেছেন, যেগুলো বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, হানাফি মাযহাবের ফতোয়াযোগ্য মতানুযায়ী (قول مفتى به) চলাচলের স্বত্ব বিক্রয় করা জায়েয।[৫৫৫] বিভিন্ন মাসআলায় হানাফি মাযহাবের উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, স্বত্ব বিক্রয় না-জায়েযের বিষয়টি ব্যাপক নয়। 'নিরেট স্বত্ব বিক্রয়' (بَيْعُ الْحُقُوْق) নামক আমার একটি পুস্তিকাতে এ মাসআলাটি তাহকিক করেছি এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

ফুকাহায়ে কেরাম যেসব স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েয বলেছেন, সেগুলো অনুসন্ধান করে জানা যায়, এ ধরনের স্বত্ব দুইভাগে বিভক্ত :

১০৭. শরয়ি স্বত্ব (اَلْحُقُوْقُ الشَّرْعِيَّة)

শরয়ি স্বত্ব হচ্ছে এমন স্বত্ব, যেগুলোর বৈধতা শরিয়তের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হয়েছে এবং যেখানে কিয়াসের কোনো ভূমিকা নেই। অর্থাৎ, শরিয়তের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমেই তার অধিকারীর জন্য সেগুলোর মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। শরয়ি বক্তব্য না-থাকলে সেগুলো তার জন্য বৈধ হতো না। যেমন, শুফআর হক, দাসত্বজনিত হক, মিরাস, বংশীয় হক, কিসাসের হক, স্ত্রী সম্ভোগের হক, তালাকের হক, বাচ্চা পালনের হক, অভিভাবকত্বের হক ও একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রত্যেকের জন্য স্বামীকে কাছে পাওয়ার হক। এ ধরনের স্বত্ব আবার দুইভাগে বিভক্ত :

১. এমন স্বত্ব, যেগুলো সত্তাগতভাবে বৈধ নয়; বরং তার অধিকারী থেকে ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শরিয়ত বৈধ করেছে। এ ধরনের স্বত্বকে 'হুকুকে জরুরিয়্যাহ' নামে নামকরণ করা যায়।

---

৫৫৫. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬৪০, ফিকরাহ নং ২৩৫১০।

২. এমন স্বত্ব, যেগুলো তার অধিকারীর জন্য সত্তাগতভাবে বৈধ। শুধু ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য বৈধ নয়। এ স্বত্বকে আমরা 'হুকুকে আসলিয়্যাহ' নামে নামকরণ করতে পারি।

'হুকুকে জরুরিয়্যাহ'-এর উদাহরণ হলো, হক্কে শুফআ। এটি সত্তাগতভাবে তার অধিকারীর জন্য বৈধ নয়। কেননা, মূলনীতি হলো, ক্রেতা-বিক্রেতা যখন সন্তুষ্টচিত্তে লেনদেন করবে, তখন তৃতীয় কারো জন্য সেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না। কিন্তু শরিয়ত কর্তৃক শরিক, পণ্যের উপকারিতায় অংশীদার, (এবং হানাফি মাযহাব অনুযায়ী প্রতিবেশীর) থেকে ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তাদের জন্য শুফআ বৈধ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট সময় পর স্বামীকে কাছে পাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে তার ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। অন্যথায় এ ব্যাপারে স্বামীর স্বাধীনতা রয়েছে যে, তার ইচ্ছেমতো যে কোনো স্ত্রীকে সম্ভোগ করবে এবং যে কোনো সময় তার কাছে রাত্রি যাপন করবে। সন্তান প্রতিপালন, এতিমের অভিভাবকত্ব ও তালাকের অনুমতিপ্রাপ্ত (اَلْمُخَيَّرَةُ) স্ত্রীর স্বাধীনতাও এ ধরনের স্বত্বের আওতাভুক্ত। এ ধরনের স্বত্বের হুকুম হলো, বিক্রয়, সমঝোতা ও পদ ছেড়ে দেওয়ার কোনো পদ্ধতিতেই এগুলোর বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। এক্ষেত্রে যৌক্তিক দলিল হলো, এ স্বত্বগুলো সত্তাগতভাবে তার অধিকারীর জন্য বৈধ হয়নি; বরং তার ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এগুলোকে বৈধ করা হয়েছে। সুতরাং সে যদি অন্যকে সেই অধিকার দিতে রাজি হয় অথবা অন্যের জন্য পদ ছেড়ে দেয়, তা হলে বোঝা গেল, এ স্বত্বটি না-থাকলেও তার কোনো ক্ষতি হবে না। অতএব, বিষয়টি আসল হুকুমের দিকে ফিরে যাবে এবং সেটি হলো, তার জন্য এমন স্বত্ব বৈধ না-হওয়া। সুতরাং এ ধরনের স্বত্বের অধিকারীর জন্য তার বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। যেমন, শুফআ। শুফআর হকদার যখন তার দাবি ছেড়ে দেবে, তখন বোঝা গেল সেটি বিক্রয় করলে তার কোনো ক্ষতি হবে না। তার জন্য স্বত্বটি বৈধ করার ক্ষেত্রে এটি মূল কারণ ছিল। অতএব, আগের বিক্রয় বাতিল করার ব্যাপারে তার অধিকারটি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তখন তার বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে না।

একইভাবে স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট সময় পর স্বামীকে কাছে পাওয়ার অধিকারটিও তাকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে বৈধ করা হয়েছে। সে যখন তার দাবি থেকে সরে আসছে তখন বোঝা গেল, এ অধিকার না-থাকলেও তার কোনো ক্ষতি নেই।
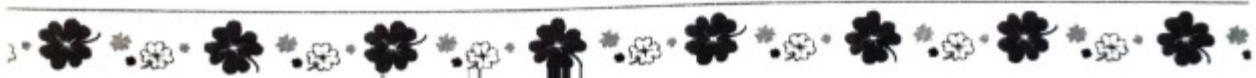
তাই এভাবে দাবি ছেড়ে দেওয়ার বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। স্বামীর পক্ষ থেকে 'তুমি তালাক নেওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন' কথার মাধ্যমে তালাক নেওয়ার অনুমতিপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিষয়টিও অনুরূপ। তার ক্ষতি প্রতিহত করতে সে বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল করার অধিকার রাখে। এখন স্ত্রী যদি বলে, 'আমার স্বামীর কাছে থাকবো এবং তার পক্ষ থেকে আমাকে দেওয়া অধিকারকে অর্থের বিনিময়ে বাতিল করছি।' এ কথার মাধ্যমে স্পষ্ট হবে যে, স্বামীর সঙ্গে থাকলে তার কোনো ক্ষতি হবে না। সুতরাং এমন অধিকার বাতিল করার বিনিময় পাবে না। পুরুষত্বহীন স্বামীর স্ত্রীর বিষয়টিও অনুরূপ। স্ত্রীর ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পুরুষত্বহীন স্বামীর বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার অধিকার সে রাখে। এরপর যদি অর্থের বিনিময়ে স্বামীর সঙ্গে থাকতে রাজি হয়, তা হলে বোঝা যাবে, স্বামীর সঙ্গে থাকতে তার কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং এমন স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, হুকুকে আসলিয়্যাহ। এগুলো হলো সেসব স্বত্ব, যেগুলো সত্তাগতভাবেই তার অধিকারীর জন্য বৈধ সাব্যস্ত হয়েছে, শুধুমাত্র তার ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বৈধ সাব্যস্ত হয়নি। যেমন, কিসাস, বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক রেখে স্ত্রী সম্ভোগ করা, মিরাস ইত্যাদি। এ ধরনের স্বত্বের হুকুম হলো, বিক্রয়ের মাধ্যমে তার বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। তা এভাবে যে, বিক্রয়ের মাধ্যমে স্বত্বটি ক্রেতার কাছে চলে যাবে, ফলে বিক্রেতা যা কিছুর অধিকারী ছিল, ক্রেতার কাছে সেগুলো চলে যাবে। সুতরাং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের জন্য অন্যের কাছে কিসাসের স্বত্ব বিক্রয় করা জায়েয নেই। তা এভাবে যে, ওয়ারিশের পরিবর্তে ওই ক্রেতা কিসাস নেওয়ার অধিকারী হবে। অনুরূপভাবে কারো পক্ষ থেকে অন্যের কাছে তার স্ত্রী সম্ভোগের স্বত্ব বিক্রয় করা জায়েয নেই। তা এভাবে যে, স্বত্ব ক্রেতা ওই স্ত্রীকে সম্ভোগ করবে। ওয়ারিশের জন্য মিরাসের স্বত্ব বিক্রয় করা জায়েয নেই। তা এভাবে যে, প্রকৃত ওয়ারিশ ছাড়া ওই ক্রেতা মিরাস নেবে। কেননা, শরিয়তের পক্ষ থেকে এ স্বত্বগুলো বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে বৈধ সাব্যস্ত হয়েছে। তাই যেখানে এ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে না, সেখানে স্বত্বটি থাকবে না। সুতরাং শরিয়তের পক্ষ থেকে কিসাসের স্বত্ব বৈধ করা হয়েছে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক হওয়ার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। অতএব, যখন অভিভাবকত্বের বৈশিষ্ট্য থাকবে না, তখন স্বত্বটিও থাকবে না।

অন্যভাবে বললে, শরয়ি দৃষ্টিতে এ স্বত্বগুলো একজন থেকে অন্যের কাছে
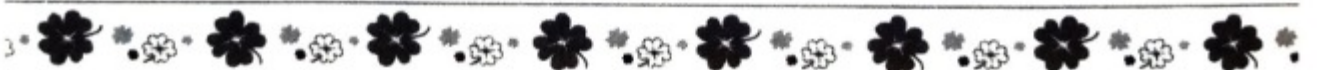
হস্তান্তরযোগ্য নয়। সুতরাং সেগুলো বিক্রয়, দান করা ও তাতে মিরাস জারি করা যাবে না। আর কিসাস ও মিরাসের ক্ষেত্রে পরবর্তী বংশধর অধিকারী হওয়ার বিষয়টি প্রকৃতভাবে নতুন মালিকানা লাভ করা নয়; বরং ওয়ারিশ না-থাকা বা নিকটতম ওয়ারিশ না-থাকার কারণে সত্তাগতভাবে দূরতম ওয়ারিশ সেটির অধিকারী হওয়া। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ওয়ারিশ হচ্ছে না যে, নিকটতম ওয়ারিশ থেকে অন্যের কাছে অধিকারটি স্থানান্তরিত হচ্ছে। সুতরাং শরিয়ত যেহেতু এ ধরনের স্বত্বকে একজন থেকে অন্যজনের কাছে হস্তান্তর করার অনুমতি দেয়নি, সেহেতু বিক্রয় বা পরিবর্তনের মাধ্যমে তার বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে না। এ হুকুমের মূলনীতি হলো, হযরত ইবনে উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেছেন–

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরাধিকার স্বত্ব বিক্রয় ও দান করতে নিষেধ করেছেন।'[৫৫৬]

তবে সমঝোতা ও পদ ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে এ ধরনের স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে। অর্থাৎ, এ ধরনের স্বত্ব ব্যবহার না-করলে উপকৃত হবে এমন ব্যক্তি থেকে অর্থ নিয়ে তার অধিকারী নিজের স্বত্ব ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ যখন কিসাস নেওয়ার অধিকারী হবে, তখন অর্থের বিনিময়ে হত্যাকারীর সঙ্গে তাদের সমঝোতা করা বৈধ হবে। এ অর্থটি তাদের স্বত্ব ব্যবহার থেকে বিরত থাকার বিনিময় হিসাবে সাব্যস্ত হবে। হত্যাকারী নিজের মৃত্যু প্রতিহত করতে এ অর্থ ব্যয় করবে। কুরআনের আয়াত, হাদিস ও উলামায়ে কেরামের ইজমার মাধ্যমে এটির বৈধতা প্রমাণিত।

অনুরূপভাবে স্বামীর এ অধিকার রয়েছে যে, স্ত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক রেখে তাকে সম্ভোগ করবে। তবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে খুলা তালাক হিসাবে প্রদেয় অর্থের বিনিময়ে স্বামী তার অধিকার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে পারবে। আল-কুরআনুল কারিমের আয়াতের মাধ্যমে এটি জায়েয এবং এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

৫৫৬. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: আযাদ করা, পরিচ্ছেদ : 'ওয়ালা' বিক্রয় ও দান, ও অধ্যায় : ফারায়েয। সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: আযাদ করা, পরিচ্ছেদ : 'ওয়ালা' বিক্রয় ও দান। হাদিসটি সহিহ মুসলিম থেকে উদ্ধৃত।

হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে আল্লামা বিরি (البيري) (রহ.) 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের' কিতাবের ব্যাখ্যায় 'হুকুকে আসলিয়্যাহ ও হুকুকে জরুরিয়্যাহ'-এর মধ্যকার পার্থক্যটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) সেটিকে 'রাদ্দুল মুহতার' কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন।[৫৫৭]

তবে উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে সমঝোতার মাধ্যমে তখনই বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে, যখন স্বত্বটি বিদ্যমান থাকবে। যেমন, কিসাস, বৈবাহিক ও দাসত্বের স্বত্বের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। স্বত্বটি যদি বিদ্যমান না-হয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য স্বত্ব হয়, তা হলে বিক্রয় বা সমঝোতার কোনো পদ্ধতিতেই তার বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। এর উদাহরণ হলো, যার থেকে মিরাস পাওয়া হবে, সে জীবিত থাকাকালীন অর্থের বিনিময়ে মিরাসের স্বত্ব ছেড়ে দেওয়া জায়েয নেই। কারণ, যার মিরাস পাওয়া হবে, সে জীবিত থাকাকালীন মিরাসের স্বত্বটি বিদ্যমান স্বত্ব নয়; বরং সেটি এমন সম্ভাব্য স্বত্ব যা হওয়া না-হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কেবল ওয়ারিশের জীবদ্দশায় যার থেকে মিরাস পাওয়া যাবে তার মৃত্যুর মাধ্যমেই মিরাসের স্বত্বটি অস্তিত্বে আসে। অনুরূপভাবে মনিবের জীবদ্দশায় তার পরিত্যক্ত সম্পদ পাওয়ার স্বত্বটিও বিদ্যমান কোনো স্বত্ব নয়, মনিবের মৃত্যুর পরই সেটি অস্তিত্ব লাভ করবে। সুতরাং অর্থের বিনিময়ে মনিবের মৃত্যুর আগে ওই স্বত্ব ছেড়ে দেওয়া জায়েয নেই। আর যার থেকে মিরাস পাওয়া যাবে, সে অথবা মনিবের মৃত্যুর পর স্বত্বটি পরিত্যক্ত বস্তুগত মালিকানার মধ্যে চলে আসে। তাই সর্বস্বীকৃত শর্ত অনুযায়ী সেগুলো বিক্রয় বা ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে।

১০৮. হুকুকে উরফিয়্যাহ (সামাজিক স্বত্ব)

স্বত্বের দ্বিতীয় প্রকারকে আমরা "হুকুকে উরফিয়্যাহ" নামে অভিহিত করতে পারি। হুকুকে উরফিয়্যাহ এর ব্যাখ্যা হলো, এটি এমন শরয়ি স্বত্ব, যেগুলো সামাজিক প্রচলনের কারণে তার অধিকারীর জন্য বৈধ সাব্যস্ত হয়েছে। এগুলো শরয়ি স্বত্ব হওয়ার কারণ হলো, সামাজিক প্রচলন ও মানুষের মাঝে সেটি জারি থাকার কারণে শরিয়ত সেটিকে বৈধ করেছে। তবে তার মূল উৎস হলো সামাজিক প্রচলন, শরিয়ত মূল উৎস নয়। এ ধরনের স্বত্বের দৃষ্টান্ত হলো, রাস্তায় চলাচল, পানি নেওয়া ও প্রবাহিত করা ইত্যাদির স্বত্ব। এসব স্বত্বের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে—

---

৫৫৭. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬৬, ফিকরাহ নং ২২২৭৪।

১০৯. বস্তুর উপকারিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বত্ব

প্রথম: বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বত্ব। অর্থাৎ, ধাতব বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত উপকারিতা ব্যবহারের স্বত্ব। উপকারিতাটি যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হয়, তা হলে ভাড়ার মাধ্যমে তার বিনিময় নেওয়া জায়েয। সে ক্ষেত্রে ভাড়ার সব বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বাড়িকে বসবাসের কাজে ব্যবহার করা। উপকারিতার মালিক যদি স্থায়ীভাবে অন্যের কাছে তার উপকারিতা হস্তান্তর করতে চায়, তা হলে সেটি হবে ওই উপকারিতা বিক্রয় করা। হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরনের উপকারিতাকে 'নিরেট স্বত্ব বিক্রয়' (بيع الحقوق المجردة) নামেও উল্লেখ করেছেন। প্রথম আলোচনায় এ কথা উল্লেখ করেছি যে, তিন ইমাম বিক্রয়ের সংজ্ঞার স্থায়ী উপকারিতাকে আওতাভুক্ত করেছেন। সুতরাং তাঁদের মতে এ ধরনের স্বত্ব বিক্রয় জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। তাই তাঁদের মতানুযায়ী চলাচল, দেয়ালের ওপর কড়িকাঠ রাখা, ছাদের ওপর কামরা তৈরি করার (যাকে ওপরের স্বত্ব (حق التعلي) নামে অভিহিত করা হয়) স্বত্ব বিক্রয় করা জায়েয আছে।[৫৫৮]

হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম মাল বলতে শুধু বস্তু বা পদার্থই বুঝিয়েছেন। উপকারিতা (المنافع) ও অধিকার (الحقوق) মালের আওতাভুক্ত করেননি। তবে হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হককে মালের আওতাভুক্ত করেছেন। যেমন, নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির ওপর চলাচলের হক। হানাফি মাযহাবের পছন্দনীয় মতে এটি বিক্রয় জায়েয। তবে ওপরের স্বত্ব (حق التعلي) বিক্রয়কে তাঁরা জায়েয বলেননি। কারণ, সেটি বাতাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সে বাতাস কোনো বস্তুনির্ভর মাল নয়।[৫৫৯] তবে স্পষ্ট কথা হলো, বর্তমান সময়ে ওপরের স্বত্বের বিক্রয়ের প্রচলন ঘটেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে তিন ইমামের মত গ্রহণ করাই উত্তম। والله تعالى أعلم

পানি নেওয়ার স্বত্বের (حق الشرب) ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। সেটি নিরেট স্বত্ব হওয়ার কারণে অনেকে সেটি বিক্রয় না-জায়েয বলেছেন। আবার সামাজিক প্রচলনের কারণে অনেকে সেটির

---

৫৫৮. আদ-দুসুকি : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪। মাওয়াহিবুল জালিল : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭৬। আত-তাজ ওয়াল ইকলিল, আল্লামা মাওওয়াক (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭৫। শারহু মুনতাহাল ইরাদাত : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪০। আল-ইয়াকুতুন নাফিস ফি মাযহাবি ইবনি ইদরিস, পৃষ্ঠা-৭৪।

৫৫৯. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৫-৬৬। রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬৪০, ফিকরাহ নং ২৩৫১০ ও ২৩৫১১।

বিক্রয় জায়েয বলেছেন।[৫৬০] তাদের এ বক্তব্য প্রমাণ করে যে, কিছু উপকারিতা ও স্বত্বকে মালের আওতাভুক্ত করার ব্যাপারে সামাজিক প্রচলনের একটি ভূমিকা রয়েছে। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন, 'সব মানুষ বা কিছু মানুষ কোনো কিছুর লেনদেন করা বা তাকে মূল্যবিশিষ্ট সাব্যস্ত করার মাধ্যমে কোনো কিছু 'মাল' হওয়া প্রমাণিত হয়। পাশাপাশি শরয়িভাবে সেটির ব্যবহার বৈধ হওয়ার মাধ্যমেও তা 'মাল' হওয়া প্রমাণিত হয়।'[৫৬১]

১১০. আগে নেওয়ার মাধ্যমে অর্জিত স্বত্ব (حق الأسبقية)

দ্বিতীয় : আগে নেওয়ার মাধ্যমে অর্জিত স্বত্ব। এ ধরনের স্বত্ব হলো, এমন মালিকানা বা অগ্রাধিকারের স্বত্ব, যেটি কোনো বৈধ বস্তু আগে অর্জন করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেমন, পতিত জমি চাষাবাদের মাধ্যমে তার মালিক হওয়ার স্বত্ব। ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, পতিত জমি চাষাবাদ করা ছাড়া কেউ তার মালিক হতে পারবে না। এমন জমিতে সীমানা নির্ধারণ করার মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না; বরং অগ্রাধিকারের স্বত্ব প্রমাণিত হয়। কেবল চাষাবাদের মাধ্যমেই মালিকানার স্বত্ব অর্জিত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো পতিত জমিতে সীমানা নির্মাণ করবে, সে ওই জমি চাষাবাদের ব্যাপারে অগ্রাধিকারী সাব্যস্ত হবে। শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরনের স্বত্ব বিক্রয় জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। তবে উভয় মাযহাবের পছন্দনীয় মত হলো, সেটি বিক্রয় করা জায়েয নেই।[৫৬২] কিন্তু হাম্বলি মাযহাবের আল্লামা বুহুতি (রহ.) বলেছেন, যদিও বিক্রয়ের মাধ্যমে এ ধরনের স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই, তবে সমঝোতা ও পদ ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে তার বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে।[৫৬৩]

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আগে গিয়ে মসজিদের কোথাও বসলো, সে ওই জায়গার ব্যাপারে অগ্রাধিকারী। সে চাইলে অন্যকে ওই জায়গা দিতে পারে। কিন্তু এ অধিকারটি বিক্রয় করতে পারবে না। তবে আল্লামা বুহুতি (রহ.) বলেছেন, অর্থের বিনিময়ে এ অধিকার ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে। হানাফি

---

৫৬০. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.) : খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৭১।

৫৬১. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৪, ফিকরাহ নং ২২১৬৯।

৫৬২. তাকমিলাতুল মাজমু শারহিল মুহাযযাব, আল্লামা মুতিয়ি (রহ.) : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৪৭১। মুগনিল মুহতাজ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৭। আল-কাফি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩৯। আল-ইনসাফ, আল্লামা মারদাবি (রহ.) : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৭৩।

৫৬৩. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, আল্লামা বুহুতি (রহ.) : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬৪।

ও মালেকি মাযহাবের বিষয়টি হলো, এ ধরনের স্বত্ব বিক্রয়ের ব্যাপারে তাঁদের থেকে স্পষ্ট কোনো হুকুম পাইনি। তবে তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্যের ওপর কিয়াস করলে বোঝা যায়, তাঁদের কাছেও এ ধরনের স্বত্ব বিক্রয় করা জায়েয নেই।

১১১. চুক্তি করা বা বহাল রাখার স্বত্ব (حق إنشاء العقد أو إبقائه)

তৃতীয় : চুক্তি করা বা বহাল রাখার স্বত্ব। এ ধরনের স্বত্বের উদ্দেশ্য হলো, কারো সঙ্গে চুক্তি করা বা তার সঙ্গে কৃত চুক্তি বহাল রাখার স্বত্ব। যেমন, বাড়ি ও দোকানের পজিশন। এটি হলো মালিকের সঙ্গে কৃত ভাড়ার চুক্তি বহাল রাখা বা ভবিষ্যতে তার সঙ্গে চুক্তি করার স্বত্ব বা হক। অনুরূপভাবে সরকারি বা ওয়াকফ স্টেটের চাকুরি, যা সরকার বা ওয়াকফের দায়িত্বশীলের সঙ্গে ইজারা চুক্তি বহাল রাখার স্বত্ব। সব মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এ ধরনের স্বত্ব বিক্রয় করা জায়েয নেই। তবে হানাফি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের অনেক ফকিহ অর্থের বিনিময়ে এ স্বত্ব ছেড়ে দেওয়াকে জায়েয বলেছেন।[৫৬৪]

বিক্রয় করা ও অর্থের বিনিময়ে স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো, বিক্রয়ের মাধ্যমে বিক্রেতার সব ধরনের কর্তৃত্ব ক্রেতার কাছে চলে যায়। আর ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে যার জন্য ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তার কাছে মালিকানা যায় না। ছেড়ে দেওয়া ব্যক্তি শুধু তার হকটি রহিত করেছে। যার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তার শুধু এ উপকার হবে যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকল না। আল্লামা কারাফি (রহ.) স্থানান্তর ও রহিত করার মধ্যকার এ পার্থক্যটি আলোচনা করেছেন।[৫৬৫]

আমাদের যুগে এ ধরনের স্বত্বের অনেক বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে তার মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্বত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিন।

১১২. বাড়ি ও দোকানের পজিশন

বর্তমানে অনেক দেশে এমন প্রচলন রয়েছে যে, কোনো জমি বা বাড়ির মালিক যখন তার জমি বা বাড়ি ভাড়া দিতে চায়, তখন শুরুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ভাড়াচুক্তি স্থায়ী করার অধিকার দিয়ে থাকে।

---

৫৬৪. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬৬, ফিকরাহ নং ২২২৭৪। নেহায়াতুল মুহতাজ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭৮। শারহু মুনতাহাল ইরাদাত : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬৪।

৫৬৫. আল-ফুরুক, আল্লামা কারাফি (রহ.) : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১০, ফরক নং ৭৯।
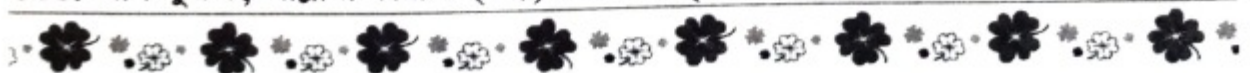
(অনেক সময় এটিকে স্থায়িত্বের স্বত্ব (حق القرار) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে) এরপর তাদের থেকে নির্ধারিত ভাড়া নিতে থাকে। এ প্রক্রিয়ার পর ভাড়াগ্রহীতাকে অবস্থানের হকদার হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়। এরপর ভাড়াদাতা যদি ভাড়া দেওয়া জমি ফেরত নিতে চায়, তা হলে উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত অর্থ দেওয়া ছাড়া ওই জমি ফেরত নিতে পারে না। অনুরূপভাবে তৃতীয় কেউ ওই জমি ভাড়া নিতে চাইলে স্থায়ী স্বত্বের অধিকারীকে অর্থ দেওয়া ছাড়া ভাড়া নিতে পারে না। আর সে অধিকারী হলো প্রথম ভাড়াগ্রহীতা। তার স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়স্বরূপ তাকে এ অর্থ দিতে হয়। আবার অনেক দেশের প্রচলিত আইন হলো, নতুন ভাড়াগ্রহীতা এ উদ্দেশ্যে আসল মালিককে অর্থ দেবে যে, সে প্রথম ভাড়াগ্রহীতা থেকে তার কাছে অবস্থান স্বত্ব স্থানান্তরিত হওয়ার স্বীকৃতি দেবে।

এ ধরনের লেনদেনে অবস্থান স্বত্বকে পজিশন (الْخُلُوّ) নামে অভিহিত করা হয়। এ সম্পর্কে এমন চারটি মাসআলা রয়েছে, যার হুকুম বয়ান করা জরুরি :

প্রথম মাসআলা : অবস্থান স্বত্ব অথবা ভাড়াচুক্তিকে স্থায়ী করার বিনিময় হিসাবে ভাড়াদাতার জন্য ভাড়া ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা জায়েয কি না?

দ্বিতীয় মাসআলা : মালিক বাড়ি অথবা জমি ফেরত নিতে চাইলে ভাড়াগ্রহীতার জন্য তার কাছ থেকে অর্থ দাবি করা জায়েয কি না?

তৃতীয় মাসআলা : প্রথম ভাড়াগ্রহীতা তার স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার বিনিময় হিসাবে নতুন ভাড়াগ্রহীতা থেকে অর্থ দাবি করা জায়েয কি না?

চতুর্থ মাসআলা : প্রথম ভাড়াগ্রহীতাকে অর্থ দেওয়ার বিনিময়ে সে তার স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর নতুন ভাড়াগ্রহীতাকে শুধু স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মালিক কর্তৃক অর্থ নেওয়া জায়েয কি না?

প্রথম মাসআলার হুকুম : প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের রচয়িতা ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, এটি জায়েয নেই। কারণ, অনেকের মতে ভাড়ার মধ্যে স্থায়িত্বের শর্ত করলে সেটি ভাড়াচুক্তিকে বাতিল করে দেয়। 'আল-মুহিতুল বুরহানি' কিতাবে বর্ণিত আছে–

والتاقيت شرط جوازها، (أي الإجارة) والتابيد يبطلها.

> 'ভাড়া জায়েয হওয়ার জন্য সাময়িক হওয়া শর্ত। স্থায়িত্বের শর্ত করলে সেটি ভাড়াচুক্তিকে বাতিল করে দেবে।'[৫৬৬]

---

৫৬৬. আল-মুহিতুল বুরহানি : খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৯০।

আল্লামা যাইলায়ি (রহ.) বলেছেন–

لا يجوز أن يضرب لها (أي للإجارة) أجلا لا يعيش إليه مثله عادة، لأن الغالب كالمتحقق في حق الأحكام... فصار كالتابيد معنى، فلا يجوز، لما عرف أن التابيد يبطلها.

'ভাড়ার জন্য এমন মেয়াদ নির্ধারণ করা জায়েয নেই, যে মেয়াদ পর্যন্ত সাধারণত মানুষ বাঁচে না। কারণ, বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা বাস্তবের মতোই গণ্য হয়। ... অতএব, এমন মেয়াদ নির্ধারণ করলে সেটি স্থায়িত্বের শর্ত করণের মতো হয়ে গেল, তাই সেটি জায়েয নেই। কেননা, এ মূলনীতি স্বীকৃত যে, স্থায়িত্বের শর্ত করলে সেটি ভাড়াচুক্তিকে বাতিল করে দেয়।'[৫৬৭]

সুতরাং স্থায়িত্বের শর্ত যদি ভাড়া বাতিল করে দেয়, তা হলে তার জন্য স্থায়ীভাবে অবস্থানের স্বত্ব কীভাবে বৈধ হবে? আর যখন তার জন্য স্বত্বটি বৈধ হবে না, তখন তার বিনিময় নেওয়া কীভাবে জায়েয হবে?

তবে, মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরাম রাষ্ট্রীয় ও ওয়াকফ এস্টেটের এমন জমির ব্যাপারে স্থায়ী অবস্থানের স্বত্ব বৈধ বলেছেন, যেগুলো পতিত এবং স্থায়ী অবস্থানের স্বত্ব দেওয়া ছাড়া কেউ সেগুলো ভাড়া নিতে রাজি হয় না, অথবা সেখানকার বিল্ডিং-এর বিনিময় বা ভাড়াগ্রহীতা কিছু নির্মাণ অথবা গাছ লাগানোর বিনিময়ে তাকে স্থায়ী অবস্থানের স্বত্ব দেওয়া যেতে পারে। কেননা, এগুলো ভাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তাই যার কাছে ভাড়া আছে অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা সে ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকারী হবে।[৫৬৮] তবে আমি এমন কোনো ফকিহ পাইনি, যিনি ভাড়া ছাড়া স্থায়ী অবস্থানের স্বত্বের জন্য ভিন্নভাবে অর্থ নেওয়া জায়েয বলেছেন; বরং তাঁরা এ কথা বলেছেন যে, স্থায়ী অবস্থান স্বত্বের শর্ত হলো, ভাড়াগ্রহীতা সবসময় ন্যায্য ভাড়া পরিশোধ করবে। এমনকি ন্যায্য ভাড়া বেড়ে গেলে নির্ধারিত ভাড়ার পরিমাণও বেড়ে

৫৬৭. তাবয়িনুল হাকায়িক, আল্লামা যাইলায়ি (রহ.) : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭৯। বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, অধ্যায়: বিয়ে : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৮৬।

৫৬৮. আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) রাদ্দুল মুহতার কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় ও 'তাহরিরুল ইবারত ফিমান হুআ আহাক্কু বিল ইজারাহ' পুস্তকে এ মাসআলাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৭২, ফিকরাহ নং ২২২৭৫। অধ্যায়: ইজারা : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৬। রাসায়েলে ইবনে আবেদিন : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৪।

যাবে। এরপর তারা বলেছেন, ভাড়াগ্রহীতার পক্ষ থেকে ওই জমিতে বিল্ডিং বা গাছ লাগানোর কারণে সে এ অবস্থান স্বত্বের অধিকারী হবে। শুধু দখলে রাখলেই এ স্বত্বের মালিক হতে পারবে না।

এ আলোচনা অনুযায়ী, পজিশনের বিনিময় হিসাবে চুক্তির শুরুতে ভাড়াদাতা এককালীন যে অর্থ নিয়ে থাকে, এটি মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরাম কর্তৃক জায়েযকৃত ওয়াকফ এস্টেট ও রাষ্ট্রীয় জমির অবস্থান স্বত্বের অনুরূপ নয়। এ বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত যে, চুক্তিকারী চুক্তির মাধ্যমে অরোপিত অর্থ ছাড়া অপর পক্ষ থেকে শুধুমাত্র চুক্তি করার বিনিময় হিসাবে কিছুই নিতে পারবে না। এমন অর্থ নিলে সেটি ঘুষ হবে।

সমকালীন অনেক ফকিহ এ পদ্ধতিতে পজিশনের বিনিময় নেওয়া জায়েয বলেছেন যে, ভাড়াগ্রহীতা থেকে জমির মালিক তার জমি ফেরত নেওয়ার যে অধিকার রয়েছে, এ পজিশন সে অধিকারের বিনিময়। আর সামাজিক প্রচলন থাকায় এমন অর্থ নেওয়া জায়েয আছে। যেমনভাবে অর্থের বিনিময়ে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে।[৫৬৯] তবে বিভিন্ন দিক থেকে এ মতটি প্রশ্নবিদ্ধ। সেসব প্রশ্নের একটি হলো, ভাড়ার মধ্যে ফুকাহায়ে কেরাম যখন স্থায়িত্বের শর্ত করাকে জায়েয বলেননি, তখন প্রকারান্তরে যেনো এটিই সাব্যস্ত হলো যে, মালিকের জন্য ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার ছেড়ে দেওয়াও জায়েয নেই। ছেড়ে দেওয়ার বিনিময় দেওয়া তখনই জায়েয হয়, যখন শরয়িভাবে সেটি ছেড়ে দেওয়া বৈধ হয়।

দ্বিতীয় মাসালার হুকুম : সমকালীন যেসব ফকিহ পজিশনের বিনিময় নেওয়া জায়েয বলেছেন, তারা এটিকেও জায়েয বলেছেন যে, মালিক তার জমি ফেরত নিতে চাইলে ভাড়াগ্রহীতা তার থেকে অর্থ দাবি করতে পারবে। এ বিনিময়টি ভাড়া নেওয়ার সময় গ্রহীতা পজিশন হিসাবে মালিককে যে পরিমাণ অর্থ দিয়েছিল, ওই পরিমাণ অর্থ হওয়া শর্ত নয়; বরং উভয় পক্ষ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ওপর সম্মত হতে পারবে। যারা পজিশনকে জায়েয বলেননি- তাঁদের মতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত- তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী যদি ভাড়ার জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ না থাকে, তা হলে ভাড়াগ্রহীতার জন্য জমি ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়স্বরূপ মালিকের কাছে কোনো অর্থ দাবি করা জায়েয নেই। তবে চুক্তির শুরুতে পজিশন হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ দিয়েছে মালিক থেকে সেটি ফেরত নিতে পারবে। কারণ, সেটি ছিল ঘুষ, যা তার দাতাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব।

---

৫৬৯. জাদিদ ফিকহি মাবাহেস, শাইখ মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমি, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৬৬।

তৃতীয় মাসআলার হুকুম : প্রথম ভাড়াগ্রহীতা ভাড়াচুক্তি স্থায়ী রাখার ব্যাপারে যে স্বত্বের অধিকারী ছিল, নতুন ভাড়াগ্রহীতা থেকে তার বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে কি না? এ ব্যাপারে কথা হলো, যেসব ফকিহ পজিশন নেওয়া জায়েয বলেছেন, তারা এটিকেও জায়েয বলেছেন। যারা না-জায়েয বলেছেন তাদের মতানুযায়ী ভাড়াটি যদি অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হয়ে থাকে, যেমনটি পজিশনভিত্তিক ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে, তা হলে নতুন ভাড়াগ্রহীতা থেকে এ পদ্ধতিতে অর্থ নেওয়া জায়েয নেই। তবে যদি আসল ভাড়ার জন্য নির্ধারিত মেয়াদ থাকে এবং সে মেয়াদের আগে নতুন ভাড়াগ্রহীতার জন্য সে তার স্বত্ব ছেড়ে দেয়, তা হলে এ প্রক্রিয়ায় স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে।

চতুর্থ মাসআলার হুকুম : প্রথম ভাড়াগ্রহীতাকে অর্থ দেওয়ার বিনিময়ে সে তার স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর নতুন ভাড়াগ্রহীতাকে শুধু স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মালিক কর্তৃক অর্থ নেওয়া জায়েয কি না? এক্ষেত্রে হুকুম হলো, এ পদ্ধতি জায়েয বলেছেন এমন কোনো ফকিহ পাইনি। এমনকি যারা পজিশন নেওয়া জায়েয বলেছেন তারাও এটিকে জায়েয বলেননি।

অধিকাংশ ফকিহ যেহেতু পজিশনের বিনিময় নেওয়া জায়েয বলেননি, তাই এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সহিহ পদ্ধতিটি নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. ভাড়াদাতার জন্য ভাড়াগ্রহীতা থেকে চুক্তির শুরুতে কয়েক বছরের অগ্রিম ভাড়া হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেওয়া জায়েয আছে। এ পরিমাণটি সাময়িক বা বাৎসরিক ভাড়ার অনুপাতে হতে হবে এবং এর ওপর ভাড়ার সব বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। এরপর নির্ধারিত মেয়াদের আগে কোনো কারণে যদি ভাড়াচুক্তি বাতিল হয়ে যায়, তা হলে অবশিষ্ট মেয়াদের বিনিময়ে যে পরিমাণ ভাড়া থাকবে মালিকের পক্ষ থেকে সেটি ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে।

২. নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়ার চুক্তি হলে ভাড়াগ্রহীতা ওই মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি বহাল রাখার অধিকারী হবে। সুতরাং কেউ যদি চায় যে, ভাড়াগ্রহীতা তার অধিকার ছেড়ে দিক এবং তার স্থানে সে ভাড়া নেবে, তা হলে প্রথম ভাড়াগ্রহীতার জন্য তার কাছে অর্থ দাবি করা জায়েয আছে। এ অর্থটি তার ভাড়ার অধিকার ছেড়ে দেওয়ার বিনিময় হিসাবে সাব্যস্ত হবে। অর্থের বিনিময়ে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার মাসআলার ওপর কিয়াস করে এটি জায়েয হবে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, আসল

ভাড়াটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হতে হবে। যেমন, দশ বছর। আর প্রথম ভাড়াগ্রহীতা ওই মেয়াদের মধ্যে তার অধিকার ছেড়ে দেবে।

৩. যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়ার চুক্তি করা হয়ে থাকে, তা হলে ভাড়াদাতার জন্য শরয়ি কারণ ছাড়া সেটি বাতিল করা জায়েয নেই। সুতরাং সে যদি কোনো শরয়ি কারণ ছাড়া বাতিল করতে চায়, তা হলে ভাড়াগ্রহীতার জন্য বিনিময় দাবি করা জায়েয আছে। আর এটি তার অধিকার ছেড়ে দেওয়ার বিনিময় হবে। সেইসঙ্গে এ অর্থের পরিমাণটি চুক্তির শুরুতে ভাড়াগ্রহীতা কর্তৃক মালিককে অগ্রিম ভাড়া হিসাবে প্রদেয় অর্থের ফেরত নেওয়ার পরিমাণ অনুপাতে হতে হবে। والله تعالى أعلم

১১৩. ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক বিক্রয় করা

অনেক ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ী কোম্পানি তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ভালো হওয়ার কারণে বাজারে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করে। আর প্রচলিত পণ্যের জন্য কোম্পানির নামকেই মূল জিম্মাদার সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে। সুতরাং ভোক্তারা পণ্যের ওপর কোম্পানির নাম দেখেই এমন আস্থার সঙ্গে সেটি ক্রয় করে যে, এ কোম্পানির যে কোনো পণ্যই তাদের চাহিদা পূরণে সক্ষম। এ কারণে ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক ভোক্তা কম-বেশি হওয়ার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ব্যবসায়ী মহলে ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক একটি মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছে। জনগণের মধ্যে যে কোম্পানি সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করতে পেরেছে, তার নামে উৎপাদিত পণ্য বাজারে অধিক ভোক্তা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। যখন বোঝা গেল যে, কিছু মানুষ বাজারে সুখ্যাতি অর্জনকারী কোম্পানির নামকে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে ব্যবহার করছে এবং এ ব্যাপারে জনগণের মধ্যে দ্বিধার আশঙ্কা করা হলো, তখন রাষ্ট্রের কাছে ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ককে রেজিস্ট্রি করানোর ব্যাপারে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন করা হলো। একজনের জন্য রেজিস্ট্রিকৃত নাম বা ট্রেডমার্ক অন্যের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। তাই ব্যবসায়ী মহলে ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক একটি মৌলিক মূল্যবিশিষ্ট হয়ে গেল। ব্যবসায়ীরা এগুলো বিক্রয় করা শুরু করল। নামটি সুখ্যাতি অর্জন করে অধিক ভোক্তা আকৃষ্ট করার কারণে চড়া মূল্যে ও বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে এটি ক্রয় করা শুরু করল।

ট্রেডমার্ক বিক্রয়ের বিনিময় নেওয়ার আলোচনাটি দুইভাগে বিভক্ত :

১. পদার্থ না হওয়া সত্ত্বেও নিরেট স্বত্বের (الحقوق المجردة) এ ব্যাবসায়িক নাম ব্যবহারের বিনিময় নেওয়া জায়েয কি না?

২. অন্যের কাছে ব্যাবসায়িক নাম স্থানান্তরিত হওয়ার মধ্যে কি ভোক্তাদের ধোঁকা দেওয়া ও বিভ্রান্ত করা হয়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর : ব্যাবসায়িক নাম ব্যবহার করা যদিও একটি স্বত্ব, তবে আগে অর্জন করার কারণে সত্তাগতভাবে সেটি তার মালিকের জন্য বৈধ। শুধু মালিকের ক্ষতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এটি বৈধ হয়নি। তা ছাড়া এটি অস্তিত্বসম্পন্ন ও একজন থেকে অন্যের কাছে স্থানান্তরযোগ্য স্বত্ব। তবে সেটি কোনো বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান নেই, তাই স্বত্ব বিক্রয়ের আলোচনায় বিভিন্ন মূলনীতি থেকে আমরা যে নির্যাস বের করলাম, তার আলোকে বিক্রয় না-করে স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে তার বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে। আমাদের শাইখ আশরাফ আলি থানবি[৫৭০] (রহ.) এমন ফতোয়া

---

৫৭০. **শাইখ আশরাফ আলি থানবি :** আশরাফ আলি ইবনে আবদুল হক থানবি (রহ.)। সাধারণ ও আলেমসমাজে হাকিমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদুল মিল্লাত নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম : ভারতের মোজাফফরনগর জেলার থানাভবনে ১২৮০ হিজরিতে। শৈশবেই কুরআন হিফয করেন এবং প্রাথমিক দীনি কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন। বয়স যখন পনেরো, দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানকার খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও ফকিহদের সান্নিধ্যে ইলম অর্জন করেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন: শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতবি, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবি (রহ.) প্রমুখ। হিজরি ১৩০০ সালে সেখান থেকে পড়াশোনা শেষ করেন। এরপর কানপুরের মাদরাসায়ে ফয়য-ই-আম -এ শিক্ষকতা করেন। সেখানে ছিলেন দীর্ঘ চৌদ্দ বছর। তারপর থানাভবনে চলে যান। সেখানে শাইখ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)-এর মাকামে অবস্থান করে লেখালেখি, সমাজসংস্কার ও তাসাওউফের কাজ আঞ্জাম দেন। তিনি লেখালেখি ও ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। ধর্মের নামে অধর্ম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তাঁর মাধ্যমে হাজারো পথভোলা মানুষ দীনের পথে এসেছে। লাখো মানুষ সহিহ ইমান ও আমল শিখেছে। ত্রিশখণ্ডে তাঁর বয়ানসমগ্র প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞান ও হেকমতের ভাণ্ডার হিসাবে এটি মুসলিমসমাজে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পঠিত ও সমাদৃত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ দেখানোর জন্য তিনি রেখে গিয়েছেন রচনাবলির বিশাল ভাণ্ডার। যার সংখ্যা প্রায় এক হাজার। সেগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: বয়ানুল কুরআন (তিন খণ্ডে), ইমদাদুল ফাতাওয়া (চার খণ্ডে), বেহেশতি জেওর (দশ খণ্ডে), মুনাজাতে মাকবুল, আগলাতুল আওয়াম, জাযাউল আ'মাল, তারবিয়াতুস সালিকিন, আদাবুল মুআশারাত, আত-তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ, আল-হিলাতুন নাজিযাহ, ইসলাহে ইনকিলাব, হায়াতুল মুসলিমিন, মাসায়িলুস সুলুক, নাশরুত তিব, বাওয়াদিরুন নাওয়াদির, আত-তাশাররুফ, আল-ইতিদাল ফি মুতাবাআতির রিজাল, আল-ইকতিসাদ ফি আত-তাকলিদ ওয়াল ইজতিহাদ প্রভৃতি। হিজরি ১৩৬২ মোতাবেক ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে থানাভবনে ইন্তেকাল করেন। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাযুদ্ধে শহিদ হাফেজ
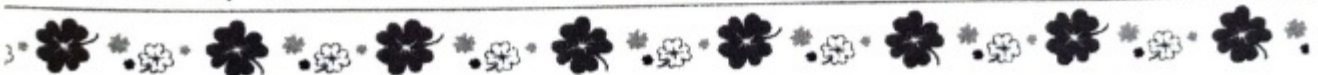
দিয়েছেন এবং এটিকে অর্থের বিনিময়ে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার মাসআলার ওপর কিয়াস করেছেন।[৫৭১]

অধমের কাছে যেটি স্পষ্ট হয় তা হলো, ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক যদিও সত্তাগতভাবে নিরেট স্বত্ব এবং কোনো বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান নয়, তবে রাষ্ট্রীয় রেজিস্ট্রেশনের জন্য কঠোর শ্রম ও বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হয় এবং রেজিস্ট্রেশনের পর এর একটি আইন-স্বীকৃত অবস্থা সৃষ্টি হয়, যেটির প্রতিনিধিত্ব করে বাহকের কাছে থাকা লাইসেন্স ও সরকারি দফতরের প্রমাণ। এ প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর সেটি বস্তুর মধ্যে স্থিতিশীল স্বত্বের অনুরূপ এবং ব্যবসায়ী মহলে বস্তুর মতোই হয়ে যায়। সুতরাং বিক্রয়ের মাধ্যমে তার বিনিময় নেওয়াও জায়েয হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, কিছু-কিছু বিষয়কে বস্তু বা পদার্থের আওতাভুক্ত করার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রচলনের ভূমিকা রয়েছে। কারণ, আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ কোনো কিছুকে মূল্যবিশিষ্ট সাব্যস্ত করা সেটি মালের আওতাভুক্ত হওয়ার কারণ। এটির দৃষ্টান্ত হলো, বৈদ্যুতিক শক্তি, গ্যাস ইত্যাদি। যেগুলোকে পূর্বের যুগে মাল ও মূল্যবিশিষ্ট বস্তু সাব্যস্ত করা হতো না। কারণ, সেগুলো কোনো বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান ছিল না এবং মানুষের সাধ্যে সেগুলো জমা রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মালে পরিণত হয়েছে এবং তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, তার মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে, সেগুলো জমা রাখা সম্ভব এবং মানুষ সেগুলোকে মাল ও মূল্যবিশিষ্ট পণ্য হিসাবে লেনদেন করছে। অতএব, ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্কও রাষ্ট্রীয়ভাবে রেজিস্ট্রেশন করার পর ব্যবসায়ী মহলে সেগুলো মূল্যবিশিষ্ট মালে পরিণত হয়েছে। আর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রদেয় প্রমাণপত্রের মাধ্যমে সেগুলো সংরক্ষিত করা সম্ভব। তা ছাড়া প্রত্যেক জিনিসের সংরক্ষণ তার অবস্থা বিবেচনা করে হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে প্রয়োজনের জন্য সেগুলো জমা রাখাও সম্ভব। সুতরাং কোনো কিছুকে 'মাল' সাব্যস্ত করতে যেসব উপাদানের প্রয়োজন হয়, এখানে তার সবগুলোই বিদ্যমান, তবে সেটি স্বতন্ত্রভাবে

যামেন (রহ.)-এর কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর জানাযার নামায পড়ান তাঁর ভাগ্নে মাওলানা যফর আহমাদ উসমানি (রহ.)। (ইলাউস সুনানের ভূমিকা ও আশরাফুস সাওয়ানেহ) –সম্পাদক

৫৭১. ইমদাদুল ফাতাওয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১১৯।

কোনো বস্তু নয়। সুতরাং বোঝা গেল, ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলোর ওপর মালের হুকুম প্রয়োগ করতে কোনো শরয়ি বাধা নেই।

দ্বিতীয় মাসআলা : অন্যের কাছে ব্যাবসায়িক নাম স্থানান্তরিত হওয়ার মধ্যে কি ভোক্তাদের ধোঁকা দেওয়া ও বিভ্রান্ত করা হয়? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, জনগণের মধ্যে যদি এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারণা না-করা হয় যে, অমুক ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক অন্য কোম্পানির কাছে চলে গেছে এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানের ক্ষেত্রে ক্রেতা কোম্পানি পূর্বের ধারা অক্ষুণ্ন রাখছে না, তা হলে সেটি ধোঁকা ও প্রতারণা হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর কুরআন-হাদিসের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে এগুলো হারাম প্রমাণিত।

তবে বিক্রেতা কোম্পানি যদি ক্রেতা কোম্পানির কাছে নাম বিক্রয়ের সঙ্গে-সঙ্গে কারিগরি প্রক্রিয়া হস্তান্তরের বিষয়টিও আবশ্যক করে নেয়, তা এভাবে যে, স্বয়ং তাদের উৎপাদন পদ্ধতিই ক্রেতা কোম্পানিকে দিয়ে দিল, অথবা জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা করল যে, এ নাম বা ট্রেডমার্কটি অমুক কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে, তা হলে এখানে কোনো ধোঁকা বা প্রতারণা থাকে না। তবে ক্রেতা কোম্পানিকে পণ্যের গুণগত মানের ক্ষেত্রে পূর্বের ধারা অক্ষুণ্ন রাখার প্রতি সাধ্যানুযায়ী সচেষ্ট হতে হবে। والله تعالى أعلم

১৪০৯ হিজরি সনের ১-৬ জমাদিউল উলা মাসে কুয়েতে অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি-এর পঞ্চম অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো–

> يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.
>
> 'ব্যাবসায়িক নাম, ব্যাবসায়িক উপাধি অথবা ট্রেডমার্কে হস্তক্ষেপ করা এবং তার কোনো একটিকে অর্থের বিনিময়ে অন্যকে দেওয়া তখন জায়েয, যখন সেখানে ধোঁকা, সন্দেহ ও প্রতারণা থাকবে না। এটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয যে, সেটি মূল্যবিশিষ্ট স্বত্বে পরিণত হয়েছে।'[৫৭২]

---

৫৭২. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যা : পঞ্চম : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫৮১।

১১৪. হুকুকে ইমতিয়ায বা ফ্রাঞ্চাইজ (Franchise)

ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক বিক্রয়ের বিষয়টি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আমাদের যুগে এমন এক পর্যায় উপনীত হয়েছে, যাকে 'হুকুকে ইমতিয়ায বিক্রয়'[৫৭৩] নামে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের স্বত্ব বিক্রয়ে একাধিক পদ্ধতির জন্ম হয়েছে। এ স্বত্বের সারকথা হলো, লাভ অর্জন করা যায় এমন কোনো স্বত্বের (হকের) মালিক অন্য কারো কাছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বা নির্দিষ্ট কালের জন্য অথবা নির্দিষ্ট জায়গার জন্য ওই স্বত্ব বা হক বিক্রয় করা।

এ স্বত্বের প্রচলিত পদ্ধতির একটি হলো, কোনো বিক্রেতার কোনো পণ্য মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে এবং নির্দিষ্ট নাম বা ট্রেডমার্কে সেটি সুখ্যাত হয়েছে, ফলে হুকুকে ইমতিয়ায ক্রয়ে আগ্রহী ব্যক্তি ওই পণ্যের সুনাম থেকে লাভ অর্জন করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে বিক্রেতা ওই ক্রেতাকে উৎপাদন প্রক্রিয়া, তার কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, বাজারজাত করার পদ্ধতি, বিক্রয়ের জায়গা প্রস্তুত করা, তার উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর সাময়িক তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি তাকে ব্যাবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এগুলোর সবকিছুই নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে হয়ে থাকে। আবার কখনো-কখনো হুকুকে ইমতিয়ায-এর ক্রেতা তার নির্দিষ্ট উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে যে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি অর্জন করেছে, সেটিও এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাকডোনাল্ডের একটি খাবার কোম্পানি বিশেষ সুনামের সঙ্গে সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডের ওই কোম্পানি নিজে সারা বিশ্বে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না; বরং পাকিস্তানের (বা বাংলাদেশের) কোনো কোম্পানির সঙ্গে হুকুকে ইমতিয়ায বিক্রয়ের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের চুক্তি করে। স্বত্বের এ চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা কোম্পানির জন্য হুবহু ওই প্রক্রিয়া ব্যবহারের অধিকার থাকে, যা আমেরিকার ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানি করে। একইভাবে তার নাম, ট্রেডমার্ক, স্টাইল, বাজারজাতের প্রচারণা এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নকশাও ব্যবহার করে। এসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানি তার থেকে স্বত্ব-ক্রয়কারী কোম্পানির প্রয়োজনীয় সব দায়িত্ব পালন করবে এবং শ্রমিকদের

---

৫৭৩. হুকুকে ইমতিয়ায এমন একটি পরিভাষা, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা অন্য পক্ষ থেকে কোনো সুযোগপ্রাপ্তকে দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো সেসব ব্যবসায়ী বিশেষত্ব, যা ব্যবসার ক্ষেত্রে তার নাম ব্যবহার, ট্রেডমার্ক ও বিশেষ ব্যবসায়-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেওয়া হয়। অনেক সময় এ স্বত্বকে ছাড়প্রাপ্ত স্বত্ব নামেও অভিহিত করা হয়।

প্রশিক্ষণ ও উৎপাদিত পণ্য দেখা-শোনা করার দায়িত্বও পালন করবে। স্বত্বের ক্রেতা নিজ খরচে পণ্য প্রস্তুত করবে; কিন্তু বিক্রেতার প্রসিদ্ধি ও সুনাম ব্যবহার করবে। সেটি এভাবে যে, ক্রেতা এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হবে যে, তারা পাকিস্তানে যে পণ্য ক্রয় করছে, তা হুবহু আমিরেকায় ক্রয়কৃত পণ্যের মতোই। এ পদ্ধতিতে যারা উক্ত পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী, স্বত্ব ক্রেতা কোম্পানির প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়বে। পূর্বেই বলেছি যে, ব্যাবসায়িক নাম ও ট্রেডমার্ক বিক্রয় করা জায়েয। তাই হুকুকে ইমতিয়ায বিক্রয় জায়েয হওয়ার বিষয়টি আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত। কারণ তা শুধু স্বত্ব নয়; বরং তার সঙ্গে অনেক বস্তু ও বহুবিধ সেবা থাকে। যেমন, বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া, স্বত্ব-ক্রয়কারীর কার্যক্রম দেখভাল করা, যেন ক্রেতাদের মধ্যে যে মানের প্রসিদ্ধি ছড়িয়েছে সে অনুযায়ী পণ্য প্রস্তুত হয় এবং ধোঁকা ও প্রতারণামুক্ত হয়।

এ স্বত্বের ক্রেতার কাছে যদি স্থায়ীভাবে স্বত্বটি দিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে সেটি স্বত্ব বিক্রয় করা হবে। আর যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হয়, তা হলে সেটি ইজারা হবে এবং সে ক্ষেত্রে ইজারার সব বিধান প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক। বর্তমান সময়ে যেহেতু সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ ধরনের স্বত্ব ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়, স্থায়ীভাবে দেওয়া হয় না, সেহেতু সে সম্পর্কিত বিধি-বিধান হবে ইজারার বিধি-বিধান।

১১৫. ট্রেড লাইসেন্স

ব্যাবসায়িক নাম ও ট্রেডমার্কের বিনিময় নেওয়া সম্পর্কে ইতঃপূর্বে যে হুকুম আলোচনা করেছি ব্যাবসায়িক লাইসেন্সের ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য হবে। এ লাইসেন্সের বাস্তবতা হলো, বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অনুমোদিত লাইসেন্স ছাড়া আমদানি-রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হয় না। এ সম্পর্কে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো, এটি ব্যবসায়ীদের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা। একান্ত বাধ্য হওয়া ছাড়া শরিয়ত এমন বাধ্যবাধকতা আরোপের বৈধতা দেয় না। তবে বর্তমানের অধিকাংশ রাষ্ট্রে একই অবস্থা। এমন লাইসেন্সের অধিকারী অনেক সময় অন্যের কাছে সেটি বিক্রয় করে, যেন বিক্রেতার পরিবর্তে সে বাইরের রাষ্ট্রের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি করতে পারে।

এসব লাইসেন্সের বাস্তবতা হলো, এগুলো কোনো পদার্থ বা বস্তু নয়, তবে বাইরের রাষ্ট্রের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি করার স্বত্বের বাহক। তাই ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি, এখানেও সেগুলো প্রযোজ্য হবে। এটি সত্তাগত মালিকানা, তাই অর্থের বিনিময়ে সেটি ছেড়ে দেওয়া জায়েয
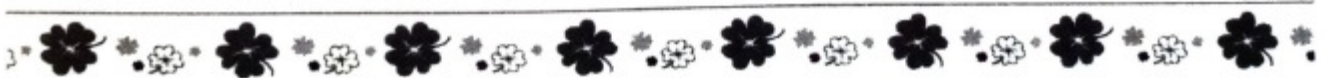
আছে। আর রাষ্ট্রের কাছ থেকে এ ধরনের লাইসেন্স সংগ্রহ করতে যেহেতু বেশ পরিশ্রম, বড় অঙ্কের অর্থও, সময়ের প্রয়োজন হয় এবং তার একটি আইন-স্বীকৃত অবস্থান সৃষ্টি হয়, যার প্রতিনিধিত্ব করে বাহকের কাছে থাকা কাগজ এবং রাষ্ট্রীয় দফতরের রেজিস্ট্রার, তাই ব্যবসায়ী মহলে এগুলো মূল্যবান বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয় এবং মালের মতোই এগুলোর লেনদেনও করা হয়। অতএব, এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে বস্তুর হুকুমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু এসব হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেগুলো অন্যের কাছে হস্তান্তরের অনুমতি থাকবে। আর যদি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা কোম্পানির নামে লাইসেন্স থাকে এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেটিকে অন্য ব্যক্তি বা কোম্পানির কাছে হস্তান্তরের অনুমতি না-থাকে, তা হলে সেটি বিক্রয় না-জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, সেটি বিক্রয় করলে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ও ধোঁকা দেওয়া হবে। কেননা, ক্রেতা নিজের নাম ব্যবহারের পরিবর্তে বিক্রেতার নাম ব্যবহার করবে। সুতরাং মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কারণে এটি না-জায়েয হবে। তবে আসল মালিক যদি তাকে ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল নির্ধারণ করে, তা হলে জায়েয হবে। তখন সেটি লাইসেন্স বিক্রয় করা না-হলেও, লাইসেন্স বাহকের জন্য তার মুআক্কিল থেকে ওকালতের বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে। والله تعالى أعلم

১১৬. আবিষ্কার, মুদ্রণ ও প্রকাশনা স্বত্ব

আবিষ্কার স্বত্ব এমন একটি স্বত্ব, আইন ও সামাজিক প্রচলন অনুযায়ী নতুন কিছুর আবিষ্কারক বা নতুন মডেলের নির্মাতা যার অধিকারী হয়ে থাকে। আবিষ্কার স্বত্বের উদ্দেশ্য হলো, আবিষ্কারক তার আবিষ্কৃত বস্তু উৎপাদন ও বাজারজাত করার একক অধিকার রাখে। অনেক সময় অন্যের কাছে এ অধিকার বিক্রয় করে দেওয়া হয়। তখন ব্যবসায়ীদের জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ওই ক্রেতা আবিষ্কারকের ভূমিকা পালন করে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কিতাব রচনা বা সংকলন করে, সে ওই কিতাব মুদ্রণ, প্রকাশনা ও লাভ অর্জনের স্বত্বের অধিকারী রাখে। অনেক সময় অন্যের কাছে এ স্বত্বটি বিক্রয় করা হয়। তাই মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে ক্রেতা লেখক বা সংকলকের ভূমিকা পালন করবে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, আবিষ্কার, মুদ্রণ ও প্রকাশনা স্বত্ব বিক্রয় করা জায়েয কি না? এ ব্যাপারে সমকালীন ফুকাহায়ে কেরামের মতে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের অনেকে জায়েয বলেছেন, আবার অনেকে না-জায়েয বলেছেন।
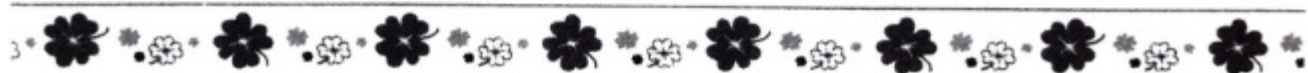
এ ব্যাপারে মৌলিক মাসআলা হলো, আবিষ্কার, মুদ্রণ বা প্রকাশনা স্বত্বটি কি শরিয়ত স্বীকৃত স্বত্ব? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নতুন কিছু আবিষ্কার করবে, সেটি কোনো পদার্থ বা বস্তু হোক বা না-হোক, নিজে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে ওই জিনিস উৎপাদন ও লাভের জন্য সেটি বাজারজাত করার ব্যাপারে সে অগ্রাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হযরত আসমার বিন মুযাররিস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন–

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ : مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ.

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বাইআত হলে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এমন জিনিস আগে অর্জন করবে, তার আগে যেটি অন্য কোনো মুসলিম অর্জন করেনি, সে ওই জিনিসের মালিক।'[৫৭৪]

আল্লামা মুনাবি (রহ.) যদিও এ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এটি পতিত জমি চাষাবাদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তবে অনেক আলেম থেকে বর্ণিত আছে, হাদিসটি প্রত্যেক বস্তু, কূপ ও খনিজজাত বস্তুকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটিকে আগে অর্জন করবে, সে-ই ওই জিনিসের মালিক হবে।[৫৭৫] এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, أَنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوْصِ السَّبَبِ অর্থাৎ, শব্দের ব্যাপকতা লক্ষণীয়, বিশেষ কারণ লক্ষণীয় নয়।

যখন এটি প্রমাণ হলো যে, আবিষ্কার স্বত্ব এমন একটি স্বত্ব, আগে আবিষ্কারের কারণে শরিয়ত যেটিকে তার জন্য বৈধ করেছে, তখন আগে অর্জনকৃত স্বত্ব সম্পর্কে আলোচিত সব বিষয়গুলো এখানে প্রযোজ্য হবে। আগে অর্জন করার কারণে বৈধ স্বত্বের আলোচনায় বলেছি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের অনেক আলেম এ স্বত্ব বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন। তবে তাদের মাযহাবের পছন্দনীয় মত হলো, এগুলো বিক্রয় করা জায়েয নেই। তবে

---

৫৭৪. সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায় : খারাজ। ইমাম আবু দাউদ ও আল্লামা মুনযিরি (রাহিমাহুমাল্লাহ) কেউই হাদিসটির সনদ নিয়ে কোনো কথা বলেননি। (ইবনে হাজার আসকালানি রহ. হাদিসটির সনদ হাসান বলেছেন। তবে শাইখ শুআইব আরনাউত যয়িফ বলেছেন। দ্র. আল-ইসাবাহ, আসমার ইবনে মুযাররিস রা. এর জীবনী : ১/৬৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩০৭১, তাহকিক শুআইব আরনাউত। –সম্পাদক)

৫৭৫. ফায়যুল কাদির : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪৮।
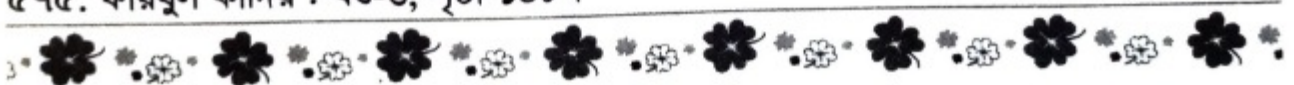
অর্থের বিনিময়ে এ ধরনের স্বত্ব ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লামা বুহুতি (রহ.) 'মুনতাহাল ইরাদাত' কিতাবে পতিত জমিতে সীমানা করার মাধ্যমে অর্জিত স্বত্ব ও আগে মসজিদে গিয়ে কোনো জায়গায় বসার মাধ্যমে অর্জিত স্বত্ব এবং অনুরূপ আগে করার দ্বারা অর্জিত স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার বিনিময় নেওয়া জায়েয বলেছেন। তাঁর এ বক্তব্যের দাবি হলো, আবিষ্কার, মুদ্রণ ও প্রকাশনা স্বত্বের বিনিময় নিয়ে সেটিকে অন্যের কাছে ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে।

তবে এ হুকুমটি শুধু আবিষ্কার ও মুদ্রণ স্বত্বের ব্যাপারে। এ স্বত্বকে যদি বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় এবং সময় ও কষ্টের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করা হয়, এরপর সেটিকে আইন-স্বীকৃত অবস্থান দেওয়া হয়, বাহকের কাছে থাকা প্রমাণপত্র ও রাষ্ট্রীয় দফতরের রেজিস্ট্রার যার প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে ব্যবসায়ী মহলে এটি মূল্যবান একটি মাল হিসাবে সাব্যস্ত হয়, তা হলে প্রচলিত এ নিয়মের কারণে রাষ্ট্রীয় রেজিস্ট্রিকৃত স্বত্বটি বস্তু ও মালের আওতাভুক্ত হওয়ার বিষয়টি অসম্ভব কিছু নয়। ইতঃপূর্বে বলেছি, কিছু বিষয়কে মাল ও বস্তুর আওতাভুক্ত করার ব্যাপারে সামাজিক প্রচলনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পূর্বোক্ত আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ কোনো কিছুকে মূল্যবিশিষ্ট সাব্যস্ত করার মাধ্যমে সেটি মাল হিসাবে গণ্য হয়। আর রেজিস্ট্রি করার পর বস্তুর মতোই এই স্বত্বগুলো সংরক্ষণ করা সম্ভব এবং প্রয়োজনের জন্য সেগুলো জমাও রাখা যায়। অন্যদিকে এর বিপক্ষে শরিয়তের পক্ষ থেকে কুরআন–সুন্নাহর স্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। সর্বোচ্চ বলা যায় যে, এটি কিয়াসের বিপরীত। আর সামাজিক প্রচলনের কারণে কিয়াস পরিহার করা হয়। এ সম্পর্কিত আলোচনায় এটি স্পষ্ট করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ করে সমকালীন অনেক আলেম এ ধরনের স্বত্ব বিক্রয় করা জায়েয ফতোয়া দিয়েছেন। যাঁরা ফতোয়া দিয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু আলেমের নাম উল্লেখ করছি : ইমাম আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি (রহ.)-এর ছাত্র মাওলানা শাইখ ফাতাহ মুহাম্মাদ লাক্ষ্ণৌবি (রহ.),[৫৭৬] দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতি আল্লামা শাইখ নেজামুদ্দিন (রহ.)[৫৭৭] ও শাইখ আবদুর রহিম লাজপুরি (রহ.)।[৫৭৮]

---

৫৭৬. ইতরু হেদায়া, পৃষ্ঠা-১৯২-১৯৪।

৫৭৭. নেজামুল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা-১২৮-১৩৩।

যারা না-জায়েয বলেছেন **তাঁদের প্রথম দলিল হলো,** আবিষ্কার স্বত্বটি শুধু একটি স্বত্ব, কোনো বস্তু নয়। আর নিরেট স্বত্বের (الحقوق المجردة) বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই।

তবে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, স্বত্বের বিনিময় নেওয়া না-জায়েয হওয়ার হুকুমটি ব্যাপক নয়; বরং তার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের স্বত্বের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তাঁদের দ্বিতীয় দলিল : যে ব্যক্তি অন্যের কাছে একটি কিতাব বিক্রয় করল, সে ওই কিতাবের সম্পূর্ণ অংশকেই ক্রেতার মালিকানায় দিয়ে দিল। তাই ক্রেতার জন্য সেখানে ইচ্ছেমতো হস্তক্ষেপ করা জায়েয আছে। সুতরাং তার জন্য সেটি মুদ্রণ করাও জায়েয আছে এবং এ ব্যাপারে বিক্রেতা তাকে বাধা দিতে পারবে না।

এভাবে এ দলিলের উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, পণ্যের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা এক বিষয় এবং তার অনুরূপ মুদ্রণ করা ভিন্ন বিষয়। ক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা যে হস্তক্ষেপের মালিক হয়েছে, সেটি প্রথম প্রকারের হস্তক্ষেপ। তাই ওই কিতাব পড়া, সেটি থেকে উপকৃত হওয়া, বিক্রয় করা, দান করা ইত্যাদি হস্তক্ষেপ তার জন্য জায়েয আছে। অনুরূপ কিতাব মুদ্রণ করা পণ্যের এমন উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত নয়, যার মালিক হওয়ার কারণে অনুরূপ কিতাব মুদ্রণের মালিক হবে। এ মাসআলাটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ঢালাইকৃত পয়সার মতো। রাষ্ট্রের কাছ থেকে কেউ সেটি ক্রয় করার পর তার ইচ্ছেমতো বিক্রয়, দান, পরিবর্তন ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু ক্রয়ের মাধ্যমে অনুরূপ পয়সা তৈরি করতে পারবে না। সুতরাং বোঝা গেল, কোনো জিনিসের মালিক হওয়া অনুরূপ জিনিস পুনরুৎপাদনের অধিকার সাব্যস্ত করে না।

তাঁদের তৃতীয় দলিল : যে ব্যক্তি অন্যের আবিষ্কৃত জিনিস উৎপাদন করছে অথবা অনুরূপ কিতাব মুদ্রণ করছে, সে আবিষ্কারক বা লেখকের লোকসানের কারণ হচ্ছে না। সর্বোচ্চ আবিষ্কারক বা লেখকের লাভের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে, আর লাভ কম হওয়া লোকসান নয়।

এভাবে তাদের এ দলিলের উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, লাভ কম হওয়া

---

৫৭৮. ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪৪।

যদিও লোকসান আবশ্যক করে না, তবে সেটি ক্ষতিকারক। লোকসান ও ক্ষতির মধ্যকার পার্থক্যটি সবার কাছে স্পষ্ট। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো কিছু আবিষ্কার বা রচনা করতে অনেক উপকরণ ব্যয় করতে হয় এবং শারীরিক-মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হয়। বড় অঙ্কের অর্থ ও দীর্ঘ সময় দিয়ে আরাম-আয়েশ থেকে দূরে থেকে যে ব্যক্তি কিছু আবিষ্কার করল বা লিখল, আর যে ব্যক্তি এক মুহূর্তে সামান্য অর্থের বিনিময়ে তার থেকে সেটি ক্রয় করল, সে ব্যক্তি অপেক্ষা আবিষ্কারক বা লেখক সেটি হতে লাভ করার ব্যাপারে অগ্রাধিকারী। উপরন্তু সে আবিষ্কারকের বাজারও নষ্ট করছে।

অনেক সময় বলা হয়, একক ব্যক্তির জন্য মুদ্রণ স্বত্বের স্বীকৃতি দেওয়া ইলম গোপন করার কারণ হবে। (এর উত্তর হলো) লেখক যদি তার লিখিত কিতাব পড়তে, শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে বাধা দিত, তা হলেই ইলম গোপন করা হতো। সে যখন মুদ্রণ স্বত্ব সংরক্ষণ করছে, তখন কাউকে তার কিতাব পড়তে বাধা দিচ্ছে না, সেটি শিক্ষা দিতে, শিখতে, তার বিষয়বস্তু প্রচার করতে এমনকি সেটি বিক্রয় ও তার ব্যবসা করতেও বাধা দিচ্ছে না, তবে তার অনুমতি ছাড়া লাভ করার উদ্দেশ্যে অন্য কাউকে মুদ্রণ করতে বাধা দিচ্ছে, তখন কোনোভাবেই এটি ইলম গোপন করা আখ্যা দেওয়া যায় না।

না-জায়েয হওয়ার প্রবক্তাদের সর্বশেষ দলিল হলো, মুদ্রণ স্বত্বের স্বীকৃতি দেওয়া কিতাব প্রচারের পরিধিকে সংকীর্ণ করে দেয়। প্রত্যেকের জন্য যদি মুদ্রণ ও প্রকাশ করার অধিকার থাকে, তা হলে সেটি বেশি প্রচার হবে এবং তার উপকারিতা ব্যাপক হবে। প্রশ্নটি একটি বাস্তব বিষয়, যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ দলিলটি ভিন্ন কিছু প্রমাণ করে। সে দৃষ্টিকোণটি হলো, আবিষ্কারকদেরকে যদি তাদের আবিষ্কৃত জিনিস থেকে লাভ অর্জনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার না-দেওয়া হয়, তা হলে আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে বড় বড় প্রকল্প হাতে নেওয়ার সাহস হারিয়ে যাবে। তারা যখন দেখবে, তাদের আবিষ্কৃত জিনিস সামান্য লাভ দেয়, তখন তারা এমন কাজে আগ্রহী হবে না। এ ধরনের দ্বিমুখী সম্ভাবনাময় বিষয়ে শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ পাওয়া যাওয়া ছাড়া সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো ফিকহি সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না। কেননা, সব বৈধ জিনিসের মধ্যে উপকার-ক্ষতি উভয়টিই রয়েছে।

১১৭. বিশেষ জ্ঞাতব্য

সারকথা, আমাদের কাছে প্রধান্যপ্রাপ্ত মত হলো (এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা
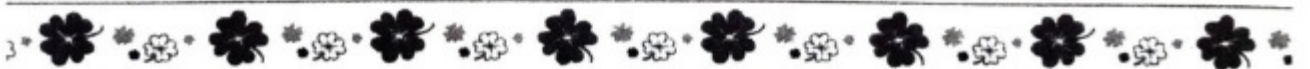
ভালো জানেন) আবিষ্কার ও রচনা স্বত্ব শরিয়ত কর্তৃক স্বীকৃত স্বত্ব। সুতরাং আবিষ্কারক বা লেখকের অনুমতি ছাড়া কারো জন্য এগুলোর মধ্যে হস্তক্ষেপ করা জায়েয নেই। কম্পিউটার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও এ হুকুমটি প্রযোজ্য। তবে কেবল তখনই এ ধরনের স্বত্বের ক্ষেত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ বলে গণ্য হবে, যখন ব্যবসা বা লাভের উদ্দেশ্যে কেউ অনুরূপ পণ্য উৎপাদন, কিতাব মুদ্রণ বা প্রোগ্রাম তৈরি করবে। কেউ যদি নিজে ব্যবহার, বা কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়া বন্ধুদের উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে করে, তা হলে সেটি আবিষ্কার স্বত্বে অবৈধ হস্তক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হবে না। সুতরাং ব্যবসার উদ্দেশ্য ছাড়া কম্পিউটার প্রোগামের মাধ্যমে কিতাব প্রকাশ করে অথবা কম্পিউটার ডিস্ক বা তার অংশবিশেষ প্রকাশ করে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কপি করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়, মৌলিকভাবে এমন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে ওই হুকুম প্রযোজ্য হবে যে, কিতাব বা ডিস্কের মালিক তার ইচ্ছেমতো ব্যক্তিগত উপকারিতার জন্য ব্যবহার করতে পারবে। আবিষ্কারক তাকে বাধা দিতে পারবে না। মূলত নিষিদ্ধ হলো, লাভ বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে অনুরূপ কপি করা। والله تعالى أعلم[৫৭৯]

১১৮ অপশন বিক্রয় করা (Selling Options)

আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং হাউজে যেসব বিক্রয় হয়, তার একটি প্রকার হলো অপশন বিক্রয়। এ বিক্রয়ের প্রক্রিয়া হলো, নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যকার নির্ধারিত মূল্যে একপক্ষ কর্তৃক কোনো ক্রয়-বিক্রয় করাকে আবশ্যক করে নেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, কারোর ভবিষ্যতে কোনো তারিখে

---

৫৭৯. এখানে উল্লেখ করা ভালো মনে করছি যে, আমার সম্মানিত পিতা মুফতি মুহাম্মাদ শফি (রহ.) প্রকাশনা স্বত্ব বিক্রয় না-জায়েয ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁর রচিত মশহুর কিতাব জাওয়াহিরুল ফিকহ-এ ওই ফতোয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু এ ফতোয়া লেখার পর নতুনভাবে এ মাসআলার তাহকিক ও বিশ্লেষণ করার ইচ্ছে করেছিলেন। যেখান থেকে স্বত্বের মাসআলা ও তার বিনিময় গ্রহণের বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তাঁর ওই সিদ্ধান্তের পরই যে কোনো নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তবে তিনি সেটি করার সুযোগ পাননি, ফলে দ্বিতীয় বার গবেষণা করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেন এবং আমি তার মূল বিষয়গুলো জমা করতে শুরু করি। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় সেটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে সেটি সম্পন্ন করতে পারি। সুতরাং আমার এ আলোচনাটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁর প্রকাশিত সিদ্ধান্তের বিপরীত হলেও তাঁর নির্দেশেই সম্পন্ন হয়েছে। তবে তিনি যেহেতু বিষয়টি নিয়ে দ্বিতীয়বার গবেষণা করার ইচ্ছে করেছিলেন, তাই নিশ্চিতভাবে এটিও বলা যাবে না যে, এ সিদ্ধান্তটি তাঁর সিদ্ধান্তের অনুরূপ বা তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। والله تعالى أعلم
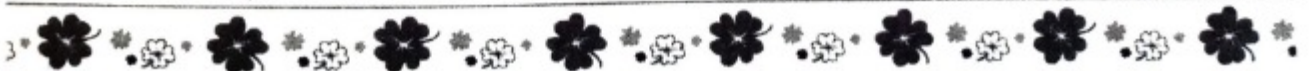
গম ক্রয়ের প্রয়োজন হলো; কিন্তু ক্রয়ের সময়ে গমের মূল্য বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে। এই অবস্থায় অন্য একজন তার কাছে এসে প্রস্তাব করে যে, আজকের মূল্যে আমি নির্দিষ্ট পরিমাণ গম বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবো, আর তোমার খিয়ার (স্বাধীনতা) থাকবে যে, তুমি আমার কাছ থেকে ভবিষ্যতে যে সময়ই আমরা একমত হবো, তখনই তুমি এগুলো (আজকের নির্ধারিত মূল্যে) কিনতে পারবে। এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণের বিনিময়ে সে অর্থ গ্রহণ করে। এই চুক্তিকে অপশনের মূল্য (ثمن الإختيار) নামে অভিহিত করা হয়।

এ পদ্ধতির বিপরীত পদ্ধতি হলো, অনেক সময় ভবিষ্যতের কোনো তারিখে বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করতে চায়। কিন্তু বিক্রয়ের সময় ওই পণ্যের মূল্য কমে যাওয়ার ব্যাপারে শঙ্কিত থাকে, তখন অন্য কেউ তার কাছে এসে বলে, আজকের নির্ধারিত মূল্যে ভবিষ্যতের অমুক তারিখে তোমার থেকে পণ্য ক্রয় করব এবং আমাদের মধ্যে নির্ধারিত যে কোনো তারিখে তা বিক্রয় করার ব্যাপারে তোমার এখতিয়ার থাকবে। এমন দায়িত্ব গ্রহণকারী তার দায়িত্বের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে। বর্তমান সময়ে শেয়ার, মুদ্রা ও আন্তর্জাতিক পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের অপশন বিক্রয়ের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। তবে শরিয়তে ইসলামির দৃষ্টিতে এ ধরনের বিক্রয় বাতিল হিসাবে সাব্যস্ত। কারণ, এক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতাকে কোনো মাল বা আর্থিক স্বত্ব দেয় না। সুতরাং তা

أَكْلُ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

অর্থ : অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করার আওতাভুক্ত হবে।

এ পদ্ধতিকে আরাবুনের পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাখ্যায়িত করা সম্ভব নয়। কারণ, অপশনের অর্থটি বিক্রেতার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়, আর আরাবুনের ক্ষেত্রে হাম্বলি মাযহাবের মতানুযায়ী বৈধ চুক্তি হওয়ায় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ থেকে অর্থ দেওয়া হয়। তা ছাড়া পরবর্তী সময়ে ক্রয় করা হলে অপশনের অর্থকে মূল্যের আওতাভুক্ত করা হয় না। অন্যদিকে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করার বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। এ ধরনের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্ধৃতি হলো ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.)-এর বক্তব্য। তিনি বলেছেন–

فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما، وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري، وان لم أشترها منك، فهذا الدرهم لك، ثم اشترها منه بعد ذلك، بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن، صح، لأن البيع خلا عن الشرط

المفسد... وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة، لم يستحق البائع الدرهم، لأنه يأخذه بغير عوض، ولصاحبه الرجوع فيه، ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخير بيعه من أجله، لأنه لو كان عوضا عن ذلك، لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه.

'যদি বিক্রেতাকে এক দিরহাম দিয়ে বলে, অন্যের কাছে এ পণ্য বিক্রয় করবে না। আর আমি যদি ক্রয় না-করি, তা হলে এ দিরহামটি তুমি পেয়ে যাবে। এমন চুক্তি করার পর যদি পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী তার থেকে সেটি ক্রয় করে ওই দিরহামকে মূল্যের মধ্যে হিসাব করে, এ পদ্ধতিটি সহিহ। কারণ, বিক্রয়টি ফাসেদ শর্তমুক্ত হয়েছে। ... যদি পণ্য ক্রয় না-করে, তা হলে বিক্রেতা সে দিরহাম পাবে না। কারণ, তখন তা বিনিময়হীন হবে, তাই দিরহামের মালিক তা ফেরত নেবে। এটিকে বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করা ও তার কারণে বিক্রয়ে বিলম্ব করার বিনিময় হিসাবে সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ, সেটি যদি ওই সময়ের বিনিময় হওয়া জায়েয হতো, তা হলে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সেটিকে মূল্যের আওতাভুক্ত করা জায়েয হতো না। তা ছাড়া বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করার বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই।'[৫৮০]

বাস্তবতা হলো, এ ধরনের লেনদেন বিক্রয় ও ব্যবসার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার চেয়ে জুয়ার সঙ্গেই বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, সাধারণত অপশন বিক্রেতা যা বিক্রয় করে সে তার মালিক থাকে না; বরং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং ক্রেতাও একই পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে।

প্রচলন থাকার কারণে বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বত্ব বিক্রয় জায়েয হওয়া ও পূর্বে বর্ণিত যেসব স্বত্বের বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে, তার ওপর এ মাসআলাকে কিয়াস করা যাবে না। কেননা, তা এমন শরয়ি স্বীকৃত স্বত্ব, বিক্রয়ের আগে বিক্রেতা যার মালিক হয়ে থাকে। ফলে মূল্যের বিনিময়ে তা ক্রেতার কাছে

---

৫৮০. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), পরিচ্ছেদ: আরাবুন : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৯।

চলে যায়। পক্ষান্তরে অপশোনের বিক্রয় তার বিপরীত। কারণ, তা এমন কোনো স্বত্ব নয়, যা ক্রেতার কাছে স্থানান্তরিত হয়। তা কেবল দায়িত্ব গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে কৃত ওয়াদা এবং এ ধরনের ওয়াদার বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই।

জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি-এর সপ্তম অধিবেশনে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নিচে সেটি উল্লেখ করা হলো—

إن المقصود بعقود الاختيارات، الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف، أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة، أو في وقت معين، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. حكمه الشرعي:

إن عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة.

وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعا.

وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها.

'অপশন বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো, নির্দিষ্ট গুণাগুণের নির্দিষ্ট সময়ে বা সিজনে নির্দিষ্ট মূল্যে কোনো পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণের বিনিময় নেওয়া। এটি সরাসরি বা উভয় পক্ষের অধিকার রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হতে পারে। বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচলিত অপশন বিক্রয়টি একটি নতুন চুক্তি, শরয়ি কোনো চুক্তির আওতাভুক্ত নয়। তা ছাড়া এ ধরনের চুক্তিতে যেহেতু কোনো মাল, উপকারিতা বা আর্থিক স্বত্বের চুক্তি করা হয় না, সেহেতু তার বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। কারণ, শরয়ি দৃষ্টিতে তা একটি না-জায়েয চুক্তি। শুরু থেকে তাতে অংশ নেওয়া জায়েয নেই এবং তার লেনদেন চালু রাখাও জায়েয নেই।'[৫৮১]

---

৫৮১. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যা, ৭ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭১১, সিদ্ধান্ত নং ৭:১:৬৫।
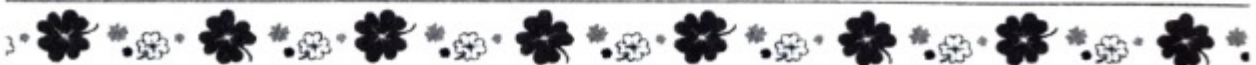
তবে যদি বিনিময় ছাড়া এমন দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়, সেক্ষেত্রে ওয়াদার হুকুম প্রযোজ্য হবে। চুক্তির শব্দের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত ও স্বতন্ত্র আলোচনা করেছি। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

১১৯. দ্বিতীয় শর্ত : পণ্যটি মূল্যমানযুক্ত হওয়া

বিক্রয় জায়েয হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত : পণ্যটি মূল্যমানযুক্ত হওয়া। এটি বিক্রয় অস্তিত্বশীল হওয়ার শর্ত। সুতরাং সামাজিক প্রচলন বা শরয়ি দিক থেকে যে বস্তুর কোনো মূল্য নেই, তার বিক্রয় সংঘটিত হবে না।

১২০. সামাজিক বিবেচনায় যার কোনো মূল্য নেই

সামাজিকভাবে যে বস্তুর কোনো মূল্য নেই তা এমন পণ্য, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় না। ফুকাহায়ে কেরাম এর তালিকায় ভূপৃষ্ঠের সব ধরনের কীট-পতঙ্গ ও সরীসৃপ উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, পিঁপড়া ও কেঁচো। অনুরূপভাবে জমিনের সেসব প্রাণীও এর অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় না। যেমন, সিংহ, বাঘ, শকুন ও উটপাখি।[৫৮২] তবে ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে এ কথা বলেছেন যে, এগুলো বিক্রয় না-জায়েয হওয়ার কারণ হলো, তা থেকে উপকৃত না হতে পারে। সুতরাং কোনো এক বৈধ পন্থায় যদি এগুলো থেকে উপকৃত হওয়া যায়, তা হলে তা বিক্রয় করা জায়েয আছে। এ কারণে শিকারের খাবার হওয়ার কারণে কেঁচো বা পোকা বিক্রয়কে তাঁরা জায়েয বলেছেন।[৫৮৩] এমনকি অনেক আলেম গৃহ সজ্জার কাজে ব্যবহৃত দৃষ্টিনন্দন পতঙ্গ বিক্রয়কে জায়েয ফতোয়া দিয়েছেন, যদিও তা অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয় না।[৫৮৪] হাতি ও অনুরূপ যেসব প্রাণীর চামড়া বা হাড় থেকে উপকৃত হওয়া যায়, সেগুলোর বিক্রয়কেও তাঁরা জায়েয বলেছেন। আল্লামা হাসকাফি (রহ.) 'আদ-দুররুল মুখতার' কিতাবে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করার পর বলেছেন–

والحاصل: أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع.

---

৫৮২. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৬৮। নেহায়াতুল মুহতাজ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮৩। আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০২।

৫৮৩. কাশশাফুল কিনা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫২।

৫৮৪. ইমদাদুল আহকাম, শাইখ যফর আহমাদ থানবি (রহ.), অধ্যায়ঃ বিক্রয় : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৫-৩৭৬।

'সারকথা, বিক্রয় জায়েয হওয়ার বিষয়টি উপকৃত হওয়া বৈধ হওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত।'

এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন–

ونقل السائحاني عن الهندية : ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار اهـ وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات

'সায়িহানি হিন্দিয়া কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেছেন, 'শূকর ছাড়া অন্য সব প্রণী বিক্রয় করা জায়েয আছে। এটিই পছন্দনীয় মত।' হেদায়া ও অন্যান্য কিতাবের 'বিবিধ অধ্যায়ে' এটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে।'[৫৮৫]

এখান থেকে বোঝা গেল, সামাজিক প্রচলনের কারণে কোনো কিছু মূল্যবিশিষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে সেটি থেকে উপকৃত হওয়া যায়। সুতরাং সামাজিক প্রচলনে যা থেকে উপকৃত হওয়া যাবে, সেটিই সামজিকভাবে মূল্যবিশিষ্ট হিসাবে গণ্য হবে। তবে সেটির বিক্রয় জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হলো, শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ হতে হবে। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন–

وجملة ذلك : أن كل مملوك أبيح الانتفاع به، يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع.

'সারকথা, শরিয়ত যেগুলোর বিক্রয় হারাম করেছে, সেগুলো ছাড়া উপকৃত হওয়া বৈধ এমন সব মালিকানাধীন জিনিস বিক্রয় করা জায়েয আছে।'[৫৮৬]

১২১. শরয়িভাবে যেসব জিনিস মূল্যহীন সাব্যস্ত

যেসব জিনিস থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নেই, শরিয়তে এ ধরনের সবকিছুই মূল্যহীন এবং এগুলো বিক্রয় করাও না-জায়েয। যেগুলো মূল্যবিশিষ্ট নয় তা হলো, এমন জিনিস যা শুধু অবৈধ কাজে ব্যবহৃত হয়।

---

৫৮৫. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: ফাসেদ বিক্রয় : খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৬০৪, ফিকরাহ নং ২৩৪১৩।

৫৮৬. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০২। মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৩। আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩৯।

১২২. মদ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য বিক্রয় করা

মদ বিক্রয় করা জায়েয নেই। কারণ, তা মাল হলেও শরয়ি দৃষ্টিতে সেটি মূল্যমানযুক্ত কোনো মাল নয়। সুতরাং কোনো মুসলিম মদ বিক্রয় করলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেটি বাতিল হবে। আর মদকে যদি মূল্য হিসাবেও গণ্য করা হয়, তা হলেও সেই তিন ইমামের মতানুযায়ী বিক্রয় বাতিল হবে, যাঁরা বাতিল ও ফাসেদের মধ্যে পার্থক্য করেন না। হানাফি মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মতানুযায়ী মদের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করলে বিক্রয় ফাসেদ হবে, বাতিল হবে না। এক্ষেত্রে ক্রেতাকে অমুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত মদের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) 'আত-তালবিহ' কিতাব থেকে উদ্ধৃত করে এভাবে উভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, 'মূল্য আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং সেটি উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর উপকরণ। কেননা, বস্তুর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায়, মূল্যের মাধ্যমে নয়। এ কারণে পণ্যের উপস্থিতি শর্ত করা হয়েছে, মূল্যের উপস্থিতিকে শর্ত করা হয়নি। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যটি বিক্রয়ের শর্তসমূহের একটি শর্ত হয়েছে। অতএব, একটি বিনিময় মূল্যবিশিষ্ট না-হওয়ার কারণে বিক্রয় ফাসেদ হবে।'[৫৮৭] অনুরূপভাবে পরস্পর বিনিময়ের মাধ্যমে বিক্রয় করলেও এদিক থেকে সেটি ফাসেদ হবে যে, মদকে পণ্য না-মেনে মূল্য মানা হবে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেছেন–

> والعكس، وإن كان ممكنا لكن ترجح هذا الاعتبار، لما فيه من الاحتياط للقرب، من تصحيح تصرف العقلاء المكلفين بطريق الإعزاز للعرض، فاعتبرنا ذكرها لإعزاز الثوب لا للخمر، فوجبت قيمة العرض لا الخمر.
>
> 'বিপরীত পদ্ধতিটি যদিও সম্ভাব্য, তবে এ দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। কারণ, সেখানে প্রস্তাব মূল্যায়ন করতে জ্ঞানসম্পন্ন মুকাল্লাফ ব্যক্তিদের লেনদেন সহিহ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করা হয়। তাই তাদের প্রস্তাবকে কাপড়ের মূল্য

---

৫৮৭. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৪, ফিকরাহ নং ২২১৬৯। মিনহাতুল খালেক : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৩০।
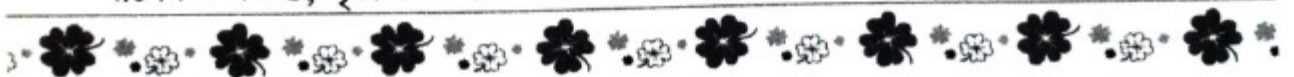
সাব্যস্ত করতে হবে, মদের মূল্য নয়। সুতরাং কাপড়ের মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হবে, মদের মূল্য দেওয়া ওয়াজিব নয়।'[৫৮৮]

এটি হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। কিন্তু আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) এক্ষেত্রেও বিক্রয় বাতিল হওয়ার মতের দিকে ঝুঁকেছেন, যদিও মদ মূল্য বা পণ্য হয়। ফাসেদ বিক্রয়ের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ।

মদ বিক্রয় হারাম হওয়া সম্পর্কে যে আলোচনা করা হলো মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব অনুযায়ী তা অন্যান্য হারাম নেশাদ্রব্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হানাফি মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.)-এরও এ মত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী শুধু আঙ্গুরের রস থেকে উৎপাদিত মদের ক্ষেত্রেই হারামের বিধান প্রযোজ্য হবে। কারণ, সেটিই প্রকৃত মদ। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী অন্যান্য পানীয় বিক্রয় করলে সেটি মাকরুহ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতানুযায়ী আঙ্গুর ও খেজুর ছাড়া অন্যান্য উপাদান থেকে উৎপাদিত পানীয়ের ক্ষেত্রে এ হুকুম হবে। লেনদেনের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হবে। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং 'ইনায়াহ'[৫৮৯] কিতাব থেকে মাকরুহ হওয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এখান থেকে বোঝা যায়, মাকরুহ হওয়ার মতটি তখন প্রযোজ্য হবে, যখন কোনো অবৈধ উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। তবে যদি বৈধ উদ্দেশ্যে এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তা হলে সেটিকে মাকরুহে তাহরিমি বলা যাবে না। বৈধ উদ্দেশ্যের উদাহরণ হলো, আরোগ্যের জন্য ড্রেসিং করা, খাবার-পানীয় ছাড়া বর্তমান সময়ের কালি ও সুগন্ধির মতো অন্য কোনো বস্তু ব্যবহার করা। যদিও এগুলোর ব্যবহার পরিহার করে চলা উত্তম, বিশেষ করে বিকল্প ঔষধ পাওয়া গেলে।

১২৩. অ্যালকোহল মিশ্রিত ঔষধ ও খাবার

বর্তমানে অধিকাংশ ঔষধ ও অনেক খাবার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নেশাজাতীয় অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়। কারণ, সেটি খাবার সংরক্ষণ করে

---

৫৮৮. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১৬।

৫৮৯. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: আশরিবাহ : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৫৪।

(Preservative)। তা ছাড়া অন্যান্য ক্যামিক্যালের জন্য সেটি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে অনেক কারখানা এটি ব্যবহারের বিকল্প দেখছে না। এর ব্যবহার ব্যাপকরূপ ধারণ করেছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারে এগুলোর শরয়ি হুকুম জানা আমাদের জন্য জরুরি। এগুলোর ব্যবহার তিন ভাগে বিভক্ত :

১. চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা।

২. অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা। যেমন: কালি, সুগন্ধি ও রং ইত্যাদিতে।

৩. খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ব্যবহার করা। যেমন: চকলেট, আইসক্রিম, বিস্কুট ও অন্যান্য খাবারে ব্যবহার করা।

ঔষধের জন্য ব্যবহৃত অ্যালকোহলের বিষয়টি হলো, এক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরামদের ফতোয়া ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের ওপর। আর তা হলো, হারাম বস্তুর মাধ্যমে আরোগ্য পাওয়ার বিষয়টি জানা গেলে এবং বিকল্প কোনো ঔষধ না থাকলে তার মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েয আছে। মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরামদের মতে এ হুকুমটি সব হারামের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। এমনকি মদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে।[৫৯০]

শাফেয়ি মাযহাবের সিদ্ধান্ত : শাফেয়ি মাযহাবের ফকিহগণ বলেছেন, নেশা সৃষ্টি করে না-এমন হারাম বস্তুর মধ্যে আরোগ্য নিশ্চিত হলে সেটির মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েয আছে। তবে নেশা সৃষ্টিকারী হারাম বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েয নেই।[৫৯১] তবে যদি অন্য ঔষধের মধ্যে মদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়, তা হলে তার হুকুমটি অন্যান্য হারাম বস্তুর মতো হবে। অর্থাৎ, বিকল্প হালাল ঔষধ না-পাওয়া গেলে তার মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েয আছে। আল্লামা রমালি (রহ.) বলেছেন–

(والأصح تحريمها) (أي الخمر) صرفا (لدواء) ... أما مستهلكة مع دواء آخر فيجوز التداوي بها كصرف بقية النجاسات إن عرف، أو أخبره طبيب عدل بنفعها وتعيينها بأن لا يغني عنها طاهر

---

৫৯০. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম কিতাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অধ্যায়: হুদুদ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৯-১৮০।

৫৯১. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫০-৫১।
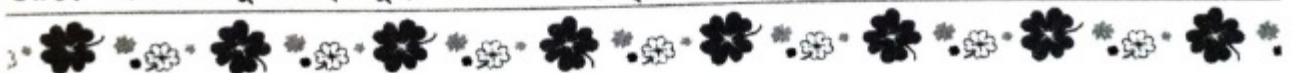
'সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো, ঔষধের জন্য সেটি (খাঁটি মদ) ব্যবহার করা হারাম।... তবে যদি অন্য ঔষধের মধ্যে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়, তা হলে তার মধ্যে আরোগ্য জানা গেলে অথবা ন্যায়পরায়ণ (দীনদার) ডাক্তার তার উপকারিতার কথা বললে এবং সেটির বিকল্প কোনো হালাল ঔষধ না-পাওয়া গেলে, অন্যান্য নাপাক বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করার মতো তা দিয়েও চিকিৎসা করা জায়েয আছে।'[৫৯২]

মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের সিদ্ধান্ত : হারাম বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা না-জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মালেকি ও হাম্বলি মাযহাব একমত।[৫৯৩] এক্ষেত্রে মদ ও অন্যান্য হারাম বস্তু সমান। তবে মালেকি মাযহাবের একটি মত শাফেয়ি মাযহাবের অনুরূপ যে, অন্য ঔষধের মধ্যে যদি মদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়, তা হলে বিকল্প ঔষধ পাওয়া না গেলে সেটির মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েয আছে। আল্লামা হাত্তাব (রহ.) বলেছেন–

أما أكله والتداوي به في باطن الجسد، فالاتفاق على تحريمه ... حكى الزناتي فيما إذا استهلكت الخمر في دواء بالطبخ، أو بالتركيب، حتى يذهب عينها ويموت ريحها وقضت التجربة بإنجاح ذلك الدواء، قولين بالجواز والمنع. قال: وإن لم تقض التجربة بإنجاحه لم يجز باتفاق، انتهى. قلت: والظاهر المنع مطلقا.

'সেটি খাওয়া ও তার মাধ্যমে শরীরের ভেতরে চিকিৎসা করার বিষয়টি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হারাম। ... যানাতি বর্ণনা করেছেন, 'পাকানো বা মেশানোর কারণে অন্য ঔষধের মধ্যে মদ যখন এমনভাবে মিশে যাবে যে, তার অস্তিত্ব ও গন্ধ দূর হয়ে যাবে এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সেটির সফলতার সাক্ষী দেয়, এমন ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুই ধরনের মত রয়েছে। একটি জায়েয ও অপরটি না-জায়েয। তিনি বলেন, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা যদি

---

৫৯২. নেহায়াতুল মুহতাজ, আল্লামা রমালি (রহ.) : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৪।

৫৯৩. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), অধ্যায়ঃ খাবার সামগ্রী : খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৮৩। হাম্বলি মাযহাবে কোনো বস্তুর মধ্যে মদ মিশ্রিত হওয়ার মাসআলার আলোচনা করা হয়নি, শাফেয়ি ও মালেকি মাযহাবে যেটি করা হয়েছে।
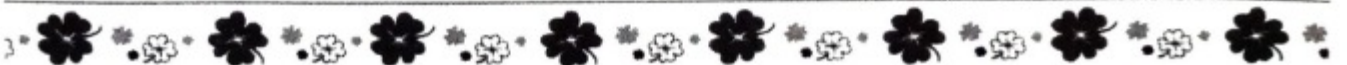
> সফলতার স্বাক্ষী না দেয়, তা হলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেটি ব্যবহার করা জায়েয নেই।' তার বক্তব্য এখানে শেষ। তার স্পষ্ট কথা হলো, শর্তহীনভাবে এগুলো ব্যবহার করা না-জায়েয।'[৫৯৪]

সারকথা, মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, মদের মাধ্যমে চিকিৎসা করা শর্তহীনভাবে না-জায়েয। যদি অন্য কোনো হালাল ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এবং তার বিকল্প না-পাওয়া যায়, তা হলে শাফেয়ি মাযহাব ও মালেকি মাযহাবের কিছু আলেমের মতানুযায়ী তার মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েয আছে। হানাফি মাযহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতানুযায়ী বিকল্প ঔষধ না-পাওয়া গেলে শর্তহীনভাবেই তা দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয আছে। (যদিও অন্য হালাল ঔষধে তার অস্তিত্ব বিলীন না হয়)

চিকিৎসা ছাড়া অন্য কাজে অ্যালকোহল ব্যবহার করার হুকুম সেটি পবিত্র বা অপবিত্র হওয়ার ওপর নির্ভর করবে। যেমন, সুগন্ধি, রং ও কালিতে ব্যবহার করা অ্যালকোহল। হানাফি মাযহাবের পছন্দনীয় মত থেকে ইতঃপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, চারটি পানীয় (আঙ্গুর অথবা খেজুর থেকে উৎপাদিত পানীয়) ছাড়া অন্য পানীয় নাপাক নয়। বর্তমানে ব্যবহৃত অ্যালকোহল যেহেতু এ চারটি পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতানুযায়ী সেগুলো নাপাক নয়। এ কারণে তাদের মতানুযায়ী অ্যালকোহল মিশ্রিত সুগন্ধি, রং ও কালি ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েয আছে।

অনুরূপভাবে যারা বলেন, মদ ও মাদক জাতীয় পানীয় হারাম, তবে নাপাক নয়। তাদের মতানুযায়ী এগুলো ব্যবহার করা জায়েয আছে। আল-কুরআনুল কারিমের আয়াতে বর্ণিত নাপাকের উদ্দেশ্য হলো, হুকুমের দিক থেকে নাপাক, বাহ্যিক নাপাক নয়। এ মতটি ইমাম মালেক (রহ.)-এর শাইখ রবিয়া ইবনে আবি আবদুর রহমান, শাফেয়ি মাযহাবের ইমাম মুযানি, লাইস বিন সাদ, মালেকি মাযহাবের বাগদাদ ও কারাউইন এলাকার মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরামদের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে।[৫৯৫] ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন, এটি দাউদ যাহেরি (রহ.)-এর মত। নববি (রহ.) তাঁর দলিলকে সমর্থন দিলেও আলোচনার শেষে বলেছেন, 'এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তার মধ্যে সুন্দর কথা হলো ইমাম গাযালি (রহ.)-এর বক্তব্য : কুকুর ও কুকুরে

---

৫৯৪. মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৯।

৫৯৫. আল-জামে লি আহকামিল কুরআন, ইমাম কুরতুবি (রহ.) : খণ্ড-৩-৬, পৃষ্ঠা-২৬৯, সুরা: মায়েদা, আয়াত-৯০।
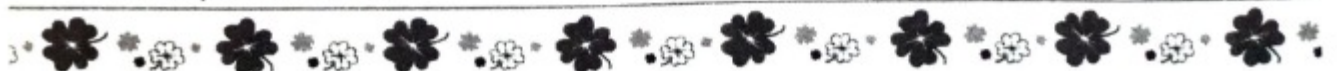
মুখ দেওয়া বস্তুর হুকুমের ওপর কিয়াস করে, সতর্কতা হিসাবে এগুলোর ক্ষেত্রে নাপাকির হুকুম দেওয়া হবে।'[৫৯৬] মুতাআখখিরিন ও সমকালীন কিছু আলেম লেখকদের একটি জামাত পাক হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ যাঁদের নাম নেওয়া যায় তাঁদের কয়েকজন হলেন, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান, শাইখ তাহের বিন আশুর, শাইখ রশিদ রেজা ও শাইখ সালেহ আল-উসাইমিন (রহ.)।[৫৯৭]

অনুরূপভাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতানুযায়ী অ্যালকোহল মিশ্রিত বস্তু পাক হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া যায়। কেননা, এ ব্যাপারে তিনি পানি ও অন্যান্য তরল দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য করেন যে, পানি দুই কুল্লা হওয়ার পর সেখানে নাপাক পড়ে যদি পানির গুণ পরিবর্তন না-হয়, তা হলে পানি নাপাক হবে না। তিনি বলেন, 'যেমনভাবে পানি নাপাক হয় না, অনুরূপভাবে অন্যান্য তরল পদার্থও নাপাক হবে না। এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত; বরং এগুলো নাপাক না-হওয়ার বিষয়টি পানি অপেক্ষা বেশি যুক্তিসঙ্গত।'[৫৯৮] সাধারণত এ ধরনের মিশ্রণ যেহেতু বড় পরিমাণে হয়ে থাকে, সেহেতু তিনি অ্যালকোহলকে নাপাক বললেও তার মতানুযায়ী অ্যালকোহল মিশ্রিত হওয়ার কারণে সেগুলো নাপাক না-হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।[৫৯৯]

মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের মত হলো, ভালোভাবে অ্যালকোহল মিশ্রিত সুগন্ধির হুকুম হলো সন্দেহযুক্ত। কারণ, তাদের মতানুযায়ী সব ধরনের অ্যালকোহল নাপাক। যদি পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থের মধ্যে মদ পড়ে এবং ওই তরল পদার্থের পরিমাণ বেশি হয় এবং মদ তার কোনো গুণ পরিবর্ত না-করে দেয়, তা হলেও সেটিকে নাপাক করে দেবে।[৬০০]

---

৫৯৬. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, অধ্যায়: হায়েজ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৬৪।

৫৯৭. আর-রাওযাতুন নাদিয়া, ড. সিদ্দিক হাসান খান : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০। আত-তাহরির ওয়াত তানবির, আল্লামা ইবনে আশুর (রহ.) : খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৫। তাফসিরুল মানার : খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৮, সুরা: মায়েদা, আয়াত-৯০। আশ-শারহুল মুমাত্তা আলা জাদিল মুসতাকনা, আল্লামা উসাইমিন (রহ.) : খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৯৫।

৫৯৮. মাজমুউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫14 ও খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫০৮।

৫৯৯. মাজমুউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : খণ্ড-৩৪, পৃষ্ঠা-২১২।

৬০০. ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন, পানি ছাড়া অন্যান্য তরল ও ভেজা জিনিসের হুকুম হলো, তা কয়েক কুল্লাহ পরিমাণ হলে তাতে নাপাক মিশ্রিত হলে তা নাপাক হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আমাদের ইমামদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। (আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, অধ্যায় : পবিত্রতা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৫) আল্লামা খলিল (রহ.) বলেছেন, সামান্য নাপাক মিশ্রিত হওয়ার কারণে অনেক তরল খাদ্য হলেও তা নাপাক হয়ে যাবে। আল্লামা হাত্তাব (রহ.) বলেছেন,

এটি এ তিন মাযহাবের পছন্দনীয় মত। তবে উল্লিখিত তিন মাযহাবের প্রত্যেকটিতেই এমন অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত মত রয়েছে যে, সব ধরনের তরল পদার্থ পানির হুকুমে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)[৬০১] সেগুলো বর্ণনা করেছেন এবং আমরা বিভিন্ন মাযহাবের যেসব কিতাব পেয়েছি সেগুলোর টীকায় তার সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

আমাদের আলোচনার সারকথা হলো, চার ইমামের মধ্যে শুধু ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) অথবা ইমাম রবিয়াহ ও অন্যান্য ফকিহের মত ছাড়া অন্য কোনো মতানুযায়ী অ্যালকোহল মিশ্রিত কোনো বস্তু পাক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না। তবে এঁদের প্রতি এ মত সম্পৃক্ত করা সহিহ কি না তা والله تعالى أعلم

সুতরাং সমকালীন অনেক আলেম যে ধারণা করেন যে, পবিত্র জিনিসের মধ্যে মদের অস্তিত্ব বিলীন হলে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) সেটি পাক বলেছেন, তাঁদের এ ধারণা সহিহ নয়; বরং তিনি বলেছেন, অন্য ঔষধ না-পাওয়া গেলে সেটি দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয আছে। এ ব্যাপারে ইতঃপূর্বে শাফেয়ি মাযহাবের উলামায়ে কেরামের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। তাঁদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, নাপাক থাকা অবস্থায় সেটি দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েয আছে। কেননা, তাদের বক্তব্যে এ শর্তের সঙ্গে জায়েয বলা হয়েছে যে, ওই রোগের জন্য ওই ঔষধের বিকল্প না-থাকা। অন্য পবিত্র জিনিসের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার কারণে যদি পাক হয়ে যেত, তা হলে বিকল্প ঔষধ না-থাকার শর্তারোপ করা হতো না। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায়, তাঁদের কাছে এ হুকুমটি শুধু চিকিৎসার জন্য। সুগন্ধি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য হবে না। কারণ, তাদের মূলনীতি হলো, নাপাকের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার কারণে যেসব জিনিস নাপাক হয়, সেগুলো যদি জমাট হয়, তা হলে সেগুলো বিক্রয় করা জায়েয আছে। যেমন, কাপড়। আর যদি তরল হয়, তা হলে সেগুলো পাক করার কোনো উপায় নেই এবং তা বিক্রয় করাও জায়েয নেই। যেমন, সিরকা, গুড়।[৬০২] তাঁদের

আমাদের পূর্ব বর্ণিত হুকুম থেকে খাদ্যের জন্য ভিন্ন কোনো বৈশিষ্ট নেই; ...বরং তা অন্য তরল পদার্থের হুকুমে হবে। (মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৮ ও ১১০) ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) এ মাসআলায় তিনটি মত বর্ণনা করেছেন, যার প্রথমটি হলো, বেশি হলে নাপাক মিশ্রিত কারণে তা নাপাক হয়ে যাবে। আর শেষে বলেছেন, প্রথম মতটিই উত্তম।' খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯

৬০১. মাজমাউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৪৮৯।

৬০২. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩৫। আল-বুজাইরামি
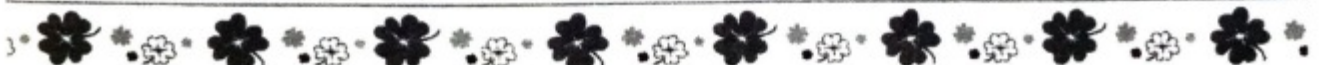
মতানুযায়ী অন্যের মধ্যে বিলীন হওয়ার মাধ্যমে পাক হওয়ার বিষয়টি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে অনেক পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়। শাফেয়ি মাযহাবে যার পরিমাণ হলো দুই কুল্লা। আর পানি ছাড়া অন্যান্য তলর পদার্থের ক্ষেত্রে শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, নাপাক লাগার সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলো নাপাক হয়ে যাবে, যদিও তা কয়েক কুল্লা পরিমাণ হোক না কেন। সুতরাং এ মূলনীতি অনুযায়ী পানি ছাড়া অন্য তরল পদার্থে অ্যালকোহল মিশ্রিত করলে তার অস্তিত্ব বিলীন হলেও সেটি পাক হবে না।

তবে তরল পদার্থে মিশ্রিত অ্যালকোহলের পরিমাণ যদি এত কম হয় যে, সেটি না থাকার মতো, তা হলে শাফেয়ি মাযহাব অনুযায়ী সেটিকে জায়েয বলার সুযোগ রয়েছে। কেননা, তাঁরা বলেছেন, নাপাকের পরিমাণ যদি এত কম হয় যে, সেটি দেখা যায় না। অর্থাৎ, কম হওয়ার কারণে সেটি চোখে পড়ে না, সেটি এভাবে যে, কাপড় ইত্যাদির রঙের বিপরীত রঙের হওয়ার পরও কাপড়ে পড়ার পর সেটি দেখা যায় না, অথবা প্রস্রাব ইত্যাদির বিন্দুর মতো ছোট ফোঁটা পড়ে, তা হলে যার মধ্যে পড়েছে সেটি পানি না-হলেও এমন ক্ষেত্রে নাপাক না-হওয়ার মত রয়েছে। আল্লামা মাওয়ারদি (রহ.) এটিকে সহিহ বলেছেন। যদিও এটি সহিহ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে শাফেয়ি মাযহাবের কিছু ফকিহ মাওয়ারদি (রহ.)-এর বিরোধিতা করেছেন।[৬০৩]

এ ব্যাপারে হাম্বলি মাযহাবও শাফেয়ি মাযহাবের অনুরূপ যে, পানি ছাড়া অন্যান্য তরল পদার্থে নাপাক পড়লে তার পরিমাণ দুই কুল্লার বেশি হলেও তা নাপাক হয়ে যাবে; বরং তাঁদের মাযহাবকে এ দিক থেকে আরও কঠোর মনে হয় যে, চোখে পড়ে না এমন নাপাককে শাফেয়ি মাযহাবে বাদ দিলেও তাঁরা এ হুকুম থেকে সেটিকে বাদ দেননি। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন–

> ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، سواء كان اليسير مما يدركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات... لأن دليل التنجيس لا يفرق بين يسير النجاسة وكثيرها، ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه، فالتفريق تحكم بغير دليل.

> 'নাপাক কম-বেশি হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। চাই কমের

আলাল খতিব, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫।

৬০৩. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, অধ্যায়: পবিত্রতা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৬-১২৭।

পরিমাণটি চোখে পড়ুক বা না-পড়ুক। সব ধরনের নাপাকের একই হুকুম। ... কারণ, নাপাকের দলিল কম-বেশি এবং চোখে পড়া না-পড়ার মধ্যে পার্থক্য করেনি। সুতরাং দলিল ছাড়া পার্থক্য করা হঠকারী সিদ্ধান্ত।’[৬০৪]

১২৪. অ্যালকোহল মিশ্রিত খাবার

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী অ্যালকোহল মিশ্রিত খাবার-পানীয় যদি নেশা সৃষ্টি না-করে, তা হলে সেটি হারাম হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মাযহাব অনুযায়ী হানাফি মাযহাবের মুতাআখখিরিন আলেমগণ ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতের ওপর ফতোয়া দিয়েছেন যে, নেশাদ্রব্যের কম-বেশি সবই হারাম। তবে এ ফতোয়ার ক্ষেত্র হলো, সরাসরি ওই দ্রব্যের ব্যাপারে। তাই অ্যালকোহলকে যদি অন্য কোনো বস্তুর সঙ্গে মেশানো হয় এবং তার মধ্যে মিশে যায়, তা হলে সেটি ব্যবহার করা জায়েয হবে। তবে মেশার প্রক্রিয়াটি অ্যালকোহলের অস্তিত্ব বিলীন করার মাধ্যমে হতে হবে, শুধু গুণের পরিবর্তনের কারণে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে না। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) এ সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন–

> إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة؛ لأنه عصير جمد بالطبخ؛ وكذا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ففيه تغير وصف فقط؛ كلبن صار جبنا، وبر صار طحينا، وطحين صار خبزا؛ بخلاف نحو خمر صار خلا وحمار وقع في مملحة فصار ملحا، ... فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف

> ‘গুড়ের মধ্যে প্রকৃত কোনো পরিবর্তন হয় না। কারণ, সেটি এমন রস, যা পাকানোর মাধ্যমে জমাট বেঁধেছে। অনুরূপভাবে যখন তিলের ঘানি ভাঙানো হয় এবং তার খৈলের সঙ্গে তেল মিশ্রিত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে শুধু তার গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। সেটা দুধ পনির হওয়া, গম আটা হওয়া ও আটা রুটি হওয়ার মতো হয়েছে। তবে মদ সিরকা হওয়া ও গাধা লবণে পড়ে লবণে

৬০৪. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), অধ্যায়: পবিত্রতা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০-৩১।

পরিণত হওয়ার বিষয়টি অনুরূপ নয়। ... কারণ, এগুলো হলো এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে পরিণত হওয়ার মতো, শুধু গুণ পরিবর্তনের মতো নয়।'[৬০৫]

সুতরাং যদি প্রকৃত অর্থে অ্যালকোহলের সত্তা পরিবর্তন না-হয়; বরং শুধু গুণ পরিবর্তন হয়, তা হলে হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মতানুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করা জায়েয নেই। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ছাড়া আর কাউকে এমন জিনিস ব্যবহার জায়েয বলতে দেখিনি। তিনি গুণ পরিবর্তনকে সত্তা পরিবর্তনের হুকুম সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

إن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت، لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلا، كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع، لم يكن الشارب لها شاربا للخمر.

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা খারাপ জিনিসগুলো হারাম করেছেন। সেগুলো হলো, রক্ত, মৃত প্রাণী, শূকরের গোশত ও অনুরূপ অন্যান্য জিনিস। সুতরাং এগুলোর কোনো একটি যখন পানি বা অন্য কিছুর মধ্যে পড়বে এবং এমনভাবে মিশে যাবে যে, সত্তাগতভাবে সেখানে কোনো রক্ত, মৃত প্রাণী বা শূকরের গোশত থাকবে না, যেমনঃ কোনো তরল পদার্থের মধ্যে মদ পড়ে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেল, তা পানকারীকে মদ পানকারী বলে সাব্যস্ত করা হবে না।'[৬০৬]

জমাট নেশাদ্রব্যের বিষয়টি হলো, সেগুলো নাপাক নয়। যেমন : আফিম, হিরোইন, গাঁজা ইত্যাদি। ঔষধ ও অন্যান্য শৈল্পিক কাজে বৈধ পদ্ধতিতে এগুলো ব্যবহার করা সম্ভব।[৬০৭] সুতরাং শরয়ি দৃষ্টিতে এগুলো বিক্রয় করা

---

৬০৫. আদ-দুররুল মুহতার, অধ্যায় : পবিত্রতা, পরিচ্ছেদঃ নাপাক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৯, ফিকরাহ নং ২৮৫৩।

৬০৬. মাজমাউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫০১-৫০২।

৬০৭. আল-মাজমু শারহুল মাহায্যাব, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩০। আল-হাবি, আল্লামা মাওয়ারদি (রহ.) : খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা-২০৮। জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, আল্লামা ইবনে রজব (রহ.), পৃষ্ঠা-৩৯৭-৩৯৮।

জায়েয আছে। আল্লামা হাসকাফি (রহ.) 'আদ-দুররুল মুখতার'[৬০৮] কিতাবে অনুরূপ বলেছেন এবং মালেকি মাযহাবের আল্লামা হাত্তাব (রহ.) বলেছেন–

وكذلك يقال في هذه الأشياء المغيبة للعقل يجوز بيع ذلك لمن لا يستعمل منه القدر المغيب للعقل ويؤمن أن يبيعه ممن يستعمل ذلك

> 'অনুরূপভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপকারী সব বস্তুর ক্ষেত্রে বলা হবে, এমন ব্যক্তির কাছে এগুলো বিক্রয় করা জায়েয আছে, যে ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপ হওয়া পরিমাণ ব্যবহার করবে না। সেইসঙ্গে এমন আস্থা রাখা যায় যে, সে-ও এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করবে যে ওই পরিমাণই ব্যবহার করবে।'[৬০৯]

তার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হলো, বিক্রেতা যদি জানতে পারে যে, ক্রেতা সেটি অবৈধ কাজে ব্যবহার করবে, তা হলে তার জন্য ওই ক্রেতার কাছে বিক্রয় করা জায়েয নেই। হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এ শর্তটি উল্লেখ করেননি। ইতঃপূর্বে চুক্তির শর্তের শিরোনামে মদ তৈরি করবে এমন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুরের রস বিক্রয়ের আলোচনায় উল্লিখিত মতানৈক্য ও বিস্তারিত আলোচনা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তবে এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, তাদের মতে এগুলো বৈধ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব, সুতরাং এই উদ্দেশ্যে তা বিক্রয় করা জায়েয আছে।

১২৫. শূকর ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয় করা

অনুরূপভাবে শরয়ি দৃষ্টিতে মূল্যবিশিষ্ট 'মাল' না-হওয়ার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মতে শূকর ও তার অঙ্গ বিক্রয় করা জায়েয নেই। তবে মৃত প্রাণীর পশম বিক্রয় জায়েয হওয়ার মতো শূকরের পশম বিক্রয় করাও জায়েয হওয়ার সপক্ষে মালেকি মাযহাবের ইবনুল কাসেম (রহ.)-এর মত রয়েছে।[৬১০] সম্ভবত এ মতের মূলভিত্তি হলো, শূকর নাপাক এবং তার থেকে উপকৃত হওয়া হারাম হওয়ার বিষয়টি তার গোশতের সঙ্গে নির্দিষ্ট।[৬১১] অথবা

---

৬০৮. আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: পানীয় : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৫৪।

৬০৯. মাওয়াহিবুল জালিল, অধ্যায়: পবিত্রতা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯০।

৬১০. মাওয়াহিবুল জালিল, অধ্যায়: পবিত্রতা : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬২।

৬১১. আল্লামা শাওকানি (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তিনি এটি গ্রহণ করেছেন। (ফাতহুল কাদির, আল্লামা শাওকানি (রহ.) : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৬, সুরা : আনআম)
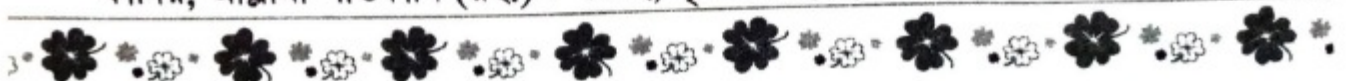
শূকর হারাম হলেও তার সত্তা নাপাক নয়। আর আল-কুরআনুল কারিমে সেটিকে নাপাক বলার উদ্দেশ্য হলো, সেটি মন্দ ও অপরিচ্ছন্ন। অনেক আলেম এ মতকে ইমাম মালেক (রহ.)-এর প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন।[৬১২] মালেকি মাযহাবের কিতাবে আমি এমন কোনো বক্তব্য পাইনি। আর যদি হয়েও থাকে, তা হলেও সেটি শায মত হবে।

তবে ফুকাহায়ে কেরামের একটি বড় জামাত প্রয়োজনের কারণে মোজা সেলাইয়ের কাজে শূকরের পশম ব্যবহারকে জায়েয বলেছেন।[৬১৩] তারা বলেছেন, 'এমনকি যদি শূকরের পশম বিনামূল্যে না-পাওয়া যায়, তা হলে প্রয়োজনের কারণে তা ক্রয় করাও জায়েয আছে। তবে এগুলো বিক্রয় করা না-জায়েয এবং তার মূল্য হালাল হবে না।'[৬১৪] উপর্যুক্ত কারণ এটি দাবি করে যে, বর্তমান যুগে শূকরের পশম থেকে উপকৃত হওয়া এবং তা ক্রয় করা না-জায়েয। কেননা, বর্তমানে মোজা সেলাই করার জন্য অনেক উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং শূকরের পশম ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার সময় এসেছে। আর তার সত্তা নাপাক ও হারাম। অতএব, বর্তমানে সেই আসল হুকুমে ফিরে আসবে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) 'আল-বাহরুর রায়েক' ও আল্লামা হাসকাফি (রহ.) 'আদ-দুররুল মুখতার' কিতাবে এটি বলেছেন।[৬১৫] বর্তমানে দাঁতের ব্রাশ, দেয়াল রং করতে ব্যবহৃত ব্রাশে শূকরের পশম ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। সুতরাং শূকরের পশম নাপাক হওয়ার কারণে তা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নেই। অন্যান্য পদার্থের উৎপাদিত ব্রাশের মাধ্যমে শূকরের পশম পরিহার করা সম্ভব। والله تعالى أعلم

শূকরের চামড়ার হুকুম : সত্তাগত নাপাক হওয়ার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের কাছে তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নেই। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর একটি বর্ণনায় জায়েয আছে। দাবাগাতের মাধ্যমে শূকরের চামড়া

---

৬১২. তাইসিরুল বয়ান লি আহকামিল কুরআন, আল্লামা ইবনে নুরুদ্দিন ইয়ামানি শাফেয়ি রহ (মৃ. ৮২৫ হি.)-রচিত : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪৮, সুরাঃ আনআম। আত-তাহরির ওয়াত তানবির, আল্লামা ইবনে আশুর (রহ.) : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯০, সুরাঃ মায়েদা।

৬১৩. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৭।

৬১৪. আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬১৪-৬১৫।

৬১৫. আল-বাহরুর রায়েক, আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.), অধ্যায়ঃ বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ ফাসেদ বিক্রয় : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৩। আদ-দুররুল মুখতার, অধ্যায়ঃ বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ ফাসেদ বিক্রয় : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬১৭।

পাক হওয়ার পক্ষে তিনি মত দিয়েছেন। ইমাম সারাখসি (রহ.) সে মতটি বর্ণনা করেছেন।[৬১৬] হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হলো, দাবাগাতের মাধ্যমে শূকরের চামড়া পাক হবে না।

১২৬. অমুসলিমদের কাছে মদ বা শূকর বিক্রয়

মদ ও শূকর সংক্রান্ত যেসব বিধি-বিধান আলোচনা করলাম সেগুলো উভয় পক্ষ বা একপক্ষ মুসলিম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর যখন এমন দুইজন অমুসলিম সেগুলোর লেনদেন করবে, যারা তা হারাম হওয়ার বিশ্বাস রাখে না, তা হলে তাদের মধ্যে বিক্রয় সংঘটিত হবে। আল্লামা নাসাফি (রহ.) 'কানজুদ দাকায়েক' কিতাবে বলেছেন–

والذمي كالمسلم في بيع غير الخمر والخنزير.

> 'শূকর ও মদ ছাড়া অন্য কিছু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জিম্মি মুসলিমের মতো।'

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এক মতানুযায়ী তার কারণ দর্শিয়েছেন যে, শাখাগত মাসআলার ব্যাপারে তারা আদিষ্ট নয়। কারণ, তাদের কাছে এ দুটি হালাল। অন্য মতে বলেছেন শাখাগত মাসআলার ব্যাপারে তারা আদিষ্ট। সেটি এভাবে যে, তাদের ক্ষেত্রেও তা হারাম হবে। তবে তাদেরকে এ দুটি বিক্রয়ে বাধা দেওয়া যাবে না। কেননা, আমাদেরকে তাদের ও তাদের ধর্মীয় বিষয় এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৬১৭]

১২৭. মৃতপ্রাণী ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয় করা

একইভাবে শরয়ি দৃষ্টিতে মৃতপ্রাণী মূল্যবিশিষ্ট মাল না-হওয়ার কারণে সেটি বিক্রয় করা বা সেটির শরীরের এমন কোনো অঙ্গ বিক্রি করা যাতে প্রাণ ছিল, জায়েয নয়। সুতরাং 'দাবাগাত' বা পরিশোধনের আগে তার চামড়া বিক্রয় করা জায়েয নয়। তবে পরিশোধনের পরে জায়েয। কারণ, পরিশোধনের মাধ্যমে সেটি পাক হয়ে যায়। অতএব সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাওয়া ছাড়া তা দ্বারা যে কোনো ধরনের উপকৃত হওয়া জায়েয আছে। শাফেয়ি ও

---

৬১৬. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.), পরিচ্ছেদঃ নামাজে নাপাক হওয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০২।

৬১৭. আল-বাহরুর রায়েক, আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.), অধ্যায়ঃ বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ বিভিদ : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৮৮।
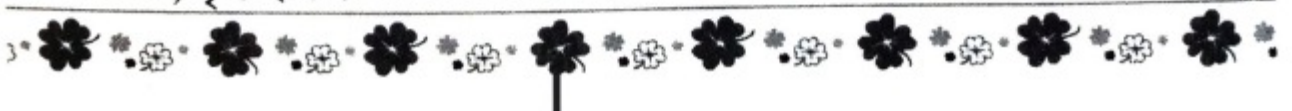
হানাফি মাযহাবের কিছু ফকিহের মতানুযায়ী সেগুলো খাওয়াও জায়েয।[৬১৮] তবে মানুষ সম্মানিত হওয়ার কারণে তার চামড়া থেকে কোনো ধরনের উপকৃত হওয়া যাবে না।

মৃতের যেসব অঙ্গে জীবন থাকে না, সেগুলো পাক এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ। তা মূল্যবিশিষ্ট এবং তা ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো বাধা নেই। ইমাম আবু হানিফা ও মালেক (রহ.)-এর মতানুযায়ী মৃতের রগ, পশম, হাড়, চুল, পালক, ঠোঁট, নখ ও ক্ষুর বিক্রয় করা জায়েয আছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এরও এই মাযহাব। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন, আল-কুরআনুল কারিমে মৃত প্রাণী হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াতটি ব্যাপক হওয়ায় এগুলোর সবই নাপাক এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নেই। এটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এরও একটি মত।[৬১৯]

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ তাঁদের মতের সপক্ষে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি হাদিসের মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন। নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'আজ' নামক উপকরণে তৈরি একটি চিরুনি ছিল।[৬২০] হাতির দাঁতকে 'আজ' বলা হয়। ইমাম দারাকুতনি (রহ.) কর্তৃক হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর একটি বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁরা দলিল দেন। তিনি বলেছেন–

إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا وَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু মৃতের গোশত হারাম করেছেন। তার চামড়া, চুল ও পশম ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই।'[৬২১]

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ যে হাদিসের মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৬২২] সারকথা হলো,

---

৬১৮. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, অধ্যায়: পবিত্রতা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৯। আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৫-১৮৬।

৬১৯. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), অধ্যায়: পবিত্রতা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৬।

৬২০. আস-সুনানুল কবুরা, ইমাম বাইহাকি (রহ.) : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬।

৬২১. সুনানে দারাকুতনি, পরিচ্ছেদ: দাবাগাত করা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৯, হাদিস নং ১১৮।

৬২২. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: মদ ও মৃত প্রাণী বিক্রয় হারাম : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫২।

হাদিসটি আপত্তিমুক্ত নয়। তবে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদিস একটি অপরটিকে সমর্থন করে। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন–

> ولأنه لا تفتقر طهارة منفصلة إلى ذكاة أصله، فلم ينجس بموته كأجزاء السمك والجراد، ولأنه لا يحله الموت فلم ينجس بموت الحيوان كبيضة، والدليل على أنه لا حياة فيه، أنه لا يحس، ولا يألم، وهما دليلا الحياة، ولو انفصل في الحياة كان طاهرا، ولو كانت فيه حياة، لنجس بفصله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أبين من حي فهو ميت، رواه أبو داود بمعناه.
>
> 'কেননা, ভিন্নভাবে পাক বস্তুটি প্রাণী জবাইয়ের মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং তার মৃত্যুর কারণে সেটি নাপাক হবে না। যেমন, মাছ ও পঙ্গপালের অঙ্গ। তা ছাড়া তার মধ্যে মৃত্যু প্রবেশ না-করায় প্রাণীর মৃত্যুর কারণে সেটি নাপাক হয় না। যেমন, ডিম। আর তার মধ্যে জীবন না-থাকার দলিল হলো, ওই অঙ্গে জীবন অনুভব করে না এবং তার কারণে কষ্ট হয় না। অথচ এ দুটি জীবন থাকার প্রমাণ। প্রাণী জীবিত অবস্থায় এগুলো পৃথক হলেও তা পাক থাকে। তার মধ্যে যদি জীবন থাকত, তা হলে পৃথক হওয়ার কারণে তা নাপাক হতো। কেননা, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'জীবিত প্রাণী থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ মৃতের হুকুমে।'[৬২৩] ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এটির সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।'[৬২৪]

যেসব প্রাণী শরয়ি বহির্ভূত পদ্ধতিতে জবাই বা হত্যা করা হয়, সেগুলো মৃতের হুকুমে। সুতরাং মুসলিমদের কাছে শ্বাসরোধে বা আঘাতে মারা যাওয়া প্রাণী বিক্রয় করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে আহলে কিতাব ছাড়া অন্য জাতি কর্তৃক জবাই করা বা ইচ্ছাকৃত 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেওয়া প্রাণী মৃতের

---

৬২৩. উল্লিখিত শব্দে বর্ণিত হাদিসটি গরিব। আর ইমাম আবু দাউদ (রহ.) কর্তৃক তার কিতাবের শিকার অধ্যায়ে হাদিস নং ২৮৫৮-এ হযরত আবু ওয়াকেদ থেকে বর্ণিত হাদিসটি হলো, 'জীবিত অবস্থায় পশু থেকে কর্তিত অঙ্গ মৃতের হুকুমে।'

৬২৪. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), অধ্যায়: পবিত্রতা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৬।
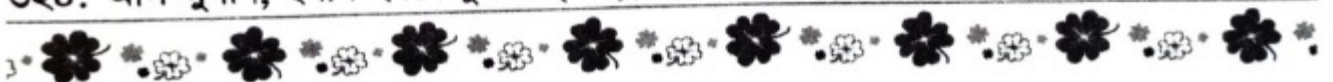
হুকুমে।[৬২৫] এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেওয়া জবাইকে জায়েয বলেছেন এবং এটি তার প্রসিদ্ধ মাযহাব। সুতরাং তার মতানুযায়ী এগুলো বিক্রয় করা জায়েয আছে। অনেক ফকিহ দাবি করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর এ মতটি 'ইজমা'র বিপরীত হওয়ায় সেটি গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন−

> لو باع متروك التسمية عمدا مسلم يقول بحله كالشافعي، نحكم ببطلان بيعه، لأنه ملتزم لإحكامنا، ومعتقد لبطلان ما خالف النص، فنلزمه ببطلان البيع بالنص، بخلاف أهل الذمة، لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون، فيكون بيعه فيما بينهم صحيحا أو فاسدا، لا باطلا كما مر.

> 'যদি এমন কোনো মুসলিম ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেওয়া প্রাণী বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি সেটি হালালের বিশ্বাস রাখে। যেমন, শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী। এমন ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হওয়ার সিদ্ধান্ত দেবো। কারণ, সে আমাদের বিধি-বিধান মানতে বাধ্য এবং কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয় বাতিল হওয়ায় বিশ্বাসী। সুতরাং কুরআন-হাদিসের মাধ্যমে আমরা তার বিক্রয় বাতিল করতে বাধ্য করব। তবে জিম্মির বিষয়টি এমন নয়। কেননা, আমরা তাদেরকে ও তাদের ধর্মীয় বিষয় এড়িয়ে চলতে আদিষ্ট। অতএব, তাদের মধ্যকার বিক্রয় সহিহ অথবা ফাসেদ হবে, বাতিল হবে না। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।'[৬২৬]

মাসআলাটি ইজতিহাদি না হওয়ার ওপর নির্ভর করে এ আলোচনা করা হয়েছে। তবে মুহাক্কিকদের মত হলো, এটি ইজতিহাদি মাসআলা। ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মত 'ইজমা'র বিপরীত নয়। আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন−

---

৬২৫. আল-মুহিতুল বুরহানি, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: ষষ্ঠ : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৩২।

৬২৬. আদ-দুররুল মুহতার, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: ফাসেদ বিক্রয় : খণ্ড-১৪, পৃ. ৫৪৯, ফিকরাহ নং ২৩২৮৩।

والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

'মাসআলাটি সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে।'[৬২৭]

এ বক্তব্যের পর তিনি বলেছেন–

> ونحن لا نطلق اسم المحرم على متروك التسمية، إذ المحرم المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به، ولم يوجد ذلك في محل الاجتهاد، إذا كان الاختلاف بين أهل الديانة، وإنما نسميه مكروها أو محرما في حق الاعتقاد قطعا، لا على طريق التعيين، بل على الإبهام، أن ما أراد الله عز وجل من هذا النهي، فهو حق، لكنا نمتنع عن أكله احتياطا، وهو تفسير الحرمة في حق العمل.
>
> 'জবাইয়ের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেওয়া প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা হারাম শব্দ ব্যবহার করব না। কেননা, নিশ্চিত হারাম হলো সে জিনিস, যেটি অকাট্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত। ন্যায়পরায়ণ ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য হলে সে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে এ অকাট্যের বিষয়টি পাওয়া যায় না; বরং সেটিকে আমরা মাকরুহ বলতে পারি, অথবা নিশ্চিত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হারাম মনে করব। নির্দিষ্টভাবে হারাম বলবো না; বরং অনির্দিষ্টভাবে এ কথা বলবো যে, এ আয়াত থেকে আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটি হক। তবে সতর্কতামূলক আমরা সেটি খাওয়া পরিহার করছি। এটি হলো আমলের ক্ষেত্রে (عَمَلاً) হারাম হওয়ার ব্যাখ্যা।'[৬২৮]

ইমাম কুরতুবি রহ. বর্ণনা করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িদের একটি জামাত ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মতো মত দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, এটি ইমাম মালেক (রহ.)-এরও একটি মত।[৬২৯] যেমনভাবে ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন, এটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর

---

৬২৭. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, অধ্যায়" জবাই : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৬।
৬২৮. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, অধ্যায়" জবাই : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৭।
৬২৯. তাফসিরে কুরতুবি, সুরাঃ আনআম : খণ্ড-৪,৭, পৃষ্ঠা-৬৭।

একটি মত।[৬৩০] আল্লামা আলুসি (রহ.) বলেছেন–
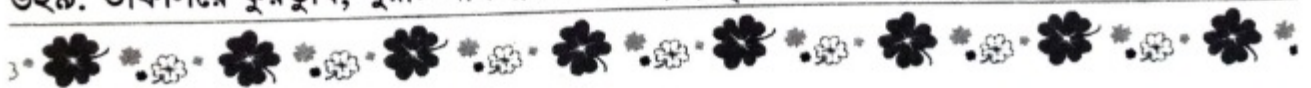
والحق عندي أن المسألة اجتهادية، وثبوت الإجماع غير مسلم، ولو كان، ما كان خرقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالي.

'আমার কাছে হক মনে হয়, এটি ইজতিহাদি মাসআলা। ইজমা হওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। যদি ইজমাই হতো, তা হলে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) সেটির বাইরে যেতেন না।'[৬৩১]

আমাদের শাইখ উসমানি (রহ.) বলেছেন, 'মাসআলাটি এমন একটি ইজতিহাদি মাসআলা, যেখানে অন্যান্য ইজতিহাদি মাসআলার মতো ইজিতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে। এটি এমন অকাট্য মাসআলা নয়, যেখানে ইজতিহাদের সুযোগ নেই। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্যকে বাতিল সাব্যস্ত করা যাবে না। আর তার বক্তব্যকে ইজমার বিপরীত বলা উচিত হবে না। কারণ, ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ইজমা ও ইজমাকারীদের সম্পর্কে বেশি জানতেন। সুতরাং তার সম্পর্কে এমন ধারণা করা যায় না যে, তিনি ইজমা ভঙ্গ করেছেন।'[৬৩২]

সুতরাং এটি প্রমাণিত হলো যে, ক্রেতা-বিক্রেতা যদি এমন দুই ব্যক্তি হয়, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে করে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেওয়া প্রাণীকে হালাল বলে বিশ্বাস করে, তা হলে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেওয়ার কারণে তাদের বিক্রয়কে বাতিল সাব্যস্ত করা যাবে না। তবে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মাযহাবে বিশ্বাসী তাদের জন্য এটি জায়েয হবে না। সে যদি এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে, যে এটিকে হালাল বলে বিশ্বাস করে, তা হলেও জায়েয হবে না। والله تعالى أعلم

আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন, পাগল ও অবুঝ শিশুর জবাইকৃত প্রাণী মৃতের হুকুমে। অনুরূপভাবে হারাম শরিফের মধ্যে জবাইকৃত প্রাণীও মৃতের হুকুমে। যদিও জবাইকারী মুহরিম বা হালাল যাই হোক। মুহরিম ব্যক্তি যেসব শিকার জবাই করবে সেগুলোরও এই হুকুম। যদিও শিকারটি হারাম শরিফ বা তার বাইরের শিকার হোক। কেননা, এগুলোর সবই মৃতের হুকুমে।[৬৩৩]

---

৬৩০. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৩।

৬৩১. তাফসিরে রুহুল মাআনি : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৬৩।

৬৩২. ইলাউস সুনান, অধ্যায়: জবাই : খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৬২।

৬৩৩. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩১-৩৩২।
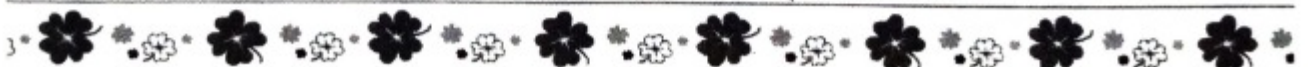
১২৮. জেলাটিনের (Gelatine) হুকুম

এখানে জেলাটিনের হুকুম আলোচনা করা ভালো মনে করছি। জেলাটিন (Gelatine) এমন একটি পদার্থ, যা ঔষধ ও বিভিন্ন খাবারে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া ও হাড় থেকে এগুলো উৎপাদন করা হয়। সুতরাং শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল হয়, তা হলে সেখানে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি শরিয়ত বহির্ভূত পদ্ধতিতে জবাইকৃত গরু থেকে জেলাটিন তৈরি করা হয়– আর বর্তমানে অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত ঔষধ ও খাবারে মিশ্রিত জেলাটিনের ক্ষেত্রে এমনটি হয়ে থাকে– তা হলে যদি তা গরুর হাড় থেকে তৈরি করা হয়, তবে হানাফি মাযহাবে তা পাক। কারণ, হাড় এমন অঙ্গ, যার মধ্যে প্রাণ থাকে না। আর যেসব অঙ্গে প্রাণ থাকে না, মৃত প্রাণীর সেসব অঙ্গ পাক।[৬৩৪] এ কারণে হানাফি মাযহাব অনুযায়ী এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে।

জবাই না-করা প্রাণীর চামড়া থেকে উৎপাদিত জেলাটিনের ব্যাপারেও সমকালীন কিছু আলেম বলেছেন, তা হালাল। কারণ, চমড়ায় এমন সব ক্যামিক্যাল ব্যবহার করা হয়, যার মাধ্যমে তার অস্তিত্ব পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং হানাফি মাযহাবের মতানুযায়ী আসল অস্তিত্ব পরিবর্তন হওয়ার কারণে সেটি হালাল ও পাক হয়ে যাবে। অনেক কারখানায় আমি নিজে এ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার মনে হয়নি যে, ক্যামিক্যাল কার্যক্রমটি তার আসল

---

৬৩৪. অনুরূপভাবে যেসব জিনিসের মধ্যে প্রাণের অনুপ্রবেশ ঘটে না। যেমন: পনির ও দুধ (প্রাধান্যপ্রাপ্ত-মতানুযায়ী)। (আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৮৭) তবে শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম যার মধ্যে প্রাণের অনুপ্রবেশ ঘটে ও যার মধ্যে ঘটে না তার মধ্যে পার্থক্য করেন না। তাই তাঁরা মৃত প্রাণীর সব অঙ্গ নাপাক হওয়ার হুকুম দিয়েছেন। (আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৬) আর মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তবে তাঁরা এ কথা বলেছেন যে, যেসব অঙ্গে প্রাণের অনুপ্রবেশ ঘটে, মৃতের কারণে সেগুলো নাপাক হয়ে যাবে। (আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা রহ. : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬০-৬১) সুতরাং তাদের মতানুযায়ী হাড় থেকে উৎপাদিত জেলাটিন পাক হবে না। এমনকি তার সত্তা পরিবর্তন হলেও, তা পাক হবে না। কারণ, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের মতানুযায়ী মদ ছাড়া অন্য জিনিসের ক্ষেত্রে সত্তা পরিবর্তন হওয়ার কারণে তা পাক হয় না। (আল-মুগনি : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬০। আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৭৪) আর মালেকি মাযহাবের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, সত্তা পবির্তন হওয়া সেটিকে পবিত্র করে দেয়। কারণ, তাঁরা সত্তা দুধ পাক হওয়ার কারণ হিসাবে তার সত্তা পরিবর্তন হওয়াকে গণ্য করেছেন। (আদদুসুকি, অধ্যায়: পবিত্রতা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫০)
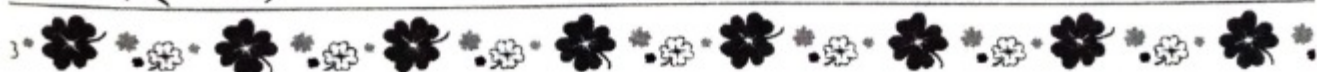
অস্তিত্ব পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট। সেখানে ক্যামিক্যালের কিছু পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। তবে ক্যামিক্যালের মাধ্যমে যেসব পরিবর্তন হয় সেটি তার অস্তিত্ব বিলীন ও পরিবর্তন করে না। এ কথার প্রমাণ হলো, গোশত রান্না করার ক্ষেত্রেও ক্যামিক্যালের মাধ্যমে তাতে পরিবর্তন হয়। অথচ কেউ এ কথা বলে না যে, রান্নার মাধ্যমে গোশতের অস্তিত্ব পরিবর্তন হয়েছে। তা হলে তো রান্নার পর সব হারাম গোশত হালাল হয়ে যেত। এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণও আমাকে বলেছেন, 'জেলাটিনের কারখানায় চামড়ার ওপর যেসব প্রক্রিয়া করা হয়, তার মাধ্যমে সেটির অস্তিত্ব পরিবর্তন হয় না। কারখানার কার্যক্রমের মাধ্যমে চামড়া পরিষ্কার করে সেটিকে তরল করা হয়। অথচ কোনো জমাট বস্তু শুধু তরল হওয়ার কারণে তার অস্তিত্ব বিলীন হয় না। বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট। এ কারণে আজ পর্যন্ত আমার কাছে এগুলোর অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত নয়।

তবে এ কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করা এবং এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার পর আমার কাছে যেটি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চামড়া পরিশোধনের (দাবাগাত) উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়। 'হেদায়া' গ্রন্থের প্রণেতা বলেছেন, 'যখন গন্ধ দূর হবে এবং নষ্ট না হওয়ার পর্যায়ে আসবে, তখন সেটি পরিশোধন হিসাবে গণ্য হবে।' আল্লামা বাবারতি (রহ.) ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর 'কিতাবুল আসার' থেকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাম্মাদ থেকে হাম্মাদ ইবরাহিম (রহ.)-এর সূত্রে এভাবে পরিশোধনের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন–

كل شيء يمنع الجلد من الفساد.

> 'পরিশোধন বলা হয় এমন জিনিসকে, যা চামড়া নষ্ট হওয়া প্রতিহত করে।'[৬৩৫]

চামড়ায় যেসব প্রক্রিয়া করা হয় সেখানে চামড়া পরিষ্কার, রস বের করা ও জীবাণু দূর করার জন্য চুন (Lime) ও আলকালাই (Alkalai) ব্যবহার করা হয়। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী এগুলো চামড়া নষ্ট হওয়া প্রতিহত করে। এ সম্পর্কে আমার ছাত্র শাইখ সরফরাজ মুহাম্মাদ বারতানাবি (হাফিযাহুল্লাহ)-এর একটি বিশেষ গবেষণা রয়েছে। তিনি ইলমে ফিকহের পাশাপাশি রসায়ন

---

৬৩৫. আল-ইনায়াহ. ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ, অধ্যায়: পবিত্রতা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৩।
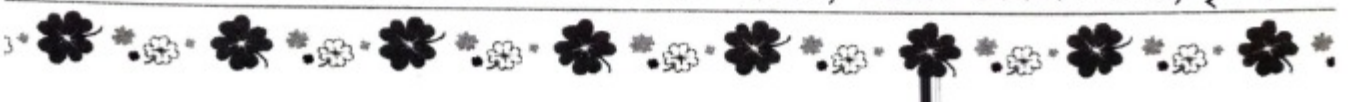
শাস্ত্রেরও একজন বিশেষজ্ঞ। সে গবেষণায় তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চামড়ার ওপর পরিচালিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চামড়ার প্রকৃত পরিশোধন সম্পন্ন হয়, তবে তার অস্তিত্ব বিলীন হয় না।

জবাই না-করা প্রাণীর হাড় যেহেতু পাক এবং পরিশোধনের পর তার চামড়াও পাক হয়ে যায়, তাই এগুলো থেকে উৎপাদিত জেলাটিনও পাক হবে। হানাফি মাযহাবের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাওয়া ছাড়া অন্য সব কাজে এগুলো ব্যবহার করা জায়েয। আর খাওয়ার বিষয়টি হলো, হানাফি মাযহাবের সহিহ এবং 'মুফতা বিহি'[৬৩৬] মতানুযায়ী এগুলো খাওয়া জায়েয নেই, তবে এক্ষেত্রে খাওয়া জায়েয হওয়ার পক্ষে হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের একটি মত রয়েছে। চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত জেলাটিন থেকে উৎপাদিত ক্যাপসুলের ক্ষেত্রেও এ হুকুমের ওপর আমল করা যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, শূকর বা তার হাড় থেকে উৎপাদিত জেলাটিন হতে পারবে না। চিকিৎসা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে সেগুলোর অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত খাওয়ার বিষয়টি পরিহার করা উচিত। অন্যদিকে ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি হলো, শূকর ছাড়া অন্য প্রাণী থেকে উৎপাদিত জেলাটিন ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে। কেননা, সেটি পাক এবং শরয়ি পদ্ধতিতে সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব, যে কথাটি পূর্বেই বলে এসেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন।

১২৯. রক্ত

রক্ত নাপাক হওয়া এবং তা বিক্রয় না-জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম একমত।[৬৩৭] বর্তমান যুগে রোগীকে অন্যের রক্ত দেওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করার বিষয়টি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বিকল্প ঔষধ না পাওয়া গেলে এ প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা করাকে সমকালীন উলামায়ে কেরাম জায়েয ফতোয়া দিয়েছেন, তবে মানুষের সম্মানার্থে তা বিক্রয় করা না-জায়েয বলেছেন।[৬৩৮] কিন্তু যদি চিকিৎসার জন্য রক্তের প্রয়োজন হয় এবং বিনামূল্যে রক্তদাতা না-পাওয়া যায়, তা হলে এমন পরিস্থিতিতে রক্ত ক্রয় করা জায়েয

---

৬৩৬. মুফতা বিহি : কোনো মাসআলায় বিবিধ মত বিদ্যমান থাকলে সেগুলোর যে কোনো একটিকে ফতোয়া প্রদানের জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কোনো মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই মতকে বলা হয় 'মুফতা বিহি' মত। –সম্পাদক

৬৩৭. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০২।

৬৩৮. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি, সংখ্যাঃ চতুর্থ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫১০, সিদ্ধান্ত নং ১১৪-৮-৮৮।
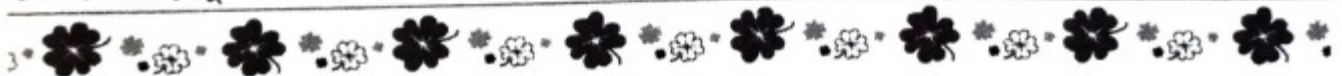
আছে কি না? এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত হলো, এমন পরিস্থিতিতে মূল্য দেওয়া জায়েয আছে। তবে বিক্রেতার জন্য মূল্য নেওয়া জায়েয নেই। এটিকে ওই মাসআলার ওপর কিয়াস করা হয়েছে, যেখানে মোজা সেলাইয়ের প্রয়োজনে ফুকাহায়ে কেরাম শূকরের পশম ক্রয়কে জায়েয বলেছেন। তারা বলেছেন, 'এমনকি যদি বিনামূল্যে না-পাওয়া যায়, তা হলে প্রয়োজনের কারণে তা ক্রয় করা জায়েয আছে। তবে বিক্রয় করা মাকরুহ হবে এবং তার মূল্য হালাল হবে না।'[৬৩৯] আমার সম্মানিত পিতা মুফতি মুহাম্মাদ শফি (রহ.) অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্পর্কে উর্দু ভাষায় রচিত তার পুস্তিকাতে এমন ফতোয়া দিয়েছেন।[৬৪০]

অনুরূপভাবে বর্তমান সময়ে মুরগির খাবার প্রস্তুতের জন্য রক্ত ব্যবহার করা হয়। মুরগির ফার্মে এগুলোর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। রক্ত নাপাক হওয়া সম্পর্কিত আল-কুরআনুল কারিমের আয়াতের ব্যাপকতা এটি না-জায়েয হওয়ার দাবি রাখে। এ কারণে এ উদ্দেশ্যে রক্ত বিক্রয় করা জায়েয নেই।

নাপাক বস্তু দিয়ে পশুর খাবার দেওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম মতানৈক্য করেছেন। হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এটিকে জায়েয বলেছেন। 'কাশশাফুল কিনা' কিতাবে লেখা হয়েছে–

> ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح قريبا ولا يحلب قريبًا ...قال في المبدع، ويحرم علفها نجاسة إن كانت تؤكل قريبا أو تحلب قريبا، وإن تأخر ذبحه أو حلبه، وقيل: بقدر حبسها المعتبر جاز في الأصح كغير المأكول على الأصح.
>
> 'যে পশুকে অল্প সময়ের মধ্যে জবাই বা দোহন করা হবে না, তাকে নাপাক খাবার দেওয়া জায়েয আছে। ...'আল-মুবদা' কিতাবে বলেছেন, অল্প সময়ের মধ্যে যদি গোশত খাওয়া বা দুধ দোহন করা হয়, তা হলে তাকে নাপাক খাবার দেওয়া হারাম। আর যদি দেরিতে গোশত খাওয়া বা দুধ দোহন করা হয়, তা হলে জায়েয। বলা হয়েছে, পশু অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। গোশত খাওয়া যায় না এমন পশুকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতানুযায়ী

---

৬৩৯. আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬১৪-৬১৫।

৬৪০. اعضاء انسان کی پیوند کاری পৃষ্ঠা-২৮।

যেমন নাপাক খাবার দেওয়া জায়েয, তেমনি করে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী গোশত খাওয়া যায় এমন পশুকেও (দোহন ও গোশত খাওয়া বিলম্বিত হলে) নাপাক খাবার দেওয়া জায়েয আছে।'[৬৪১]

এমন খাবার দেওয়া না-জায়েয হওয়ার বিষয়টিকে হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম শর্তহীন রেখেছেন। 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া'তে বলা হয়েছে–

وإذا تنجس الخبز أو الطعام لا يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان المأكول اللحم، وقال أصحابنا : لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه، ولا يطعمها الكلاب والجوارح، كذا في القنية.

'খাবার অথবা রুটি নাপাক হয়ে গেলে সেটি ছোট বাচ্চা, নির্বোধ বা গোশত খাওয়া বৈধ এমন পশুকে খাওয়ানো জায়েয নেই। আমাদের ইমামগণ বলেছেন, কোনো অবস্থায়ই মৃত থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নেই। কুকুর বা অন্য হিংস্র পশুকেও সেটি খাওয়ানো যাবে না। কিনইয়া কিতাবে এমনই রয়েছে।'[৬৪২]

শাফেয়ি ও মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম নাপাক হয়ে যাওয়া এবং সত্তাগত নাপাকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। নাপাক হয়ে যাওয়া বস্তুকে পশুর খাবার বানানো জায়েয বলেছেন। তবে সত্তাগত নাপাককে পশুর খাবার বানানো জায়েয বলেননি। 'মুখতাসারু খলিল' কিতাবে বলা হয়েছে, 'নাপাক হয়ে যাওয়া বস্তু থেকে মসজিদ ও মানুষ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে উপকৃত হওয়া যাবে, তবে সত্তাগতভাবে নাপাক থেকে নয়'।

আল্লামা হাত্তাব (রহ.) এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

مراده بالمتنجس، ما كان طاهرا في الأصل، وأصابته نجاسة، كالثوب النجس، والزيت والسمن ونحوه، تقع فيه فأرة أو نجاسة، وبالنجس ما كانت عينه نجسة، كالبول والعذرة والميتة والدم، وذكر أن الأول ينتفع به في غير المسجد والآدمي، وشمل سائر وجوه الانتفاع.

---

৬৪১. কাশশাফুল কিনা, অধ্যায়: খাবার : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৯২।

৬৪২. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, অধ্যায়: কারাহিয়্যাত, পরিচ্ছেদ: ১২ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৪৪।

'নাপাক হয়ে যাওয়া থেকে তাঁর উদ্দেশ্য হলো, যেটি সত্তাগতভাবে পাক, তবে তাতে কোনো নাপাক লেগে গেছে। যেমন : নাপাক কাপড়, তেল, মাখন ইত্যাদির মধ্যে ইঁদুর বা কোনো নাপাক পড়ে গেল। আর 'নাপাক' থেকে উদ্দেশ্য হলো, সত্তাগতভাবে নাপাক হওয়া। যেমন : পেশাব, মল, মৃত প্রাণী ও রক্ত। তিনি বলেছেন, প্রথম প্রকার থেকে মসজিদ ও মানুষ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে উপকৃত হওয়া জায়েয আছে। আর তাঁর এ কথা সব ধরনের উপকারিতাকে অন্তর্ভুক্তকরে নেয়।'

আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আরও বলেছেন–

وقال في المدونة: وفي العسل النجس لا بأس بعلفه للنحل، قال سند: وكذلك الطعام الذي يعجن أو يطبخ بماء نجس يطعم للبهائم والدواب، وسواء في ذلك ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، على ظاهر المدونة، وكذلك الماء النجس يسقى للدواب والزرع والنبات وسائر الأشجار.

'নাপাক মধু সম্পর্কে মুদাওয়ানা কিতাবের লেখক বলেছেন, তা দিয়ে মৌমাছির খাবার দিতে কোনো সমস্যা নেই। শাইখ বলেন, অনুরূপভাবে নাপাক পানি দিয়ে যে খাবার পাকানো বা খামির তৈরি করা হয়, সেগুলো পশু ও চতুষ্পদ প্রাণীকে খাওয়ানো যাবে। চাই সেগুলো এমন প্রাণী হোক যার গোশত খাওয়া হয় বা এমন প্রাণী না হোক। মুদাওয়ানা কিতাবের বক্তব্য অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত। অনুরূপভাবে পশু, ক্ষেত, ফসল ও অন্যান্য সব গাছের জন্য নাপাক পানি ব্যবহার করা যাবে।'[৬৪৩]

ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন–

وإذا عجن دقيقا بماء نجس، وخبزه، فهو نجس، يحرم أكله، ويجوز أن يطعمه لشاة وبعير ونحوهما، ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، ونقله البيهقي في السنن الكبير في باب نجاسة الماء الدائم عن نصه، واستدل له بحديث صحيح، وفي فتاوى صاحب الشامل، أنه يكره

---

৬৪৩. মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.), অধ্যায়: পবিত্রতা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৭-১১৮।
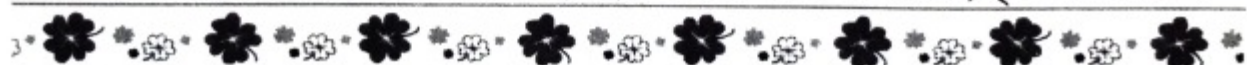
إطعام الحيوان المأكول نجاسة، وهذا لا يخالف ما نص عليه الشافعي في الطعام، لأنه ليس بنجس العين.

'নাপাক পানি দিয়ে আটার খামির করে তার রুটি তৈরি করলে সেটি নাপাক হবে এবং খাওয়া হারাম হবে। তবে ছাগল, গরু বা অনুরূপ কোনো পশুকে সেটি খাওয়ানো জায়েয আছে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। ইমাম বাইহাকি (রহ.) 'আস-সুনানুল কাবির' কিতাবের 'স্থির পানি নাপাক হওয়ার' পরিচ্ছেদে ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর সে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং তার পক্ষে সহিহ হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছেন। 'আশ-শামেল' কিতাবের লেখকের ফতোয়া হলো, গোশত খাওয়া বৈধ এমন পশুকে নাপাক খাবার দেওয়া মাকরুহ। খাবারের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) যে বক্তব্য দিয়েছেন, এটি তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, সেটি সত্তাগতভাবে নাপাক নয়।'[৬৪৪]

সারকথা, হাম্বলি মাযহাব ছাড়া অন্য মাযহাবে রক্তের মতো সত্তাগতভাবে নাপাক কোনো বস্তু দিয়ে পশুর খাবার দেওয়া জায়েয নেই। আর এ উদ্দেশ্যে তা বিক্রয় করাও জায়েয নেই। 'কাশশাফুল কিনা' কিতাবের লেনদেন অধ্যায়ে বলা হয়েছে–

لا يصح بيع دم وخنزير وصنم... ولا يصح بيع أدهان متنجسة ...ولو بيع لكافر يعلم حاله... ويجوز الاستصباح بها في غير مسجدعلى وجه لا تتعدى نجاسته.

'রক্ত, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা সহিহ নয়। ... নাপাক তেল বিক্রয় করা সহিহ নয়। ... যদিও এমন অমুসলিমের কাছে বিক্রয় করা হয়, যার অমুসলিম হওয়ার বিষয়টি জানা আছে। (তা হলেও সহিহ হবে না) সে তেল দিয়ে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও এমনভাবে বাতি জ্বালানো জায়েয আছে, যেখানে নাপাক ছড়াবে না।'[৬৪৫]

---

৬৪৪. রাওযাতুত তালিবিন, অধ্যায়: খাবার : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৭৯।

৬৪৫. কাশশাফুল কিনা, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৫।
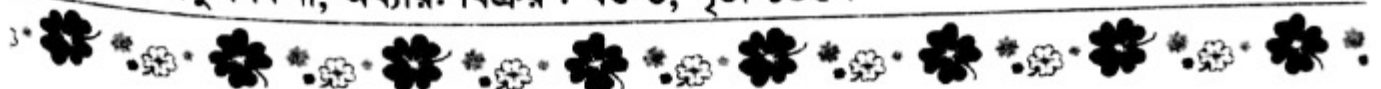
তবে মুরগির জন্য যেসব খাবার প্রস্তুত করা হয়, সেগুলো বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণে হয়ে থাকে। যেমন, গম, যব, চাল ইত্যাদি। এসব উপাদানের মধ্যে পাক উপাদানের পরিমাণ বেশি। সুতরাং বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর মিশ্রণে উৎপাদিত খাবারের হুকুম হলো, নাপাক হয়ে যাওয়া খাবারের হুকুম। অতএব, মালেকি ও শাফেয়ি মাযহাবের মতানুযায়ী এগুলোর মাধ্যমে মুরগির খাবার দেওয়া জায়েয আছে। তবে তাদের মাযহাবে এমন নাপাক হয়ে যাওয়া বস্তু বিক্রয় করা জায়েয নেই, যেগুলো পাক করা অসম্ভব। এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে। সুতরাং এ মতানুযায়ী এ ধরনের মিশ্রিত খাবার বিক্রয় করা জায়েয নেই।

হানাফি মাযহাবে নাপাক হয়ে যাওয়া বস্তু বিক্রয় করা এবং খাবার ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে। এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে। খাবারের মধ্যে পশুর খাবারও রয়েছে। 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া' ও 'কুনইয়া' কিতাব থেকে এ সম্পর্কে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সুতরাং এ মতানুযায়ী তা বিক্রয় করা না-জায়েয হওয়া উচিত, তবে নাপাক পানি ও তা দিয়ে খামির তৈরির ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের কিছু ফকিহ বলেছেন, নাপাকের কারণে যদি পানির গুণ পরিবর্তন না হয়, তা হলে পশুকে পান করানো ও ক্ষেতে সেচ দেওয়ার কাজে সেটি ব্যবহার করা জায়েয আছে। এ হুকুমে তারা গোশত খাওয়া বৈধ ও বৈধ নয় এমন পশুর মধ্যে পার্থক্য করেননি।[৬৪৬] এ মতানুযায়ী তা বিক্রয় করাও জায়েয হওয়া উচিত। কেননা, তা দিয়ে উপকৃত হওয়া যাচ্ছে। والله تعالى أعلم

১৩০. অন্যান্য নাপাক জিনিস বিক্রয় করা

অন্যান্য নাপাকের হুকুম হলো, তিন ইমামের কারো কাছেই তা বিক্রয় করা জায়েয নেই। নাপাকের উদাহরণ : মানুষের মল। তবে হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এমন নাপাককে এ হুকুম থেকে ভিন্ন রেখেছেন, যার মধ্যে মাটির পরিমাণ বেশি থাকে।[৬৪৭] ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, জমির ক্ষেত্রে এ ধরনের নাপাক ব্যবহার করা জায়েয আছে। সুতরাং

---

৬৪৬. আল-মুহিতুল বুরহানি : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৬। (বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলামিয়া) বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, অধ্যায়: পবিত্রতা, পরিচ্ছেদ: প্রকৃত পবিত্রতা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৬। (এইচ, এম, সায়িদ)

৬৪৭. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: ফাসেদ বিক্রয় : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৫৬২-৫৬৩, ফিকরাহ নং ২৩৩১৯।
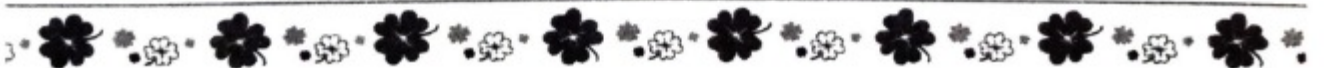
জমির জন্য তা বিক্রয় করাও জায়েয আছে। আল্লামা ইবনে নুজাইম ও যাইলায়ি (রহ.)[৬৪৮] এটিকে সহিহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেছেন, জাহেরুল মাযহাব হলো, জায়েযের মতটি শুধু সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন নাপাকটি মাটির সঙ্গে মিশ্রিত হবে।[৬৪৯]

গোশত খাওয়া বৈধ এমন প্রাণীর মলের হুকুম হলো, শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, এগুলো বিক্রয় করা জায়েয নেই। এমনকি ক্ষেতের জন্য হলেও তা বিক্রয় জায়েয নেই। ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন–

> بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام ... واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه.
>
> 'গোশত খাওয়া বৈধ বা বৈধ নয় এমন চতুষ্পদ প্রাণীর বিষ্ঠা ও কবুতরের বিষ্ঠা বিক্রয় করা বাতিল এবং তার মূল্য হারাম। ... আমাদের ইমামগণ ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেন। যেখানে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতির ওপর কিছু হারাম করেন, তখন তাদের জন্য তার মূল্যও হারাম করেন।'[৬৫০]

এরপর ইমাম নববি (রহ.) আল্লামা মাওয়ারদি (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, ক্ষেতের জন্য বিক্রয়ের যে প্রচলন ঘটেছে, সেটি মুর্খ ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষ করে থাকে।'[৬৫১]

মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, গোশত খাওয়া বৈধ এমন প্রাণীর বিষ্ঠা পাক। সুতরাং তা বিক্রয় করা জায়েয। আর যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম, তার বিষ্ঠার ক্ষেত্রে আসল মাযহাব হলো, তা বিক্রয় করা জায়েয নেই। যেমন, খচ্চর, গাধা ও হিংস্র প্রাণীর বিষ্ঠা। তবে মালেকি

---

৬৪৮. তাবয়িনুল হাকায়িক, আল্লামা যাইলায়ি (রহ.), অধ্যায়: কারাহিয়্যাত : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৬। আল-বাহরুর রায়েক, অধ্যায়: কারাহিয়্যাত, পরিচ্ছেদ: বিক্রয় সম্পর্কে : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৬৫।

৬৪৯. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.) : খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২৩।

৬৫০. সুনানে আবু দাউদ, পরিচ্ছেদ : মদ ও মৃতের মূল্য। সেখানে বর্ণিত হাদিসটি হলো, আল্লাহ তাআলার যে জাতির জন্য যা খাওয়া হারাম করেছেন, তার মূল্যও হারাম করেছেন।

৬৫১. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩০-২৩১।
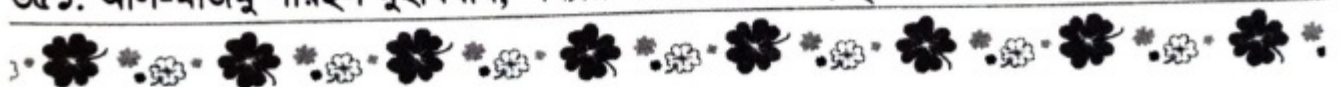
মাযহাবের কিছু ফকিহ জরুরি পরিস্থিতিকে এ হুকুম থেকে ভিন্ন রেখেছেন।[৬৫২] হাম্বলি মাযহাবে এমন ভিন্ন হুকুম পাইনি।[৬৫৩]

হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, উট ও গরুর বিষ্ঠা বিক্রয় করা জায়েয। কারণ, তা দিয়ে বৈধ উপকারিতা নেওয়া সম্ভব। সে উপকারিতা হলো, ক্ষেত উর্বরের জন্য ব্যবহার করা। আর বিক্রয় হালাল হওয়ার বিষয়টি বৈধ উপকারিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সর্ব যুগে কোনো ধরনের বিরোধিতা ছাড়াই মুসলিম জনগণ এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা মারদিনি (রহ.) বলেছেন–

وقوله : إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، خرج على شحوم الميتة التي حرم أكلها، والانتفاع بشيء منها، وكذا الخمر، أي إذا حرم أكل شيء ولم يبح الانتفاع به، حرم ثمنه، ولم يعن ما أبيح الانتفاع به، بدليل إجماعهم على بيع الهر والفهود والسباع المتخذة للصيد والحمر الأهلية، وقال ابن حزم : وممن أجاز بيع المائع تقع فيه النجاسة، والانتفاع به علي وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري والقاسم وسالم وعطاء والليث وأبو حنيفة وسفيان وإسحاق وغيرهم.

'তিনি যে বলেছেন, 'কোনো কিছু খাওয়া হারাম হলে তার মূল্যও হারাম হবে' -এ বিষয়টি মৃতের চর্বির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা খাওয়া হারাম এবং তার কোনো অংশ থেকে উপকৃত হওয়াও হারাম। মদের বিষয়টিও অনুরূপ। অর্থাৎ, যখন কোনো কিছু হারাম হয় এবং তা থেকে উপকৃত হওয়াও অবৈধ হয়, তখন তার মূল্যও হারাম হয়। যা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ এক্ষেত্রে তা উদ্দেশ্য না। এ কথার দলিল হলো, বিড়াল, চিতা, শিকারের জন্য ধরা হিংস্র

---

৬৫২. এটি আল্লামা আশহাব (রহ.)-এর মত। হাশিয়াতুদ দুসুকি আলাশ শারহিল কাবির, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০।

৬৫৩. কাশশাফুল কিনা, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-৩,পৃ. ১৪৫, কিতাবে বলা হয়েছে, পশুর বিষ্ঠা বিক্রয় করা জায়েয নেই। তবে তার পবিত্রগুলো বিক্রয় জায়েয আছে। যেমন, কবুতর ও চতুষ্পদ প্রাণীর মল।

প্রাণী ও পালিত গাধা বিক্রয় (জায়েযের) ব্যাপারে সব ফকিহ একমত। ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) বলেছেন, তরল জিনিসের মধ্যে নাপাক পড়লে তা বিক্রয় ও সেটি থেকে উপকৃত হওয়াকে যাঁরা জায়েয বলেছেন তাঁরা হলেন, হযরত আলি, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, আবু মুসা আশআরি, আবু সায়িদ খুদরি (রাযি.), কাসেম, সালেম, আতা, লাইস, আবু হানিফা, সুফিয়ান, ইসহাক প্রমুখ (রহ.)।'[৬৫৪]

যেসব পাক জিনিস নাপাক মিশ্রিত হওয়ার কারণে নাপাক হয়ে যায় এবং ফুকাহায়ে কেরাম যেটিকে নাপাক হয়ে যাওয়া নামে অভিহিত করেছেন হানাফি মাযহাবে তার হুকুম হলো, তা বিক্রয় করা জায়েয আছে। 'আদ-দুররুল মুখতার' কিতাবে বলা হয়েছে, 'নাপাক তেল বিক্রয় করা জায়েয এবং খাওয়া ছাড়া অন্য কাজে তা থেকে উপকৃত হওয়াকে আমরা জায়েয বলি।'[৬৫৫]

মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম যেগুলো পাক করা যায় এবং যেগুলো পাক করা যায় না, তার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এরপর যেগুলো পাক করা যায়, সেগুলোর বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন। যেমন, নাপাক কাপড়। আর যেগুলো পাক করা যায় না, সেগুলোর বিক্রয়কে নাজায়েয বলেছেন। যেমন, নাপাক তেল।[৬৫৬] তবে শাফেয়ি মাযহাবের কিছু ফকিহ নাপাক তেলের ব্যাপারে বলেছেন, বিশেষ প্রক্রিয়ায় তা পাক করা সম্ভব। সুতরাং তা বিক্রয় করাও জায়েয। মালেকি মাযহাবের কিছু ফকিহ বলেছেন, অমুসলিমের কাছে এগুলো বিক্রয় করা জায়েয আছে। والله تعالى أعلم[৬৫৭]

১৩১. মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয় করা

হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মতানুযায়ী মানুষ সম্মানিত হওয়ার কারণে তার অঙ্গ মূল্যবিশিষ্ট 'মাল' নয়। সুতরাং মর্যাদাহীন হওয়ার কারণে তা বিক্রয় করা জায়েয নেই। এ কারণে হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম

---

৬৫৪. আল-জাওহারুন নাকি, ইমাম বাইহাকি (রহ.)-এর 'সুনানুল কুবরা'র সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ, পরিচ্ছেদ: নাপাক জিনিস বিক্রয় করা হারাম ও তা খাওয়া হালাল না : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩-১৪।

৬৫৫. আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-১৪,পৃ. ৬১৯।

৬৫৬. মাওয়াহিবুল জালিল : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৩। আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩৫। কাশশাফুল কিনা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৫-১৪৬।

৬৫৭. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, অধ্যায় : বিক্রয় : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩৫।
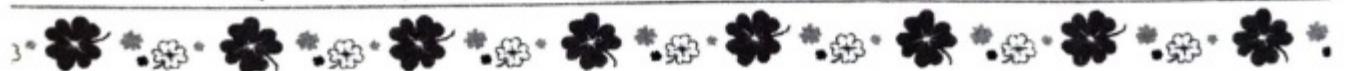
বলেছেন, কোনো পাত্র করে মহিলার দুধ বিক্রয় করা জায়েয নেই। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেছেন, এটি ইমাম মালেক ও আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মাযহাব। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন, 'এমন দুধ বিক্রয় করা জায়েয। কারণ, তা পবিত্র পানীয়।'[৬৫৮]

আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মাযহাব সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন তার বাস্তবতা হলো, এটি তাঁর একটি মত। হাম্বলি মাযহাবের শেষ মতটি শাফেয়ি মাযহাবের অনুরূপ। আল্লামা শামসুদ্দিন ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন–

> فأما بيع لبن الآدميات فرويت الكراهة فيه، عن أحمد، واختلف أصحابنا في جوازه، وهو قول ابن حامد، ومذهب الشافعي، وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، لأنه مائع خارج من آدمية فلم يجز بيعه، كالعرق، ولأنه جزء من آدمي، فلم يجز بيعه، أشبه سائر أجزائه، والأول أصح، لأنه طاهر منتفع به، فجاز بيعه كلبن الشاة.

> 'মানুষের অঙ্গ বিক্রয়ের বিষয়টি হলো, ইমাম আহমাদ (রহ.) হতে এ সম্পর্কে মাকরুহের মত বর্ণিত আছে। আমাদের ইমামগণ এটি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। এটি ইবনে হামেদ (রহ.)-এর মত এবং শাফেয়িদের মাযহাব। আমাদের ইমামদের একটি জামাত তা বিক্রয় হারামের মত দিয়েছেন। এটি ইমাম আবু হানিফা ও মালেক (রহ.)-এর মাযহাব। কারণ, সেটি মানুষ থেকে নির্গত তরল পদার্থ। সুতরাং তা বিক্রয় করা জায়েয নেই। এটি মানুষের অন্যসব অঙ্গের সদৃশ। প্রথম মতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

---

৬৫৮. ফাতহুল কাদির, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: ফাসেদ বিক্রয় : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬০-৬১। ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন, আমাদের মতানুযায়ী মানুষের দুধ বিক্রয় করা জায়েয আছে, মাকরূহ নয়। এটি আমাদের মাযহাবের সিদ্ধান্ত। আমাদের ইমামগণ এটিকে চূড়ান্ত মত সাব্যস্ত করেছেন। তবে ইমাম মাওয়ারদি, শাশি ও রুইয়ানি (রহ.) দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারা আমাদের ইমামদের থেকে আবুল কাসেম আনমাতি (রহ.) থেকে একটি বিরল মত বর্ণনা করেছেন যে, তা নাপাক এবং তা বিক্রয় করা জায়েয নেই। প্রয়োজনের কারণে তা দিয়ে সন্তান পালন করা হয়। এ মতটি সঠিক নয়। (আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, পরিচ্ছেদ: যা বিক্রয় করা জায়েয ও যা বিক্রয় করা জায়েয নেই : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৫৪)

কেননা, তা পাক এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। সুতরাং ছাগলের দুধের মতো তা বিক্রয় করা জায়েয।'[৬৫৯]

১৩২. মিল্ক ব্যাংক

আগের আলোচনা থেকে পশ্চিমা দেশে প্রতিষ্ঠিত মিল্ক ব্যাংকের হুকুম জানা গেল। সেখানে অনেক মহিলার দুধ জমা করে বাচ্চার জন্য বিক্রয় করা হয়। হানাফি ও মালেকি মাযহাব অনুযায়ী এগুলো বিক্রয় করা জায়েয নেই। শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব অনুযায়ী জায়েয আছে, তবে তাদের সবার মতানুযায়ী এমন ব্যাংক করা এবং সেখান থেকে বাচ্চাদের দুধ পান করানো জায়েয নেই। কারণ, তার কারণে দুগ্ধপান সম্পর্কিত বিধি-বিধান সাব্যস্ত হয়। উপরন্তু এটি জানাও যায় না যে, বাচ্চা কোন মহিলার দুধ পান করেছে। সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামির দ্বিতীয় অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহে এটি নিষিদ্ধ করণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে সিদ্ধান্তটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো–

١- أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية. ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.

٢- أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.

...وبناء على ذلك قرر:

أولا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.

ثانيا: حرمة الرضاع منها– والله أعلم

'১. মিল্ক ব্যাংক এমন একটি প্রক্রিয়া, যা পশ্চিমা জনগণ উদ্ভাবন করেছে। এরপর এ প্রচলনের সঙ্গে প্রযুক্তিগত ও কার্যক্রমগত কিছু নেতিবাচক বিষয় সামনে এসেছে। তাই সেটি দমে গেছে এবং তার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

---

৬৫৯. আশ-শারহুল কাবির আলাল মুকনি, আল-মুগনি-এর সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২।
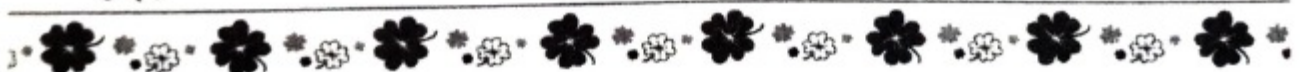
২. শরিয়তে ইসলামি দুধের সম্পর্ককে বংশের সম্পর্কের মতো সাব্যস্ত করেছে। সকল মুসলিমের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বংশের কারণে যা কিছু হারাম হয়, দুধের কারণেও তা হারাম হয়। শরিয়তের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহের একটি উদ্দেশ্য হলো বংশ ঠিক রাখা। আর মিল্ক ব্যাংক সেটির মধ্যে গরমিল ও সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। ...

এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে :

১. ইসলামি রাষ্ট্রে মায়েদের পক্ষ থেকে মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে নিষেধ করতে হবে।

২. এ ধরনের ব্যাংক থেকে দুধ পান করানো হারাম। والله تعالى أعلم'[৬৬০]

অনুরূপভাবে অন্য মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করার জন্য মানুষের চুল বা অঙ্গ বিক্রয় করাও জায়েয নেই।[৬৬১] সমকালীন উলামায়ে কেরাম প্রতিস্থাপন জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন, তবে অঙ্গ বিক্রয় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী না-জায়েয। মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি-এর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে–

> لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.
>
> 'ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ব্যাপক অনুমতি দেওয়া জায়েয নেই।'[৬৬২]

১৩৩. এমন জিনিস বিক্রয় করা যা শুধুই না-জায়েয কাজের জন্য নির্দিষ্ট নয়

যেসব জিনিস খারাপ কাজে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং হালাল-হারাম উভয় ধরনের কাজে ব্যবহার করা যায়, এমন জিনিস বিক্রয়ের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা রয়েছে। এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনা অধ্যয়ন ও গবেষণা করার পর আমার কাছে যেটি স্পষ্ট

---

৬৬০. ১৪০৬ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসের ১০-১৬ তারিখে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত সেমিনারের ৬/২ নম্বর ধারা।

৬৬১. ফাতহুল কাদির অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: ফাসেদ বিক্রয় : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬০-৬১। আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, পরিচ্ছেদ: কোন জিনিস বিক্রয় করা জায়েয ও জায়েয নেই : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৫৪।

৬৬২. ১৪১০ হিজরি সনের শাবান মাসে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সেমিনারের ৫৬ (৬/৭) নম্বর সিদ্ধান্ত।

হয়েছে তা হলো, এ ধরনের জিনিস তিন ভাগে বিভক্ত–

১. এমন জিনিস, যা শরয়ি নিষিদ্ধ কাজে ব্যবহারের মতো করেই তৈরি করা হয়েছে। বৈধ কাজে ব্যবহার করতে হলে তার অবকাঠামোতে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন, বাদ্যযন্ত্র।

২. এমন জিনিস, বৈধ কাজে ব্যবহারের জন্য যার অবকাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। নিষিদ্ধ কাজে ব্যবহার করতে হলে তার অবকাঠামোতে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন, আঙ্গুরের রস। সেটি নেশাদ্রব্য করতে হলে তা মদে পরিণত করতে হয়।

৩. এমন জিনিস, যা সাধারণ কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তার বিদ্যমান অবকাঠামোতে বৈধ ও অবৈধ উভয় কাজে ব্যবহার করা যায়। নির্দিষ্ট কোনো ব্যবহারের জন্য সেটি প্রস্তুত করা হয়নি; বরং ব্যবহারকারীর ইচ্ছার ওপর তার ব্যবহার নির্ভর করে। যেমন, অস্ত্র।

বিস্তারিত আলোচনার সঙ্গে এ তিনটির প্রত্যেকটির বিধি-বিধান বর্ণনা করব–ইনশাআল্লাহ।

প্রথম প্রকার : যা শুধু না-জায়েয কাজের জন্যই তৈরি করা হয়েছে

১৩৪. বাদ্যযন্ত্র

প্রথম প্রকার : যা শুধু অবৈধ কাজের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তবে তার মূলধাতু বৈধ। সুতরাং শ্রমদান বা সংস্কার করা ছাড়া সেটি বৈধ কাজে ব্যবহার করা যায় না। ফুকাহায়ে কেরাম এ প্রকারের মধ্যে নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের যন্ত্র দ্বারা সেসব বাদ্যযন্ত্র উদ্দেশ্য, যেসব বাদ্যযন্ত্র চার মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে হাম্বলি মাযহাবের পছন্দনীয় মত হলো, শরয়ি দৃষ্টিতে তা মূল্যবিশিষ্ট জিনিস নয়। সুতরাং তা বিক্রয় করা জায়েয নেই।[৬৬৩] এ কথার উদ্দেশ্য হলো, বিক্রয়টি বাতিল হবে এবং তাদের মতে তা সংঘটিতই হবে না। যেমন, শূকরের বিক্রয় সংঘটিত হয় না। এটি মালেকি মাযহাবেরও মত। কেননা, আল্লামা হাত্তাব (রহ.) ইমাম কারাফি (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'হারাম বাদ্যযন্ত্র উপকারহীন বস্তুর আওতাভুক্ত, তাই তা বিক্রয় ও তার মালিক হওয়া সহিহ নয়।' এরপর আল্লামা হাত্তাব

৬৬৩. কাশশাফুল কিনা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৫।

(রহ.) 'মাতিতিয়্যাহ'[৬৬৪] থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যে ব্যক্তি ডঙ্কা ইত্যাদির মতো কোনো বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করবে, তার ক্রয় প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাকে শিক্ষামূলক শাস্তি দিতে হবে। এখান থেকে বোঝা যায়, বিক্রয়টি সংঘটিত হবে, তবে সেটি প্রত্যাহার করা ওয়াজিব।[৬৬৫]

হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবে এ ধরনের যন্ত্র বিক্রয় করলে বিক্রয় সংঘটিত হবে। কারণ, সেগুলো বৈধ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। যদিও তার অবকাঠামো পরিবর্তন করে ব্যবহার করতে হয়। তবে তার মূল অবকাঠামোসহ বিক্রয় করা মাকরুহ। আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন–

> ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط، والطبل، والمزمار، والدف، ونحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكره وعند أبي يوسف، ومحمد : لا ينعقد بيع هذه الأشياء؛ لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق، والفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء، ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا

> 'ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী গিটার বা বীণা, তবলা, বাঁশি, দফ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বিক্রয় করা জায়েয আছে। তবে মাকরুহ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতানুযায়ী এগুলোর বিক্রয় সংঘটিত হবে না। কারণ, এগুলো বাদ্যযন্ত্র এবং পাপাচার ও খারাপ কাজের জন্য প্রস্তুতকৃত। সুতরাং মাল না-হওয়ায় তা বিক্রয় করা জায়েয নেই। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলিল হলো, অন্যভাবে এটি শরয়িভাবে বৈধ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। তা এভাবে যে, বাতি জ্বালানোর পাত্র

---

৬৬৪. 'মাতিতিয়্যাহ' একটি কিতাবের নাম। যার পূর্ণ নাম হলো, 'আন-নিহাইয়্যাহ ওয়াততামাম লি-মারিফাতিল ওয়াসাইকি ওয়াল আহকাম।' আল্লামা আলি ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মাতিতি (মৃ. ৫৭০ হি.)-এর রচিত এবং আল্লামা ইবনে হারুন কিনানি রহ. (মৃ. ৭৫০ হি.) এটি সংক্ষিপ্ত করেছেন।

৬৬৫. মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.), অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৩। তাহযিবু ফুরুকিল কারাফি, ড. মুহাম্মাদ আলি , ফরক নং ১৮৫ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪০।

ইত্যাদির মতো কাজে সেটি ব্যবহার করা সম্ভব। অতএব, তা মালের বাইরে নয়।'[৬৬৬]

এটি স্পষ্ট কথা যে, হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরনের যন্ত্র ভিন্ন করার আগে তা বিক্রয়ের ব্যাপারে যে মাকরুহের কথা বলেছেন, তার উদ্দেশ্য হলো মাকরুহে তাহরিমি। কেননা, মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম (রহ.) 'হেদায়া'র ব্যাখ্যায় 'মাকরুহ' পরিচ্ছেদে বলেছেন–

لما كان دون الفاسد أخره عنه، وليس المراد بكونه دونه في حكم المنع الشرعي بل في عدم فساد العقد، وإلا فهذه الكراهات كلها تحريمية لا نعلم خلافا في الإثم.

'এটি যেহেতু ফাসেদের নিচের স্তর, তাই তার পরে উল্লেখ করেছেন। তার নিচের স্তর হওয়ার উদ্দেশ্য এ নয় যে, শরয়িভাবে নিষিদ্ধের দিক থেকে নিচে; বরং চুক্তি ফাসেদ না-হওয়ার ক্ষেত্রে সেটি নিচের স্তরের। অন্যথায় এ ধরনের মাকরুহের সবগুলোই তাহরিমি এবং এগুলোর ক্ষেত্রে গোনাহ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত আমি পাইনি।'[৬৬৭]

এ বক্তব্যের দাবি হলো, বিক্রেতার জন্য তার মূল্য হালাল হবে না।

অনুরূপভাবে শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, ভিন্ন করার আগে এগুলো বিক্রয় করা মাকরুহ। শাফেয়ি মাযহাবের আল্লামা মাওয়ারদি (রহ.) বলেছেন–

فأما الملاهي، كالطنبور والعود والدف والمزمار، فإن أمكن الانتفاع بها إذا فصلت جاز بيعها، وكذلك اللعب. لكن يكره بيع ذلك قبل تفصيله لبقاء المعصية فيه. فإن بيع على حاله جاز.

'বাদ্যযন্ত্র যদি এমন হয় যে, সেটি ভিন্ন করে তা ব্যবহার করা সম্ভব, যেমন: তাম্বুরা, একতারা, দফ ও বাঁশি, তা হলে সেটি বিক্রয় করা জায়েয আছে। খেলার যন্ত্রেরও অনুরূপ হুকুম হবে, তবে ভিন্ন করার আগে বিক্রয় করা মাকরুহ হবে। কারণ, তার

---

৬৬৬. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে' : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৭।

৬৬৭. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০৬।

মধ্যে খারাপ জিনিসটি রয়েছে। তারপরও যদি এ অবস্থায় বিক্রয় করা হয়, তা হলে তা জায়েয হবে।'[৬৬৮]

তবে শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, তাঁদের বক্তব্যে শর্তহীন মাকরুহ বললে তার উদ্দেশ্য হয় মাকরুহে তানযিহি। والله تعالى أعلم[৬৬৯]

১৩৫. মূর্তি, ভাস্কর্য ও খেলনা পুতুলের বিধান

মূর্তি ও ভাস্কর্য এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে এগুলো ভেঙে ফেলার পর তার অংশ দিয়ে উপকৃত হওয়া গেলে তা বিক্রয় করা জায়েয আছে। এ ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত হাদিস। মক্কা বিজয়ের দিনে মক্কায় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তিনি বলতে শুনেছেন–

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ.

'নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মদ, মৃত প্রাণী, শূকর ও মূর্তি বিক্রয়কে হারাম করেছেন।'[৬৭০]

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এ হাদিস থেকে বাচ্চাদের খেলনা পুতুলকে ভিন্ন রেখেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন, 'এটি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর প্রতি সম্পৃক্তকরণ এটি প্রমাণ করে না যে, ইমাম (আবু হানিফা রহ.) তার বিরোধিতা করেছেন। কেননা, এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ মাসআলাতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কোনো মতই নেই। সুতরাং বিষয়টি উপলব্ধি-সাপেক্ষ।'[৬৭১]

---

৬৬৮. আল-হাবি, আল্লামা মাওয়ারদি (রহ.) : খণ্ড-৫, পৃ. ৩৮৫।

৬৬৯. আল্লামা বায়যাবি (রহ.) 'আল-মিনহাজ' কিতাবে বলেছেন, মাকরুহ বলা হয়, যা থেকে সংযম অবলম্বনকারী প্রশংসিত হয়, কিন্তু তাতে লিপ্ত ব্যক্তি তিরস্কারের যোগ্য হয় না। (আল-মিনহাজ, আল্লামা আসনাবি (রহ.)-এর নেহায়াতুস সুল-এর সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৯) আল্লামা বুজাইরামি (রহ.) বলেছেন, শর্তহীনভাবে মাকরুহ শব্দ ব্যবহার করলে তার উদ্দেশ্য হবে মাকরুহে তানযিহি। (আল-বুজাইরামি আলাল খতিব, অধ্যায় : সিয়াম, সন্দেহের দিনের রোজার মাসআলা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩৫)

৬৭০. সহিহ বুখারি, অধ্যায়ঃ বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ মৃত প্রাণী ও মূর্তি বিক্রয় করা, হাদিস নং ২২৩৬। সহিহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাকত, পরিচ্ছেদঃ মদ, মৃত প্রাণী, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা, হাদিস নং ৪০১৯। সহিহ মুসলিমের বর্ণনা।

৬৭১. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৪১৪, ফিকরাহ নং ২৪৮৭৭। জেনে রাখা উচিত যে, অন্য একটি নুসখায় "أن لا يكون له في المسألة قول" বাক্যে 'لا' শব্দটি নেই।
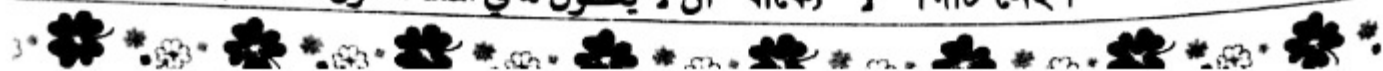
এ সম্পর্কে মূলনীতি হলো, হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিস। 'তাঁর অনেক মেয়ে' পুতুল ছিল, যেগুলো নিয়ে তিনি খেলতেন।'[৬৭২] এ হাদিসের ওপর নির্ভর করে একদল উলামায়ে কেরাম বাচ্চাদের জন্য খেলনা পুতুল রাখা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয বলেছেন। কাজি ইয়ায[৬৭৩] ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এ সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। মালেকি মাযহাবের ইবনে বাত্তাল (রহ.)-এর মতো কিছু আলেম এ হাদিসকে মূর্তি নিষিদ্ধের আগের অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন, তাই পরবর্তী সময়ে সেটি রহিত হয়ে গেছে। আল্লামা মুনযিরি ও হালিমি (রহ.) হাদিসটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সেগুলো মূর্তি ছিল না; বরং সেগুলো কাপড়ের টুকরো ছিল, যা কেটে হাত ও পায়ের সদৃশ বানানো হতো এবং যেগুলোতে মাথাও থাকত না। আল্লামা খাত্তাবি (রহ.) হাদিসটিকে এক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন যে, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এগুলো ব্যবহার করা জায়েয আছে। কারণ, তারা শরিয়তের মুকাল্লাফ (বিধানের অধীন) নয়।'[৬৭৪]

তারপরও স্পষ্ট কথা হলো, বাচ্চাদের জন্য যাঁরা এসব খেলনা পুতুল রাখা

---

৬৭২. সহিহ বুখারি, অধ্যায়ঃ শিষ্টাচার, পরিচ্ছেদঃ মানুষের প্রতি হাস্যোজ্জ্বল থাকা, হাদিস নং ৬১৩০।

৬৭৩. **কাজি ইয়ায** : ইয়ায ইবনে মুসা ইবনে ইয়ায ইবনে আমর আবুল ফযল আল-ইয়াহসাবি আস-সিবতি আল-মালেকি (রহ.)। জন্মঃ ৪৭৬ হিজরি মোতাবেক ১০৮৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন মাগরিবের (মরক্কো বা উত্তর আফ্রিকা) শ্রেষ্ঠ আলেম এবং তাঁর সময়ের ইমামুল মুহাদ্দিসিন। সিবতের কাজি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেখানেই তাঁর জন্ম। এরপর মুসলিম স্পেনের বিখ্যাত শহর গ্রানাডার প্রধান বিচারপতি হন। সেসময় তাঁর মতো এত কিতাব রচয়িতা খুব কমই পাওয়া যেত। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছেঃ আশ-শিফা বি তা'রিফি হুকুকিল মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তারতিবুল মাদারিক, আল-ইকমাল শারহু সহিহি মুসলিম, মাশারিকুল আনওয়ার, আল-ইলমা' ইলা মা'রিফাতি উসুলির রিওয়ায়াতি ওয়া তাকয়িদিস সামা', আল-আকিদাহ প্রভৃতি। ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন, 'তাঁর রচনা খুবই সুন্দর। সবচেয়ে মর্যাদাবান যে কিতাবটি তিনি রচনা করেছেন, তা হলোঃ আশ-শিফা–যদি এতে অগ্রহণযোগ্য হাদিসের বিরাট ভাণ্ডার না-থাকত। পাশাপাশি এতে যেসব দুর্বল ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেগুলোও এর মান হ্রাস করেছে।' মরক্কোয় তিনি শাহাদাত-বরণ করেন। সেখানে মুহাম্মাদ ইবনে তুমার্ত নামে এক ব্যক্তি ইমাম মাহদি দাবি করেছিল। কাজি ইয়ায (রহ.) তাকে নিষ্পাপ ও ইমাম মাহদি হিসাবে মেনে না-নেওয়ার কারণে খুন হন। তখন ৫৪৪ হিজরি মোতাবেক ১১৪৯ খ্রিস্টাব্দ। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২০/২১২-২১৯; আল-আ'লাম : ৫/৯৯) –সম্পাদক

৬৭৪. এটি ফাতহুল বারি কিতাবের আলোচনার সংক্ষেপ : খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫২৭।
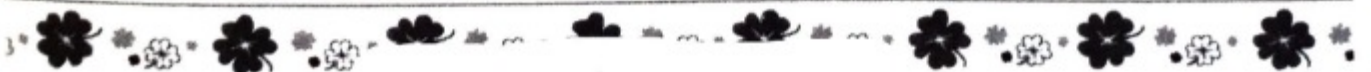
জায়েয বলেছেন, তাঁরা এমন ছোট মূর্তিকে জায়েয বলেছেন, যা বড় মূর্তির সদৃশ নয়। আর আমাদের যুগে প্রচলিত বড় খেলনা, এগুলো একেবারে মূর্তির সদৃশ। আমার ধারণা, বৈধতাদানকারীগণ যদি এগুলো দেখতেন, তা হলে অবশ্যই না-জায়েযের সিদ্ধান্ত দিতেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

১৩৬. ছবি

দেহহীন ছবি, যা কাগজ, কাপড় ইত্যাদির ওপর আঁকা হয়, মালেকি মাযহাবের কিছু ফকিহ এগুলোকে জায়েয বলেছেন।[৬৭৫] তাঁদের বক্তব্যের দাবি হলো, শর্তহীনভাবে এগুলো বিক্রয় করা জায়েয আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের মতানুযায়ী না-জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে দেহ ও দেহহীন ছবির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের মাযহাব অনুযায়ী দেহহীন ছবি বিক্রয় করাও জায়েয নেই। এ কথার পক্ষে দলিল হলো, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস। তিনি মূর্তি বিক্রয়কে হারাম করেছেন। আর হাদিসের 'صنم' শব্দ দেহহীন ছবিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। তবে 'وثن' শব্দটি এর বিপরীত। সেটি শুধু দেহবিশিষ্ট ছবিকে বোঝায়। হাফিযুল হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) অনেক অভিধানবিদ থেকে অনুরূপ মত উল্লেখ করেছেন।[৬৭৬]

ছবি অঙ্কিত কাপড় বা কাগজ যদি এমন হয় যে, ছবি মুছে তা ব্যবহার করা যায়, তা হলে তার ক্ষেত্রে সে হুকুম প্রযোজ্য হবে, যা ইতঃপূর্বে বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। আর তা হলো, হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাব অনুযায়ী মাকরুহের সঙ্গে বিক্রয় সংঘটিত হবে।

তবে মাকরুহের এ হুকুম তখন হবে, যখন কাপড় বা কাগজে শুধু ছবি থাকবে। পক্ষান্তরে যদি অন্য কোনো বৈধ পণ্য বিক্রয় করা হয় এবং তা ছবিযুক্ত হয়ে আসল বিক্রয়ের মধ্যে আসে, তা হলে তা বিক্রয় করা জায়েয আছে। এটির দৃষ্টান্ত হলো, বিভিন্ন পত্রিকা, স্বরণিকা ও বই, যার মূল উদ্দেশ্য থাকে তার বিষয়বস্তু জানা, তবে অনেক সময় এগুলোতে নিষিদ্ধ ছবি থাকে। অনুরূপভাবে বৈধ পণ্যের কভারের ক্ষেত্রে এ ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে যে, তার

---

৬৭৫. আত-তাজ ওয়াল ইকলিল, আল্লামা মাওওয়াক (রহ.), মাওয়াহিবুল জালিল কিতাবের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪।

৬৭৬. ফাতহুল বারি : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪২৪।
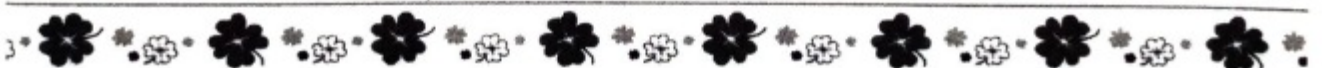
অধিকাংশই ছবিযুক্ত থাকে। সুতরাং ছবি উদ্দেশ্য না-করে বৈধ পণ্যটি মূল উদ্দেশ্য থাকলে এগুলোর বিক্রয় না-জায়েয বলা যাবে না।[৬৭৭]

ছবির উপকরণ– যেমন, ক্যামেরা, টেলিভিশন ইত্যাদি–তৃতীয় অধ্যায়ে এগুলোর হুকুম আলোচনা করা হবে– ইনশাআল্লাহ।

১৩৭. নারদাশির ও দাবা

নারদাশির নামক খেলনাও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এ খেলনা বিক্রয় করা মাকরুহে তাহরিমি। কারণ, এটি হারাম হওয়া সম্পর্কে সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম (রহ.) হযরত বুরাইদাহ (রাযি.) হতে বর্ণনা করেছেন–

أَنَّ النَّبِيَّ –ﷺ– قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.

'রাসুল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নারদাশির খেলল, সে শূকরের গোশত ও রক্তে হাত রঞ্জিত করল।'[৬৭৮]

তবে বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি উপর্যুক্ত বাদ্যযন্ত্রের বিক্রয়ের মতো মতানৈক্যপূর্ণ, তাই হানাফি মাযহাব অনুযায়ী বিক্রয় সংঘটিত হবে। কারণ, আকৃতি পরিবর্তনের পর তা ব্যবহার করা সম্ভব। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতানুযায়ী বিক্রয় সংঘটিত হবে না।[৬৭৯] হাম্বলি মাযহাব ও মালেকি মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহের কাছেও বিক্রয় সংঘটিত হবে না। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

দাবার বিষয়টি হলো, অধিকাংশ ফকিহের মতানুযায়ী তা না-জায়েয, তাই তাঁদের কাছে এটি নারদাশিরের হুকুমে। শাফেয়ি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হলো, মাকরুহের সঙ্গে এটি জায়েয। ইমাম গাযালি (রহ.) বলেছেন–

اللعب بالشطرنج ليس بحرام، ولكنه مكروه، وإن قلنا: إنه مباح، أردنا أنه لا إثم فيه، لا لاكراهية فيه، فلا ترد به الشهادة، إلا أن يختلط به قمار.

---

৬৭৭. আত-তাসবির লি আহকামিত তাসবির, মুফতি মুহাম্মাদ শফি (রহ.), পৃষ্ঠা-৭৬।

৬৭৮. সহিহ মুসলিম, অধ্যায় : কবিতা, হাদিস নং ২২৬০।

৬৭৯. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৭।
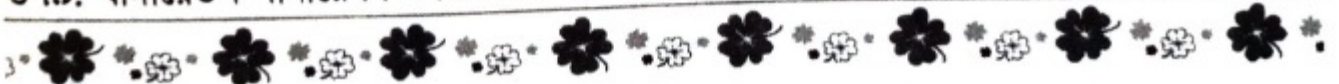
'দাবা খেলা হারাম নয়; তবে মাকরুহ। যদিও আমরা এ কথা বলেছি যে, তা বৈধ, তবে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, তাতে গোনাহ হবে না। মাকরুহ নয় এমনটি উদ্দেশ্য না। সুতরাং এমন খেলা করলে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে না, তবে তার সঙ্গে জুয়া যুক্ত হলে হারাম হবে।'[৬৮০]

তাঁর এ বক্তব্য অনুযায়ী শাফেয়ি মাযহাবে দাবার উপকরণ বিক্রয় করা জায়েয।

শরীর ও বুদ্ধিমত্তা অনুশীলনের উদ্দেশ্যে যেসব বৈধ খেলা করা হয় এবং তা মানুষের আবশ্যকীয় কাজ থেকে বিরত রাখে না, সেসব খেলার উপকরণের হুকুম হলো, তা বিক্রয় করা জায়েয। যেমন: বল খেলা। অনুরূপভাবে সেসব দেশীয় খেলা, যেখানে দাবা-নারদাশিরের মতো গভীর মনোনিবেশ হয় না, এগুলোর উপকরণ বিক্রয় করাও জায়েয বোঝা যায়। কারণ, সেসব খেলা নিষিদ্ধ, যা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে।[৬৮১] والله تعالى أعلم

১৩৮. দ্বিতীয় প্রকার : বৈধ কাজের জন্য প্রস্তুতকৃত যন্ত্র

দ্বিতীয় প্রকার : এমন যন্ত্র, যা বৈধ কাজের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, অবৈধ কাজে ব্যবহারের জন্য তার অবকাঠামোতে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন: আঙ্গুরের রস। এটি নেশাদ্রব্য করতে মদ বানানোর প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এটিকে বৈধ কাজে ব্যবহার করবে অথবা যার সম্পর্কে জানা যাবে না যে, সে বৈধ না-কি অবৈধ কাজে ব্যবহার করতে ক্রয় করছে, সকল ইমামের মতানুযায়ী তার কাছে এটি বিক্রয় করা জায়েয, মাকরুহ নয়। আর ক্রেতা সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, অবৈধ কাজেই ব্যবহার করবে, তা হলে সে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। চুক্তিকারীর শর্তসমূহের আলোচনায় 'একপক্ষ যদি অবৈধ কাজের ইচ্ছে করে' শিরোনামে এ সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা করা হয়েছে।

১৩৯. তৃতীয় প্রকার : সাধারণ কাজের জন্য প্রস্তুতকৃত যন্ত্র

তৃতীয় প্রকার : এমন যন্ত্র, যা সাধারণ কাজের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তার অবকাঠামোতে কোনো ধরনের পরিবর্তন না-করে বৈধ-অবৈধ উভয় কাজে

---

৬৮০. আল-ওয়াসিত, ইমাম গাযালি (রহ.), অধ্যায়: শাহাদাত : খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৪৮।

৬৮১. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম,অধ্যায়: কবিতা : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৬, (দারুল কলম, দামেশক থেকে প্রকাশিত)।

ব্যবহার করা সম্ভব। এমন যন্ত্রের ক্ষেত্রে মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম যার বেশি উপকারিতা হারাম, আর যার বেশি উপকারিতা হালাল, এ-দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। আল্লামা মাযারি (রহ.) বলেছেন–

فإن كان جل المنافع والمقصود منها محرما، والمحلل منها تبعا فواضح إلحاقه بالقسم الأول (أي ما كان جميع منافعه محرمة)، ويمكن تمثيل ذلك بالزيت النجس فإن جل منافعه كالأكل، والادهان، وعمله صابونا، والإيقاد في كل موضع ممنوع منه على المشهور، وإنما فيه إيقاده في غير المساجد، وانتفاع غير الآدمي منه، وذلك في حكم التبع فامتنع بيعه.

'যদি অধিকাংশ উপকারিতা ও তার উদ্দেশ্য হারাম হয় এবং হালালটি হারামের আনুষঙ্গিক হয়, তা হলে তাকে প্রথম প্রকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি স্পষ্ট (অর্থাৎ, যার সমস্ত উপকার হারাম)। নাপাক তেলের মাধ্যমে এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কেননা, প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী খাওয়া, মাখা, সাবান তৈরি করা ও সব জায়গায়[৬৮২] জ্বালানোর মতো তার অধিকাংশ উপকারিতা না-জায়েয। তবে মসজিদ ছাড়া অন্য জায়গায় তা দিয়ে বাতি জ্বালানো এবং মানুষ ছাড়া অন্যের কাজে ব্যবহার করা যাবে। তবে এগুলো আনুষঙ্গিক বিষয়ের হুকুমে, তাই তা বিক্রয় করা না-জায়েয।'[৬৮৩]

শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবে বিক্রয় জায়েয ও না-জায়েয হওয়ার বিষয়টি পণ্য পাক-নাপাকের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যেগুলো পাক হবে এবং এ তৃতীয় প্রকারের মধ্যে যেগুলো পাক করা সম্ভব হবে, তা বিক্রয় করা জায়েয। তবে তার জন্য শর্ত হলো, বিক্রেতা এটি জানবে না যে, ক্রেতা অবৈধ কাজে ব্যবহার করবে। আর যেগুলো এমন নাপাক যে, তা পাক করা সম্ভব নয়, সেগুলো বিক্রয় করা জায়েয নেই। যেমনঃ এমন তরল পদার্থ নাপাক হয়ে গেল, যা পাক করা অসম্ভব। এ ধরনের জিনিস বিক্রয় করা জায়েয নেই। যদিও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। যেমন মসজিদ ছাড়া

৬৮২. কিতাবটির মুদ্রিত দুইটি কপিতে এমন বক্তব্য রয়েছে। এখানে 'সব জায়গা' বলতে উদ্দেশ্য হলো এমন জায়গা, যেখানে নাপাক তেল জ্বালানো জায়েয নেই। যেমন, মসজিদ।

৬৮৩. মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.), অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৪।
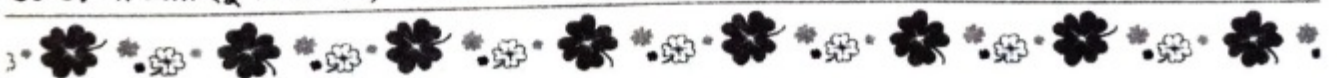
অন্য জায়গার জন্য বাতি জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা।[৬৮৪] ক্রয়কৃত পণ্য থেকে ক্রেতা অবৈধ উদ্দেশ্য নিলে এবং বিক্রেতা সেটি জানতে পারলে কী হুকুম হবে, ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। চুক্তিকারীর শর্তের আলোচনায় সেগুলো দেখুন।

হানাফি মাযহাবের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, তাঁরা এ ধরনের বিক্রয়কে জায়েয বলেন। যদিও তার অধিকাংশ উপকারিতা হারাম হয়। এ কারণে তাঁরা নাপাক তেল বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন। আল্লামা হাসকাফি (রহ.) 'আদ-দুররুল মুখতার' কিতাবে বলেছেন, 'নাপাক তেল বিক্রয় করা এবং খাওয়া ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করাকে আমরা জায়েয বলি। তবে চর্বির বিষয়টি অনুরূপ নয়।'[৬৮৫] হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম মৃত প্রাণীর চর্বি বিক্রয় হারাম বলার কারণ হলো, সেটি মৃতের অংশ, তাই তা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত হাদিসের কারণেও তাঁরা তা না-জায়েয বলেছেন–

> إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ : لَا هُوَ حَرَامٌ.
>
> 'নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মদ, মৃত প্রাণী, শূকর ও মূর্তি বিক্রয়কে হারাম করেছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, মৃত প্রাণীর চর্বির ক্ষেত্রে আপনি কী বলেন? তা দিয়ে নৌকায় প্রলেপ দেওয়া হয়, চামড়ায় তেল দেওয়া হয় এবং তা দিয়ে মানুষ বাতি জ্বালায়। উত্তরে তিনি বললেন, সেটিও হারাম।'[৬৮৬]

তবে এগুলো বিক্রয় জায়েয হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, চুক্তিটি সহিহ হবে। গোনাহের বিষয়টি হলো, চুক্তিকারীর শর্তের আলোচনায় বলেছি যে, একপক্ষ

---

৬৮৪. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৬২। কাশশাফুল কিনা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৫।

৬৮৫. আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ : ফাসেদ বিক্রয়, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬১৯।

৬৮৬. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: বিক্রয়, হাদিস নং ২২৩৬।

অবৈধ কাজের উদ্দেশ্য করলে অপর পক্ষ যদি তা জানার পর বিক্রয় করে, তা হলে মাকরুহে তাহরিমি হবে। আর মাকরুহ হওয়ার বিষয়টি অন্তরের নিয়তের কারণে অথবা চুক্তির সময় এভাবে স্পষ্টকরে বলার কারণে হতে পারে যে, এর দ্বারা অবৈধ উদ্দেশ্য নেওয়া হচ্ছে। তবে চুক্তিটি যদি এ-দুটি বিষয় থেকে মুক্ত হয় এবং বিক্রেতা নিশ্চিত জানে না যে, ক্রেতা তা অবৈধ কাজে ব্যবহার করবে, তা হলে তার জন্য বিক্রয় করা জায়েয হবে এবং তার কোনো গোনাহ হবে না। আর বিক্রেতা যদি জানতে পারে যে, ক্রেতা অবৈধ কাজে ব্যবহার করবে এবং সে ওই অবৈধ কাজের নিকটতম কারণ হয়, তা হলে এ অবস্থায় বিক্রয় করা মাকরুহে তাহরিমি হবে। পক্ষান্তরে সে যদি দূরবর্তী কারণ বা মাধ্যম হয়, তা হলে মাকরুহ হবে না। যেমনঃ অমুসলিম বা বিদ্রোহীদের কাছে লোহা বিক্রয় করা।

এখান থেকে রেডিও, টেলিফোন, টেলিগ্রাম বিক্রয়ের হুকুম জানা যায়। কেননা, সাধারণ উপকারিতার জন্য এগুলো তৈরি করা হয়েছে। এগুলো বৈধ-অবৈধ সব ধরনের কাজে ব্যবহার হতে পারে। সুতরাং এগুলোর বিক্রয় সহিহ হবে এবং বিক্রেতা ক্রেতার অবৈধ উদ্দেশ্য না-জানলে মাকরুহ হবে না। এটি উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আর বিক্রেতা যদি নিশ্চিত জানতে পারে যে, ক্রেতা শুধু অবৈধ কাজে ব্যবহার করবে, তা হলে হানাফি, শাফেয়ি ও মালেকি মাযহাবের মতানুযায়ী মাকরুহে তাহরিমি হবে, তবে বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। হাম্বলি মাযহাবের মত এর বিপরীত, তাদের কাছে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, ক্যামেরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কারণ, সাধারণ উদ্দেশ্যে তা তৈরি করা হয়েছে। প্রাণ আছে শুধু এমন বস্তুর ছবি তোলার জন্যই তা নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং প্রাণ নেই এমন বস্তুর ছবি তোলার কাজেও সেটি ব্যবহার করা সম্ভব। আর এ ধরনের ছবি তোলা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জায়েয। তবে বিক্রেতা যখন জানবে যে, ক্রেতা শুধু অবৈধ উদ্দেশ্যের জন্যই ক্রয় করছে, তখন তার কাছে বিক্রয় করা মাকরুহে তাহরিমি হবে।

ছবি দেহহীন হওয়ার ওপর নির্ভর করে উপর্যুক্ত হুকুম দেওয়া হয়েছে। ফটোগ্রাফির ছবিগুলোও নিষিদ্ধ ছবির আওতাভুক্ত হবে। মালেকি মাযহাবের যেসব ফকিহ ও সমকালীন ফকিহদের যাঁরা এ মত দিয়েছেন যে, ছায়াহীন ছবি জায়েয আছে, তাঁদের মতানুযায়ী ফটোগ্রাফির ছবি নিষিদ্ধ ছবির আওতাভুক্ত নয়। যেমনঃ ড. মুহাম্মাদ বুখাইত মিশরি (রহ.)-এর মতো যাঁরা

মনে করেন যে, ফটোগ্রাফির ছবি নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁদের বক্তব্যের দাবি হলো, এসবের উপকরণ বিক্রয় করা তাঁদের কাছে মাকরুহ নয়। তবে (এর বিপরীত সিদ্ধান্ত হবে যদি) বিক্রেতা জানতে পারে যে, ক্রেতা তা দিয়ে এমন ছবি তুলবে, যার ছবি তোলা জায়েয নেই, যেমনঃ তার জন্য বিয়ে করা জায়েয নেই এমন মহিলার ছবি তোলা।

আর টেলিভিশনের হুকুম হলো, সমকালীন অনেক আলেম টেলিভিশনের স্ক্রিনে আসা ছবিকে না-জায়েয ছবির আওতাভুক্ত করেছেন। সুতরাং তাঁদের মতানুযায়ী সেগুলো প্রথম প্রকারের আওতাভুক্ত হবে। তাঁদের বক্তব্যের দাবি হলো, তা বিক্রয়ের হুকুম বাদ্যযন্ত্র বিক্রয়ের হুকুমের অনুরূপ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আবার অনেকে বলেছেন, এগুলো না-জায়েয ছবির আওতাভুক্ত নয়। কারণ, তা কোনো বস্তুর মধ্যে স্থির থাকে না। এটি বরং কাপড় বা কাগজের ছবির সঙ্গেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। আমাদের কাছে এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো তৃতীয় প্রকারের আওতাভুক্ত। তাই তার উপকরণ বিক্রয় করলে তা সহিহ হিসাবে সংঘটিত হবে। তবে আমাদের যুগে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যবহৃত টেলিভিশনের অধিকাংশই শরয়ি নিষিদ্ধ প্রোগ্রাম মুক্ত নয়। অধিকাংশ ক্রেতা না-জায়েয ফিল্ম ও প্রোগ্রাম দেখার উদ্দেশ্যে এটা ক্রয় করে। সুতরাং কেউ যদি এ না-জায়েয উদ্দেশ্যে ক্রয় না-করে এবং সেটিকে বৈধ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তা হলে তার বিক্রয়কে মাকরুহে তাহরিমি বলতে পারি না। তবে না-জায়েয কাজের জন্য ব্যবহার নিশ্চিত হলে তা বিক্রয় করা মাকরুহে তাহরিমি হবে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যবহারের প্রতি লক্ষ করে, এটি মাকরুহে তানযিহি মুক্ত নয়। এ আলোচনা অনুযায়ী বর্তমান পরিস্থিতিতে টেলিভিশনের ব্যবসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে মুসলিমদের সতর্ক হওয়া উচিত। তবে আল্লাহ তাআলা যদি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন, যেখানে এগুলো শুধু বৈধ বা অধিকাংশ বৈধ কাজে ব্যবহার হবে, তখন সেটির ব্যবসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। والله تعالى أعلم

* * *
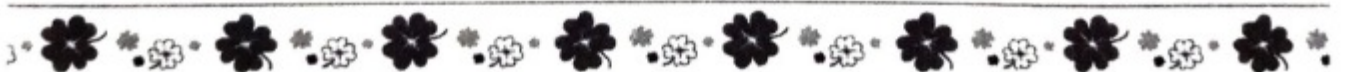
১৪০. তৃতীয় শর্ত : পণ্য বিদ্যমান থাকা

বাইয়ে সালাম ও অর্ডার ছাড়া অন্যান্য বিক্রয় সহিহ হওয়ার তৃতীয় শর্ত হলো, পণ্য বিদ্যমান থাকা। এটি বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার শর্ত। সুতরাং পণ্য নেই এমন বস্তু বিক্রয় করলে তা সংঘটিত হবে না। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ হাদিসটি–

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

> 'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পশুর গর্ভস্থ বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'[৬৮৭]

অনুরূপভাবে যেগুলো বিদ্যমান না-হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা বিক্রয় করাও জায়েয নেই। অর্থাৎ, যে জিনিস বিদ্যমান হওয়া না-হওয়া উভয়ের সমান সম্ভাবনা রয়েছে, যেমনঃ গাভীর স্তনের দুধ। কেননা, তাতে দুধ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত নয়। কারণ, কখনো-কখনো দুধ ছাড়াই তার স্তন ফুলে থাকে।[৬৮৮]

১৪১. গাছে ফল আসার আগে তা বিক্রয় করা

এ আলোচনা অনুযায়ী গাছে ফল আসার আগে তা বিক্রয় করা জায়েয নেই, তবে বাইয়ে সালামের পদ্ধতিতে বিক্রয় করা জায়েয আছে। না-জায়েয হওয়ার কারণ হলো, বিদ্যমান নেই এমন জিনিস বিক্রয় করা হচ্ছে এবং কোনো ফকিহ এটিকে জায়েয বলেননি। এমনকি এ পদ্ধতির বিক্রয়ের প্রচলন ঘটলেও তাকে জায়েয বলেননি। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত হাদিস। ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

أَنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ.

> 'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'মুআওয়ামাহ' পদ্ধতিতে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'[৬৮৯]

'মুআওয়ামাহ'-এর উদ্দেশ্য হলো, এক বছর বা ততোধিক মেয়াদের মধ্যে নির্দিষ্ট গাছ বা বাগান যে ফল দেবে, তা বিক্রয় করে দেওয়া। এটি হারাম

---

৬৮৭. সহিহ বুখারি, অধ্যায়ঃ বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ ধোঁকা ও গর্ভের বাচ্চা বিক্রয় করা, হাদিস নং ২১৪৩।

৬৮৮. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২৬।

৬৮৯. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৯১৩। সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৩৭৫।
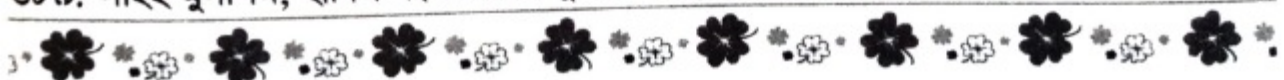
করার কারণ হলো, এখানে ধোঁকা রয়েছে। কারণ, এমন জিনিস বিক্রয় করা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এখনো পর্যন্ত যা সৃষ্টি করেননি। অনেক সময় এটিকে 'বাইউস সিনিন' (কয়েক বছরের জন্য বিক্রয়) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সহিহ মুসলিম ও সুনানে আবু দাউদ শরিফের কিছু বর্ণনাতে অনুরূপ রয়েছে।

ফলগুলো যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তা মানুষ বা পশুর খাওয়ার যোগ্য হয়েছে, তা হলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা বিক্রয় করা জায়েয আছে। আর গাছে ফল আসার পর যদি খাওয়ার যোগ্য না-হয়, এমনকি পশুকেও খাওয়ানো যায় না, তা হলে এমন অবস্থায় তা বিক্রয় জায়েয হওয়ার ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের ইমামগণ মতানৈক্য করেছেন। আল্লামা কাজি খান (রহ.) অধিকাংশ ফকিহের মত হিসাবে উল্লেখ করেছেন, এমন ফল বিক্রয় করা জায়েয নেই, তবে আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) জায়েযের মতকে সহিহ বলেছেন। কারণ, তা এমন মাল, যা প্রথম পর্যায়ে ব্যবহার না-করা গেলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যবহার করা যায়।[৬৯০] এটি অন্য তিন ইমামেরও মাযহাব। কোনো ধরনের শর্ত ছাড়াই ফল খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার আগে বিক্রয়কে তাঁরা জায়েয বলেছেন, (তবে কেটে নেওয়ার শর্তে বিক্রয় করতে হবে)। তা ব্যবহারযোগ্য হওয়ার বিষয়টিকে তারা শর্ত করেননি।[৬৯১]

যদি এমন সময় গাছ বা বাগানের সব ফল বিক্রয় করা হয়, যখন কিছু ফল এসেছে আর কিছু আসেনি, সেক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যেসব গাছে ফল এসেছে, তা ছাড়া বাকিগুলোর ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েয হবে না। এটি হানাফি মাযহাবের 'যাহের' মত। কারণ, এখনো পর্যন্ত যেসব ফল গাছে আসেনি তা বিদ্যমান নয়। তবে শামসুল আইম্মা হালওয়ানি (রহ.) ফতোয়া দিয়েছেন যে, গাছে আসা ফলের পরিমাণ যদি না-আসা ফল অপেক্ষা বেশি হয়, তা হলে সবগুলোর ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েয হবে। ইমাম ফাযলি (রহ.) অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন; বরং তাঁর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, গাছে আসা ফলের পরিমাণ বেশি হওয়া শর্ত নয়; বরং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গাছে আসা ফলকেই আসল সাব্যস্ত করতে হবে। আর পরবর্তীকালে যে ফল আসবে, সেগুলোকে মূলের অনুগামী সাব্যস্ত করতে হবে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাঁর ফাতাওয়াগ্রন্থে অনুরূপ

---

৬৯০. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৮৯।

৬৯১. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০২।

ফতোয়া দিয়েছেন।[৬৯২] আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) আল্লামা ফাযলি (রহ.)-এর ফতোয়া নকল করার পর বলেছেন–

وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد رحمه الله وهو بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق، ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق وهو قول مالك رحمه الله.

'ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা দেখেছি। সেটি হলো, গাছের ফুল বিক্রয় করা। কারণ, ফুল পর্যায়ক্রমে ফুটতে থাকে। এরপর এ পদ্ধতিতে সবগুলোর ক্ষেত্রে বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন। এটি ইমাম মালেক (রহ.)-এরও মত।'[৬৯৩]

ইমাম সারাখসি (রহ.) তাঁর শাইখ ইমাম হালওয়ানি ও ফাযলি (রহ.) থেকে জায়েযের মত বর্ণনা করেছেন। তবে যাহেরুল মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুধু বিদ্যমান ফলের ক্ষেত্রে বিক্রয়কে তাঁরা সহিহ বলেছেন। কেননা, প্রয়োজনের সময় এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, আর এখানে কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, মূল গাছ বিক্রয় করা বা আংশিক মূল্য দিয়ে বিদ্যমান ফল ক্রয় করে অবশিষ্ট ফল আসা পর্যন্ত তার চুক্তি বিলম্বিত করা সম্ভব অথবা পূর্ণ মূল্য দিয়ে বিদ্যমান ফল ক্রয় করবে এবং সেখান থেকে উৎপাদিত বস্তুর ব্যবহার বৈধ করে দেবে।[৬৯৪] তবে আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন–

لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا، ولا سيما في مثل دمشق الشام، كثيرة الأشجار والثمار، فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس، لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم، وفي نزعهم عن عادتهم حرج ... ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية.

'কিন্তু আমাদের যুগে প্রয়োজনের বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। বিশেষ

৬৯২. ফাতাওয়ায়ে ইবনে নুজাইম, ফাতাওয়া আল-গিয়াসিয়্যাহ-এর সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১১৩।

৬৯৩. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯২।

৬৯৪. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.), খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৯৬।

করে শামের দামেশক এলাকার মতো অধিক গাছ ও ফলের এলাকায়। কেননা, অধিকাংশ মানুষ মূর্খ হওয়ায় তাদেরকে উপর্যুক্ত কোনো একটি পদ্ধতি অবলম্বনে বাধ্য করা সম্ভব নয়। যদিও সামান্য কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। আর তাদেরকে অভ্যাস থেকে বের করে আনাও বেশ কষ্টসাধ্য। ... আর এটা তো সর্বজনবিদিত যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যাহেরুর রেওয়ায়াত-এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।'[৬৯৫]

ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন–

وجملة ذلك : أنه إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول لم يجز، إلا بيع الموجود منها دون المعدوم، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز بيع الجميع، لأن ذلك يشق تمييزه، فجعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر، كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا.

'সারকথা, যখন এসব ফলের কোনো কিছু বিক্রয় করবে, তখন শুধু বিদ্যমান ফলের ক্ষেত্রেই বিক্রয় জায়েয হবে। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ি (রহ.) অনুরূপ বলেছেন। ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, সবগুলোর ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েয হবে। কারণ, এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন, তাই গাছে না-আসা ফলকে আসা ফলের অনুগামী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমনভাবে খাওয়ার যোগ্য নয় এমন ফল খাওয়ার যোগ্য ফলের অনুগামী করা হয়।'[৬৯৬]

মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম জায়েযের সিদ্ধান্তকে সেসব ফলের সঙ্গে নির্দিষ্ট করেছেন, যা এক সময় হয় অথবা এমন পর্যায়ক্রমে হয়, যার মধ্যে পার্থক্য করা যায় না, তবে তার একটি শেষ সময় রয়েছে, যখন আর ফল আসে না। আর যদি পর্যায়ক্রমে ফল আসতে থাকে এবং তার কোনো শেষ সময় না-থাকে, তা হলে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা ছাড়া তা বিক্রয় করা জায়েয নেই। তবে নির্ধারিত সময়টি দীর্ঘ হতে পারে। যেমন, অনেক এলাকায় কলা উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকে না। তাঁদের অনেক ফকিহ

---

৬৯৫. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২১১–২১২, ফিকরাহ নং ২২৫০৫।
৬৯৬. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৭।
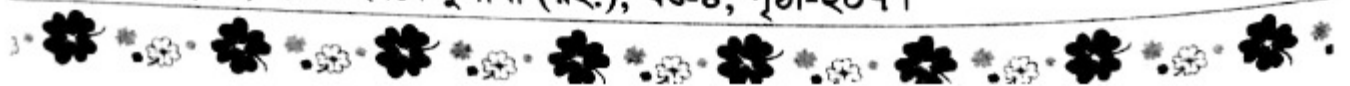
চুক্তির মেয়াদকে এক বছর, আবার অনেকে দুই বছর করার শর্তারোপ করেছেন।[৬৯৭] এটি স্পষ্ট কথা যে, হানাফি মাযহাবের যেসব ফকিহ এটিকে জায়েয বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য হলো এক সিজনে উৎপাদিত ফল। যেসব ফল বিভিন্ন সিজনে উৎপাদিত হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে জায়েযের সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত নয়। তবে যেসব ফল বছরের অধিকাংশ সময় হতে থাকে, সেগুলোর ক্ষেত্রে স্পষ্ট বিষয় হলো, তাতে কয়েক বছরের বিষয়টি পাওয়া যায়। ফলে তা জায়েয বলা যাবে না। والله تعالى أعلم

১৪২. ফল বিক্রয়ের পর গাছে রাখার বিধান

গাছে ফল আসার ব্যাখ্যার মতানৈক্য অনুযায়ী ফল আসার পর তখনই তা বিক্রয় করা জায়েয, যখন বিক্রয়ের পর বিক্রেতা তা কেটে ফেলার শর্তে বিক্রয় করবে। এভাবে বিক্রয় করলে তা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। যদি ফল আসার পর খাওয়ার যোগ্য হওয়ার আগে বিক্রয় করা হয় এবং বিক্রেতা এমন শর্ত না-করে যে, ক্রেতা তা কেটে নেবে, আর ক্রেতাও এমন শর্ত করে না যে, তা গাছে রেখে দেবে, এ মাসআলাটি হানাফি ও হিজাজি অন্য তিন ইমামের মধ্যে মতানৈক্যের ক্ষেত্র। হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, এ বিক্রয় জায়েয আছে। কারণ, এখানে বিক্রয়চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন কোনো শর্ত করা হয়নি। অন্য তিন ইমাম বলেছেন, এ বিক্রয় জায়েয নেই। কারণ, খাওয়ার যোগ্য হওয়ার আগে ফল বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত হাদিসের ব্যাপকতা এটিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।[৬৯৮]

হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম খাওয়ার যোগ্য হওয়ার আগে ফল বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত হাদিসটিকে সে অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন, যেখানে গাছে ফল রেখে দেওয়ার শর্তারোপ করা হয়। আর যদি কোনো ধরনের শর্তারোপ ছাড়া বিক্রয় করার পর ক্রেতা সেটি রেখে দেয়, তা হলে হানাফি মাযহাব অনুযায়ী সে বিক্রয় জায়েয হবে। কেননা, ইমাম মালেক (রহ.) ফল ও ফসল বিক্রয়ে দুর্যোগে পতিত হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে হযরত আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন–

---

৬৯৭. বিস্তারিত জানতে দেখুন : হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা শারহিদ দারদির আল-কাবির : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭৭।

৬৯৮. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০২।
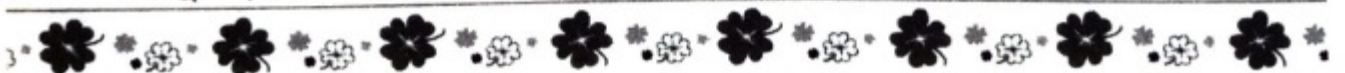
ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيهِ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ، فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ، فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا.

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে জনৈক ব্যক্তি একটি বাগানের ফল ক্রয় করে তা দেখা-শোনা করল। এরপর তার লোকসান হলে সে বাগানের মালিককে মূল্য কমাতে বা বিক্রয়চুক্তি বাতিল (ইকালা) করতে বলল। বিক্রেতা এমনটি না-করার ব্যাপারে কসম করল। এরপর ক্রেতার মাতা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে ঘটনা বলল। (তার কথা শোনার পর) রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে ভালো কাজ না-করার কসম করেছে।'[৬৯৯]

হাদিসটির মাধ্যমে দলিল দেওয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট। কেননা, ক্রেতা ক্রয়কৃত ফল গাছে রেখেছে। সুতরাং যদি শর্ত করে রাখতো, তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে ফাসেদ হতো। অতএব, বোঝা যায় যে, শর্তারোপ না-করেই সে রেখেছিল, আর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে বিক্রয়ের বৈধতা দিয়েছেন। আর বিক্রেতাকে ক্রেতার প্রতি ইহসান করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিক্রয়টি যদি ফাসেদ হতো, তা হলে সেটির বৈধতা দিতেন না।

ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গাছে ফল রেখে দেওয়ার শর্তারোপ করে, তা হলে তা দুই পদ্ধতিতে হতে পারে–

১. ফল উপযুক্ত হয়েছে।

২. ফল উপযুক্ত হয়নি।

ফল যদি ব্যবহারযোগ্য হয়। অর্থাৎ, পাকার আগের আপদমুক্ত হয়, তা হলে মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব অনুযায়ী এমন শর্তারোপ করা জায়েয আছে। কেননা, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'উপযুক্ত হওয়ার আগে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'[৭০০] এ হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, উপযুক্ত হওয়ার পর তা বিক্রয় করা জায়েয আছে। হানাফি মাযহাবের

---

৬৯৯. মুয়াত্তা মালেক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬২১।

৭০০. সহিহ বুখারি, পরিচ্ছেদ: ৫৮, হাদিস নং ১৪৮৬।

বাহ্যিক বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, এমন শর্তারোপ করা জায়েয নেই। কারণ, এটি এমন শর্ত, যা বিক্রয়চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সুতরাং এ শর্তের কারণে চুক্তি ফাসেদ হবে। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) হতে বর্ণিত আছে, ফল বড় হওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর এমন শর্তারোপ করা জায়েয আছে। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) এভাবে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতের কারণ দর্শিয়েছেন যে, ইস্তিহসান ও সামাজিক প্রচলনের কারণে জায়েয হবে। 'কেননা, তারা ফল বড় হওয়ার প্রক্রিয়ার পর এমন লেনদেন প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং এটি তখন চুক্তিতে দাবি করে এমন শর্তে পরিণত হয়ে যায়।'[৭০১] ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেছেন, ব্যাপক প্রচলনের কারণে ইমাম তাহাবি (রহ.) এ মত গ্রহণ করেছেন। 'তানবিরুল আবসার' কিতাবে বলা হয়েছে, 'এ মতের ওপর ফতোয়া।' যদিও আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) কুহিস্তানির[৭০২] সূত্রে 'নেহায়া' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের ওপর ফতোয়া।

যদি ফল বড় হওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হওয়া বা উপযুক্ত হওয়ার আগে তা গাছে রাখার শর্তারোপ করে, সেক্ষেত্রে চার মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, ওই শর্তের কারণে চুক্তি ফাসেদ হবে। তার কারণ হলো, হাদিসে ফল ব্যবহারযোগ্য হওয়ার আগে বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। তা ছাড়া এমন শর্ত করলে অস্তিত্বহীন জিনিস বিক্রয় করা হয়ে যায়। তবে আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেছেন, ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বড় হওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হওয়া ও না-হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যেগুলো বড় হওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে শুধু সেগুলো গাছে রাখার প্রচলন রয়েছে। আর যেগুলোর প্রক্রিয়া শেষ হয়নি, সেগুলোর ব্যাপারে প্রচলন হয়নি। অন্যথায় মূল চুক্তিবহির্ভূত শর্ত হওয়ার ক্ষেত্রে উভয় প্রকার

---

৭০১. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯০।

৭০২. **কুহিস্তানি** : শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে হুসামুদ্দিন আল-কুহিস্তানি আল-হানাফি (রহ.)। ইরানের খোরাসান প্রদেশের কুহিস্তান-এর প্রতি সম্বন্ধ করে তাঁকে কুহিস্তানি বলা হয়। কুহিস্তান এলাকাটি আফগানিস্তানের হেরাত এবং ইরানের নিশাপুরের মাঝামাঝি অবস্থিত। তিনি বুখারার খ্যাতনামা মুফতি ছিলেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে: জামিউর রুমুয ফি শারহিন নিকায়াহ মুখতাসারুল বিকায়াহ, শারহু মুকাদ্দিমাতিস সালাহ, জামিউল মাবানি ফি শারহি ফিকহিল কাইদানি প্রভৃতি। তাঁর রচনায় গবেষণাগত দুর্বলতা থাকার কারণে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম সেখান থেকে সচেতনভাবে উপকৃত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তিনি ৯৫০/৯৫৩/৯৬২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। (কাশফুয যুনুন : ২/১৯৭২; উসুলুল ইফতা, টীকা, পৃষ্ঠা-১২৫-১২৬) –সম্পাদক

সমান।[৭০৩] তার এ বক্তব্য দাবি করে যে, বড় হওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হয়নি, এমন ফলের ক্ষেত্রেও যদি লেনদেনের প্রচলন ঘটে, তা হলে সেগুলো রাখার শর্তারোপ করাও জায়েয হবে। কেননা, কোনো শর্ত বৈধ হওয়ার ব্যাপারে নবসৃষ্ট সামাজিক প্রচলন গ্রহণযোগ্য। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) 'ফাসেদ শর্তের' আলোচনায় অনুরূপ বলেছেন।[৭০৪] এ কথার ওপর নির্ভর করে ইমাম থানবি (রহ.) বলেছেন, 'গাছে ফল রাখার শর্তটির ব্যাপারে প্রচলন ঘটলে সামাজিক প্রচলনের কারণে এটি জায়েয হবে।'[৭০৫] আমাদের শাইখ মুফতি রশিদ আহমাদ লুধিয়ানভি (রহ.) এমন ফতোয়া দিয়েছেন।[৭০৬]

এ সিদ্ধান্তের ওপর এভাবে প্রশ্ন তোলা হয় যে, ফল কেটে নেওয়ার শর্তে বিক্রয় করা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জায়েয। আর কোনো ধরনের শর্ত না-করে বিক্রয় করা হানাফি মাযহাবে জায়েয। এখন যদি সামাজিক প্রচলনের কারণে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয়কে জায়েয বলা হয়, তা হলে ফল ব্যবহারযোগ্য হওয়ার আগে বিক্রয় নিষিদ্ধ সম্পর্কিত হাদিসটির কোনো ক্ষেত্রই অবশিষ্ট থাকল না। আর উসুলে ফিকহে এটি স্বীকৃত যে, সামাজিক প্রচলন হাদিসের পরিধিকে সীমিত করতে পারে, রহিত করতে পারে না। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া সম্ভব যে, ফল ব্যবহারযোগ্য হওয়ার আগে বিক্রয় নিষিদ্ধ সম্পর্কিত হাদিসসমূহ এ কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে, তা বিবাদ আবশ্যক করবে। সুতরাং সামাজিক প্রচলনের কারণে যেখানে বিবাদের সম্ভাবনা থাকবে না, সেখানে নিষিদ্ধতাও থাকবে না।

এভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, হাদিসটি উপদেশমূলক ও উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং কাজটি যে অনুত্তম তা বুঝানোর জন্য বিবৃত হয়েছে, হারাম বোঝানো হয়নি। এমন ব্যাখ্যা করার কারণ হলো, হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাযি.)-এর বর্ণিত একটি হাদিস। ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন–

كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ،
فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ، إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ

---

৭০৩. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯০।
৭০৪. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬৬৯, ফিকরাহ নং ২৩৫৮০।
৭০৫. ইমদাদুল ফাতাওয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৬, মাসআলা নং ১২৪।
৭০৬. আহসানুল ফাতাওয়া : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৮৬ ও ৪৯০।

أَصَابَهُ مُرَاضٌ أَصَابَهُ قُشَامٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ، فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ، كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ.

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মানুষ ফল ক্রয়-বিক্রয় করত। যখন ফল পাড়ত এবং তাদের পাওনাদার আসত, বিক্রেতা তখন বলত, কাঠপাখির আক্রমণ লেগেছে, রোগ হয়েছে, আঘাত পেয়েছে, আপদ এসেছে–এসব আপত্তির মাধ্যমে তারা হুজ্জাতবাজি করত। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এ সম্পর্কিত বিবাদ বেশি আসলে তিনি বললেন, যদি এগুলো এড়িয়ে চলা না-যায়, তা হলে ফল উপযুক্ত হওয়ার আগে তা বিক্রয় করবে না। তাদের বিবাদ বেশি হওয়ার কারণে তিনি তাদের পরামর্শ হিসাবে এটি বলেছেন।'[৭০৭] আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

১৪৩. হস্তান্তরের আগে অর্ডারকৃত জিনিস বিক্রয় করা

যে ব্যক্তি বাইয়ে সালামের পদ্ধতিতে কারো থেকে কিছু ক্রয় করবে, যার থেকে ক্রয় করেছে সে হস্তান্তর করার আগে ক্রেতার জন্য অন্যের কাছে ওই জিনিস বিক্রয় করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে কেউ কোনো কিছুর অর্ডার করলে তৈরিকারীর কাছ থেকে গ্রহণ করার আগে অন্যের কাছে তা বিক্রয় করা জায়েয নেই। কেননা, তা হয়তো বিদ্যমান নেই অথবা বিক্রেতার মালিকানাধীন নয়। এ মাসআলা অনুযায়ী যে ব্যক্তি প্রস্তাবিত বিল্ডিং-এ এমন কোনো কামরা ক্রয় করবে যার নকশা করা হয়েছে, তবে এখনো পর্যন্ত বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়নি, এ ধরনের কামরা অর্ডারের মতো। সুতরাং অর্ডারগ্রহীতা সেটি হস্তান্তর করার আগে অর্ডারদাতার জন্য তা অন্য কারো কাছে বিক্রয় করা জায়েয নেই। কারণ, অর্ডারগ্রহীতা যদি নির্মাণ শুরু না-করে, তা হলে তা অবিদ্যমান বস্তু বিক্রয় করা। আর যদি নির্মাণ শুরু করে, তা হলেও অর্ডারগ্রহীতা তা হস্তান্তরের আগে অর্ডারদাতার মালিকানাধীন নয়। আর এমন অস্তিত্বহীন বা মালিকানাহীন বস্তু বিক্রয় করা জায়েয নেই। অর্ডারের শিরোনামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। ইনশাআল্লাহু তাআলা।

* * *

৭০৭. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: ৮৫, হাদিস নং ২১৯৩।

১৪৪. চতুর্থ শর্ত : পণ্যটি কারো মালিকানায় থাকা

বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার জন্য পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানাধীন হওয়া শর্ত। সুতরাং মালিকানায় নেই এমন জিনিস বিক্রয় করলে তা বাতিল হবে। এ সম্পর্কে মূলনীতি হলো, হযরত হাকিম বিন হিযাম (রাযি.) হতে বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেছেন–

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ، قَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

'আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম, জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে এসে আমাকে এমন জিনিস বিক্রয় করতে বলে, যা আমার কাছে নেই, বাজার থেকে ক্রয় করে আনার পর তাকে দেবো। তিনি বললেন, তোমার কাছে যে জিনিস নেই, তা বিক্রয় করো না।'[৭০৮]

হযরত আমর বিন শোআইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم: لَيْسَ على رجُلٍ بَيْعٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ.

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কারো জন্য এমন জিনিস বিক্রয় করা জায়েয নেই, সে যার মালিক না।'[৭০৯]

বিক্রয়চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য চুক্তির সময় ক্রেতার কাছে অর্থ থাকা শর্ত নয়। সুতরাং কেউ যদি অর্থের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করে এবং ক্রয়ের সময় তার কাছে অর্থ না-থাকে, তা হলে অন্যান্য শর্ত ঠিক থাকলে বিক্রয় সহিহ হয়ে যাবে। আর ওই অর্থ ক্রেতার জিম্মায় ঋণ হিসাবে থাকবে।[৭১০]

---

৭০৮. জামে তিরমিযি, হাদিস নং ১২৩২। ইমাম তিরমিযি (রহ.) এ হাদিস বর্ণনা করার পর বলেছেন, এটি হাসান হাদিস। সুনানে নাসায়ি ও অন্যান্য কিতাবে এটি বর্ণিত হয়েছে।

৭০৯. সুনানে নাসায়ি, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: বিক্রেতার কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রয় করা, হাদিস নং ৪৬১২।

৭১০. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.), অধ্যায় : বাইয়ে সরফ, পরিচ্ছেদ: পয়সা বিক্রয় করা : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২৪।

১৪৫. সত্তাগতভাবে বৈধ, এমন কোনো জিনিস বিক্রয় করা

এ আলোচনা অনুযায়ী কারো মালিকানা নয় এমন সত্তাগত বৈধ জিনিস বিক্রয় করলে তা সংঘটিত হবে না। যেমনঃ (অসংরক্ষিত) ঘাস। কেননা, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.

'তিনটি জিনিসের মধ্যে সব মুসলিম অংশীদার, ঘাস, পানি ও আগুন।'[৭১১]

সুতরাং যদি এমন জায়গার ঘাস হয়, যা কারো মালিকানাধীন নয়, তা হলে তা সবার জন্য বৈধ। কারো পক্ষ থেকে তা বিক্রয় করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে চাষ করা ছাড়া কারো জমিতে ঘাস হলে তা বিক্রয় করা জায়েয নেই।[৭১২] তবে অন্যকে তার জমিতে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, জমির মালিককে বলা হবে, হয়তো তুমি সেখান থেকে কেটে মানুষদের দাও অথবা তাদের প্রয়োজন পরিমাণ কেটে নেওয়ার অনুমতি দাও। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে, যখন ওই মালিকানাধীন জমির পাশে আর কোনো বৈধ ঘাস পাওয়া যাবে না। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) অনুরূপ বলেছেন।

কেউ যদি কোনো মালিকানা বা মালিকানাধীন মুক্ত কোনো জমি থেকে ঘাস কেটে জমা করে, তা হলে সে ওই ঘাসের মালিক হয়ে যাবে এবং তা বিক্রয় করা জায়েয হবে।

যেসব ঘাস চাষ করা হয়, তা মালিকানাধীন হিসাবে গণ্য হবে এবং বিক্রয় করাও বৈধ।[৭১৩] অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঘাস উৎপাদন এবং নিজস্ব চারণভূমি করার জন্য জমিতে চাষাবাদ বন্ধ করেছে, তার জমিতে উৎপাদিত ঘাসের ব্যাপারে মালেকি মাযহাবের কিছু ফকিহের এই মত। এক্ষেত্রে তার জন্য ওই ঘাস বিক্রয় করা জায়েয।[৭১৪]

---

৭১১. সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ পানি বিক্রয় নিষিদ্ধ সম্পর্কে, হাদিস নং ৩৪৭৭।

৭১২. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়ঃ পতিত জমি চাষ করা, পরিচ্ছেদঃ সেচ দেওয়া : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৪০। হাশিয়াতুল কালয়ুবি, অধ্যায়ঃ পতিত জমি চাষ করা,খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৬। আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), অধ্যায়ঃ বিক্রয়ঃ খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০০–২০১। আল-বয়ান ওয়াত তাহসিল, ইমাম ইবনে রুশদ (রহ.), অধ্যায়ঃ সাদাদ... খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৪৭।

৭১৩. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়ঃ পতিত জমি চাষ করা, পরিচ্ছেদঃ সেচ দেওয়াঃ খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৪০। হাশিয়াতুল কালয়ুবি, অধ্যায়ঃ পতিত জমি চাষ করা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৬।

৭১৪. আল-বয়ান ওয়াত তাহসিল, ইমাম ইবনে রুশদ (রহ.), অধ্যায়ঃ সাদাদ... খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৪৭।
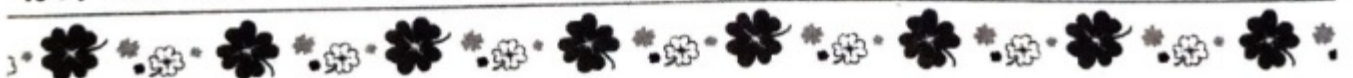
আর সবার জন্য আগুন বৈধ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি খোলা ময়দানে আগুন জ্বালাবে, তার আগুনে সবার অংশীদারিত্ব থাকবে। সুতরাং কেউ সেখান থেকে আলো নিতে, তার আলোয় কাপড় সেলাই করতে, তাপ নিতে অথবা বাতি জ্বালাতে চাইলে আগুনের মালিক তাকে বাধা দিতে পারবে না। তবে কেউ যদি তার মালিকানাধীন জমিতে আগুন জ্বালায়, তা হলে তার মালিকানাধীন জিনিস থেকে অন্যকে উপকৃত হতে বাধা দিতে পারবে। কেউ তার বাতির ফিতা থেকে আগুন বা অঙ্গার নিতে চাইলে সে বাধা দিতে পারবে। কারণ, ফিতা ও অঙ্গার সবই তার মালিকানাধীন সম্পদ, ব্যাপকভাবে বৈধ নয়।[৭১৫]

এ আলোচনা অনুযায়ী বিদ্যুতের মাধ্যমে যে ব্যক্তি তার মালিকানাধীন জমি আলোকিত করবে এবং তার জমির বাইরে আলো ছড়িয়ে পড়বে, অন্যের জন্য ওই আলো ব্যবহার করা জায়েয। যেমনভাবে কারো মালিকানাধীন দেয়াল থেকে ছায়া নেওয়া জায়েয। তবে তার জন্য শর্ত হলো, মালিকের অনুমতি ছাড়া তার মালিকানায় প্রবেশ করা যাবে না। তবে এমন সংযোগের মাধ্যমে কারো জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করা জায়েয হবে না, যার কারণে বিদ্যুৎ মালিকের জমির বাইরে চলে যায়।

অনুরূপভাবে কারো মালিকানাধীন নয় এমন যে কাঠ, ঘাস বা স্থলে অবস্থান করছে এমন শিকার অথবা শিকার করা হয়নি এমন শূন্যে উড়ন্ত পাখি বিক্রয় করা জায়েয নেই।[৭১৬] এক্ষেত্রে অনেক রাষ্ট্র যে নিয়ম জারি করে যে, যাদের কাছে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন থাকবে শুধু তারাই শিকার করতে পারবে এবং এ অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্র অর্থ নিয়ে থাকে, এটি জুলুম ও না-জায়েয। কারণ, আল্লাহ তাআলা সবার জন্য শিকার বৈধ করেছেন। সুতরাং জনসাধারণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে শিকারের অনুমোদন দিয়ে তার বিনিময় নেওয়াও জায়েয নেই।

১৪৬. পানি বিক্রয় করা

পানি কয়েক ভাগে বিভক্ত :

১. এমন সমুদ্র ও নদীর পানি, যেখানে কারো মালিকানা নেই। সত্তাগতভাবে এ পানি সবার জন্য বৈধ এবং তা বিক্রয় করা জায়েয নেই।

২. আমাদের যুগে পাত্র ও বোতলের মাধ্যমে সংরক্ষিত পানি। সর্বসম্মত

---

৭১৫. রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৪০–৪৪১।

৭১৬. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২২, ফিকরাহ নং ২২১৮৭।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি সংরক্ষণকারীর মালিকানা, তাই তা বিক্রয় করা জায়েয। এ দুই প্রকার পানির হুকুমে কোনো মুজতাহিদ ইমামের দ্বিমত পাইনি।

৩. কূপ, পুকুর, ঝরনা ও মালিকানাধীন খালের পানি। এ প্রকারের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। শাফেয়ি মাযহাবের কিছু ফকিহ বলেছেন, এটি পাত্রে সংরক্ষিত পানির মতো মালিকানাধীন পানি। এটি ইমাম ইয়াহইয়া ও মুআইয়াদ বিল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণনা। হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম ও শাফেয়ি মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহ বলেছেন, 'এটি হক, মালিকানা নয়।'[৭১৭] হক হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, তা মালিকানা নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেছেন, কূপ, পুকুর, ঝরনা ও চ্যানেলের মালিক পানির অগ্রাধিকারী। তবে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি মানুষ, পশু, পাখি, চতুষ্পদ প্রাণী ও অন্যান্য প্রাণীকে পান করতে দেওয়া আবশ্যক। জমি, ক্ষেত বা বাগান সেচ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারবে।[৭১৮]

তবে তিনি বলেছেন, সেচের জন্য এ ধরনের পানি বিক্রয় না-জায়েয হওয়ার কারণ হলো, তার পরিমাণ অনির্দিষ্ট। এ কারণ দর্শানো থেকে বোঝা যায় যে, কোনোভাবে যদি অনির্দিষ্টতা দূর হয়ে যায়, তা হলে তা বিক্রয় করা জায়েয হবে। যেমন, পাত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা। কেননা, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) না-জায়েয হওয়ার কারণ এটি বলেননি যে, তা মালিকানা নয়। তিনি কারণ দর্শিয়েছেন যে, তার পরিমাণ অনির্দিষ্ট। হানাফি মাযহাবের যাহেরুর রেওয়ায়াত হলো, পানির সেচ বিক্রয় করা ফাসেদ। তারা ফাসেদের কারণ দর্শিয়েছেন যে, তা পণ্যের হক, তাই ভিন্নভাবে বিক্রয় করা যাবে না। তা ছাড়া সেটি অনির্দিষ্ট। তবে শামসুল আইম্মা সারাখসি (রহ.) বলেছেন–

> وبعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله أفتى، أن يبيع الشرب، وإن لم يكن معه أرض، للعادة الظاهرة فيه في بعض البلدان، وهذه عادة معروفة بنسف.
>
> 'আমাদের মুতাআখখিরিন শায়খগণ জমি ছাড়াই পানির সেচ বিক্রয় জায়েযের ফতোয়া দিয়েছেন। অনেক এলাকায় এমন ব্যাপক প্রচলন থাকার কারণে এ ফতোয়া দিয়েছেন। 'নাসাফ' নামক এলাকায় এটির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।'[৭১৯]

---

৭১৭. নাইলুল আওতার, আল্লামা শাওকানি (রহ.), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৫৯।
৭১৮. কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), পৃষ্ঠা-৯৫।
৭১৯. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.), খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৭১।
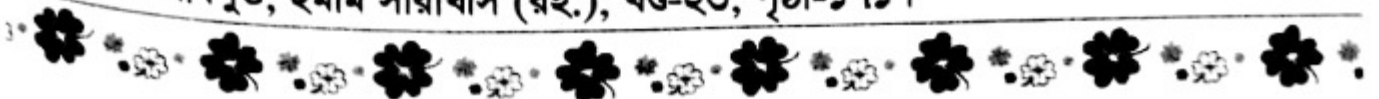
ইমাম মালেক (রহ.) পানির সেচ বিক্রয় জায়েয বলেছেন। যদিও পানির স্বত্ব বিক্রয় করা হয় অথবা সেখান দিয়ে প্রবাহিত পানি বিক্রয় করা হোক। 'মুদাওওয়ানাতুল কুবরা' কিতাবে বলা হয়েছে–

قلت: أرأيت إن بعت شرب يوم أيجوز ذلك أم لا؟ قال: قال مالك: ذلك جائز.

قلت: فإن بعت حظي بعت أصله من الشرب وإنما لي فيه يوم من اثني عشر يوما أيجوز في قول مالك؟ قال: نعم.

قلت: فإن لم أبع أصله ولكن جعلت أبيع منه السقي إذا جاء يومي بعت ما صار لي من الماء ممن يسقي به أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم.

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি এক দিনের সেচ বিক্রয় করি, তা হলে সেটি জায়েয হবে কি না? উত্তরে তিনি বললেন, ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, এটি জায়েয। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি সেচ থেকে আমার প্রাপ্য আসল অংশ বিক্রয় করি? আর বারো দিনের মধ্যে আমি এক দিন সে অংশ পাই। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতানুযায়ী কি এটি জায়েয হবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি আসল বিক্রয় না-করে শুধু সেচ বিক্রয় করি, (সেটি এভাবে যে) যখন আমার পালা আসবে তখন আমার প্রাপ্য পানি সেচ নিতে চায় এমন কারো কাছে বিক্রয় করব। ইমাম মালেক (রহ.)-এর অভিমতে কি এটি জায়েয হবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ।'[৭২০]

আমাদের যুগের বড় ট্যাংকি, যেখানে অনেক পানি জমা রাখা হয়, এগুলো সংরক্ষিত পানির দ্বিতীয় প্রকারের আওতাভুক্ত। কেননা, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেছেন, 'কেউ যদি পানি সংরক্ষণাগার করে সেখানে অনেক পানি জমা করার পর পাত্রের মাধ্যমে সেখান থেকে বিক্রয় করে, তা হলে তা জায়েয আছে।'[৭২১]

* * *

৭২০. আল-মুদাওওয়ানাহ, অধ্যায়: শত্রুর এলাকায় ব্যবসা করা, পরিচ্ছেদ: সেচের পালার দিন : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১২।

৭২১. কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), পৃষ্ঠা-৯৫।

১৪৭. পঞ্চম শর্ত : পণ্য হস্তান্তরযোগ্য হওয়া

চুক্তির সময় পণ্য হস্তান্তরযোগ্য হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করতে সক্ষম হওয়া। এটি বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার শর্ত। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো সেসব হাদিস, যেগুলোতে ধোঁকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা,[৭২২] ইবনে উমর,[৭২৩] ইবনে আব্বাস[৭২৪] ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম হতে এমন হাদিস বর্ণিত আছে।

ধোঁকা একটি ব্যাপক বিষয়, যার মধ্যে অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ধোঁকার বিষয়বস্তুর ওপর একমত হলেও তার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যে ভিন্নতা রয়েছে। সম্ভবত ধোঁকার যেসব সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ কিন্তু সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হলো ইমাম সারাখসি (রহ.)-এর সংজ্ঞা। তাঁর সংজ্ঞাটি এরূপ :

الغرر ما يكون مستور العاقبة.

'ধোঁকা বলা হয়, যার শেষ পরিণতি গোপন থাকে।'[৭২৫]

ধোঁকার বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো সেসব বিক্রয়, যার শেষ পরিণতি এমন গোপন হয় যে, কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা জানা যায় না। আল্লামা কাসানি (রহ.)-এর বক্তব্য এ সংজ্ঞার সমার্থবোধক। তিনি বলেছেন :

الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك.

'ধোঁকা বলা হয় এমন ঝুঁকিকে, যা হওয়া না-হওয়া উভয় দিকে সমান এবং তা সন্দেহের অবস্থানে থাকে।'[৭২৬]

আল্লামা শিরাজি (রহ.) 'আল-মুহায্যাব' কিতাবে বলেছেন–

الغرر ما انطوى عنه امره وخفي عليه عاقبته

'ধোঁকা হলো, পরিণতি গোপন থাকে এমন ঘটিত জিনিস।'[৭২৭]

---

৭২২. ইমাম বুখারি (রহ.) ছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিস এটি বর্ণনা করেছেন।

৭২৩. মুসনাদে আহমাদ : খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৯৩ ও খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৭৫। সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকি (রহ.), খণ্ড-৫, পৃ. ৩০২। সহিহ ইবনে হিব্বান। নাইলুল আওতার : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৫।

৭২৪. সুনানে ইবনে মাজাহ, আল্লামা সিনদি (রহ.)-এর টীকাসহ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৮, হাদিস নং ২১৯৫।

৭২৫. আল-মাবসুত, আল্লামা সরাখসি (রহ.), খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৯৪।

৭২৬. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৬৩।

৭২৭. আল-মুহায্যাব : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬২।
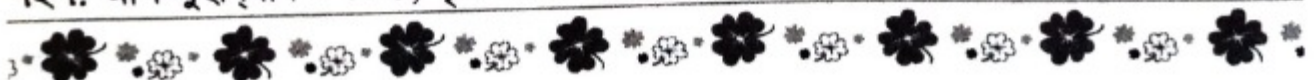
আল্লামা কারাফি (রহ.) বলেছেন–

أصل الغرر هو الذي لا يدري: هل يحصل أم لا؟ كالطير في الهواء، والسمك في الماء.

'ধোঁকার মূলকথা হলো, এটি জানা যায় না যে, তা অর্জিত হবে কি না? যেমন: উড়ন্ত পাখি ও পানির মাছ।'[৭২৮]

আসল কথা হলো, ধোঁকা একটি ব্যাপক বিষয়, যার অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার সব শাখা বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে, ধোঁকা নিম্নোক্ত তিন প্রকারের বাইরে নয় :

১. চুক্তিকৃত বস্তুটি হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

২. চুক্তিটি চুক্তিকৃত বস্তু অথবা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে অস্পষ্টতা রাখবে। (পণ্য, মূল্য বা পারিশ্রমিক অস্পষ্ট রাখা)

৩. চুক্তির মধ্যে এমন কোনো বিষয় থাকবে, যা মালিকানা অর্জনকে ঝুঁকির সম্মুখীন করে। যেমন জুয়ার মধ্যে হয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত প্রকারসমূহের প্রথম প্রকার তথা চুক্তির সময় বিক্রেতা যা হস্তান্তর করতে সক্ষম না, এটি ধোঁকা। কারণ, তার শেষ পরিণতি জানা যায় না যে, বিক্রেতা তা হস্তান্তর করতে পারবে কি না।

এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, পলাতক দাস বিক্রয় করা জায়েয নেই। কেননা, সে বিক্রেতার মালিকানাধীন হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির সময় বিক্রেতা তাকে হস্তান্তর করতে সক্ষম নয়। বিক্রেতার মালিকানাধীন হারানো সব ধরনের জিনিস এ প্রকারের আওতাভুক্ত হবে। আল্লামা কারখি (রহ.) বলেছেন, 'পলাতক দাস বিক্রয় করলে তা সংঘটিত হবে। এমনকি তাকে পাওয়া গেলে বিক্রেতা যদি ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করে, তা হলে সে বিক্রয়ও জায়েয হবে। নতুন করে বিক্রয়চুক্তি করতে হবে না। তবে ক্রেতা হস্তান্তর দাবি করে কাজির কাছে বিচার দেওয়ার পর বিক্রেতা তা হস্তান্তর করতে অক্ষম হওয়ার পর কাজি সে চুক্তি বাতিল করে দিলে নতুন করে চুক্তি করতে হবে। আর যাহেরুর রেওয়ায়াতের উত্তর হলো, পলাতক দাস পাওয়ার পর চুক্তি কার্যকর হবে না; বরং নতুন করে ইজাব-কবুল অথবা তাআতির মাধ্যমে

---

৭২৮. আল-ফুরুক, আল্লামা কারাফি (রহ.), খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬৫।

চুক্তি করতে হবে। আর সেই পাখির বিক্রয় এ হুকুমের আওতাভুক্ত হবে, যা বিক্রেতার হাতে থাকার পর উড়ে যায়। যাহেরুর রেওয়ায়াত অনুযায়ী বিক্রয় সংঘটিত হবে না। অনুরূপভাবে সেই মাছ বিক্রয়টি এ হুকুমের অধীনে হবে, যেখানে মাছ ধরার পর পুকুরে ছেড়ে দিয়েছে এবং শিকার করা ছাড়া সেগুলো ধরা সম্ভব না। যদি শিকার করা ছাড়া ধরা যায়, সেটি এভাবে যে, ছোট জলাশয়ে ফেলেছে, তা হলে তা বিক্রয় করা জায়েয আছে। কারণ, তা হস্তান্তরযোগ্য।

পণ্যটি যদি নির্দিষ্ট ছিনতাইকারীর হাতে থাকে এবং মালিক অন্যের কাছে তা বিক্রয় করে দেয়, তা হলে হস্তান্তরের ওপর মওকুফ অবস্থায় বিক্রয় সংঘটিত হবে। কারণ, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান, কাজি ও মুসলিম জনতার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ছিনতাইকৃত বস্তু হস্তান্তরযোগ্য। তবে তৎক্ষণাৎ বিক্রয় কার্যকর না-হওয়ার কারণ হলো, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা ছিনতাইকারীর হাতে রয়েছে। সুতরাং সে যখন হস্তান্তর করবে, তখন বাধা দূর হয়ে যাবে এবং চুক্তি কার্যকর হবে। তবে পলাতক দাসের বিষয়টি অনুরূপ নয়। কেননা, সর্বাবস্থায়ই তা হস্তান্তর করা অসম্ভব।[৭২৯]

ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন, পলাতক দাস বিক্রয় করা সহিহ নয়। চাই তার অবস্থান জানা থাক বা না-থাক। অনুরূপভাবে পলাতক উট, ছুটে যাওয়া ঘোড়া ও তার সদৃশ বস্তু এ হুকুমের আওতাভুক্ত হবে। ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আবু সাওর,[৭৩০] ইবনুল মুনায়্যির ও হানাফি উলামায়ে কেরাম এ

---

৭২৯. আল্লামা কাসানি (রহ.)-এর বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে কিতাবের আলোচনার সারসংক্ষেপ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪১-৩৪২।

৭৩০. **আবু সাওর :** ইবরাহিম ইবনে খালিদ ইবনে আবুল ইয়ামান আল-কালবি আল-বাগদাদি আবু সাওর (রহ.)। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু আবদুল্লাহ এবং লকব আবু সাওর। তাঁর উস্তাদগণ: সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না, ইসমাইল ইবনে উলাইয়া, ওয়াকি ইবনুল জাররাহ, আবদুর রাহমান ইবনে মাহদি, ইমাম শাফেয়ি, ইয়াযিদ ইবনে হারুন (রহ.) প্রমুখ। তাঁর ছাত্রগণ: ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আবুল কাসেম আল-বাগাভি (রহ.) প্রমুখ। তিনি যদিও ইমাম শাফেয়ির ছাত্র ছিলেন, তবে তিনি স্বতন্ত্রভাবে ইজতিহাদ করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখতেন এবং তাঁর আলাদা মাযহাবও ছিল। কিন্তু তা চার মাযহাবের মতো প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। ইবনে হিব্বান বলেন, 'তিনি ছিলেন উম্মতে মুসলিমার অন্যতম ইমাম।' আবু বকর আল-আ'য়ুন বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে আবু সাওর সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, 'ইলমে হাদিসের একজন বিশিষ্ট আলেম হিসাবে আমি তাঁকে পঞ্চাশ বছর যাবৎ চিনি। আমার কাছে তিনি ইমাম সুফিয়ান সাওরি (রহ.)-এর সমপর্যায়ের।' ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কাছে এক লোক একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে আবু সাওরের কাছে জিজ্ঞেস করো।' তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন: ইমাম

কথা বলেছেন। এরপর হযরত ইবনে উমর, ইবনে সিরিন ও শুরাইহ (রহ.) হতে জায়েযের মত বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বিপক্ষে হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)-এর হাদিসের মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন। সে হাদিসটি হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধোঁকার বিক্রয়কে নিষেধ করেছেন।[৭৩১]

১৪৮. ঋণীর কাছে ঋণ বিক্রয় করা

ধোঁকাযুক্ত বিক্রয়ের মধ্যে একটি বিক্রয় হলো, ঋণদাতা ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা। যদি স্বয়ং ঋণীর কাছে বিক্রয় করা হয়, তা হলে বাইয়ে সালাম ও সুদি বস্তু ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে বর্তমান মূল্যে বিক্রয় করা জায়েয হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঋণদাতা ঋণীকে বলবে, 'তোমার কাছে আমি যে ঋণ পাই, তার বিনিময়ে তোমার এ কাপড়টি আমার কাছে বিক্রয় করো।' অথবা বলবে, 'তোমার কাছে থাকা আমার ঋণকে তোমার এ কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রয় করছি।' এ পদ্ধতিতে বিক্রয় করা জায়েয। ফুকাহায়ে কেরাম এ পদ্ধতিকে 'ঋণীর কাছে ঋণ বিক্রয় করা' নামে অভিহিত করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের অভিমতে এটি জায়েয। আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন–

ويجوز بيعه (أي بيع الدين) ممن عليه؛ لأن المانع هو العجز عن التسليم، ولا حاجة إلى التسليم ههنا، ونظيره بيع المغصوب أنه يصح من الغاصب، ولا يصح من غيره إذا كان الغاصب منكرا، ولا بينة للمالك.

'ঋণীর কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েয। কারণ, না-জায়েয হওয়ার কারণ হলো, হস্তান্তরে অক্ষম হওয়া। আর এখানে হস্তান্তর করার প্রয়োজন নেই। এর দৃষ্টান্ত হলো, ছিনতাইকৃত বস্তু বিক্রয় করা। ছিনতাইকারীর কাছে বিক্রয় করা জায়েয, ছিনতাইকারী অস্বীকার করলে এবং মালিকের কাছে প্রমাণ না- থাকলে অন্যের কাছে বিক্রয় করা জায়েয নেই।'[৭৩২]

মালেক, শাফেয়ি এবং তাঁর নিজের মত সম্বলিত একটি ফিকহের কিতাব, আহকামুল কুরআন প্রভৃতি। ২৪০ হিজরিতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। (তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত : ২/২০০; তারিখুল ইসলাম : ৫/৭৭২; আল-আ'লাম : ১/৩৭) –সম্পাদক

৭৩১. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭১।

৭৩২. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, অধ্যায় : বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ পণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪৮।
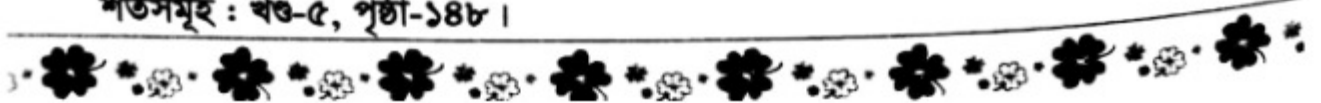
'বাইয়ে সালাম ছাড়া', কথাটি এ কারণে বলেছি যে, বাইয়ে সালামের ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতা হতে কব্জা করার আগে বিক্রেতার কাছে ওই পণ্য বিক্রয় করা জায়েয নেই। কারণ, তা হচ্ছে কব্জা করার আগে বিক্রয়। আর এটি জায়েয নেই। আল্লামা কাসানি (রহ.) এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। আল্লামা শিরাজি (রহ.) বলেছেন :

> وإن كان الدين غير مستقر نظرت، فإن كان مسلمًا فيه، فلم يجز بيعه، لما روى أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل أسلف في حلل دقاق، فلم يجد تلك الحلل، فقال: آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الجل[৭৩৩]، فكرهه ابن عباس.

> 'ঋণটি যদি অস্থিতিশীল হয় তা হলে লক্ষ করতে হবে, তা বাইয়ে সালামের ঋণ হলে বিক্রয় করা জায়েয নেই। কেননা, বর্ণিত আছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে পাতলা পোশাকের বাইয়ে সালাম করেছিল; কিন্তু ওই পোশাকগুলো পেল না। সে তখন বলল, একটি পাতলা পোশাকের পরিবর্তে তোমার থেকে দুটি মোটা পোশাক নেবো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) এটিকে অপছন্দ করেছিলেন।'[৭৩৪]

বাইয়ে সালামের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে–ইনশাআল্লাহ।

'সুদি বস্তু নয়' এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, ঋণ ও তার বিনিময় উভয়টি যদি সুদি বস্তু হয়, তা হলে তার বিনিময়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক টাকা লেনদেনের শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবে। সুতরাং সমজাতীয় হলে উভয় বিনিময় সমান হতে হবে। ঋণী যখন ঋণদাতা থেকে তার নগদ পরিমাণ অপেক্ষা বেশি মূল্যে ক্রয়

---

৭৩৩. الجل: بالكسر ضد الدق، كما في تاج العروس.

৭৩৪. আল-মুহায্‌যাব, আল্লামা শিরাজি (রহ.), অধ্যায়: বিক্রয়, (তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-মাজমু'সহ) খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৭২। হাদিসের কিতাবসমূহে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর এ বর্ণনাটি পাইনি। তবে সামনে বাইয়ে সালামের আলোচনায় একটি মারফু হাদিস আসছে এবং সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। হাদিসটি হলো,

من أسلف في شيئ فلا يصرفه إلى غيره.

'যে ব্যক্তি কোনো জিনিসের বাইয়ে সালাম করবে, সে যেন অন্যের কাছে সেটি না-দেয়।'
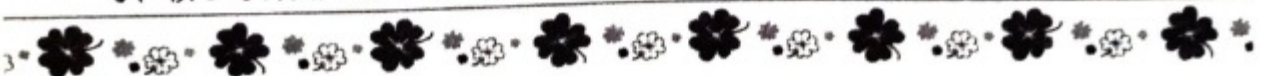
করবে, তখন তা স্পষ্ট সুদ হবে। আর এটি 'পরিশোধ করবে, না কি বাড়িয়ে দেবে' মূলনীতির আওতাভুক্ত হবে এবং পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাষায় এটিকে হারাম করেছে।

অনুরূপভাবে নগদ পরিশোধ করার শর্তে কিছু ঋণ কমিয়ে দেওয়াকেও অধিকাংশ ফকিহ না-জায়েয বলেছেন। এটি চার মাযহাবের সিদ্ধান্ত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, যায়েদ বিন সাবেত (রাযি.), মুহাম্মাদ বিন সিরিন, হাসান বসরি, ইবনুল মুসায়্যিব, হাকাম বিন উতাইবাহ ও শাবি (রহ.) হতে অনুরূপ মত বর্ণিত আছে।[৭৩৫] এটি ضَعْ وَتَعَجَّلْ-এর মাসআলা। 'কিস্তিতে বিক্রয় করা' শিরোনামে আমার একটি পুস্তিকাতে এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেছি।[৭৩৬] সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।

উল্লিখিত আলোচনা নগদ মূল্যে ঋণীর কাছে ঋণ বিক্রয়ের হুকুম। আর যদি বাকিতে ঋণ বিক্রয় করা হয়, তা হলে জায়েয নেই। কারণ, সেটি বাকির বিনিময় বাকি বিক্রয়কে আবশ্যক করে। এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে এমন কথা বলার সুযোগ নেই যে, আগে থেকেই তো ঋণীর কাছে ঋণের কব্জা রয়েছে, সুতরাং তা বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রয় করা হচ্ছে না। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত ঋণীর জিম্মায় ঋণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বস্তু হিসাবে গণ্য করা হয় না। এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, বাইয়ে সালামে ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার কাছে যে ঋণ পায়, সেটিকেই বাইয়ে সালামের মূল্য নির্ধারণ করা জায়েয নেই। 'তানবিরুল আবসার' কিতাবে অনুরূপ বলা হয়েছে–

> فان أسلم مائتي درهم في كر بر، مائة دينا عليه (أي على المسلم إليه) ومائة نقدا، وافترقا على ذلك، فالسلم في حصة الدين باطل، لأنه دين بدين.
>
> 'দুইশত দিরহামের বিনিময়ে যদি এক কুর পরিমাণ গমের বাইয়ে সালাম করে। যার একশত দিরহাম তার ওপর ঋণ রয়েছে আর

---

৭৩৫. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, পৃষ্ঠা-৬০৬। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা-৭১।
৭৩৬. বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫।
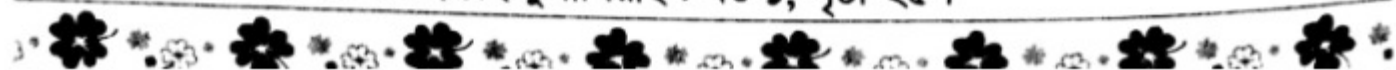
বাকি একশত দিরহাম নগদ দিয়ে চুক্তির মজলিস ত্যাগ করে, তা হলে ঋণের বিনিময় যে পরিমাণ গম হবে, তার বিক্রয় বাতিল হবে। কারণ, ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করা হয়েছে।'[৭৩৭]

চার মাযহাবের কোনো ফকিহ এটিকে জায়েয বলেননি। তবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর ছাত্র ইবনুল কায়্যিম (রহ.) জায়েয বলেছেন এবং ইবনুল কায়্যিম (রহ.) তাকে 'بيع الواجب بالساقط' নামকরণ করেছেন। তিনি বলেছেন–

> وأما بيع الواجب بالساقط، فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته، فقد وجب له عليه دين، وسقط له عليه دين غيره، وقد حكى الإجماع على امتناع هذا، ولا إجماع فيه، قاله شيخنا واختار جوازه، وهو الصواب، إذ لا محذور فيه.
>
> 'بيع الواجب بالساقط' বিক্রয় হলো, যেমন কেউ দশ দিরহামের বিনিময়ে এমন ব্যক্তির কাছে বাইয়ে সালামের পদ্ধতিতে এক কুর পরিমাণ গম বিক্রয় করে, যে ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার কাছে ওই দশ দিরহাম পায়। তার ওপর একটি ঋণ আরোপ হয়েছিল এবং অন্য ঋণের মাধ্যমে তা রহিত হয়েছে। এ পদ্ধতি না-জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইজমার কথা বলা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কোনো ইজমা হয়নি। আমাদের শাইখ এটি বলেছেন। তিনি জায়েযের মত গ্রহণ করেছেন এবং এটিই সঠিক। কেননা, এখানে কোনো সমস্যা নেই।'

এটির প্রক্রিয়া হলো, যায়েদ আমর থেকে দশ দিরহাম ঋণ নিয়েছে। এরপর আমর যায়েদকে বলল, তোমার কাছে যে দশ দিরহাম পাই তার বিনিময়ে বাইয়ে সালামের পদ্ধতিতে তোমার থেকে দশ কেজি গম ক্রয় করছি। একমাস পর দশ কেজি গম দেবে। এ পদ্ধতিতে আমরের জিম্মায় দশ কেজি গমের মূল্য ঋণ আরোপ হলো। আর আগের ঋণ তার এ ঋণকে রহিত করে দিল, ফলে 'بيع الواجب بالساقط' হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কায়্যিম (রহ.) 'بيع الواجب بالساقط' নামক বিক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে সে বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন,

---

৭৩৭. তানবিরুল আবসার ও আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, পরিচ্ছেদ: বাইয়ে সালাম : খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৩৮৬–৩৮৭।

যেখানে জিম্মায় ওয়াজিব ঋণকে ভিন্ন জাতীয় ঋণের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। কাজেই পূর্বের ঋণ রহিত হয়ে তার বিনিময় পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়। এটি হলো যার জিম্মায় ঋণ রয়েছে তার কাছে ঋণ বিক্রয় করা।[৭৩৮]

এটির প্রক্রিয়া হলো, যায়েদ দশ দিরহামের বিনিময়ে আমরের কাছ থেকে এক মাস মেয়াদের বাইয়ে সালামে দশ কেজি গম ক্রয় করল, ফলে আমরের জিম্মায় দশ কেজি গম ঋণ হয়ে গেল। এরপর যখন গম দেওয়ার সময় এলো, তখন যায়েদ বলল, তোমার কাছে যে দশ কেজি গম পাই সেটিকে এক মাস মেয়াদের বাইয়ে সালামে দশ কেজি যবের বিনিময়ে তোমার কাছে বিক্রয় করলাম। এ পদ্ধতিতে আমরের জিম্মা থেকে তার ওপর থাকা দশ কেজি গমের ঋণ রহিত হয়ে গেল এবং দশ কেজি যবের ঋণ আরোপ হলো।

বাইয়ে সালামের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ।

১৪৯. ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করা

ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করা, যাকে (بيع الكالئ بالكالئ) 'বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রয়' নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় এটি ঋণীর সঙ্গে হয়, আবার কখনো-কখনো অন্যের সঙ্গে হয়। ঋণীর কাছে ঋণ বিক্রয়ের উদাহরণ হলো, জনৈক ব্যক্তি কাউকে বলল, দুই হাজার রিয়ালে তোমার থেকে এক টন গম ক্রয় করলাম, একমাস পর তুমি আমাকে গম দেবে, আর আমি দুই মাস পর তোমাকে দুই হাজার রিয়াল দেবো। ফুকাহায়ে কেরাম এ পদ্ধতিকে 'ابتداء الدين بالدين' (ঋণকে ঋণ দিয়ে শুরু করা)[৭৩৯] নামে অভিহিত করেছেন। সুতরাং বিক্রেতার জিম্মায় গম ঋণ আর ক্রেতার জিম্মায় দুই হাজার রিয়াল ঋণ। উভয় পক্ষ বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যের ওপর ঋণ আরোপ করতে চাচ্ছে। অনুরূপভাবে বাইয়ে সালামের পদ্ধতিতে যায়েদ এক টন গম বিক্রয় করল। এরপর যখন গম দেওয়ার সময় এলো, তখন তা দিতে পারল না, তাই ক্রেতাকে সে বলল, আমার জিম্মায় যে গম রয়েছে, সেটিকে তিন

---

৭৩৮. ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন, অধ্যায়: হাওয়ালা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩১। এখানে লক্ষণীয় যে, শর্তহীনভাবে 'সাকেত বিল ওয়াজিব' বিক্রয় জায়েয বলা সুদের বাহানায় পরিণত করতে পারে। সেটি এভাবে যে, ঋণী যখন নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবে, তখন ঋণদাতা ভিন্ন জাতের বিনিময়ে তার চেয়ে বেশি মূল্যে সেটি বিক্রয় করবে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ দীর্ঘ করে সে লাভ লুফে নেবে।

৭৩৯. আশ-শারহুল কাবির, আল্লামা দারদির (রহ.), মুরাবাহার পরিচ্ছেদের আগে : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৮।
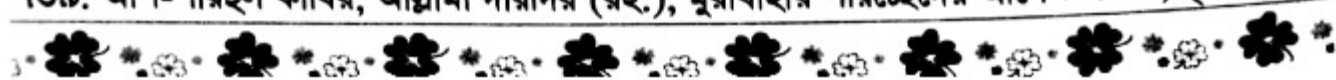
হাজার রিয়ালে আমার কাছে বাকি বিক্রয় করো। একমাস পর মূল্য পরিশোধ করব। কিছু ফকিহ এ পদ্ধতিকে 'فسخ الدين في الدين' (ঋণের মাধ্যমে ঋণ রহিত করা) নামে অভিহিত করেছেন। কারণ, উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য হলো, ঋণীর ওপর যে ঋণ রয়েছে তার পরিবর্তে দ্বিতীয় ঋণের মাধ্যমে প্রথম ঋণ রহিত করা।[৭৪০]

দ্বিতীয়টির উদাহরণ, ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা। বাইয়ে সালামের পদ্ধতিতে যায়েদ আমরের কাছে এক টন গম পাবে। এরপর যায়েদ খালেদকে বলল, আমি আমরের কাছে যে ঋণ পাবো, সেটিকে এক মাসের মেয়াদে পাঁচ হাজার টাকায় তোমার কাছে বিক্রয় করছি।

শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদ্ধতি না-জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ একমত। এ ব্যাপারে একটি প্রসিদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেওয়া হয়। হাদিসটি এরূপ–

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ.

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'

ইমাম হাকেম, তাহাবি, দারাকুতনি, বাইহাকি, আবদুর রাযযাক, ইবনে আবি শাইবাহ ও বাযযার (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও রাফে বিন খাদিজ (রাযি.)-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৭৪১] এ হাদিসের ব্যাপারে অভিযোগ করা হয় যে, সেটি যয়িফ। কারণ, উভয় সূত্রে হযরত মুসা বিন উবাইদাহ নামের একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন, 'তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা হালাল নয়।' তবে ইমাম আবদুর রাযযাক (রহ.) কর্তৃক তাঁর 'মুসান্নাফ' কিতাবে হযরত ইবরাহিম বিন আবু ইয়াহইয়া আসলামি (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি এ হাদিসকে সমর্থন করে। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) হযরত ইবরাহিম (রহ.) থেকে খুব বেশি

---

৭৪০. প্রাগুক্ত

৭৪১. মুস্তাদরাকে হাকেম : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৫, হাদিস নং ২৩৪২। সুনানে দারাকুতনি : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭১, হাদিস নং ২৬৯। সুনানে বাইহাকি : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯০। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : খণ্ড-৮ পৃ. ৯০, হাদিস নং ১৪৪৪। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৯৮, হাদিস নং ২১৬৯। শারহু মাআনিল আছার, ইমাম তাহাবি (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১। কাশফুল আসতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯১।

হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বললেও ইবনে উকদাহ, ইবনে আদি ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম হাদিসটি গ্রহণ করেছেন, যা এর দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) হতে বর্ণিত আছে, 'এ ব্যাপারে কোনো সহিহ হাদিস নেই, তবে ইজমা হলো, ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করা জায়েয নেই।'[৭৪২] আর বাস্তবতা হলো, ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয়ের বিশেষ কিছু পদ্ধতি না-জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। যেমন, তিন দিনের বেশি মেয়াদের বাকি মূল্যে বাইয়ে সালামের চুক্তি করা, অথবা বাইয়ে সালামের পণ্যকে তার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিনিময় করা।

মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয়ের কিছু পদ্ধতিকে জায়েয বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ, মালেকি মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহ শর্ত করে বাইয়ে সালামের মধ্যে মূল্যকে তিন দিনের বেশি সময়ের জন্য বাকি রাখা জায়েয বলেছেন।[৭৪৩] অনুরূপভাবে ঋণদাতা যদি ঋণীর ওপর থাকা ঋণকে তৃতীয় কারো কাছে এমন নির্দিষ্ট বস্তু বা উপকারিতার বিনিময়ে বিক্রয় করে, যা কব্জা করা বিলম্ব হবে, তা হলে তাদের মতানুযায়ী এ পদ্ধতিটিও জায়েয হবে। উদাহরণস্বরূপ, যায়েদ আমরের কাছে ঋণ পাবে, এরপর সে ঋণকে খালেদের কাছে একটি সাইকেলের বিনিময়ে বিক্রয় করল এবং খালেদ সে সাইকেলটি একমাস পরে হস্তান্তর করবে, অথবা একমাস সাইকেল ব্যবহারের উপকারিতার বিনিময়ে বিক্রয় করল।[৭৪৪] তবে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়ের সমস্ত শর্তের সঙ্গে বিক্রয় হওয়া শর্ত। এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ।

অন্য মাযহাবের ফকিহদের মতে এটি জায়েয নেই। কারণ, তাঁরা ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয়কে শর্তহীনভাবে হারাম বলেছেন। এগুলোর মধ্য থেকে

---

৭৪২. ফয়যুল কাদির, আল্লামা মুনাবি (রহ.), খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩।

৭৪৩. হাশিয়াতুদ দুসুকি আলাশ শারহিল কাবির, আল্লামা দারদির (রহ.), পরিচ্ছেদঃ বাইয়ে সালাম : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৫।

৭৪৪. হাশিয়াতুদ দুসুকি আলাশ শারহিল কাবির, আল্লামা দারদির (রহ.), অধ্যায়ঃ বিক্রয়,খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৩। বাস্তবতা হলো, গাড়ি নির্ধারণ করলে তা ঋণ হিসাবে থাকে না; বরং সেটি একটি বস্তু এবং তা কব্জা করা বিলম্বিত হয়েছে। সুতরাং এখান থেকে বোঝা গেল এটি ঋণের বিনিময় ঋণ বিক্রয় করা না। কিন্তু মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এটিকে ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয়ের আওতাভুক্ত করেছেন। কারণ তা কব্জা করা বিলম্বিত হয়েছে।

কোনো প্রকারকে ভিন্ন রাখেননি।[৭৪৫] মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম ঋণ বিক্রয়ের যে পদ্ধতিকে জায়েয বলেছেন, শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম সেটিকে হারাম বলেছেন। ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন–

فأما بيعه (أي الدين) لغيره كمن له على رجل مائة فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة ففي صحته قولان مشهوران (أصحهما) لا يصح لعدم القدرة على التسليم (والثاني) يصح بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن هو عليه وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس فإن تفرَّقا قبل قبض أحدهما بطَلَ العقد.

'ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় সহিহ হওয়ার ব্যাপারে দুটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। যেমন, কেউ অন্যের কাছে একশত টাকা পাবে, সে ওই টাকার বিনিময়ে তৃতীয় কারো থেকে একটি দাস ক্রয় করল। মত দুটির মধ্যে অধিক সহিহ মত হলো, এ বিক্রয় সহিহ হবে না। কারণ, তা হস্তান্তর অসম্ভব। দ্বিতীয় মত হলো, চুক্তির মজলিসে ঋণের ক্রেতা ঋণীর কাছ থেকে ঋণ কব্জা করা এবং ঋণ বিক্রেতা তার বিনিময় কব্জা করার শর্তে জায়েয আছে। এ দুটির কোনো একটি কব্জা করার আগে যদি তারা চুক্তির মজলিস ত্যাগ করে, তা হলে চুক্তি বাতিল হবে।'[৭৪৬]

১৫০. ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা

ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা, যেটিকে ফুকাহায়ে কেরাম 'بيع الدين من غير من هو عليه' নামে অভিহিত করেছেন। এ পদ্ধতির হুকুমের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফি, হাম্বলি ও জাহেরি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করলে শর্তহীনভাবে তা না-জায়েয। ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানি (রহ.) বলেছেন–

৭৪৫. কাশশাফুল কিনা, আল্লামা বুহুতি (রহ.), পরিচ্ছেদঃ সুদ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫২। রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬০, ফিকরাহ নং ২২২৬৮।

৭৪৬. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, পরিচ্ছেদঃ ধোঁকা ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বিক্রয় : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৭৫, দারুল ফিকর।
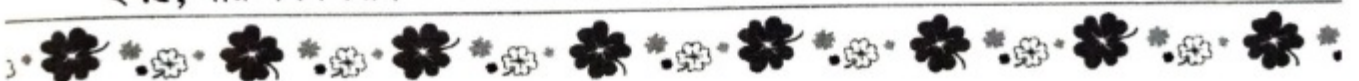
لا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه لأنه غرر فلا يدري أيخرج أم لا يخرج.

'কেউ অন্যের কাছে ঋণ পেলে তা উসুল করার আগে অন্যের কাছে বিক্রয় করা জায়েয নেই। কারণ, তা ধোঁকার বিক্রয়। কেননা, ঋণ উসুল হবে কি না সে সম্পর্কে বিক্রেতা জানে না।'[৭৪৭]

আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন–

ولا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين؛ لأن الدين إما أن يكون عبارة عن مال حكمي في الذمة، وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه، وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع، ولو شرط التسليم على المديون لا يصح أيضا؛ لأنه شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطا فاسدا فيفسد البيع.

'ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করলে তা সংঘটিত হবে না। কারণ, ঋণ হলো জিম্মায় আরোপিত কৃত্রিম মাল অথবা মালের মালিক হওয়া ও হস্তান্তর করা। আর এ দুটির প্রত্যেকটিই বিক্রেতার হস্তান্তর ক্ষমতার বাইরে। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি ঋণীর ওপর হস্তান্তরের শর্তারোপ করা হয়, তা হলে তা সহিহ হবে না। কারণ, এতে বিক্রেতা ছাড়া অন্যের ওপর হস্তান্তরের শর্ত করা হয়, ফলে তা ফাসেদ শর্ত হবে এবং সেটি বিক্রয়কে ফাসেদ করে দেবে।'[৭৪৮]

হাম্বলি মাযহাবের আলোচনায় আল্লামা মারদাবি (রহ.) বলেছেন–

لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته، وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.

'স্থিতিশীল ঋণকে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রয় করা জায়েয নেই। এটিই সহিহ মাযহাব এবং আমাদের ইমামগণ এ মতের পক্ষে।'[৭৪৯]

---

৭৪৭. আল-মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, পরিচ্ছেদ: কেউ অন্যের কাছে প্রাপ্ত উপহার বা ঋণ বিক্রয় করা, পৃষ্ঠা-২৬৬।

৭৪৮. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪৮।

৭৪৯. আল-ইনসাফ, আল্লামা মারদাবি (রহ.), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১২।

ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) বলেছেন–

لا يجوز بيع دين يكون لإنسان على غيره، لا بنقد ولا بدين، ولا بعين، ولا بعرض، كان ببينة، أو مقرا به، أو لم يكن... برهان ذلك أنه بيع مجهول، وما لا يدري عينه... وروينا من طريق وكيع، نا زكريا بن أبي زائدة قال: سئل الشعبي عمن اشترى صكا فيه ثلاثة دنانير بشرب، قال: لا يصلح. قال وكيع: وحدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: هو غرر.

'কারো জন্য অন্যের কাছে পাওনা ঋণ বিক্রয় করা জায়েয নেই। নগদ, ঋণ, বস্তু ও পণ্যের কোনো কিছুর বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েয নেই। চাই ঋণটি দলিল কিংবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হোক অথবা এর কোনোটিই না হোক। ... এ কথার সপক্ষে দলিল হলো, এটি অনির্দিষ্ট জিনিসের বিক্রয় এবং মূলধাতু বোঝা যায় না এমন জিনিসের বিক্রয়। ...ওয়াকি (রহ.), যাকারিয়া বিন আবু যায়েদাহ (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত শাবি (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, (যদি) কোনো ব্যক্তি তিন দিনারের কোনো চুক্তিপত্র (রশিদ বা চেক) সেচের বিনিময়ে ক্রয় করে (তবে তার এই চুক্তির হুকুম কী হবে?)। উত্তরে তিনি বললেন, এটি সঠিক নয়। ওয়াকি (রহ.) বলেছেন, সুফিয়ান (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আবুস সফর থেকে শাবি (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এটি ধোঁকা।'[৭৫০]

মালেকি মাযহাবের মূলনীতি হলো, ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েয নেই। তবে বিশেষ কিছু শর্তের সঙ্গে তাঁরা জায়েয বলেছেন। আল্লামা যুরকানি (রহ.) সেসব শর্তের সারকথা বর্ণনা করে বলেছেন–

ومنع بيع دين على حاضر، ولو ببينة، إلا أن يقر، والدين مما يباع قبل قبضه وبيع بغير جنسه، وليس ذهبا بفضة، ولا عكسه، وليس بين مشتريه ومن عليه عداوة، ولا قصد إعانته، فلا بد من هذه الخمسة شروط.

৭৫০. আল-মুহাল্লা, ইমাম ইবনে হাযম (রহ.), খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬।
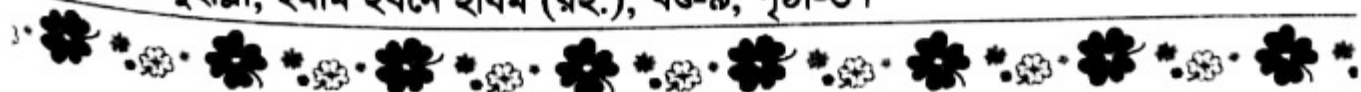
'উপস্থিত ব্যক্তির কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েয নেই, যদিও দলিলের মাধ্যমে ঋণ প্রমাণিত থাকে। তবে ঋণী স্বীকারোক্তি দিলে সে ঋণ বিক্রয় করা জায়েয আছে। সেসব জিনিসের ঋণ বিক্রয় করা জায়েয, যেগুলো কব্জা করার আগে বিক্রয় করা জায়েয। ভিন্ন জাতীয় বস্তুর সঙ্গে বিক্রয় করা যাবে। স্বর্ণের ঋণকে রুপার সঙ্গে বা তার বিপরীতে বিক্রয় করা জায়েয নেই। ঋণী ও ঋণ ক্রেতার মধ্যে কোনো ধরনের শত্রুতা থাকতে পারবে না। ঋণ বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণীর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার ইচ্ছাও থাকতে পারবে না –এই পাঁচটি শর্ত রক্ষা করা আবশ্যক।'[৭৫১]

সারকথা, নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে মালেকি মাযহাবে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েয–

১. ঋণী উপস্থিত থাকতে হবে। অর্থাৎ, ওই শহরে থাকতে হবে। সে যদি চুক্তির মজলিসে উপস্থিত না-থাকে, তা হলে বিক্রয় করা জায়েয হবে না। সে যদি নিকটতম জায়গায় থাকে, তা হলেও জায়েয হবে না।

২. ঋণী কর্তৃক ঋণ স্বীকার করতে হবে।

৩. এমন জিনিসের ঋণ হতে হবে, মালেকি মাযহাব অনুযায়ী যা কব্জা করার আগে বিক্রয় করা জায়েয। সুতরাং ঋণটি যদি খাদ্যদ্রব্যের হয়, তা হলে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রয় করা জায়েয নেই। কারণ, মালেকি মাযহাবে খাদ্যদ্রব্য কব্জা করার আগে বিক্রয় করা জায়েয নেই। তারা যেহেতু খাবার ছাড়া অন্য জিনিস কব্জা করার আগে বিক্রয় করাকে জায়েয বলেন, তাই ঋণটি খাদ্যদ্রব্য না-হয়ে ভিন্ন জিনিসের হলে এবং অন্যান্য শর্ত পাওয়া গেলে তা বিক্রয় করা জায়েয আছে।

৪. ঋণকে ভিন্ন জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে বিক্রয় করতে হবে। সুতরাং যদি তুলার ঋণ হয়, তা হলে তুলার বিনিময়ে তা বিক্রয় করা জায়েয নেই। আল্লামা দুসুকি (রহ.) আরও বাড়িয়ে বলেছেন, যদি সমজাতীয় হয়, তা হলে সমান করে বিক্রয় করা আবশ্যক।[৭৫২]

---

৭৫১. শারহুয যুরকানি আলা মুখতাসারি খলিল : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৩।

৭৫২. হাশিয়াতুদ দুসুকি আলাশ শারহিল কাবির : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৩। মুদ্রার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। কারণ, সামনে আসবে, সেটি বাইয়ে সরফ না-হওয়া আবশ্যক।
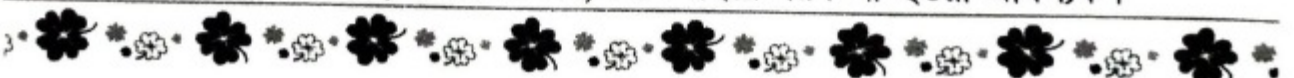
৫. স্বর্ণের ঋণকে রুপা বা রুপার ঋণকে স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা যাবে না। কারণ, তা বাইয়ে সরফ এবং চুক্তির মজলিসে উভয় বিনিময় কব্জা করার বিষয়টি পাওয়া যাচ্ছে না।

৬. ঋণী ও ঋণ ক্রেতার মধ্যে কোনো ধরনের শত্রুতা থাকতে পারবে না। যেন ঋণ বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণীর শত্রুকে তার বিরুদ্ধে সুযোগ নিতে সহায়তা না-করা হয়। আল্লামা দুসুকি (রহ.) এ শর্তসমূহের ওপর আরও দুটি শর্ত বাড়িয়েছেন। সে শর্ত দুটি হলো–

৭. মূল্যটি নগদ হতে হবে। এটি একটি স্পষ্ট বিষয়। কারণ, পণ্যটি যদি ঋণ হয় এবং মূল্য নগদ না-হয়, তা হলে ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করা হবে। ইতঃপূর্বে এটি নিষিদ্ধ বিষয়ের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আল্লামা দুসুকি (রহ.) 'নগদ হওয়ার' ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, নগদের উদ্দেশ্য হলো জিম্মায় ওয়াজিব হবে না। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, বস্তু ও তার উপকারিতা জিম্মায় ওয়াজিব হয় না। কেননা, এগুলো কৃত্রিমতার যোগ্য নয়। সুতরাং এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এগুলো নগদ। নগদের উদ্দেশ্য এ নয় যে, তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করতে হবে।[৭৫৩]

৮. ঋণী এমন ব্যক্তি হতে হবে, যে বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত। যেন সে পরিশোধ না-করলে কাজির মাধ্যমে প্রাপ্য উসুল করা সম্ভব হয়।

এরপর আসল ঋণটি যদি বন্ধক বা কাফালতের মাধ্যমে গ্যারান্টিযুক্ত হয়, তা হলে শুধুমাত্র চুক্তি করলে বন্ধক বা কাফালত বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হবে না। আর যদি বিক্রয়চুক্তির মধ্যে তার শর্ত করে, তা হলে সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লামা হাত্তাব (রহ.)-এর আলোচনা দেখা যেতে পারে।[৭৫৪]

১৫১. ঋণ বিক্রয়ের ব্যাপারে শাফেয়ি মাযহাব

ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়ের ব্যাপারে শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। কিছু বর্ণনা অনুযায়ী শর্তহীনভাবে জায়েয নেই। কিছু বর্ণনা অনুযায়ী এ শর্তে জায়েয আছে যে, চুক্তির মজলিসে ঋণ-

---

৭৫৩. আদদুসুকি : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৩।

৭৫৪. মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.), পরিচ্ছেদ : খাবারের ক্ষেত্রে ইল্লত হলো বেশি হওয়া : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬৮।

ক্রেতা ঋণী থেকে ঋণ এবং বিক্রেতা তার বিনিময় কব্জা করবে। উভয়টি কব্জা করার আগে যদি তাদের কেউ চুক্তির মজলিস ত্যাগ করে, তা হলে চুক্তি বাতিল হবে।[৭৫৫]

এ শর্তটি না-জায়েযের দিকে নিয়ে যায়। কেননা, চুক্তির মজলিসে ঋণ কব্জা করলে সেটি আর ঋণ থাকে না। তবে শাফেয়ি মাযহাবের যেসব ফকিহ ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন, তাদের অনেকে এ শর্তটি উল্লেখ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, 'মাতনুল মুহায্যাব' কিতাবের লেখক আল্লামা শিরাজি (রহ.)-এর কথা বলা যায়। আর আল্লামা আশ-শিরবিনি আল-খতিব (রহ.) বলেছেন–

> وصرح في أصل الروضة باشتراط قبض العوضين في المجلس، وهذا هو المعتمد وإن قال في المطلب: مقتضى كلام الأكثرين يخالفه.
>
> 'রাওযাতুত তালিবিন কিতাবের মূলগ্রন্থে[৭৫৬] চুক্তির মজলিসে উভয় বিনিময় কব্জা করার শর্তের কথা বলা হয়েছে এবং এটিই নির্ভরযোগ্য। যদিও আল্লামা মুত্তালিব (রহ.) বলেছেন, অধিকাংশ ফকিহের বক্তব্য এটির বিপরীত।'[৭৫৭]

অনেকে এভাবে উভয় বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করেছেন যে, চুক্তির মজলিসে উভয় বিনিময় কব্জা করার শর্তটি সেক্ষেত্রে, যেখানে ঋণ ও তার বিনিময়

---

৭৫৫. রাওযাতুত তালিবিন, ইমাম নববি (রহ.), খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫১৪। আত-তাহযিব, আল্লামা বাগাবি (রহ.), খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১৭। আল-মাজমু শারহুল মুহায্যাব, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: ধোঁকা ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বিক্রয় সম্পর্কে : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৭৫।

৭৫৬. ইমাম রাফেয়ি (রহ.) ইমাম গাযালি (রহ.)-এর কিতাব আল-ওয়াজিয-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন 'ফাতহুল আজিজ' নামে। 'ফাতহুল আজিজ' কিতাবটিকে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করে তার ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম নববি (রহ.)। শাফেয়ি মাযহাবের গ্রন্থাবলিতে 'আসলুর রাওযাহ' বলতে ইমাম নববি কৃত ফাতহুল আযিযের মুখতাসারকে বুঝানো হয়ে থাকে। আর 'যাওয়ায়িদুর রাওযাহ' বলতে 'মুখতাসারু ফাতহিল আজিজ'-এর উপর ইমাম নববি 'রাওযাতুত তালিবিন' কিতাবে যে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করেছেন, সেটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যখন শুধু 'আর-রাওযাহ' উল্লেখ করা হয়, তার দ্বারা 'মুখতাসারু ফাতহিল আজিজ' এবং 'যাওয়ায়িদুর রাওযাহ' এই দুটির যে কোনো একটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। (দ্র. মুগনিল মুহতাজ লিশ শিরবিনি : ১/৩০; আল-ফাওয়ায়িদুল মাক্কিয়্যাহ লিস সাক্কাফ, পৃ. ৪৩; মুসতালাহাতুল মাযাহিবিল ফিকহিয়্যাহ ওয়া আসরারুল ফিকহিল মারমুয লি মারইয়াম আয-যাফিরি, পৃ. ২৪৯) –সম্পাদক

৭৫৭. মুগনিল মুহতাজ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭১।
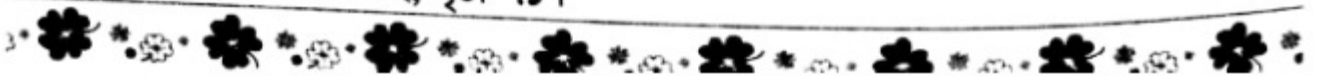
উভয়টি সুদি মাল হয়। আর জায়েযের মত হলো, সুদহীন বস্তুর ক্ষেত্রে। তবে আল্লামা শিরবিনি ও রমালি (রহ.) এ বক্তব্যকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, যারা জায়েযকে কব্জার সঙ্গে শর্তযুক্ত করেছেন, তারা সুদহীন বস্তুর উদাহরণ দিয়েছেন। আর তা হলো, দাস।[৭৫৮] সুতরাং বোঝা যায় যে, এ সম্পর্কে শাফেয়ি মাযহাবে তিন ধরনের মত রয়েছে। ১. শর্তহীনভাবে জায়েয নেই। ২. শর্তহীন জায়েয। ৩. চুক্তির মজলিসে উভয় বিনিময় কব্জা করার শর্তে জায়েয। والله تعالى أعلم

ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়ের মতানৈক্যের মূলভিত্তি হলো, যারা ঋণকে পরিণাম অস্পষ্ট জিনিসের আওতাভুক্ত করেছেন, তারা ঋণ বিক্রয়কে ধোঁকা সাব্যস্ত করেছেন এবং তার বিক্রয়কে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন। পরিণাম অস্পষ্ট হওয়ার উদাহরণ হলো, তা উসুল হবে কি না? যেমন, হানাফি, হাম্বলি ও শাফেয়ি মাযহাবের একটি মত রয়েছে। আর যারা মনে করেছেন যে, উপস্থিত ঋণীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে যখন ঋণকে গ্যারান্টিযুক্ত করা হবে, তখন তা নিশ্চিত উসুলের মতো হবে, তারা শর্তের সঙ্গে এমন বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এমন মত দিয়েছেন। তবে স্পষ্ট কথা হলো, দলিলের দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মত শক্তিশালী। কারণ, ঋণের স্বীকারোক্তিদাতা কেবল তার জিম্মায় ঋণ থাকার স্বীকারোক্তি দেয়। এ স্বীকারোক্তি ঋণ উসুলের নিশ্চয়তা দেয় না। এমন অনেক ঋণী রয়েছে, যারা ঋণ স্বীকার করার পরও তা পরিশোধের প্রতি সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ করে না। আবার অনেক স্বীকৃতি প্রদানকারী তার স্বীকারোক্তি অস্বীকারও করে, ফলে ঋণদাতাকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। সুতরাং শুধু ঋণীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তা উসুলের নিশ্চয়তার কথা বলা যায় না। অতএব, তা ধোঁকার আওতাভুক্ত হবে।

১৫২. সমকালীন আর্থিক প্রমাণপত্র

বর্তমান বাজারে আর্থিক প্রমাণপত্র ক্রয়ের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। এ প্রমাণপত্রগুলো তার বাহককে ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল দেওয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানির শেয়ারের ওপর এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিক্রয় সহিহ হওয়ার ষষ্ঠ শর্তের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-বিধান আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ। আর সে

৭৫৮. মুগনিল মুহতাজ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭১। নেহায়াতুল মুহতাজ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৯০।
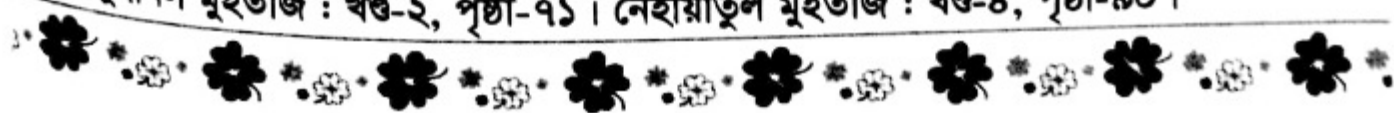
শর্তটি হলো নির্দিষ্ট হওয়া। এ কারণে এখানকার আলোচনা থেকে আমাদের উদ্দেশ্য সেসব প্রমাণপত্র, যা তার ইস্যুকারীর ওপর বাহকের ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে। সমকালীন বাজারে এই প্রচলন রয়েছে যে, এ পত্রগুলোই তার ইস্যুকারীর জন্য আসল ঋণদাতা। তাই অনেক সময় পত্রের ক্রেতাকে আসল বাহকের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য তা বাজারে বিক্রয় করা হয়। আর ক্রেতার এ অধিকার সৃষ্টি হয় যে, তাতে লিখিত পরিমাণ ঋণ উসুল করবে।

এটি যেহেতু ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়, তাই ইতঃপূর্বে ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয়ের হুকুম থেকে এটির হুকুম জানা যায়। এ ধরনের প্রমাণপত্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তার কয়েকটি প্রকার এখানে আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ।

১৫৩. "আল-জামিকিয়্যাহ"

মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরাম এক ধরনের প্রমাণপত্রের আলোচনা করেছেন, যাকে 'জামিকিয়্যাহ' নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। এটি রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা ওয়াকফ স্টেটের পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির জন্য ইস্যু করা হয়, যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা ওয়াকফ স্টেটের কাছে অর্থ পাবে। এটি ফার্সি 'جامكي' 'জামিকি' শব্দের পরিবর্তিত রূপ, যার মূল উৎস হলো 'جامه' 'জামাহ' অর্থাৎ, কাপড়। শুরুতে কাপড় সংরক্ষণকারীর পারিশ্রমিকের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হতো। তারপর সব ধরনের পারিশ্রমিক বা বেতনের জন্য এটি ব্যবহার হতে থাকে।[৭৫৯] 'আল-মুনজিদ' অভিধানে এটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, 'সেনাবাহিনী বা রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত সেবকদের বেতনকে জামিকিয়্যাহ বলে।' সেখানে বলা হয়েছে শব্দটির মূল উৎস হলো তুর্কি এবং তার বহুবচন হলো, 'جوامك'।

হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এ ফতোয়া দিয়েছেন যে, জামিকিয়্যাহ বিক্রয় করা জায়েয নেই। কারণ, তা ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা হয়।[৭৬০] তবে মালেকি মাযহাবের আল্লামা হাত্তাব (রহ.) সেটিকে জায়েয বলেছেন। তিনি বলেছেন–

---

৭৫৯. লুগাত নামাহ্ দেহ্খোদা : খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৯৭।

৭৬০. রাদ্দুল মুহতার, মতলব, জামিকিয়্যাহ বিক্রয় সম্পর্কে : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬০, ফিকরাহ নং ২২২৬৮। কাশশাফুল কিনা, আল্লামা বুহুতি (রহ.), খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৬। তিনি এটিকে উপহার বিক্রয় নামে অভিহিত করেছেন।
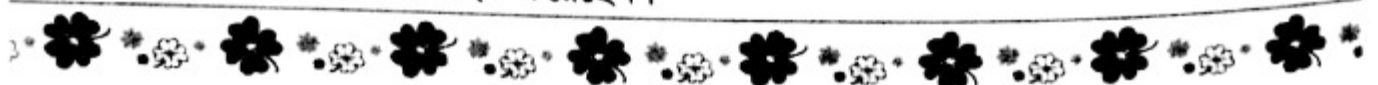
بخلاف الجامكية؛ فإن الملك محصل فيها لمن حصل له شرط الواقف، فلا جَرَم صح أخذ العوض بها وعنها.

'তবে জামিকিয়্যাহর ব্যাপারটি এর বিপরীত। কারণ, যে ব্যক্তি ওয়াকফের শর্ত পূর্ণ করতে পারবে, তার জন্য সেটির মালিকানা হয়ে যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে এর বিনিময় দেওয়া-নেওয়া সহিহ।'[৭৬১]

এটি স্পষ্ট যে, তাদের কাছে এ বিক্রয় জায়েয হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন জাতীয় জিনিসের বিনিময় হওয়ার সঙ্গে শর্তযুক্ত। আর যদি সমজাতীয় বস্তুর বিনিময় হয়, তা হলে সেখানে উভয় বিনিময় সমান হতে হবে এবং উভয় বিনিময় কব্জাহীন বাইয়ে সরফ হবে না। আল্লামা যুরকানি ও দুসুকি (রহ.)-এর বক্তব্যের মাধ্যমে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ঋণ বিক্রয়ের ব্যাপারে যেহেতু শাফেয়ি মাযহাবের বক্তব্যে ভিন্নতা রয়েছে, তাই তাঁদের মতানৈক্য অনুযায়ী জামিকিয়্যাহর হুকুমেও ভিন্নতা হওয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট। তবে এ ধরনের অধিকার ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে তাঁরা আলোচনা করেছেন। এটি ঋণ বিক্রয় করা নয়; বরং আর্থিক বিনিময় নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া। আল্লামা শাবরামাল্লাসি দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া জায়েয বলার পর বলেছেন−

ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شيء من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه ويصير الحال في تقرير من أسقط حقه له موكولا إلى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأى المصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره.

'এগুলোর মধ্যে একটি হলো স্বীকৃত জাওয়ামেক। যার কাছে এগুলো থাকবে, তার জন্য বিক্রয় করা জায়েয আছে। সে ওই জিনিসের অধিকারী। সেটি এভাবে যে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রাপ্য অর্থ ছাড়া তার আর কোনো উপার্জন থাকবে না। যার জন্য

---

৭৬১. মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২৪। ১৩৯৮ হিজরি সনে প্রকাশিত সংস্করণ।
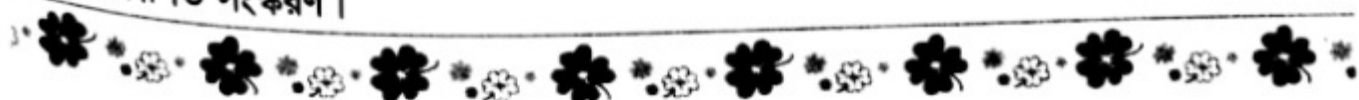
পদ ছেড়ে দিচ্ছে তাকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি দায়িত্বশীলের ওপর নির্ভর করবে। যেমন, পাশা। সুতরাং যার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে বা অন্যদের মধ্য থেকে যাকে ভালো মনে করবে, দায়িত্বশীল তাকেই নিয়োগ দেবে।'[৭৬২]

সারকথা, যদি কারো কাছে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রাপ্ত এমন কোনো রশিদ থাকে, যার বিনিময়ে সে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পায়, তা হলে তার পক্ষ থেকে অন্যের জন্য স্থায়ীভাবে সেটি ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে এবং ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ নেওয়াও জায়েয। তবে যার জন্য ছেড়ে দিচ্ছে, প্রথম ব্যক্তি সরে যাওয়ামাত্র সে ওই অর্থের অধিকারী হবে না; বরং আগের ব্যক্তি ছেড়ে দেওয়ার ফল হলো, ওই প্রাপ্য অর্থের ব্যাপারে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমবে। এরপর তাকে ওই পদে আসীন করার বিষয়টি তার দায়িত্বশীলের ওপর নির্ভর করবে। আর এ বিষয়টি ঋণ বিক্রয়ের আলোচনার বাইরের বিষয়।

১৫৪. বন্ড (Bonds)

বর্তমান সময়ে বন্ড নামে যে প্রমাণপত্র বোঝানো হয়, এটি আধুনিক পুঁজিবাজারে প্রচলিত আর্থিক প্রমাণপত্রের একটি প্রকার। এগুলো এমন প্রমাণপত্র, যা ঋণী কর্তৃক ঋণদাতার জন্য এ কথার স্বীকারোক্তিস্বরূপ ইস্যু করা হয় যে, সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ নিয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে বর্ধিত সুদসহ তা পরিশোধ করতে বাধ্য। বিভিন্ন শেয়ারভিত্তিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যখন বড় অঙ্কের ঋণের সম্মুখীন হয়, তখন এগুলো ইস্যু করে জনগণের কাছে পেশ করে। আবার যেসব রাষ্ট্র অর্থায়ন করার ক্ষেত্রে বাজেট সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের বন্ড ইস্যু করে জনগণ হতে ঋণ নেয়। নির্দিষ্ট অর্থের জন্য এগুলো ইস্যু করা হয়। যেমন, এক লাখ। এর ইস্যু প্রক্রিয়া দুধরনের হয়ে থাকে :

১. বন্ড এ কথার স্বীকৃতি দেয় যে, তার ইস্যুকারী বাহক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিয়েছে। আর বাহক তার ওপর শতকরা হারে সুদ পাবে। অনেক সময় ইস্যু করার সময় তার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, আবার কখনো সুদের সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। এরপর লটারির মাধ্যমে

---

৭৬২. হাশিয়াতু শাবরামাল্লাসি আলা নেহায়াতিল মুহতাজ, জিআলার আলোচনার শেষ দিকে : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭৮।
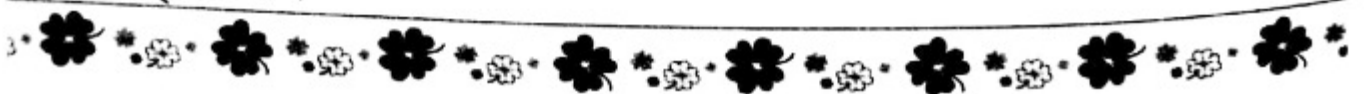
তার বাহককে সুদ প্রদান করা হয়। এ ধরনের বন্ডকে কুপন বন্ড 'Coupon bonds' নামে নামকরণ করা হয়। কারণ, শুরু থেকেই সুদ প্রদানের বিষয়টি কুপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। বন্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তার বাহক বন্ডের গায়ের মূল্য পায়। বর্ণিত উদাহরণে যার পরিমাণ হলো এক লক্ষ টাকা। আর্থিক বাজারে এ বন্ডগুলোকে উভয় পক্ষের সম্মত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। বন্ডের বাহক এ উদ্দেশ্যে একশত পাঁচ টাকায় তা বাজারে বিক্রয় করে যে, উসুলের সময় ক্রেতা একশত দশ টাকা উসুল করতে পারবে।

২. বন্ড ইস্যু করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, নির্দিষ্ট মূল্যে সেগুলো ইস্যু করা হয়। যেমন, এক লক্ষ টাকা। তবে তার ক্রেতার কাছে এমন কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়, যা সুদের প্রতিনিধিত্ব করে। উদাহরণস্বরূপ, এক লক্ষ টাকার বন্ড নব্বই হাজার টাকায় বিক্রয় করা হয়। সুতরাং নব্বই হাজার টাকা দিয়ে যারা এ বন্ড গ্রহণ করবে, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তারা এক লক্ষ টাকা পাবে। কেমন যেন নব্বই হাজার টাকা নগদ ঋণ দিয়ে বাকি এক লক্ষ টাকা উসুল করছে। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হলে একবারই তাকে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। এ ধরনের বন্ডকে জিরো কুপন বন্ড (Zero coupon bond) বলা হয়। কেননা, এখানে পর্যায়ক্রমে কুপনের মাধ্যমে তার বাহককে কিছু দেওয়া হয় না; বরং মেয়াদ শেষ হলে সে একবারই বন্ডের গায়ের মূল্য পেয়ে যায়।

এটি শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ ও হারাম লেনদেন হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এগুলোকে তার গায়ের সমমূল্যে বিক্রয় করা জায়েয আছে কি না? অর্থাৎ, আমাদের বর্ণিত উদাহরণে এক লক্ষ টাকায় বিক্রয় করা জায়েয আছে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, জিরো কুপন বন্ড, যেগুলো তার গায়ের মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ইস্যু করা হয়, বাজার দরে হলেও এগুলো ক্রয় করা জায়েয নেই। কারণ, তার মূল্যের দশ হাজার টাকা সুদি টাকা। তার বাহক থেকে এটি ক্রয়ের অর্থ হলো, ইস্যুকারীর প্রতিনিধি হিসাবে তার বাহক ক্রেতার কাছে সুদ হস্তান্তর করছে।

কুপন বন্ডের হুকুম হলো, যদি সুদের উদ্দেশ্য না-নিয়ে শুধু গায়ের মূল্য নেওয়ার জন্য ক্রয় করে, উদাহরণস্বরূপ, কেউ এমন বন্ড নেওয়ার পর আল্লাহ তাআলা তাকে তাওবার তৌফিক দিলেন, ফলে সুদ পরিহার করার ইচ্ছা করল এবং এ উদ্দেশ্যে কোনো ঋণীর কাছে বিক্রয় করতে চাইল যে, মেয়াদ শেষে
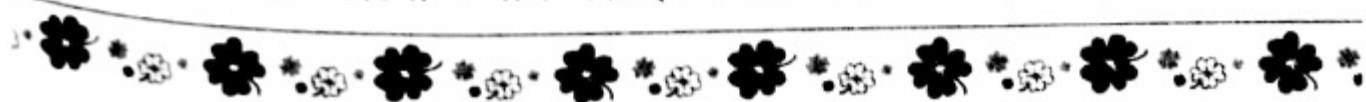
সে যেন ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়, কোনো ধরনের সুদি অর্থ নেবে না, তা হলে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঋণ বিক্রয়ের মাসআলা প্রযোজ্য হবে। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মালেকি মাযহাবের মতানুযায়ী তাঁদের বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষ তা বিক্রয় করা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে শাফেয়ি মাযহাবের কিছু ফকিহের মতে জায়েয। হানাফি ও হাম্বলি মাযহাব অনুযায়ী জায়েয নেই। তার গায়ের মূল্যে বিক্রয় করলেও জায়েয হবে না। কারণ, তা ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করা। তবে হাওয়ালার শর্ত অনুযায়ী তা হাওয়ালা করা জায়েয আছে। যার প্রক্রিয়া হবে, বন্ডের বাহক কারো থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিয়ে বন্ড ইস্যুকারীর কাছে তা হাওয়ালা করে দেবে। হাওয়ালা ভেঙে যাওয়া সম্পর্কিত মাসআলায় যে মতানৈক্য রয়েছে, এখানেও সেগুলো কার্যকর হবে। সুতরাং হানাফি মাযহাব অনুযায়ী হাওয়ালা বাতিল হয়ে গেলে হাওয়ালাকারীর কাছ থেকে উসুল করা হবে। আর অন্য তিন ইমামের মতানুযায়ী এভাবে উসুল করা জায়েয নেই।[৭৬৩]

১৫৫. প্রাইজ বন্ড (Prize Bond)

প্রত্যেক বাহককে সুদ দেওয়ার দায়ভার নেওয়া ছাড়াই এক ধরনের ঋণের প্রমাণপত্র ইস্যু করা হয়। তবে তা ইস্যুকারী এটি আবশ্যক করে যে, নির্দিষ্ট সময় পর বন্ডের নম্বর অনুযায়ী লটারি করে তার বাহকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত বাহকদেরকে সুদ দেবে। যেমন, তিন মাস পর লটারি করা হবে। সুতরাং লটারিতে যে বাহকের নম্বর উঠবে, তাকে বড় অঙ্কের পুরস্কার দেওয়া হবে। সাধারণত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ ধরনের বন্ড ইস্যু করা হয়ে থাকে।

সমকালীন অনেক আলেম এটি মনে করে এ ধরনের বন্ডকে জায়েয বলেছেন যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বন্ডের বাহক ঋণদাতাকে কোনো সুদ দেওয়ার শর্তারোপ করে না। সুতরাং প্রত্যেক বন্ড বাহকের সঙ্গে রাষ্ট্রের চুক্তিটি সুদহীন ঋণের চুক্তি হয়। এরপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সৌজন্যমূলকভাবে বন্ড বাহকদের মধ্যে লটারি করে পুরস্কার দেওয়া হয়। সুতরাং এটি সুদ হবে না। তবে তাদের এ দলিল সহিহ নয়।

তাদের দলিল সহিহ না-হওয়ার প্রথম কারণ হলো, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এটি আবশ্যক করা হয়েছে যে, বন্ড বাহকদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

---

৭৬৩. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৮। ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫০।

সুতরাং ঋণের ওপর বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি যদিও প্রত্যেক ঋণদাতার সঙ্গে ভিন্নভাবে চুক্তি করা হয় না, তবে সমস্ত ঋণদাতার সঙ্গে সামষ্টিকভাবে চুক্তি করা হয়। কেননা, এসব বন্ড ইস্যু করার সময় রাষ্ট্র ঘোষণা দেয় যে, তাদের মধ্যে এ পুরস্কার বিতরণ করা হবে। আর আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক। সেটি এভাবে যে, রাষ্ট্র যদি পুরস্কার না-দেয়, তা হলে প্রত্যেক বন্ড বাহক আইনের মাধ্যমে তা আদায়ের দাবি করতে পারবে। 'আহকামুল জাওয়াইয' নামক আমার একটি পুস্তিকাতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৭৬৪]

১৫৬. বিল অব এক্সচেঞ্জ (Bill of Exchange)

বিল অব এক্সচেঞ্জ এমন একটি প্রমাণপত্র, বাকি বিক্রয়ের মধ্যে অধিকাংশ সময় যা বিক্রেতার উপকারিতার জন্য ক্রেতা তা ইস্যু করে। এর মাধ্যমে সে (ক্রেতা) এ স্বীকৃতি দেয় যে, তার ওপর সেখানে লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা আবশ্যক এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে সে ওই মূল্য পরিশোধ করবে। এ বিলে উল্লিখিত পরিশোধের তারিখকে পরিভাষায় বিল চূড়ান্ত (Maturity) হওয়া বলে। অনেক সময় বিক্রেতা তথা বিলের বাহক দ্রুত মূল্য উসুল করতে চায় এবং সেখানে বর্ণিত মেয়াদের অপেক্ষা করতে চায় না; বরং তৃতীয় পক্ষের কাছে তা বিক্রয় করে দেয়। পুঁজিবাজারের প্রচলিত নিয়ম হলো, বিলের ক্রেতা তার গায়ের মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে তা ক্রয় করে থাকে। আর এই কমে ক্রয়কে ডিসকাউন্ট বলা হয়। বর্তমান বাজারের নিয়ম হলো, ডিসকাউন্টের পরিমাণটি তার পরিশোধের মেয়াদ অনুপাতে নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং মূল্য পরিশোধের মেয়াদ যত বেশি হয়, ডিসকাউন্টের পরিমাণও ততো বেশি হয়। অন্য দিকে মেয়াদ কম হলে ডিসকাউন্টের পরিমাণও কম হয়।

এটি স্পষ্ট কথা যে, বর্ণিত পদ্ধতিতে বিলের ডিসকাউন্ট দেওয়া একটি সুদি লেনদেন, যা কোনো অবস্থায় বৈধ নয়। আর যদি বিলকে তার গায়ের মূল্যে বিক্রয় করা হয়, সেক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে বর্ণিত জামিকিয়্যাহ বিক্রয়ের হুকুম প্রযোজ্য হবে। 'গ্যারান্টিপত্রের' আলোচনায় বিলের বিস্তারিত হুকুম ও তার শরয়ি বিকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে– ইনশাআল্লাহ।

---

৭৬৪. বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ, জাস্টিস মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (হাফিযাহুল্লাহ), খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৯।

পুঁজিবাজারে এমন অনেক কোম্পানি সৃষ্টি হয়েছে, যারা বিভিন্ন ব্যাংক ও কোম্পানি থেকে তাদের গ্রাহকদের সব বিল অব এক্সচেঞ্জ ক্রয় করে এবং তার উসুলের সব ঝুঁকি বহন করে। তাদের ক্রয়টি সমষ্টি ঋণ অপেক্ষা কম মূল্যে হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়াকে 'Factoring companies' বলা হয়। ঋণ বিক্রয়ের ওপর এ প্রক্রিয়ার মূলভিত্তি। শরয়ি দৃষ্টিতে এটি নিষিদ্ধ।

অনুরূপভাবে পুঁজি বাজারে 'forfeiting' নামে একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। তা হলো, বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন লেনদেনের কারণে সৃষ্ট ঋণ বিক্রয় করা। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোম্পানি তার সঙ্গে লেনদেনকারী গ্রাহকদের ওপর আরোপিত ঋণের এক চতুর্থাংশ বিক্রয় করে দিল। 'Factoring' ও 'forfeiting'-এর মধ্যকার পার্থক্য হলো, প্রথমটির মধ্যে সব ঋণ বিক্রয় করা হয়, আর দ্বিতীয়টির মধ্যে কিছু ঋণ বিক্রয় করা হয়। এটি যেহেতু ঋণকে তার গায়ের মূল্য অপেক্ষা কমে বিক্রয় করা, তাই তা নিশ্চিত সুদ এবং তা জায়েয হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

১৫৭. পেনশন বিক্রয় করা (Pension)

সরকারি ও কিছু বেসরকারি কোম্পানির চাকুরির নিয়ম হলো, অবসরপ্রাপ্তরা চাকুরি শেষে পেনশন নামে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পায়। যা মাসিক হিসাবে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত দেওয়া হয়। অনেক সময় অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার ভবিষ্যতের সব প্রাপ্ত অর্থ একসঙ্গে উসুল করতে চায়, তাই নগদ মূল্যে তৃতীয় কারো কাছে তার পেনশন বিক্রয় করে। যেন রাষ্ট্র বা কোম্পানির কাছ থেকে পেনশন উসুল করার ক্ষেত্রে ক্রেতা তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এ লেনদেনে ধোঁকা থাকার কারণে শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এটি না-জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, সেখানে জানা যায় না যে, বিক্রেতা কতদিন বেঁচে থাকবে এবং পেনশন পাবে। সুতরাং বিক্রয়টি অনির্দিষ্ট জিনিসের বিক্রয় হলো। তা ছাড়া টাকায় বিক্রয় করলে তা সুদ হবে, কারণ অনুমান করে টাকার বিনিময়ে টাকা বিক্রয় করা হচ্ছে।

অনেক সময় চাকুরিদাতা কোম্পানি অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মাসিক পেনশনের দাবি ছেড়ে দেওয়ার জন্য এককালীন নগদ অর্থ দিয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ এটি বিক্রয় বলে থাকে, তবে প্রকৃত অর্থে এটি বিক্রয় না; বরং উভয় পক্ষের সমঝোতা। সুতরাং এক্ষেত্রে সমকালীন অনেক ফকিহের মতানুযায়ী আমরা যদি পেনশনকে চাকুরিদাতা কোম্পানির পক্ষ থেকে

সৌজন্যমূলক প্রদত্ত অর্থ বলে থাকি, তা হলে সেটি হবে প্রতিশ্রুত দানকে নগদ দানে পরিণত করা। অতএব, এখানে কোনো সমস্যা নেই।[৭৬৫]

তবে এ ব্যাপারে সমকালীন আলেমদের ভিন্ন একটি মত রয়েছে এবং আমিও এটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করি। সে মতটি হলো, পেনশন কোনো সৌজন্যমূলক দান নয়; কেননা তা চাকুরির শর্তের আওতাভুক্ত। আর অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি আইনিভাবে তা দাবি করার অধিকার রাখে। তা ছাড়া সরকারি চাকুরির বিশেষ একটি আইন রয়েছে, যে আইনটি সাধারণত পেনশনকে আবশ্যক করে। সুতরাং পেনশনটি বাকি বেতনের আওতাভুক্ত হবে। যদি এটি সৌজন্যমূলক দান হতো, তা হলে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে তা দাবি করার অধিকার রাখতো না।

এ মতের ওপর প্রশ্ন করা হয় যে, এ পেনশন যদি বেতনের আওতাভুক্ত হয়, তা হলে তার পরিমাণ অনির্দিষ্ট। কারণ, এটি জানা যায় না যে, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকুরি ছাড়ার পর কতদিন বেঁচে থাকবে। এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া হবে যে, এ অনির্দিষ্টতা বিবাদ আবশ্যক করে না। কেননা, আইন সেটিকে বিশেষ নিয়মের আওতাভুক্ত করেছে এবং তার ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। আজ অবধি এ ব্যাপারে কোনো বিবাদ হয়নি। সুতরাং এ ধরনের অনির্দিষ্টতা ক্ষমাযোগ্য। যেমন, গোসলখানায় প্রবেশের ভাড়া এবং বুফের খাবারের মূল্য দেওয়া জায়েয আছে। বুফের খাবার সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ। এ মতানুযায়ী চাকুরিদাতা কোম্পানি যদি নগদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়, তা হলে সেটি হবে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিতে বাকি বেতনকে নগদে পরিণত করা।

এ মতের সমর্থনে ইমাম বুখারি (রহ.) কর্তৃক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদিসের সহায়তা নেওয়া যায়। তিনি বলেছেন–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

৭৬৫. শাইখ মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি (রহ.) 'আরায়া' বিক্রয়ের ওপর কিয়াস করে এমন ফতোয়া দিয়েছেন। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৮) শাইখ রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ.ও এমন ফতোয়া দিয়েছেন। (আহসানুল ফাতাওয়া : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫২২)
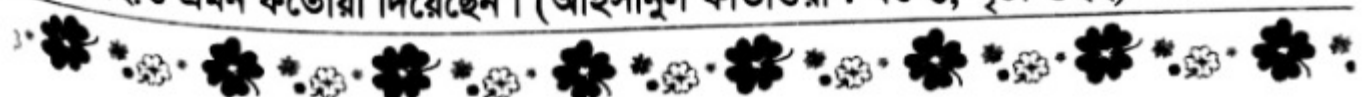
يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الْأَرْضَ.

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খায়বারের উৎপাদিত ফল ও ফসলের অর্ধেক ভাগের ওপর তাদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। তিনি নিজ স্ত্রীদেরকে একশত ওয়াসাক পরিমাণ খাবার দিতেন। যার আশি ওয়াসাক খেজুর আর বিশ ওয়াসাক যব। হযরত উমর (রাযি.) খায়বার এলাকা ভাগ করলেন এবং নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীদেরকে এ স্বাধীনতা দিলেন যে, তাঁরা নিজের জন্য পানি ও জমির ভাগ নেবে অথবা আগের নিয়ম অনুযায়ী খাবার নেবে। এরপর তাঁদের অনেকে জমির ভাগ নিল আর অনেকে আগের মতো ওয়াসাক হিসাবে খাবার নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। হযরত আয়েশা (রাযি.) জমির ভাগ নিয়েছিলেন।'[৭৬৬]

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিদায়ের পর খায়বারে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উম্মাহাতুল মুমিনিনের আমৃত্যু অধিকার ছিল।[৭৬৭] যেমন, চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি আজীবন পেনশন পাওয়ার অধিকারী থাকে। হযরত আয়েশা (রাযি.) ওয়াসাক-ভিত্তিক খাবার নেওয়ার পরিবর্তে জমির মাধ্যমে সমঝোতা করলেন। অতএব, এটি প্রমাণ করে যে, চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্তদের পক্ষ থেকে একবারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেওয়ার মাধ্যমে সমঝোতা করা জায়েয।

অনেক সময় এ প্রশ্ন করা হয় যে, উম্মাহাতুল মুমিনিন তাঁদের প্রাপ্যের বিপরীত জিনিসের মাধ্যমে সমঝোতা করেছিলেন। কারণ, তাঁদের পাওনা ছিল খেজুর ও যবের ওয়াসাক। আর তাঁরা জমির মাধ্যমে সমঝোতা করেছিলেন। পক্ষান্তরে চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে টাকা দিয়ে সমঝোতা করছে। এভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে,

---

৭৬৬. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: চাষাবাদ..., পরিচ্ছেদ: বর্গার ক্ষেত্রে মেয়াদের শর্তারোপ না-করলে..., হাদিস-২৩১৮

৭৬৭. কেননা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার মিরাস দিনার-দিরহামরূপে বণ্টিত হবে না। আমার স্ত্রী ও কর্মচারীদের ব্যয়ের পর যা রেখে যাবো তা সদকা হিসাবে গণ্য হবে। সহিহ বুখারি, পরিচ্ছেদ: পরিবার কর্তার ব্যয়..., হাদিস নং ২৭৭৬।
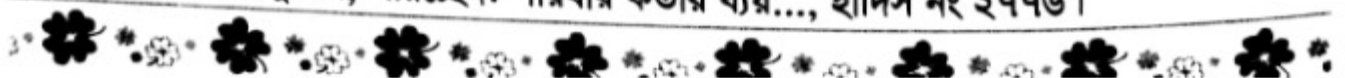
উম্মাহাতুল মুমিনিনের কাজের মাধ্যমে যেটি দলিল দেওয়া হয়েছে তা হলো, তাঁরা অনির্দিষ্ট অধিকারের ব্যাপারে সমঝোতা করেছেন। কারণ, তাঁদের আজীবন প্রাপ্য ওয়াসাকের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। অনুরূপভাবে পেনশনের বিনিময়টিও নির্দিষ্ট নয়। আর এটি ضَعْ ও تعجَّل-এর আওতাভুক্ত নয়। কারণ, তা ওই ক্ষেত্রে হয়, যেখানে বাকি ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। কেননা, ঋণের পরিমাণটি যদি অনির্দিষ্ট হয়, তা হলে সেখানে এ কথা বলা যায় না যে, নগদ পরিশোধের বিনিময়ে ঋণদাতা কিছু ঋণ কমিয়ে দিয়েছে। আর টাকার ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট পাওনায় সমঝোতা করাও জায়েয। উদাহরণস্বরূপ, যখন কারো ওপর ঋণ থাকবে এবং ঋণদাতা ও ঋণীর কেউ তার পরিমাণ ও মেয়াদ জানবে না, তখন উভয়ের সম্মতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের ব্যাপারে সমঝোতা করা জায়েয আছে। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) 'আল-কাফি' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'গায়াতুল বয়ান' হতে উদ্ধৃত করেছেন–

> ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها، فصالحه منها على ثوب أو غيره فهو جائز، لأن جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحة الصلح، وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس، لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه ولكني أستحسن أن أجيزه، لأن الظاهر أنه كان أقل مما عليه، لأن مبنى الصلح على الحط والإغماض، فكان تقديرهما بدل الصلح بشيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل مما عليه وإن كان قدر ما عليه بنفسه ا ه

'কেউ যদি কারো কাছে এমন দিরহাম পায়, যার ওজন সম্পর্কে তাদের কারো জানা নেই। এরপর তারা কাপড় বা অন্য কিছুর মাধ্যমে সমঝোতা করল, তা হলে তা জায়েয আছে। কারণ, তারা যার ব্যাপারে সমঝোতা করেছে, তা অনির্দিষ্ট হওয়া তাদের সমঝোতা সহিহ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। আর যদি দিরহামের মাধ্যমে সমঝোতা করে, তা হলে কিয়াস অনুযায়ী তা ফাসেদ হবে। কেননা, যার বিনিময়ে সমঝোতা করছে তার পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ইস্তিহসান এটিকে জায়েয বলে। কারণ, বাহ্যিক অবস্থা হলো, যার বিনিময়ে সমঝোতা করা হচ্ছে, তার পরিমাণ কম। কেননা, সমঝোতার মূলভিত্তি হলো, কম ও

ছেড়ে দেওয়ার ওপর। সুতরাং কোনো কিছুর মাধ্যমে তাদের সমঝোতা করা স্পষ্ট প্রমাণ যে, তাদের ওপর যে পরিমাণ ঋণ ছিল তার চেয়ে কমে সমঝোতা করেছে। যদিও ঋণীর ওপর থাকা ঋণের সমপরিমাণের মাধ্যমে সমঝোতা করা হোক না কেন।'[৭৬৮]

অনির্দিষ্ট অধিকারের ব্যাপারে সমঝোতা করার দলিল হলো নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলি (রাযি.)-কে বনি খুযাইমার মধ্যে সমঝোতা করতে পাঠানোর ঘটনা।[৭৬৯] সে ঘটনাটি হলো, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাযি.)-কে পাঠিয়েছিলেন। তাদের অনেককে সিজদা অবস্থায় তিনি হত্যা করেছিলেন। এরপর তিনি হযরত আলি (রাযি.)-কে সম্পদ দিয়ে পাঠালেন। আলি (রাযি.) তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিলেন। এমনকি তাদের কুকুরের খাবারের পাত্রেরও ক্ষতিপূরণ দিলেন।[৭৭০] এরপর আলি (রাযি.)-এর কাছে কিছু অর্থ রয়ে গেলে তিনি বললেন, এ অর্থ তোমাদের সে ক্ষতির বিনিময় যা তোমরা জানো না, এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জানেন না। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সংবাদ জানতে পেরে খুশি হলেন। والله تعالى أعلم

১৫৮. অনুগামী হিসাবে ঋণ বিক্রয় করা

বর্তমান যুগে এমন প্রচলন রয়েছে যে, কোনো ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং তার ঋণকে সামষ্টিক মূল্যে বিক্রয় করে। গ্রাহকের জিম্মায় থাকা মেয়াদী ঋণের মেয়াদ শেষ হলে ক্রেতা তাদের থেকে সেগুলো উসুল করতে পারে। উসুলকৃত ঋণ ক্রেতা পাবে, বিক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে না। এ বিক্রয়ের মধ্যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও বস্তুর অনুগামী হিসাবে ঋণ বিক্রয় করা হয়। এক ব্যবসাকে যখন শরিকরা ভাগ করে নেয়, তখন এমনটি হয়ে থাকে। ঋণও বণ্টিত অংশ হিসাবে ভাগে পড়ে। আবার কখনো-কখনো উভয়

---

৭৬৮. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: সমঝোতা, পরিচ্ছেদ: ঋণের দাবি : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৩৯।

৭৬৯. ফাতহুল কাদিরের প্রকাশিত সংস্করণে অনুরূপ রয়েছে : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৯। তবে সহিহ নাম হবে 'জুযাইমা', সিরাতে ইবনে হিশাম : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪২৮। দালায়িলুন নুবুওয়াহ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৩। তারিখে তাবারি : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৬।

৭৭০. নেহায়া, আল্লামা ইবনে আসির (রহ.)-এর রচিত। 'তা এমন পাত্র যাতে কুকুর খাবার খায়।' অর্থাৎ, তাদের যা কিছু ক্ষতি হয়েছিল তার সব কিছুর মূল্য দিয়েছিলেন। এমনকি কুকুরের পাত্রের মূল্যও পরিশোধ করেছিলেন।

পক্ষের উপকারিতার জন্য এমনটি করা হয়। কেননা, তারা চায় যে, দীর্ঘমেয়াদি ঋণের জন্য অপেক্ষা না-করে একবারেই সব বিক্রয় অথবা বণ্টনের মাধ্যমে দায়িত্ব মুক্ত হবে। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এমন বিক্রয় জায়েয আছে কি না?

এই পদ্ধতিটি অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে বড় ব্যবসা ও কোম্পানির ক্ষেত্রে। তা ছাড়া যেসব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা হিসাবে লেনদেন করে, সেখানে ওই কৃত্রিম সত্তাই আসল ঋণদাতা হয়। আর প্রতিষ্ঠানের আগের মালিকগণ তাদের ব্যক্তিগত কৃত্রিম নাম বা কোম্পানির কৃত্রিম নাম দিয়ে ওই ঋণ উসুল করতে পারে না। কেননা, কোম্পানি তাদের কর্তৃত্বের বাইরে চলে গেছে, তবে নতুন মালিকদের অবস্থান অনুরূপ নয়, তারা ঋণ উসুল করতে পারে। এ ছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের উসুলযোগ্য ঋণটি দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে থাকে। আর বিক্রেতার পক্ষ থেকে তার তাগাদা করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

এ বিষয়টির সমাধানে বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সমকালীন উলামায়ে কেরামের গবেষণার জন্য সেগুলো উপস্থাপন করলাম। আল্লাহ তাআলাই তৌফিকদাতা।

১. প্রথম প্রস্তাব : কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের সময় সে যদি অন্যের কাছে কোনো ঋণ পায় তা হলে এক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হলো, নগদ মূল্যটি শুধু বিদ্যমান বস্তু ও অর্থের বিনিময় হবে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, বিদ্যমান অর্থ অপেক্ষা বিক্রয় মূল্য বেশি হবে। এমন ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাব অনুযায়ী আজওয়া খেজুরের এক মুদ বিক্রয়ের (مُدُّ عجوة) মতো এটি জায়েয হবে। এরপর ক্রেতা ঋণের সমমূল্যের এক বা একাধিক বস্তু বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করবে এবং বিক্রেতা ওই বস্তুর মূল্যকে ঋণীদের ওপর হাওয়ালা করে দেবে। এ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা ঋণীদের থেকে ঋণ উসুল করতে পারবে এবং সে ওই ঋণের মালিক হবে। প্রতিষ্ঠান বিক্রেতার পক্ষ থেকে ঋণীদের তাগাদা করার প্রয়োজন হবে না। ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদ্ধতিতে কোনো সমস্যা নেই। মিরাসে ঋণ থাকলে ওয়ারিশদের কেউ সমঝোতা করা যেমন জায়েয, এ মাসআলাটিও অনুরূপ জায়েয। 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া'য় বলা হয়েছে–

فإن طلبوا أن يجوز هذا الصلح على أن يكون نصيبها (أي المراة المتخارجة من الميراث) من الدين للوارث فطريق ذلك أن تشتري المرأة
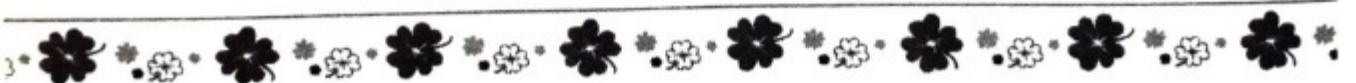
(المصالحة) عينا من أعيان الوارث بمقدار نصيبها من الدين ثم تحيل الوارث على غريم الميت بحصتها من الدين يعقدون عقد الصلح بينهم من غير أن يكون ذلك شرطا في الصلح، كذا في الظهيرية.

'ওয়ারিশগণ যদি এ পদ্ধতিতে সমঝোতা করতে চায় যে, মিরাস থেকে বের হয়ে যাওয়া মহিলার ঋণের অংশটি ওয়ারিশগণ পাবে, তা হলে তার পদ্ধতি হবে, সমঝোতাকারী মহিলা ওয়ারিশদের মালিকানাধীন কোনো বস্তু তার ঋণের সমমূল্যে ক্রয় করবে। এরপর মৃত ব্যক্তির ঋণীদের কাছে তার প্রাপ্য অংশ পরিমাণ ঋণকে ওয়ারিশের কাছে হাওয়ালা করার পর তাদের মধ্যে সমঝোতার চুক্তি করবে। তবে মূল সমঝোতার মধ্যে এটিকে শর্ত করা যাবে না। ফাতাওয়ায়ে যাহিরিয়া-তে অনুরূপ রয়েছে।'[৭৭১]

'হেদায়া' কিতাবের মতনে রয়েছে–

إذا كان في التركة دين على الناس، فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه ويكون الدين لهم، فالصلح باطل.

'মিরাসের মধ্যে যখন মানুষের কাছে প্রাপ্য ঋণ থাকবে এবং ওয়ারিশরা এভাবে সেটিকে সমঝোতার আওতাভুক্ত করবে যে, তাদের সঙ্গে সমঝোতাকারী সে ঋণের দাবি থেকে বেরিয়ে যাবে এবং বাকিরা তা পেয়ে যাবে, এমন সমঝোতা করা বাতিল।'

এরপর 'হেদায়া' গ্রন্থের প্রণেতা জায়েযের জন্য দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করার পর বলেছেন–

والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه، ويصالح عما وراء الدين، ويحيلهم على استفاء نصيبه من الغرماء.

'উত্তম হলো, সমঝোতাকারীকে তারা তার অংশ পরিমাণ ঋণ দেবে এবং সে ঋণের বিনিময়ে সমঝোতা করবে। এরপর ঋণীদের থেকে তার ঋণ উসুল করার দায়িত্বটি তাদের কাছে হাওয়ালা করবে।'[৭৭২]

---

৭৭১. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, অধ্যায় : সন্ধি, পরিচ্ছেদ: ১৫ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৯।

৭৭২. হেদায়া, ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ, অধ্যায়: সমঝোতা, পরিচ্ছেদ: তাখারুজ : খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪১০।

তবে এক্ষেত্রে হাওয়ালার সব বিধি-বিধান বাস্তবায়ন হওয়া জরুরি। আর সেসব বিধানের একটি বিধান হলো, হানাফি মাযহাব অনুযায়ী হাওয়ালা বাতিল হলে যে হাওয়ালা করেছে তার থেকে আসল পাওনা আদায় করা যাবে।

২. দ্বিতীয় প্রস্তাব : শুধু বস্তু বিক্রয় করা হবে। আর ভবিষ্যতে আদায়যোগ্য ঋণকে বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে দান করে তাকে তা উসুলের ক্ষমতা দেবে। হাম্বলি ও শাফেয়ি মাযহাবে ঋণী ছাড়া অন্যকে ঋণ দান করা জায়েয নেই।[৭৭৩] হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামও অনুরূপ বলেছেন। তবে তারা এ কথা বলেছেন যে, এ শর্তে ঋণী ছাড়া অন্যকে ঋণ দান করা জায়েয আছে যে, ঋণী ক্রেতাকে ঋণ উসুলের অধিকার দেবে, যাকে দান করা হয়েছে সে ওই ঋণ কব্জা করার পর তার মালিক হয়ে যাবে। 'আদ-দুররুল মুখতার' কিতাবে উল্লেখ আছে–

> تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث: حوالة وصية وإذا سلطه أي سلط المملك غير المديون على قبضه... أي الدين (فيصح) حينئذ.
>
> 'তিন অবস্থা ব্যতীত ঋণী ছাড়া অন্যকে ঋণের মালিক বানানো বাতিল হিসাবে গণ্য হবে : ১. হাওয়ালা, ২. ওসিয়ত, ৩. মালিক যখন অন্যকে ওই ঋণ কব্জা করার অধিকার দেবে, তখন সহিহ হবে।'[৭৭৪]

ফুকাহায়ে কেরাম এক্ষেত্রে ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলেছেন, উকিল বানানোর কথা বলেননি। এ দুটির মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট। ওকালত হলো এমন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যা উভয় পক্ষের ইজাব-কবুল ছাড়া সম্পন্ন হয় না। আর চুক্তির মজলিসে এ-দুটি সম্পন্ন হওয়া ওয়াজিব। আর ক্ষমতা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, অনুমতির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা। শুধু একপক্ষ থেকে এটি সম্পন্ন করা সম্ভব। এ কারণে 'জামেউল ফুসুলাইন' কিতাবে এটিকে অনুমতির

---

৭৭৩. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), অধ্যায়: উপহার : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৫৭। আল-মাজমু শারহুল মুহায্যাব, অধ্যায়: উপহার : খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৩৭৬।

৭৭৪. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: উপহার : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৭০৮।

মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। সে বক্তব্যটি এরূপ–
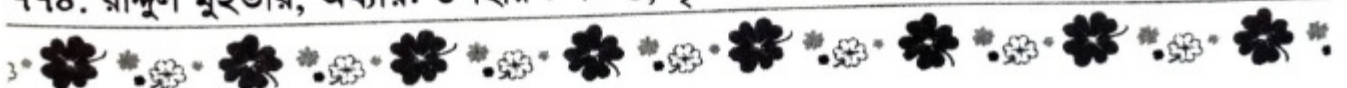
هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز إلا إذا وهبه، وأذن له بقبضه.

‘ঋণী ছাড়া অন্যকে ঋণ দান করা জায়েয নেই। তবে কাউকে দান করে তাকে কব্জা করার ক্ষমতা দিলে জায়েয হবে।’[৭৭৫]

‘আল-বাহরুর রায়েক’ কিতাবে ‘আল-মুহিত’ হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে–

ولو وهب دينا له على رجل وأمره أن يقبضه فقبضه جازت الهبة - استحسانا، فيصير قابضا للواهب بحكم النيابة، ثم يصير قابضا لنفسه بحكم الهبة، وإن لم يأذن بالقبض لم يجز اهـ.

‘কেউ যদি অন্যের কাছে পাওনা ঋণকে তৃতীয় কাউকে দান করে তাকে কব্জা করতে বলে এবং সে কব্জা করে নেয়, তা হলে ইস্তিহসান অনুযায়ী দান জায়েয হবে। সে দানকারীর প্রতিনিধি হিসাবে তা কব্জা করার পর দান হিসাবে নিজের জন্য কব্জা করবে। আর যদি তাকে কব্জা করার অনুমতি না- দেয়, তা হলে জায়েয হবে না।’[৭৭৬]

আল্লামা রাফেয়ি (রহ.) বলেছেন–

الظاهر من عباراتهم عدم التوقف على الإذن في المجلس، فإنهم إنما شرطوا لصحة الهبة الإذن، ولم يشترطوا أن يكون في المجلس.

‘তাঁদের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, চুক্তির মজলিসে অনুমতি দেওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়। কারণ, দান সহিহ হওয়ার জন্য তারা অনুমতি শর্ত করেছেন, চুক্তির মজলিসে অনুমতি হওয়া শর্ত করেননি।’[৭৭৭]

উপর্যুক্ত সব বক্তব্য অনুযায়ী ক্রেতা ঋণী থেকে ঋণ কব্জা করার পরই দান সম্পন্ন হবে। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন, এ কথার উদ্দেশ্য হলো, দাতার জন্য এ ক্ষমতা রয়েছে যে, যাকে দান করেছে সে কব্জা করার

---

৭৭৫. জামেউল ফুসুলাইন, পরিচ্ছেদ: ৩৪ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৬।

৭৭৬. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: উপহার : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৮৭।

৭৭৭. আত-তাহরিরুল মুখতার : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৫০।
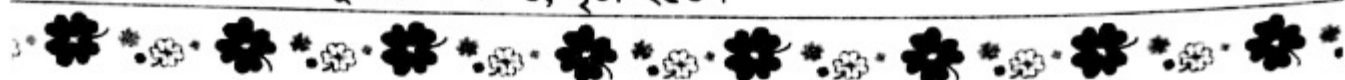
আগে তা প্রত্যাহার করতে পারবে। তবে 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের' কিতাবে 'ওয়াকিআতুল হুসামিয়্যাহ' হতে বর্ণনা করা হয়েছে, 'যাকে দান করা হয়েছে সে দিরহামের পরিবর্তে দিনার কব্জা করতে পারবে। কারণ, তার জন্য এমন অধিকার সৃষ্টি হয়েছে। এ কথার দাবি হলো, তাকে প্রদেয় ক্ষমতা প্রত্যাহার করা সহিহ নয়।[৭৭৮] আল্লামা রাফেয়ি (রহ.) বলেছেন, 'এটিও সাংঘর্ষিক, কেননা প্রথমে উকিল হিসাবে মুয়াক্কিল হতে কব্জা করছে, তারপর নিজের পক্ষ হতে কব্জা করছে।'[৭৭৯]

এটি হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্ত। মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মতানুযায়ী শর্তহীনভাবে ঋণী ছাড়া অন্যকে ঋণ দান করা জায়েয। আল্লামা মাওওয়াক (রহ.) বলেছেন–

> من المدونة :... ولو كان دينه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد بذلك وجمع بينك وبين غريمه ودفع إليك ذكر الحق إن كان عنده فهو قبض، وإن لم يكن كتب عليك ذكر الحق وأشهد لك وأحالك عليه كان ذلك قبضا، وكذلك إن أحالك به عليه في غيبته وأشهد لك وقبضت ذكر الحق كان ذلك قبضا لأن الدين هكذا يقبض ليس هو شيئا بعينه .... وقال ابن شاس: هبة الدين تصح كما يصح رهنه ثم قبضك قبضه في الرهن مع إعلام المديان بالهبة.

> 'মুদাওওয়ানাহ কিতাবে রয়েছে... যদি অন্যের কাছে তার ঋণ থাকে এবং তা তোমাকে দান করে। সে যদি এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখে, তোমার ও ঋণীর মধ্যে মিল করে দেয় এবং তার উপস্থিতিতে তোমাকে উসুল করার অধিকার দেয়, তা হলে সেটি কব্জা হিসাবে বিবেচিত। আর যদি তোমাকে উসুল করার অধিকার লিখে না-দিয়ে সাক্ষী রাখে এবং তোমার কাছে হাওয়ালা করে দেয়, তা হলেও সেটি কব্জা হিসাবে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে ঋণীর অনুপস্থিতিতে তোমার কাছে হাওয়ালা করলে এবং তোমার

৭৭৮. আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, আল্লামা হামাবি (রহ.)-এর ব্যাখ্যাসহ, তৃতীয় ফন, ঋণের বিধান : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৪।

৭৭৯. আত-তাহরিরুল মুখতার : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৫৫।
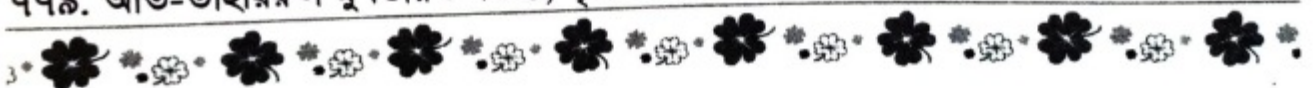
পক্ষে সাক্ষী রাখলে এবং তুমি উসুল করার অধিকার নিলে সেটিও কব্জা হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ, এভাবেই ঋণ কব্জা করা হয়, আর তা নির্দিষ্ট কোনো বস্তু নয়। ... ইবনুশ শাস (রহ.) বলেছেন, ঋণ বন্ধক রাখার মতো তা দান করা সহিহ। এরপর তার কব্জাটি বন্ধকের কব্জার মতো হবে, তবে ঋণীকে দানের বিষয়টি জানাতে হবে।'[৭৮০]

৩. তৃতীয় প্রস্তাব : এ পরিস্থিতিতে ঋণ বিক্রয়ের বিষয়টি মূলত গৌণ। এটি বরং অনুগামী হিসাবে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনেক সময় অনুগামী হিসাবে এমন বস্তু জায়েয হয়ে যায়, যা সত্তাগতভাবে জায়েয নেই। ইমাম কারখি (রহ.) বলেছেন–

الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان يبطل قصدا، من مسائله... لو باع عبدا، دخل أطرافه في المبيع تبعا، وكذا هواء الدار في بيع الدار، وكذا الشرب في بيع الأرض، ولو باع الأطراف قصدا، والهواء، والشرب، لم يصح، ونظائرها كثيرة.

'মূলনীতি হলো, অনেক সময় অনুগামী ও হুকুমের দিক থেকে এমন জিনিস বৈধ হয়, যা উদ্দিষ্ট বস্তু হিসাবে বাতিল হয়। এমন মাসআলার মধ্য থেকে কিছু মাসআলা : ... দাস বিক্রয় করলে তার অঙ্গসমূহ বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে বাড়ি বিক্রয় করলে তার ওপরের ফাঁকা জায়গা বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হয়। জমি বিক্রয় করলে তার সেচ বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হয়। যদি ভিন্নভাবে অঙ্গ, ঘরের ওপরের ফাঁকা বা সেচ বিক্রয় করে, তা হলে সহিহ হবে না। এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।'[৭৮১]

এ মাসআলার সুন্দর দৃষ্টান্ত হলো ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ফল বিক্রয়ের মাসআলাটি। গাছে কিছু ফল আসার পর সব ফল বা বাগান বিক্রয় করলে শাফেয়ি, হাম্বলি ও হানাফি মাযহাবের যাহেরুর রেওয়ায়াত অনুযায়ী যেসব

---

৭৮০. আত-তাজ ওয়াল ইকলিল, অধ্যায়: ওয়াকফ ও উপহার : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫২।

৭৮১. উসুলুল কারখি ও তাসিসুন নজর, আল্লামা দাবুসি (রহ.), পৃষ্ঠা-৬২, করাচি থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।

ফল এসেছে, শুধু তার মধ্যে বিক্রয় জায়েয হবে। কারণ, এখনো পর্যন্ত যেসব ফল আসেনি, তা বিদ্যমান নেই। তবে শামসুল আইম্মা হালওয়ানি (রহ.) এ ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি না-আসা ফল অপেক্ষা আসা ফলের পরিমাণ বেশি হয়, তা হলে সবগুলোর ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েয হবে। ইমাম ফাযলি (রহ.)ও এ ফতোয়া দিয়েছেন; বরং তার বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, গাছে আসা ফলের পরিমাণ বেশি হওয়াও শর্ত নয়। বিদ্যমান ফলকে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল সাব্যস্ত করে পরবর্তী সময়ে আসা ফলকে তার অনুগামী সাব্যস্ত করা হবে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাঁর ফাতাওয়াগ্রন্থে এ ফতোয়া দিয়েছেন।[৭৮২] আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) আল্লামা ফাযলি (রহ.)-এর ফতোয়া উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, 'ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) হতে অনুরূপ বর্ণনা দেখেছি। সেটি হলো, গাছের ফুল বিক্রয় করা। কারণ, ফুল পর্যায়ক্রমে ফুটতে থাকে। এরপর এ পদ্ধতিতে সব কিছুর মধ্যে বিক্রয় জায়েয বলেছেন। এটি ইমাম মালেক (রহ.)-এরও মত।'[৭৮৩]

সুতরাং এক্ষেত্রে বিদ্যমান ফলের অনুগামী হিসাবে বিদ্যমান নয় এমন ফল বিক্রয়কে জায়েয বলা হয়েছে। সুতরাং বিদ্যমান নয় এমন জিনিস যদি বিদ্যমান ফলের অনুগামী হতে পারে, তা হলে প্রয়োজনের সময় স্বীকারোক্তিকারীর ঋণ উপস্থিত পণ্যের অনুগামী হওয়া বেশি যুক্তিসঙ্গত। তবে হানাফি মাযহাবের মতানুযায়ী তার মূল্য ঋণ অপেক্ষা বেশি হতে হবে। আজওয়া খেজুর বিক্রয়ের ওপর কিয়াস করে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। যেন টাকার বিনিময়ে টাকা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কম-বেশি না-হয়।

এ মতের ওপর অনেক সময় এমন প্রশ্ন করা হয় যে, যদি সুদ বা সুদের সন্দেহ না-হয়, তা হলেই অনুগামী মূলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং চুক্তির সময় নির্ধারিত ঋণের মূল্যটি যদি ঋণের সমপরিমাণ হয়, তা হলে ভবিষ্যতে যে পরিমাণ ঋণ উসুল হবে তার পরিমাণ জানা যাচ্ছে না। আর এরপর যদি কিছু ঋণ নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে মূল্য ও পণ্যের মধ্যে সমতা পাওয়া যাচ্ছে না। আর যেসব জিনিস কম-বেশি করে বিক্রয় করা জায়েয নেই, তা অনুমান করেও বিক্রয় করা জায়েয নেই। এ কারণে মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে

---

৭৮২. ফাতাওয়ায়ে ইবনে নুজাইম, ফাতাওয়ায়ে গিয়াসিয়্যাহ-এর সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১১৩।

৭৮৩. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯২।

কেরাম ঋণ বিক্রয় জায়েয হওয়ার জন্য এ শর্ত করেছেন যে, তা ঋণের ভিন্ন জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করতে হবে এবং এমন জিনিস হতে হবে, যার উভয় বিনিময় কব্জা করা শর্ত নয়। এ কারণেই টাকার বিনিময়ে বাকি টাকা বিক্রয়ের ক্ষেত্রসমূহে তারা সমঝোতা করাকে জায়েয বলেননি।[৭৮৪] তবে মূল্যটি যদি ঋণের ভিন্ন জাতীয় হয়, তা হলে যেসব জিনিসের উভয় বিনিময় কব্জা করা শর্ত নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম ঋণ বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন। তার পদ্ধতিটি এরূপ হবে যে, টাকার বিনিময় নিরেট বস্তু বিক্রয় সাব্যস্ত করে ঋণের বিক্রয়কে কোনো বস্তুর অনুগামী সাব্যস্ত করতে হবে।

৪. চতুর্থ প্রস্তাব : বর্তমান সময়ের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা সাব্যস্ত করা হয়। তাই এটি বিক্রয়ের দৃষ্টান্ত হবে এমন দাস বিক্রয় করা, যার মালিকানায় মাল রয়েছে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত আছে–

مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

'যে ব্যক্তি কোনো দাস ক্রয় করবে, বিক্রেতা ওই দাসের মাল পাবে। তবে ক্রেতা মালের শর্ত করলে সে পাবে।'[৭৮৫]

মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম হাদিসটিকে শর্তহীনভাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন–

الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا.

'আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, ক্রেতা যদি দাসের মাল নেওয়ার শর্তারোপ করে, তা হলে সে ওই মাল পাবে। চাই দাসের মাল নগদ, ঋণ বা বস্তু হিসাবে থাকুক না-কেন। সে তার সম্পর্কে জানুক বা না-জানুক। যদিও দাসের মূল্য অপেক্ষা তার মালের

৭৮৪. আল-মুদাওওয়ানাতুল কুবরা, অধ্যায় : সমঝোতা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৮।

৭৮৫. সহিহ বুখারি ও মুসলিম, উল্লিখিত হাদিসটি সহিহ মুসলিমের বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৩৮৭৯।
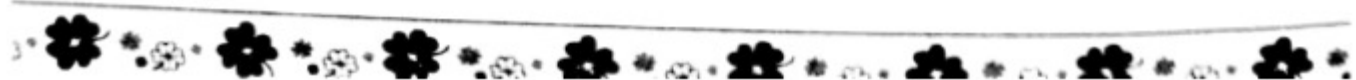
পরিমাণ বেশি হোক না-কেন, তার মূল্য নগদ, ঋণ বা বস্তু হিসাবে হোক না-কেন।'[৭৮৬]

তবে দাস সম্পদের মালিক হওয়ার বিষয়টি মালেকি মাযহাবের সিদ্ধান্ত। যদিও তার মাল ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মনিবের একক অধিকার রয়েছে। আল্লামা বাজি (রহ.) বলেছেন–

يريد أن اشتراط المبتاع هذا المال لا يفسد العقد بأن يكون المال المشترط عينا أكثر مما اشتري به من العين أو يكون دينا مؤجلا فيشترى بالدين أو بالنقد أو يكون المشترط من المال مجهولا عند المتبايعين أو أحدهما؛ لأن ما اشترط من ذلك ليس بعوض في البيع فيؤثر فيه الفساد بشيء مما ذكرناه؛ لأن المبتاع لم يشترطه لنفسه، وإنما اشترط بقائه على ملك العبد فليس بعوض في البيع.

'তার উদ্দেশ্য হলো, ক্রেতা উক্ত সম্পদের শর্তারোপ করলে তা চুক্তিকে ফাসেদ করবে না। এর সুরতগুলো হলো, যে বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করা হচ্ছে, তার চেয়ে শর্তকৃত বস্তু বেশি হবে, অথবা তা ঋণ হবে এবং ঋণের বিনিময়ে বা নগদে তা ক্রয় করা হবে, অথবা শর্তকৃত জিনিসটি উভয় পক্ষ বা এক পক্ষের কাছে অস্পষ্ট থাকবে। কারণ, যার শর্তারোপ করা হচ্ছে, বিক্রয়ে তার কোনো বিনিময় নেই। তাই বর্ণিত কারণে তার মধ্যে ফাসেদ হওয়ার কারণ অনুপ্রবেশ করবে, যেহেতু ক্রেতা নিজের জন্য শর্তারোপ করেনি; বরং দাসের মালিকানায় বিদ্যমান থাকার শর্তারোপ করেছে। অতএব বিক্রয়ে তার কোনো বিনিময় থাকল না।'[৭৮৭]

এ আলোচনা অনুযায়ী মালেকি মাযহাবের মতানুযায়ী মাল রয়েছে এমন দাস বিক্রয় আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। তবে হাম্বলি মাযহাবের সে মাসআলা অনুযায়ী এ মাসআলার সমাধান করা সম্ভব, যেখানে মাল ছাড়া দাস ক্রয় করতে চায় এবং মালকে তার অনুগামী সাব্যস্ত করে। ইমাম ইবনে

---

৭৮৬. মুয়াত্তা মালেক, অধ্যায় : বিক্রয়, বিক্রয় দাসের সম্পদ..., ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.)-এর 'আল-ইস্তিযকার' কিতাবসহ : খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা-৩২।

৭৮৭. আল-মুনতাকা, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: দাসের সম্পদ সম্পর্কে : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬০।
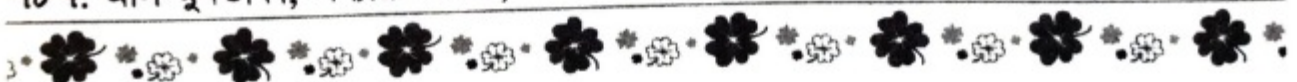
কুদামা (রহ.) বলেছেন–

ومعناه أنه لا يقصد بالبيع شراء مال العبد إنما يقصد بقاء المال لعبده وإقراره في يده فمتى كان كذلك صح اشتراطه ودخل في البيع به، سواء كان المال معلوما أو مجهولا، من جنس الثمن أو من غيره، عينا كان أو دينا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر، قال البتي: إذا باع عبدا بألف درهم ومعه ألف درهم فالبيع جائز إذا كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم وذلك لأنه دخل في البيع تبعا غير مقصود... فأما إن كان المال مقصود بالشراء جاز اشتراطه إذا وجدت فيه شرائط البيع من العلم به وأن لا يكون بينه وبين الثمن ربا.

'এ কথার উদ্দেশ্য হলো, এ বিক্রয়ের মাধ্যমে দাসের মাল ক্রয় করা উদ্দেশ্য নয়; বরং মালকে দাসের মালিকানা ও তার হাতে রাখা উদ্দেশ্য। সুতরাং যখন এমন হবে, তখন তা শর্ত করা এবং বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হওয়া সহিহ হবে। যদিও মাল নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট, মূল্যের সমজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয়, বস্তু বা ঋণ, ন্যায্য মূল্য বা তার চেয়ে কম-বেশি হোক না কেন। আল্লামা বাত্তি (রহ.) বলেছেন, যদি এক হাজার দিরহামে কোনো দাস বিক্রয় করে এবং তার মালিকানায় আরও এক হাজার দিরহাম থাকে, তা হলে ক্রেতার উদ্দেশ্য দিরহাম না-হয়ে দাস হলে বিক্রয় সহিহ হবে। কারণ, তা উদ্দেশ্যহীনভাবে বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হয়েছে। ... আর ক্রয়ের মাধ্যমে যদি দাসের মাল উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তা হলে বিক্রয়ের শর্ত পাওয়া গেলে শর্ত করা জায়েয। সে শর্ত হলো মাল সম্পর্কে জানতে হবে এবং ওই মাল ও মূল্যের মধ্যে কোনো ধরনের সুদ হবে না।'[৭৮৮]

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিক্রয় থেকে বোঝা যায়, এগুলো ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয় ওই প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে থাকা বস্তু ও উপকারিতা। ঋণ ক্রয় আসল উদ্দেশ্য থাকে না। সুতরাং তার ক্ষেত্রে এ শর্তটি প্রযোজ্য হবে। আর এ ব্যাপারে

---

৭৮৮. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), পরিচ্ছেদ: মুসাররাত : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৫।

হাম্বলি মাযহাব গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। কারণ, সেটি সহজ ও এ ধরনের লেনদেনে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন পূরণ করে। ইতঃপূর্বে বর্ণিত ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.)-এর বক্তব্যে স্পষ্ট রয়েছে যে, দাসের মাল যদি ঋণ হিসাবে থাকে, তা হলে অনুগামী হিসাবে বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হবে। والله تعالى أعلم

হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাব অনুযায়ী দাসের মালকে দাস বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হিসাবে অন্যান্য সব শর্তের সঙ্গে জায়েয। সেসব শর্তের একটি হলো, তার কারণে সুদ এবং ঋণী ছাড়া অন্যের কাছে ঋণ বিক্রয় করার মতো সুরত হতে পারবে না।[৭৮৯] সুদ ও আজওয়া খেজুরের এক মুদ বিক্রয় (مسئلة مُدّ عجوة) সংক্রান্ত আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলব– ইনশাআল্লাহ।

* * *

১৫৯. ষষ্ঠ শর্ত : পণ্য নির্দিষ্ট হওয়া

পণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তসমূহের ষষ্ঠ শর্ত হলো, পণ্য নির্দিষ্ট হওয়া। এটি বিক্রয় সহিহ হওয়ার শর্ত, কার্যকর হওয়ার শর্ত নয়। সুতরাং বিবাদ আবশ্যক করে এমন অস্পষ্টতা বিক্রয়কে ফাসেদ করে। কারণ, তা ধোঁকার বিক্রয়ের আওতাভুক্ত। ইতঃপূর্বে পঞ্চম শর্তের আলোচনায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যদি চুক্তির মজলিসে এ অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়, তা হলে চুক্তিটি সহিহ হয়ে যাবে। অস্পষ্টতা কখনো পণ্যের প্রকারের মধ্যে আবার কখনো তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

১৬০. পণ্যের প্রকারে অস্পষ্টতা

পণ্যের প্রকারে অস্পষ্টতার উদাহরণ হলো, পাথর নিক্ষেপ করে বিক্রয়। যেটিকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন।[৭৯০]

---

৭৮৯. ফাতহুল বারি, অধ্যায় : বর্গা দেওয়া : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫০–৫১। আল-ইস্তিযকার, ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.), খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা-৩৫। তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, পরিচ্ছেদ: ফলবিশিষ্ট খেজুর গাছ বিক্রয় করা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৫।

৭৯০. হাদিসটি হচ্ছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাথর ছুঁড়ে ও ধোঁকাযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।' সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: পাথর ছুঁড়ে বিক্রয় বাতিল হওয়া, হাদিস নং ৩৭৮৩।

আল্লামা ইবনুল আসির (রহ.) এভাবে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

قيل هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت.

'এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বিক্রেতা বলবে, তুমি পাথর মারলে যে পণ্যের ওপর পাথর পড়বে সেটি তোমার কাছে বিক্রয় করলাম।'[৭৯১]

এক্ষেত্রে পণ্য নির্দিষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, তা কোন প্রকারের, সেটিই অস্পষ্ট।

১৬১. পণ্য নির্ধারণে অস্পষ্টতা

পণ্যের এককের মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে, তা হলে তা নির্ধারণে অস্পষ্টতা বিক্রয় সহিহ হওয়ার প্রতিবন্ধক। উদাহরণস্বরূপ, বিক্রেতা বলবে, 'ছাগলের এ পাল থেকে তোমার কাছে একটি ছাগল বিক্রয় করলাম।' এখানে একটি ছাগল অনির্দিষ্ট এবং এগুলোর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য হয়ে থাকে। সুতরাং বিক্রয় সহিহ হবে না। আর পণ্যের এককের মধ্যে যদি বিবাদ আবশ্যককারী পার্থক্য না-থাকে, তা হলে তা নির্ধারণ করা আবশ্যক নয়। উদাহরণস্বরূপ, বিক্রেতা বলল, 'এ গমের স্তূপ হতে তোমার কাছে এক কফিয পরিমাণ গম বিক্রয় করলাম', তা হলে বিক্রয় জায়েয হবে।[৭৯২] ওই স্তূপ হতে ক্রেতা যে কোনো এক কফিয পরিমাণ গম নিতে পারবে।[৭৯৩] এক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েয হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, অনির্দিষ্টভাবে এক কফিযের মধ্যে বিক্রয়টি আবশ্যক হয়ে যাবে এবং ক্রেতা তার মালিক হয়ে যাবে। পণ্য আলাদা করার পর তার মালিকানাধীন পণ্য নির্দিষ্ট হবে। যেমনটি 'খিয়ারে তায়িন' (নির্দিষ্টকরণের এখতিয়ার)-এর হুকুম। তবে পণ্য আলাদা করা এবং কব্জা করা ছাড়া ক্রেতার ওপর তার দায়ভার বর্তাবে না।[৭৯৪] সুতরাং নির্দিষ্ট করার আগে যদি বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় তা নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে বিক্রয় বাতিল হবে। কারণ, বিক্রয়ের ক্ষেত্রটিই নষ্ট হয়ে গেছে।

---

৭৯১. জামেউল উসুল, আল্লামা ইবনুল আসির (রহ.), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫২৮।

৭৯২. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫৯। রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৪৬, ফিকরাহ নং ২২৩৭৫। আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৯৩–৯৪। আদ-দুসুকি : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭।

৭৯৩. হেদায়া, ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭৩–৪৭৪।

৭৯৪. খিয়ারে তায়িনের ক্ষেত্রে পণ্য নষ্ট হলে ক্রেতার ওপর জরিমানা আরোপ হওয়ার কারণ হলো, সেটি তার কব্জায় থাকে।
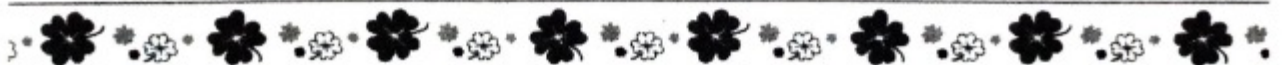
শাফেয়ি মাযহাবের কিছু ফকিহের মত হলো, স্তূপের অংশবিশেষের ওপর বিক্রয়ের হুকুম প্রয়োগ করতে হবে। যখন জানা যাবে যে, স্তূপে দশ সা গম আছে, তখন পণ্য হবে দশভাগের একভাগ। সুতরাং স্তূপে থাকা পণ্যের কিছু নষ্ট হলে ক্রয়কৃত পণ্য থেকে ওই অংশ অনুযায়ী নষ্ট হবে। তাদের আরও একটি মত রয়েছে এবং তা হানাফি মাযহাবের মতের অনুরূপ। সেটি হলো, পণ্য হলো স্তূপে থাকা পণ্যের পরিমাণ মাত্র এক সা। সেটি যে কোনো সা হতে পারে। অতএব, স্তূপে এক সা পরিমাণ গম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত বিক্রয় অবশিষ্ট থাকবে।[৭৯৫] অর্থাৎ, স্তূপ থেকে কিছু মাল নষ্ট হলে তা বিক্রেতার সম্পদ নষ্ট হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। সেখানে এক সা পরিমাণ গম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতাকে পরিপূর্ণ এক সা পরিমাণ গম দিতে হবে। আর পণ্য দেওয়ার আগে যদি সব গম নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে বিক্রয় ফাসেদ হবে এবং ক্রেতা কিছুই পাবে না।

এ আলোচনা থেকে জানা গেল, পণ্যের এককে পার্থক্য হয় না এমন পণ্যের সমষ্টি থেকে কেউ যদি সেখানে থাকা পণ্য অপেক্ষা কম পরিমাণ পণ্য ক্রয় করে, তা হলে বিক্রয় সহিহ হবে। তবে নির্দিষ্ট করা ছাড়া পণ্যের কব্জা সম্পন্ন হবে না। যদিও বিক্রেতা ক্রেতাকে এ সুযোগ দেয় যে, তার ইচ্ছেমতো যে কোনো সময় পণ্য কব্জা করতে পারবে। (তা হলেও তা কব্জা হিসাবে সাব্যস্ত হবে না)

এরপর যেসব পণ্যের এককে পার্থক্য রয়েছে, সেগুলো যদি খিয়ারে তায়িনের শর্তে বিক্রয় না-করা হয়, তা হলে এ অস্পষ্টতা বিক্রয়কে ফাসেদ করবে। পক্ষান্তরে যদি খিয়ারে তায়িনের শর্তে বিক্রয় করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, বিক্রেতা বলল, 'এ তিনটি ছাগলের মধ্য থেকে এ শর্তে তোমার কাছে একটি ছাগল বিক্রয় করছি যে, তোমার পক্ষ থেকে তিন দিনের মধ্যে তার কোনো একটি নির্দিষ্ট করার অধিকার রয়েছে,' তা হলে হানাফি ও মালেকি মাযহাবের মতানুযায়ী বিক্রয় জায়েয হবে। আর খিয়ারে তায়িন-পাওয়া ব্যক্তির পক্ষ থেকে তা নির্দিষ্ট করার অধিকার থাকবে। খিয়ারের অধ্যায়ে এসব খিয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে– ইনশাআল্লাহ।

১৬২. পণ্যের পরিমাণে অস্পষ্টতা

পণ্য যদি পরিমাণভিত্তিক বিক্রয় হয়, তা হলে বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য

---

৭৯৫. শারহুল মুহাল্লা আলাল মিনহাজ, আল্লামা কালয়ুবি (রহ.)-এর টীকাসহ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬১।
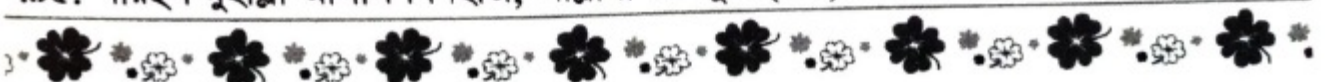
পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা শর্ত। যেমন, কাইল, ওজন বা গণনার মাধ্যমে বিক্রয় করা হলে পণ্যের পরিমাণ জানা আবশ্যক। আর যদি ইশারা বা নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়, তা হলে পরিমাণ জানা আবশ্যক নয়। ইশারার মাধ্যমে বিক্রয়ের উদাহরণ হলো, বিক্রেতা বলবে, ছাগলের এই পাল বা খাবারের এই স্তূপটি তোমার কাছে এ মূল্যে বিক্রয় করলাম।' উদাহরণের প্রথমটির মধ্যে ছাগলের সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে গমের পরিমাণ বা ওজন অজানা, তারপরও বিক্রয় জায়েয হবে। এটিকে 'অনুমান করে বিক্রয় করা' নামে অভিহিত করা হয়। সুদ হয় এমন জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় না-হওয়ার শর্তে এ পদ্ধতিতে বিক্রয় করা জায়েয আছে। কারণ, সুদি জিনিসের মধ্যে অনুমান করে বিক্রয় করা জায়েয নেই। সামনে সুদের পরিচ্ছেদে যেসব বস্তুতে সুদ হয়, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে– ইনশাআল্লাহ।

নির্দিষ্ট করার উদাহরণ হলো, বিক্রেতা বলবে, 'তোমার কাছে অমুক জমিটি বিক্রয় করলাম', ক্রেতা ওই জমির পরিমাপ সম্পর্কে না-জানলেও বিক্রয় জায়েয হবে। 'ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়া'-তে বর্ণিত আছে–

> اشترى أرضا، وذكر حدودها لا ذرعها طولا وعرضا جاز... وإن لم يذكر الحدود ولم يعرفه المشتري جاز البيع إذا لم يقع بينهما تجاحد.
>
> 'কেউ জমি ক্রয় করল এবং শুধু তার সীমানা বর্ণনা করল, দৈর্ঘ্য-প্রস্থের দিক থেকে তার পরিমাপ উল্লেখ করল না, তা হলেও বিক্রয় জায়েয হবে। ... যদি সীমানা না-বলে এবং ক্রেতা যদি তা না-চেনে, তারপরও চুক্তি জায়েয হবে, যদি তাদের মধ্যে মতানৈক্য না-ঘটে।'[৭৯৬]

এখান থেকে বোঝা গেল, জমিটি যখন এমনভাবে জানা হবে যে, পরিচিত পরিমণ্ডলে তা বিক্রেতার মালিকানাধীন, তা হলে বিক্রয় জায়েয হবে। আর যদি এমন না-হয়, তা হলে তা বেশি অস্পষ্টতা বলে গণ্য হবে, যা বিক্রয়কে ফাসেদ করে দেবে। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন, পণ্যের পরিমাণে অত্যধিক অস্পষ্টতা বিক্রয় ফাসেদ করে দেয়। সুতরাং কেউ যদি এভাবে বিক্রয় করে যে, এ গ্রামে অথবা এ বাড়িতে যা কিছু রয়েছে তা বিক্রয় করলাম এবং সেখানে কী রয়েছে সে সম্পর্কে ক্রেতা জানে না, তা হলে

---

৭৯৬. ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়া, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ার সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭২।

অত্যধিক অস্পষ্টতার কারণে বিক্রয় সহিহ হবে না। আর যদি এভাবে বিক্রয় করে যে, এ ঘর, বাক্স বা সিন্দুকের মধ্যে যা কিছু আছে, তা বিক্রয় করলাম, তা হলে বিক্রয় সহিহ হবে। কারণ, এখানে অধিক অস্পষ্টতা নেই। এ হুকুম সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে পণ্য হস্তান্তর করার প্রয়োজন হয়। আর যদি এমন পণ্য হয়, যা হস্তান্তর করতে হয় না, তা হলে সেখানে পণ্যের পরিমাণ না জানলেও বিক্রয় সহিহ হবে। যেমন, কেউ এমন স্বীকারোক্তি দিল যে, তার কাছে অমুকের ছিনতাইকৃত বা আমানতের সম্পদ রয়েছে, এরপর তার মালিক থেকে সেটি ক্রয় করে নিল, তা হলে পণ্যের পরিমাণ না-জানলেও বিক্রয় করা জায়েয হবে।[৭৯৭]

১৬৩. বারনামিজ (পণ্য-বিবরণী)-এর মাধ্যমে বিক্রয় করা

ফুকাহায়ে কেরাম 'বারনামিজ এর মাধ্যমে বিক্রয়' শীর্ষক এক প্রকারের বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন। 'برنامج' শব্দটি 'বা' বর্ণে যবর এবং 'মিম' বর্ণে জেরের মাধ্যমে পড়তে হবে। 'মিম' বর্ণে যবর পড়ার একটি মত রয়েছে। এ শব্দটি ফার্সি 'برنامه' শব্দের পরিবর্তিত রূপ। যার অর্থ প্যাক-করা পণ্যের গুণাগুণের বিবরণ-সম্বলিত বিবরণ। যেন ক্রেতা সেটি দেখে প্যাকেট খোলা ছাড়াই তা ক্রয় করতে পারে। পণ্য না-দেখে এবং কাপড়ের পরিমাণ জানা ছাড়াই ফুকাহায়ে কেরাম এ পদ্ধতির বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন। ইমাম মালেক (রহ.) 'মুয়াত্তা' কিতাবে এ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন। আল্লামা দারদির (রহ.) বলেছেন, প্রয়োজনের কারণে এমন বিক্রয়কে জায়েয বলা হয়েছে। আল্লামা দুসুকি (রহ.) তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

> أي لِما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويثه، ومؤنة شده، إن لم يرضه المشتري، فأقيمت الصفة مقام الرؤية.
>
> 'অর্থাৎ, প্যাকেট (বা গাট্টি) খোলার পর ক্রেতা তা নিতে রাজি না-হলে তা প্যাকেট করার ব্যয় ও পণ্যের একটি অন্যটির সঙ্গে মিশ্রণের কারণে বিক্রেতার ক্ষতি ও কষ্টের কারণে (তা জায়েয করা হয়েছে)। সুতরাং সেখানে বর্ণিত গুণাগুণকে দেখার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।'[৭৯৮]

---

৭৯৭. রাদ্দুল মুহতার, অধ্যায় : বিক্রয় : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১০৪, ফিকরাহ নং ২২৩১৪।

৭৯৮. আদ-দুসুকি আলাশ শারহিল কাবির, আল্লামা দারদির (রহ.), খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) অনুমান করে বিক্রয়ের আলোচনায় এ বিক্রয়কে জায়েয বলেছেন। তিনি বলেছেন–

> أرأيتم رجلا انتهى إلى رجل، ومعه عدل ثياب، فقال صاحب العدل: ما أدري كم فيه ثوبا، وإن فتحته فعددته، أضر ذلك بعدل، وقد هلك البرنامج، أما ينبغي أن يجوز بيع هذا أبدا حتى يفتح ويعد؟ فهذا جائز.

> 'আপনি এক্ষেত্রে কী বলেন, যেখানে কোনো ব্যক্তি এমন একজনের কাছে গেল, যার কাছে কাপড়ের প্যাকেট রয়েছে। প্যাকেটটির মালিক বলল, এখানে কয়টি কাপড় আছে তা জানি না, খুললে তা গণনা করে বলতে পারব। তবে খুললে প্যাকেটটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর বারনামিজটিও তো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্যাকেট খুলে গণনা করা ছাড়া কি কখনোই এ বিক্রয় জায়েয হওয়া উচিত? [ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন:] এটি জায়েয।'[৭৯৯]

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মতানুযায়ী এ পদ্ধতির বিক্রয় তখন আবশ্যক হবে, যখন পণ্য-বিবরণীতে বর্ণিত গুণাগুণ অনুযায়ী পণ্য পাওয়া যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেছেন, 'যে গুণাগুণ-সম্বলিত পণ্য-বিবরণীর ওপর নির্ভর করে বিক্রয় করা হয়েছে, যখন সে অনুযায়ী পণ্য পাওয়া যাবে, তখন বিক্রয় চূড়ান্ত হয়ে যাবে।' ফুকাহায়ে কেরাম যখন থেকে এটিকে জায়েয বলেছেন, তখন থেকেই তাঁরা এ বিষয়টি আবশ্যক করেছেন যে, পণ্য তার বর্ণিত মান অনুযায়ী হতে হবে। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি।[৮০০]

প্যাকেটের বারনামিজে যদি বর্ণিত গুণের পণ্য পাওয়া না-যায়, তা হলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা গ্রহণের ব্যাপারে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে। এ এখতিয়ারকে 'খিয়ারুল খুল্‌ফ' (বা অসঙ্গতি-সংক্রান্ত এখতিয়ার) বলা হয়। আর যদি বর্ণিত গুণ অনুযায়ী পণ্য পাওয়া যায়, তা হলে ক্রেতার কোনো এখতিয়ার থাকবে না। ইমাম মালেক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মতানুযায়ী তার জন্য বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করা আবশ্যক হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিক্রয়-সংক্রান্ত মাসআলার ওপর কিয়াসের ভিত্তিতে

---

৭৯৯. আল-হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদিনাহ, ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.), খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৩০।

৮০০. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: নমুনা দেখিয়ে বিক্রয় করা, আওজাযুল মাসালেক কিতাবের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩১৫-৩১৬।
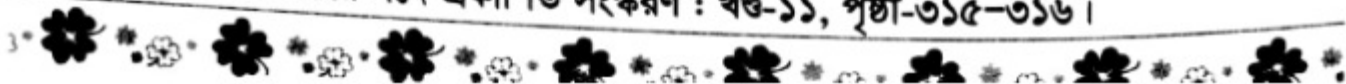
এক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য 'খিয়ারুর রুইয়াহ' (বা পণ্য দেখে নেওয়ার এখতিয়ার) থাকবে।

১৬৪. প্যাকেটজাত দ্রব্য বিক্রয় করা

এ আলোচনা অনুযায়ী আমাদের যুগে প্যাকেটজাত দ্রব্য বিক্রয়ের হুকুম জানা যায়। কারণ, সেখানে কাঙ্ক্ষিত পণ্য দেখা যায় না; বরং তার ওপরের লেখা অথবা বিক্রেতার মুখের কথার ওপর আস্থা রেখে ক্রেতা তা ক্রয় করে। অনুরূপভাবে কার্টনজাত পণ্য ক্রয়ের সময়ও তা দেখা যায় না। তবে তার ওপরে বিস্তারিত লেখা অথবা তার নাম ও ব্যাবসায়িক চিহ্ন দেখে তার প্রকৃতি ও গুণগত মান জানা যায়। সুতরাং তার হুকুম গাট্টির হুকুমের অনুরূপ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। ক্রেতা যদি প্যাকেট বা কার্টনের পণ্যতে তার মৌলিক গুণের বিপরীত পায়, তা হলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার জন্য সেটি গ্রহণের এখতিয়ার থাকবে। আর যদি বর্ণিত গুণাগুণ অনুযায়ী পায়, তা হলে মালেকি, হাম্বলি ও শাফেয়ি মাযহাবের এক মতানুযায়ী বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হবে। এটি মুহাম্মাদ বিন সিরিন, আইয়ুব, আম্বারি, ইসহাক ও আবু সাওর (রহ.)-এর মত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বক্তব্যের দাবি হলো, ক্রেতার জন্য তাতে 'খিয়ারে রুইয়াহ' (দেখে নেওয়া-সংক্রান্ত এখতিয়ার) থাকবে। এটি শাফেয়ি মাযহাবেরও একটি মত।[৮০১]

তবে প্যাকেটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে 'খিয়ারে রুইয়াহ' দেওয়া, বিশেষ করে উভয় পক্ষের সম্মতিনির্ভর গুণাগুণ প্রাপ্তির পর এই এখতিয়ার দিলে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, প্যাকেট খোলার পর সে অন্যের কাছে সেটি বিক্রয় করতে পারবে না, দ্বিতীয়বার সেটি প্যাকেটজাত যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং ইসলামি শরিয়তে এ-ধরনের অসুবিধা এড়িয়ে চলা হয়। অর্ডারকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে অর্ডারগ্রহীতা যদি তাদের মধ্যকার চুক্তির গুণাগুণ অনুযায়ী পণ্য প্রস্তুত করে, সেক্ষেত্রে খিয়ারে রুইয়াহ রহিত করে মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ-এর উলামায়ে কেরাম এমন ফতোয়া দিয়েছেন।[৮০২] সুতরাং অর্ডারের ক্ষেত্রে খিয়ারে রুইয়াহ রহিত করার পক্ষে মাজাল্লাতুল আহকামিল

---

৮০১. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), পরিচ্ছেদ: বিক্রয় সহিহ হওয়া : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৩।
৮০২. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ, ধারা নং ৩৯২, মুকাদ্দামাতুল মাজাল্লাহ-সহ।

আদলিয়্যাহ প্রণয়নকারী উলামায়ে কেরাম যে কারণ দর্শিয়েছেন, এ বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সেটি পূর্ণাঙ্গরূপে প্রযোজ্য হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। والله تعالى أعلم

১৬৫. অংশ বিক্রয় করা

পণ্যের মধ্যে অংশীদার থাকা তা নির্দিষ্ট হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক নয়। সুতরাং বাড়ি, জমি বা কোনো বস্তুর অংশবিশেষ বিক্রয় করা জায়েয। তবে তার জন্য শর্ত হলো, যে শরিক তার অংশ বিক্রয় করেনি, এ বিক্রয়ের কারণে তার কোনো ক্ষতি হতে পারবে না। চার মাযহাবের ইমামগণ এ সিদ্ধান্তে একমত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন–
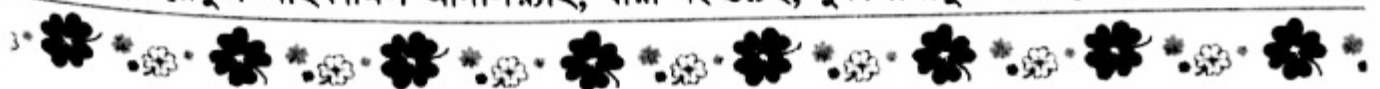
> يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين، كما مضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله الذي في صحيح مسلم: أيما رجل كان له شرك في عرض أو ربعة أو حائط، فلا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه.

> 'মুসলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো কিছুর অংশবিশেষ বিক্রয় করা জায়েয। এ ব্যাপারে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সহিহ মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, 'কোনো বস্তু, জমি বা দেয়ালে কারো শরিক থাকলে শরিকের অনুমতি ছাড়া তার জন্য ওই অংশ বিক্রয় করা হালাল না।'[৮০৩]

মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ-এর দুইশত পনেরো নম্বর ধারায় উল্লেখ আছে–

> يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك.

> 'শরিকের অনুমতি ছাড়া অংশীদারি জিনিসের নির্দিষ্ট অংশ বিক্রয় করা সহিহ।'

আল্লামা খালেদ আতাসি (রহ.) এ ধারার ব্যাখ্যায় বলেছেন–

> ثم إن هذه المادة ليست على إطلاقها، بل يستثنى منها فصلان: الأول:

৮০৩. মাজমুউল ফাতাওয়া : খণ্ড-২৯, পৃষ্ঠা-২৩৩।
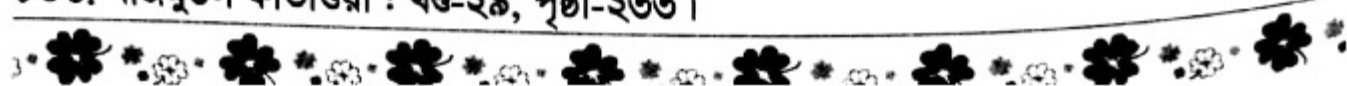
بيع أحد الشريكين حصته من مال مشترك بينهما بسبب الخلط، فإنه من الأجنبي لا يجوز إلا بإذن الشريك، وذلك بأن يخلط رجلان بفعلهما ماليهما، فيتعذر تمييز أحدهما عن الآخر، كحنطة بحنطة، أو جوز بجوز، أو لوز بلوز، أو يتعسر كحنطة بشعير، لأن كل حبة تكون مملوكة لأحدهما بجميع أجزائها ليس للآخر منها شيئ، فإذا باع نصيبه من غير الشريك، لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك، فيتوقف على إذنه، بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسلم والتسليم، ومثله الاختلاط بلا صنع من أحدهما، بأن انشق الكيسان، فاختلط ما فيهما، وهذا بخلاف ما إذا كان الخلط بفعل أحدهما بدون إذن الأخر، فإن الخالط يملك مال الأخر، ويكون مضمونا عليه بالمثل للتعدي، وبخلاف ما إذا كان الشريك بينهما ابتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثاها، فإن كل حبة تكون مشتركة بينهما، فبيع كل منهما نصيبه شائعا جائز، ولو من الأجنبي بلا إذن الشريك اهملخصا من الفتح والبحر والدر المختار وحواشيه.

'এ ধারাটি ব্যাপক নয়; বরং দুটি মাসআলা এর বাইরে থাকবে– ১. মাল সংমিশ্রণের কারণে এক শরিক কর্তৃক তার অংশ বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন হবে। কারণ, শরিকের অনুমতি ছাড়া তা অন্যের কাছে বিক্রয় করা জায়েয নেই। এর সুরত হলো, দুই ব্যক্তি তাদের মালকে এমনভাবে মেশালো যে, সেখান থেকে একজনের মাল অন্যের মাল থেকে ভিন্ন করা অসম্ভব হবে। যেমন, গমের সঙ্গে গম, আখরোটের সঙ্গে আখরোট, বাদামের সঙ্গে বাদাম অথবা ভিন্ন করা কঠিন হবে, যেমন, গমের সঙ্গে যব মিশানো। কেননা, তখন প্রত্যেকটি দানার সম্পূর্ণ অংশ তাদের কারো একজনের মালিকানা হয় এবং সেখানে অন্যের কোনো অধিকার নেই। সুতরাং একজন যখন শরিক ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রয় করবে, তখন শরিকের অংশমিশ্রিত পণ্য ছাড়া তাকে পণ্য হস্তান্তর করতে পারবে না। অতএব, শরিকের অনুমতির ওপর বিক্রয় মওকুফ থাকবে। তবে
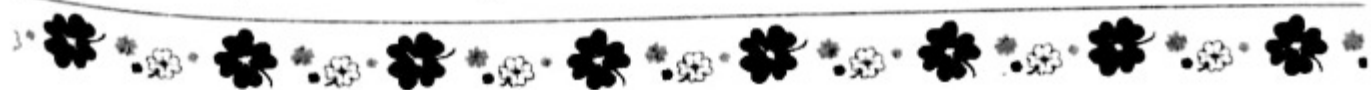
শরিকের কাছে বিক্রয়ের বিষয়টি এ হুকুমের বিপরীত। কারণ, সেখানে হস্তান্তর করতে ও গ্রহণ করতে সক্ষম। তাদের কারো কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া মিশ্রিত হওয়া জিনিসেরও অনুরূপ হুকুম। সেটি এভাবে যে, দুটি পাত্র ফেটে গিয়ে তার ভেতরের জিনিস মিশে গেল। আর অপর পক্ষের অনুমতি ছাড়া শুধু একপক্ষ থেকে মিশ্রণ করার বিষয়টি এ হুকুমের বিপরীত। কেননা, মিশ্রণকারী অন্যের মালের মালিক হবে এবং তার সীমালঙ্ঘনের কারণে ওই পণ্যের ন্যায্যমূল্যের জরিমানা দিতে হবে। শুরুতে অংশীদারিত্ব হওয়া বস্তুর হুকুমও এ হুকুমের বিপরীত। সেটি এভাবে যে, দুজন গম ক্রয় করেছে বা তারা মিরাসসূত্রে পেয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দানা উভয়ের অংশে হবে। অতএব, প্রত্যেকের অংশ বিক্রয় করা জায়েয। এমনকি শরিকের অনুমতি ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রয় করলেও জায়েয হবে। 'ফাতহুল কাদির', 'আল-বাহরুর রায়েক', 'আদ-দুররুল মুখতার' ও এর হাশিয়া হতে উদ্ধৃত।'[৮০৪]

ফুকাহায়ে কেরাম সবিস্তারে অংশীদারি জিনিস বিক্রয়ের মাসআলার আলোচনা করেছেন। এমনকি ফিকহে ইসলামিতে এটি জটিল মাসআলাসমূহের অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। আল্লামা আতাসি (রহ.) এ সম্পর্কে অনেক মাসআলা আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী সেগুলোর মূল ইল্লত হলো, বিক্রেতা, ক্রেতা বা শরিকের ক্ষতি হওয়া। ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য হতে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে এ বিষয়টি জানা যায়। এ ইল্লত অনুযায়ী যেখানে ক্ষতিমুক্ত হবে, সেখানে অংশীদারি জিনিস বিক্রয় করা জায়েয হবে। আর যেখানে ক্ষতি থাকবে, সেখানে জায়েয হবে না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে 'শারহুল মাজাল্লাহ' দেখুন।

১৬৬. জমির অনির্দিষ্ট অংশ বিক্রয় করা

অনেক সময় গজ বা মিটার হিসাবে জমির অংশ বিক্রয় করার পর তা নির্ধারণের বিষয়টি ভবিষ্যতের ওপর মওকুফ রাখা হয়। সাধারণত রিয়েল এস্টেট কোম্পানির ক্ষেত্রে এমন হয়ে থাকে। তারা বড় জমি ক্রয় করে গজ ও মিটার হিসাবে সাধারণের কাছে বিক্রয় করে। উদাহরণস্বরূপ, তার প্রত্যেকটি অংশ পাঁচশত মিটার। তবে ক্রয়ের সময় ওই পাঁচশত মিটার নির্দিষ্ট করা হয়

৮০৪. শারহুল মাজাল্লাহ, আল্লামা খালেদ আতাসি (রহ.), খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৯।

না; বরং পরবর্তী সময়ে কোম্পানির প্রস্তাব অনুযায়ী তা নির্দিষ্ট করা হয়। সুতরাং প্রশ্ন হলো, বড় জমির অংশবিশেষ হওয়া সত্ত্বেও এ প্রক্রিয়ায় বিক্রয় করা সহিহ কি না? আর যে ব্যক্তি এমন জমি ক্রয় করবে, তার জন্য সেটি অন্য কারো কাছে বিক্রয় করা জায়েয কি না?

হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণিত যে-মাসআলা হতে এ মাসআলার হুকুম জানা যায় তা হলো, কোনো বাড়ির অনির্দিষ্ট দশ গজ পরিমাণ জমি বিক্রয় করলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী তা ফাসেদ হবে। কারণ, পণ্যের পরিমাণ অনির্দিষ্ট। কেননা, উৎকৃষ্ট হওয়ার দিক থেকে বাড়ির বিভিন্ন অংশ ভিন্ন হয়, তাই পণ্য নির্ধারণে বিবাদ হবে। সাহেবাইন (রহ.) বলেছেন, বাড়ির অংশ বিক্রয় হিসাবে এ বিক্রয় জায়েয। কারণ, অংশ বিক্রয় করা জায়েয। অনেক ফকিহ তাঁদের এ মতের এমন ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁদের মতানুযায়ী বাড়ির মোট পরিমাণ জানার শর্তে অংশ বিক্রয় করা জায়েয। তবে অন্যরা বলেছেন, তাঁদের জায়েযের মত শুধু বর্ণিত পদ্ধতির সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়; বরং সহিহ ব্যাখ্যা হলো, বাড়ির মোট পরিমাণ না-জানলেও তাদের মতানুযায়ী বিক্রয় সহিহ হবে। কেননা, ক্রেতা-বিক্রেতার হাতেই এ বিবাদ নিরসনের ক্ষমতা রয়েছে।[৮০৫]

এ আলোচনা অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমতে জমির অনেক অংশের অনির্দিষ্ট অংশ বিক্রয় করা জায়েয নেই। সাহেবাইন (রহ.)-এর অভিমতে জায়েয আছে। তবে স্পষ্ট কথা হলো, নির্দিষ্ট করার অস্পষ্টতা যদি বিবাদ আবশ্যক করে, সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত গ্রহণ করা উত্তম। আর বিবাদ আবশ্যক না-হলে সাহেবাইন (রহ.)-এর মতই গ্রহণ করা উত্তম।

মোট পরিমাণ জানা গেলে সেক্ষেত্রে শাফেয়ি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মত সাহেবাইন (রহ.)-এর মতের অনুরূপ। কারণ, যেসব পণ্যের এককে পরিবর্তন হয় না, সেগুলো বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের একটি মত হলো, স্তূপ থেকে যদি এক কফিয পরিমাণ ক্রয় করা হয়, তা হলে স্তূপের অংশবিশেষের ক্ষেত্রে ক্রয় সাব্যস্ত হবে। যেমন, গম। আল্লামা জালালুদ্দিন মাহাল্লি (রহ.) 'শারহুল মিনহাজ' কিতাবে বলেছেন–

---

৮০৫. আল-বাহরুর রায়েক, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: বাড়ি বিক্রয় করলে কামরা ও চাবি বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হবে : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৮৭-৪৮৮।
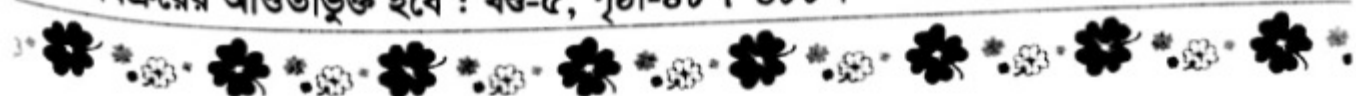
يصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها للمتعاقدين، وينزل على الإشاعة، فإذا علما أنها عشرة آصع، فالمبيع عشرها، فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع.

'ক্রেতা-বিক্রেতা মোট 'সা'র পরিমাণ জানলে সেখান থেকে এক 'সা' বিক্রয় করা সহিহ এবং এটিকে অংশ বিক্রয়ের মতো সাব্যস্ত করতে হবে। তারা যখন জানবে যে, সেখানে দশ 'সা' রয়েছে, তখন পণ্য হবে তার একভাগ। সুতরাং যদি তার কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে ক্রয়কৃত পণ্যের অংশবিশেষ নষ্ট হবে।'[৮০৬]

তবে জমির বিভিন্ন অংশকে কি সেসব জিনিসের আওতাভুক্ত করা হবে, যার এককে পার্থক্য হয় না? এ ব্যাপারে নানা মত রয়েছে। তবে স্পষ্ট কথা হলো, বর্ণিত পদ্ধতিতে যখন জমির কোনো অংশ বিক্রয় করা হয়, তখন তার অবস্থান অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হয়। কারণ, প্রধান সড়কের পাশের জমির অংশের মূল্য অন্য জমি অপেক্ষা ভিন্ন হয়। অনুরূপভাবে যে জমি সম্পূর্ণ জমির এক পার্শ্বে থাকে, ভেতরের জমি অপেক্ষা তার মূল্য বেশি হয়। সুতরাং যদি এ প্রক্রিয়ায় জমির স্থান ও মূল্য নির্ধারিত হয়, তা হলে সে জমিকে এককে ভিন্ন না এমন জিনিসের আওতাভুক্ত করতে হবে। শাফেয়ি মাযহাব ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতানুযায়ী তা বিক্রয় করা জায়েয। অনুরূপভাবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতানুযায়ী এমন জমির ক্রেতার জন্য অন্যের কাছে সেটি বিক্রয় করা জায়েয হবে। কারণ, কব্জা করার আগে জমি বিক্রয় করা জায়েয। والله تعالى أعلم

১৬৭. কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করা

অংশ বিক্রয়ের প্রকারসমূহের একটি হলো, জয়েন্ট স্টক কোম্পানির (Joint stock Companies) শেয়ার বিক্রয় করা। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো, কোম্পানির উদ্যোক্তারা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন পাওয়ার পর একটি প্রজ্ঞাপন (Prospectus) জারি করে। সেখানে তাদের প্রস্তাবিত কোম্পানির উদ্দেশ্য ও যে ধরনের ব্যবসা করতে আগ্রহী তার বিবরণ থাকে।

---

৮০৬. শারহুল মিনহাজ, আল্লামা মাহাল্লি (রহ.), কালয়ুবি ও উমাইরাহ (রহ.)-এর ব্যাখ্যাসহ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬১।

এ প্রজ্ঞাপন জনগণকে কোম্পানি গঠনে অংশ নিতে আহ্বান করে। তাদের অংশ গ্রহণের প্রক্রিয়াটি হলো, কোম্পানির মূলধনকে একক ইউনিটে ভাগ করে এবং প্রত্যেকটি ইউনিটের একটি নির্দিষ্ট মূল্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ, দশ রিয়াল। যেমন কোনো কোম্পানির ইস্যুকৃত মূলধন (Issued Capital) দশ মিলিয়ন হলে তারা এক মিলিয়ন শেয়ার ইস্যু করবে। শেয়ার ক্রয়ে আগ্রহীরা যে কোনো মূল্যের শেয়ারের আবেদন করতে পারবে। প্রস্তাবিত মূলধন অপেক্ষা যদি শেয়ারের আবেদন বেশি হয়, তা হলে লটারি বা পরিমাণ অনুপাতে তাদের মধ্যে শেয়ার বণ্টন করা হয়, ফলে কেউ এক হাজার শেয়ার পায়, আবার কেউ দুই হাজার শেয়ার পায়। এভাবে শেয়ার বণ্টনের প্রক্রিয়া শেষ করা হয়। শেয়ার ক্রয়ে আগ্রহীদের এ কার্যক্রমকে সাবস্ক্রিপশন বলা হয়। সাবস্ক্রিপশনের জন্য যার আবেদন গ্রহণ করা হয়, তাকে একটি প্রমাণপত্র দেওয়া হয়, যা এটি প্রমাণ করে যে, তার বাহক এ কোম্পানির অংশীদার।[৮০৭] আর প্রত্যেক শেয়ারপত্র বাহককে কোম্পানির বাৎসরিক সভার (A.G.M) একজন সদস্য সাব্যস্ত করা হয়। কোম্পানির মৌলিক সিদ্ধান্ত এবং তার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ, পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন ও অন্যান্য ব্যাপারে এ সভাকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়।

এরপর কোম্পানি যদি লাভবান হয়, তা হলে সেখান থেকে রিজার্ভ ফান্ডে নির্দিষ্ট অংশ রাখার পর অবশিষ্ট লভ্যাংশ পরিমাণ অনুপাতে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার অন্যের কাছে তার শেয়ার বিক্রয় করে তার স্থানে ক্রেতাকে শেয়ার ও তার অধিকার সম্পৃক্ত স্বত্বের মালিক বানাতে পারে। যে বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাকে স্টক এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange) বলে।

শেয়ারের ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সমকালীন উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। অনেকের মত হলো, শেয়ার কোম্পানির সম্পদের অংশ-বিশেষের প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং এগুলো আর্থিক প্রমাণপত্র, যা কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে। কোম্পানি গঠনের সময় তার মূলধনের অংশবিশেষের প্রতিনিধিত্ব করে না। সুতরাং এটি কোম্পানির বিদ্যমান সম্পদের মূল্যের মোকাবেলায় প্রমাণপত্র হিসাবে পরিগণিত

---

৮০৭. অনেক ক্ষেত্রে শেয়ারের বিপরীতে কোনো কাগজ বা প্রমাণপত্র দেওয়া হয় না; বরং তার কাছে থাকা হিসাবে ওই নাম রেজিস্ট্রেশন করা হয়। পরিভাষায় যেটিকে 'CDC' বলে।

হবে।[৮০৮] তাঁদের এই বিশ্লেষণের কারণ হলো, শেয়ার হোল্ডারদের এমন ক্ষমতা নেই যে, সরাসরি কোম্পানির অ্যাসেটে হস্তক্ষেপ করবে। আর শেয়ার বিক্রয় করা ছাড়া কোম্পানি থেকে বের হওয়ারও সুযোগ নেই। এ মতানুযায়ী শেয়ার যেহেতু অর্থের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তা কোম্পানির সম্পদের অংশবিশেষ না, তাই তার ওপর টাকা বিক্রয়ের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

তবে সমকালীন অধিকাংশ আলেমের মত হলো, তারা শেয়ারকে কোম্পানির সম্পদের অংশবিশেষের প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেন। এ মতটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কারণ, প্রচলন অনুযায়ী শেয়ার হোল্ডারদেরকে কোম্পানির মালিক সাব্যস্ত করা হয়। তারা কোম্পানির লভ্যাংশ পায় এবং লস হলে তার দায়ভার বহন করে। কোম্পানির অবসান হলে তারা তার বিদ্যমান সম্পদের মালিক হয়। আর তারা সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে না পারার বিষয়টি হলো, সমষ্টি সম্পদের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের অংশবিশেষ মালিকানা রয়েছে। সুতরাং কারো জন্য অংশীদারি জিনিসের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। আর প্রত্যেক শরিক অংশগ্রহণের সময় এ শর্তে একমত হয়েছে যে, সাধারণ সভায় নির্বাচিত পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানির সম্পদের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব, শেয়ার বিক্রয় করার অর্থ হলো, কোম্পানির সম্পদের অংশবিশেষ বিক্রয় করা এবং তার ক্ষেত্রে অংশবিশেষ বিক্রয়ের হুকুম প্রযোজ্য হবে। মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি-এর সিদ্ধান্তে এমনটি বলা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ–

> أن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة.
>
> 'শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির মূল ক্ষেত্রটি হলো কোম্পানির মূলধনের অংশবিশেষ। আর শেয়ারপত্র ওই অংশের মালিকানার প্রমাণ।'[৮০৯]

সমকালীন অনেক আলেম কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়কে না-জায়েয বলেছেন।

---

৮০৮. তকিউদ্দিন নাবহানি রহ.-এর রচিত 'নিযামুল ইকতেসাদ ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা-১৭৩, দারুল উম্মাহ।

৮০৯. ১৪১২ হিজরি সনের জিলকদ মাসে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামির সপ্তম অধিবেশনের ৬৩ নম্বর সিদ্ধান্ত, ফিকরাহ নং ৫।
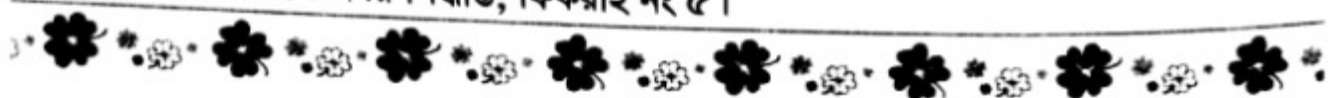
কারণ, তার ক্রেতা জানে না যে, একটি শেয়ার কোম্পানির কী পরিমাণ সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করছে; বরং অনেক সময় তার প্রকারও জানে না। আর এ অস্পষ্টতা অত্যধিক হওয়ায় তা বিক্রয়কে ফাসেদ করবে। যারা শেয়ার বিক্রয় জায়েয বলেছেন, তারা এ দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয বলেছেন যে, কোম্পানির বাজেট ও আর্থিক বিবরণে তার সম্পদ উল্লেখ থাকে। সুতরাং শেয়ার ক্রয়ের জন্য সম্পদ সম্পর্কে এ সংক্ষিপ্ত জ্ঞান যথেষ্ট। আর বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য বিস্তারিত জানা শর্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, এ ঘরে যা কিছু আছে, তা বিক্রয় করলাম, এমন বিক্রয় জায়েয আছে। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ ব্যাখ্যাটি বেশি স্পষ্ট।

হিন্দুস্তানের অনেক আলেম শেয়ার বিক্রয় জায়েয বলেও ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন– শাইখ আশরাফ আলি থানবি (রহ.)।[৮১০]

তবে বিক্রয়ের অন্য সব শর্তের সঙ্গে এ জায়েযের হুকুম সম্পৃক্ত। সুতরাং এখনো পর্যন্ত যদি কোনো কোম্পানি অস্তিত্বে না-আসে এবং তার সম্পদ তরল হিসাবে থাকে, তা হলে ওই কোম্পানির শেয়ার তার তরল অর্থ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে না। এ অবস্থায় যদি নগদ টাকায় শেয়ার বিক্রয় করা হয়, তা হলে তার গায়ের মূল্যের চেয়ে কম-বেশিতে বিক্রয় করা জায়েয নেই। কেননা, কম-বেশি করলে সুদ হবে। অনুরূপভাবে কোম্পানিটি যদি হারাম জিনিসের ব্যবসা করে, তা হলে তার শেয়ার লেনদেন করা হারাম। উদাহরণস্বরূপ, এমন কোম্পানি যা মদ বা শূকরের কারবার করে অথবা কোনো সুদি ব্যাংকের শেয়ার।

যদি কোম্পানির মৌলিক কার্যক্রম হালাল হয়, তবে সুদি ব্যাংকে তার অর্থ জমা রাখে এবং কখনো-কখনো সুদি ঋণ নেয়, তা হলে এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সমকালীন ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। একদল বলেছেন, এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা জায়েয নেই। কারণ, শেয়ার হোল্ডার এসব হারাম কার্যক্রমে অংশীদার হচ্ছে। সুতরাং এটি এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের মতো হলো, যার মৌলিক ব্যবসায়ী কার্যক্রম হারাম। অন্য কতক আলেম বলেছেন, প্রাপ্য অর্থ সুদি ব্যাংকে জমা রাখা তার ব্যবসায়ী কার্যক্রমের বাইরের বিষয়। সুতরাং মূল কার্যক্রমে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, তার

---

৮১০. ইমদাদুল ফাতাওয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৮৬–৫০৫।
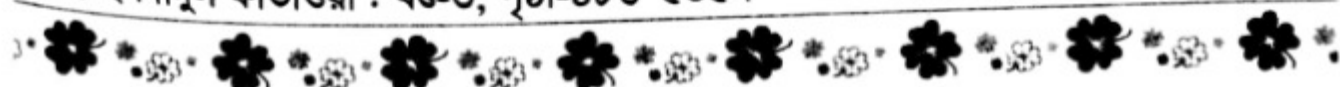
মৌলিক কার্যক্রম অপেক্ষা বর্ণিত সুদি কার্যক্রম কম হতে হবে। জায়েয হওয়ার প্রবক্তাদের অধিকাংশ এটির পরিমাণ এভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, কোম্পানির মোট সম্পদের মূল্যের শতকরা ত্রিশ পার্সেন্টের কম অর্থ ব্যাংকে রাখবে। আর সেখান থেকে প্রাপ্য অর্থ কোম্পানির মোট লাভের শতকরা পাঁচ পার্সেন্টের কম হতে হবে। তারা আরও বলেছেন, শেয়ার হোল্ডারকে বাৎসরিক সভায় সুদভিত্তিক ঋণ দেওয়া-নেওয়ার বিপক্ষে দাবি জানাতে হবে। কিন্তু বিরোধী পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে যখন তার দাবি প্রত্যাখ্যাত হবে এবং কোম্পানির লাভের মধ্যে হারাম পন্থায় উপার্জিত অর্থ চলে আসবে, তখন ব্যাংকে অর্থ রাখার কারণে যে পরিমাণ লাভ হয়েছে, তার প্রাপ্য লাভ থেকে ওই পরিমাণ সদকা করে তাকে হারাম মুক্ত হতে হবে।

সুদি ঋণ নেওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং এ কারণে তার কর্তা গোনাহগার হবে। তবে ঋণ নেওয়া অর্থ তার মালিকানা ও দায়িত্বে চলে আসবে। সুতরাং ওই অর্থ থেকে উপার্জিত অর্থ হারাম হবে না। আর শেয়ার হোল্ডারের ওপর ওয়াজিব হলো, বাৎসরিক সভায় সুদি কার্যক্রমের বিপক্ষে দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদকে তার অনুমতি দেবে না। তারা যদি হারাম কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে, তা হলে উদ্দেশ্য সাধিত হলো। আর যদি বিরত না-হয়, তা হলে তাদের কার্যক্রমকে এ শেয়ার হোল্ডারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে না। কেননা, এ দিক থেকে প্রাইভেট ও পাবলিক কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যে, শেয়ারভিত্তিক পাবলিক কোম্পানিগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাইভেট কোম্পানির মতো সব অংশীদারের মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। অতএব, যে শেয়ার হোল্ডার হারাম কার্যক্রম অস্বীকার করেছে, কোম্পানির গৃহীত সিদ্ধান্তকে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে না। আমাদের শাইখ আশরাফ আলি থানবি (রহ.)-এর মত এ মতেরই অনুকূল বলে প্রতীয়মান হয়।[৮১১] والله تعالى أعلم

তারপর যদি কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা জায়েয হয়, তা হলে সেখানে বিক্রয় জায়েয ও সহিহ হওয়ার সব শরয়ি শর্ত প্রযোজ্য হবে। এ কারণে কারো জন্য এমন করা জায়েয নেই যে, শেয়ারের মালিক হওয়ার আগেই তা বিক্রয় করবে। স্টক এক্সচেঞ্জে এমন লেনদেনের প্রচলন রয়েছে। কেননা, মানুষ শেয়ারের মালিক হওয়ার আগে তা বিক্রয় করে। এমন বিক্রয়কে সর্ট

---

৮১১. ইমদাদুল ফাতাওয়া : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯১।
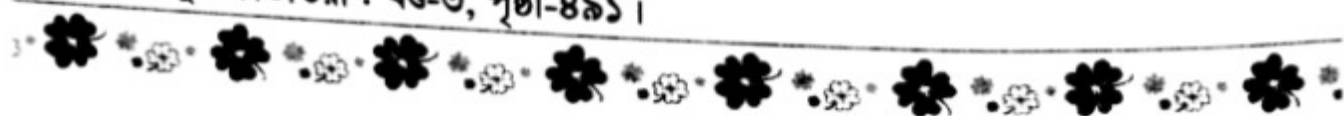
সেল (Short Sale) বলে। শরয়ি দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে এটি না-জায়েয। অনুরূপভাবে শেয়ার বিক্রয়ের আগে তা বিক্রেতার কব্জায় থাকা ওয়াজিব। ভবিষ্যতের কোনো তারিখের বিক্রয় হতে পারবে না। তা ছাড়া সুদের মতো অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয় সম্পৃক্ত হতে পারবে না।

স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার বিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি রয়েছে– ১. ফরওয়ার্ড সেল (Forward Sale), ২. স্পট সেল (Spot Sales)। সামান্য ব্যাখ্যার সঙ্গে উভয় প্রকার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ।

১৬৮. ফরওয়ার্ড সেল (Forward Sales)

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন বিক্রয় যা ভবিষ্যতের কোনো তারিখের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। অর্থাৎ, বিক্রয়চুক্তির দিন বিক্রেতা এমন চুক্তি করে যে, ভবিষ্যতের অমুক তারিখে নির্দিষ্ট কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করছে। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিক্রয়চুক্তিটি না-জায়েয হওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে :

১. ভবিষ্যতের তারিখের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বিক্রয় করা হচ্ছে। (মূলচুক্তি সম্পর্কিত বিক্রয়ের শর্তসমূহে) সামনে বলা হবে যে, শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে বাইয়ে সালাম ছাড়া অন্য সব বিক্রয়ে এ পদ্ধতি না-জায়েয। এ পদ্ধতিতে শেয়ার বিক্রয় করলে সেখানে বাইয়ে সালামের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না।

২. এ পদ্ধতিতে বিক্রয় করলে উভয় বিনিময় বাকি হওয়া ও বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রয় করা হয়ে যায়। কেননা, সাধারণত চুক্তির সময় মূল্য পরিশোধ করা হয় না; বরং চুক্তিকৃত তারিখে মূল্য পরিশোধ করা হয়।

৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের চুক্তির সময় পণ্য বিক্রেতার মালিকানায় থাকে না। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পণ্য হস্তান্তর করা ও বুঝে নেওয়া আসল উদ্দেশ্য থাকে না; বরং বাজার দরের মধ্যে সমন্বয় করে চুক্তি নিষ্পত্তি করা হয়। এটি ফটকা ও জুয়ার একটি প্রকারমাত্র।

অনেকে এ বিক্রয়কে আবশ্যকীয় ওয়াদা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তবে সেটি সহিহ নয়। কেননা, ইতঃপূর্বে ওয়াদার আলোচনায় বলেছি, ওয়াদার একটি মূলনীতি হলো, বিচারিক দিক থেকে তা আবশ্যক না-হওয়া। তবে কখনো-কখনো জনস্বার্থে বা ব্যাপক সমস্যা প্রতিহত করতে বিচারিক দিক থেকে তা আবশ্যক সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু এখানে তার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, শেয়ারের ফরওয়ার্ড সেল এমন একটি বিষয়, প্রকৃত ব্যবসায় যার কোনো

প্রয়োজন নেই; ধারণা-নির্ভর হয়ে তা ফটকার (speculation) দরজা খুলে দেয়। অর্থনীতিতে এর ক্ষতিকর হওয়ার বিষয়টি এত স্পষ্ট, যা দলিল দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না।[৮১২]
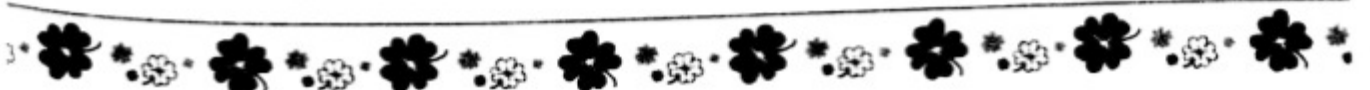
১৬৯. স্পট সেল (Spot Sales)

স্পট সেলের ক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রচলিত নিয়ম হলো, বিক্রয়চুক্তি করার সময় স্টক এক্সচেঞ্জের কম্পিউটারে তার প্রমাণস্বরূপ রেজিস্ট্রেশন করা হয়। ক্রেতা-বিক্রেতার দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে স্টক এক্সচেঞ্জ দায়ভার গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিক্রেতা পণ্য হস্তান্তর করে এবং ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করে। বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে এ সময়ের পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে। অনেক স্টক এক্সচেঞ্জে বিক্রয়ের দিনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এটি সম্পন্ন করা হয়। আবার কোনোটিতে একদিন, দুইদিন অথবা তিনদিনের মধ্যে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সাধারণত তিনদিনের বেশি সময় লাগে না। এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জের পক্ষ থেকে হস্তান্তর তথা ডেলিভারি (Delivery) এবং মূল্য পরিশোধ সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, ক্রেতা বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে। আর শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্য হলো, যে কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেছে, ওই কোম্পানির রেজিস্টারে ক্রেতার নাম লেখা হয়। এ কার্যক্রমে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে যেগুলো পর্যালোচনা করা একান্ত জরুরি।

১. এ পদ্ধতিতে শেয়ার বিক্রয় করলে চুক্তির সময় হস্তান্তর করা ও বুঝে নেওয়া হয় না। কারণ, অনেক সময় বিক্রেতা এমন শেয়ার বিক্রয় করে, যা তার মালিকানায় নেই। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, শরয়ি দৃষ্টিতে এমন বিক্রয় জায়েয নেই।

২. বিক্রয়চুক্তি করার সময় বিক্রয়কৃত শেয়ার যদিও বিক্রেতার মালিকানায় থাকে, তবে চুক্তির সময় হস্তান্তর করা ও বুঝে নেওয়া হয় না। সুতরাং এটিকে উভয় বিনিময় বাকি হিসাবে সাব্যস্ত করা যাবে কি না? এ প্রশ্নের

---

৮১২. আমার 'Present Financial Crisis: causes and remedies from Islamic perspective' নামক ইংরেজি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আরবি ভাষায় 'أسباب الأزمة المالية وعلاجها في ضوء الشريعة الإسلامية' নামে প্রকাশিত হয়েছে। (বাংলা ভাষায় 'বিশ্বের অর্থ সঙ্কট ও ইসলামি দর্শন' নামে ফিকহি মাকালাত সিরিজের অনুবাদে সেটি প্রকাশিত হয়েছে –অনুবাদক)
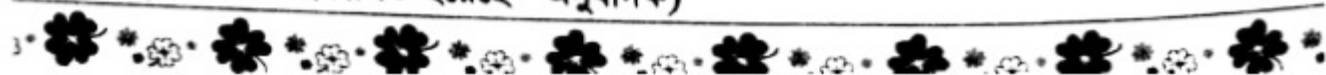
উত্তর হলো, এটি উভয় বিনিময় বাকির আওতাভুক্ত না। কারণ, এ অর্থে নগদ বিক্রয় হচ্ছে যে, চুক্তি সম্পন্ন করামাত্র শেয়ারের মালিকানা ক্রেতার কাছে চলে যাবে। আর বিক্রেতার জন্য তৎক্ষণাৎ মূল্য দাবি করার অধিকার থাকে। তবে আনুষঙ্গিক কিছু কারণে হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হচ্ছে। এটি মূল্য আদায়ের জন্য বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য আটকিয়ে রাখার মতো। কেননা, এটি নগদ বিক্রয়, তবে অন্য কারণে হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে।

৩. সুদি স্টক এক্সচেঞ্জে যে প্রক্রিয়া জারি রয়েছে তা হলো, ক্রেতা শেয়ার ক্রয়ের চুক্তি করার পর তার ডেলিভারি পাওয়ার আগে তৃতীয় কারো কাছে তা বিক্রয় করে দেয়। সুতরাং এটিকে কি কব্জার আগে বিক্রয় সাব্যস্ত করা হবে, ফলে তা না-জায়েয হবে? অনেক সময় মনে হয়, এটি কব্জা করার আগে বিক্রয় নয়। কারণ, কব্জার উদ্দেশ্য হলো, ক্রেতার কাছে পণ্যের অধিকার ও আবশ্যকীয় বিষয় চলে আসা এবং পণ্যটি তার জামানতভুক্ত হওয়া। আর প্রথম বিক্রয়ের মাধ্যমেই এ বিষয়গুলো পাওয়া যায়। সেটি এভাবে যে, স্টক এক্সচেঞ্জের কম্পিউটারে তার নাম রেজিস্ট্রেশন করা হয়। স্টক এক্সচেঞ্জের দায়িত্বশীলগণ এমন মত দিয়েছেন। আর পণ্য হস্তান্তরের যে সময় দেওয়া হয়, তা কেবল ক্রেতার নামে রেজিস্ট্রি করার সময়মাত্র। ক্রেতার নামে পণ্য রেজিস্ট্রি করতে বিলম্বিত হওয়া কব্জা সম্পন্ন হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। যেমন, কেউ গাড়ি ক্রয় করে তা কব্জা করে, তবে আইন অনুযায়ী তার নামে রেজিস্ট্রেশন হতে সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এ রেজিস্ট্রি করার ওপর কব্জা মওকুফ থাকবে না; বরং রেজিস্ট্রি ছাড়াই কব্জা সম্পন্ন হবে। অনুরূপভাবে হস্তান্তরের নির্দিষ্ট তারিখে রেজিস্ট্রি হওয়ার আগেই শেয়ারের কব্জা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

স্টক এক্সচেঞ্জের নিয়মনীতি পর্যবেক্ষণ করার পর জানা যায় যে, প্রকৃত অর্থে চুক্তির সময় ক্রেতার কাছে শুধু শেয়ারের মালিকানা যায়। আর হস্তান্তরের তারিখের আগে তার কব্জা পাওয়া যায় না। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এটি প্রমাণ করে :

১. ফিকহি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক জিনিসের প্রচলন অনুযায়ী তার কব্জা হয়। আর স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সেখানে লেনদেনকারীদের নিয়ম হলো, ওয়াদাকৃত নির্দিষ্ট তারিখে বাস্তবে হস্তান্তর করা ছাড়া তারা ক্রেতার কাছে শেয়ার হস্তান্তর হিসাবে বিবেচনা করে না। এ হস্তান্তরকে তারা
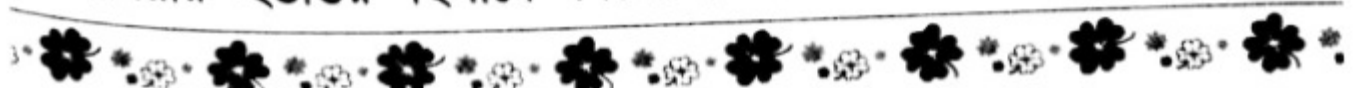
ডেলিভারি নামে অভিহিত করে। এ পরিভাষার মধ্যে স্পষ্ট রয়েছে যে, ভবিষ্যতের ওই তারিখেই ক্রেতা শেয়ার বুঝে পাবে, তার আগে পাবে না। আর হস্তান্তরটিই কব্জা হিসাবে সাব্যস্ত হবে।

২. ইতঃপূর্বের আলোচনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোম্পানির শেয়ার ওই কোম্পানির সব সম্পদের অংশবিশেষের প্রতিনিধিত্ব করে। আর কোনো জিনিসের অংশ বিক্রয় করা জায়েয এবং তা 'তাখলিয়া'[৮১৩] (নিষ্কণ্টক করা)-এর মাধ্যমে কব্জা সম্পন্ন হয়।[৮১৪] সেটি এভাবে যে, ক্রেতা নিজ ইচ্ছা মতো তা হতে উপকৃত হতে ও সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। আর শেয়ার ক্রেতাকে নির্দিষ্ট তারিখে হস্তান্তর করার আগে তার এ ক্ষমতা অর্জন হয় না। কারণ, হস্তান্তরের আগে তাকে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হিসাবে সাব্যস্ত করা হয় না। এ কারণে হস্তান্তরের আগে বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হলে ক্রেতা সেখানে দাবি উত্থাপন করতে পারে না। কারণ, এখনো পর্যন্ত কোম্পানি স্বীকার করেনি যে, সে তার শেয়ার হোল্ডার। অনুরূপভাবে এ সময়ের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হলে আগের মালিকের নামে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। যদিও মালিকানা পরিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী সে মালিক ক্রেতাকে লভ্যাংশ দিয়ে দেয়।

৩. স্টক এক্সচেঞ্জের নীতিতে রয়েছে যে, বিক্রেতা যদি নির্দিষ্ট তারিখে শেয়ার হস্তান্তর না-করে, তা হলে ক্রেতা বাজার থেকে ওই শেয়ার ক্রয় করতে পারবে। এ প্রক্রিয়াকে 'Buy In' নামে অভিহিত করা হয়। এক্ষেত্রে ক্রেতা যদি আগের বিক্রেতার সঙ্গে চুক্তিকৃত মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে শেয়ার ক্রয়ে বাধ্য হয়, তা হলে বিক্রেতা উভয় মূল্যের মধ্যকার ক্ষতিপূরণ দেবে।[৮১৫] এটি স্পষ্ট দলিল যে, হস্তান্তরের তারিখের আগে ক্রেতা শেয়ার কব্জা করে না। অন্যথায় বিক্রেতার পক্ষ থেকে হস্তান্তর না-করার কোনো সম্ভাবনা থাকত না। কেননা, কেবল দুই অবস্থায় বিক্রেতা হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়। ১. হয়তো তার

---

৮১৩. তাখলিয়া বা খালি করা : কোনো পণ্য বিক্রয়ের পর বিক্রেতা কর্তৃক সেই পণ্যকে মুক্ত করে দেওয়া, যাতে সহজেই ক্রেতা পণ্যটি নিজের আয়ত্তে নিতে পারে। –সম্পাদক

৮১৪. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.), অধ্যায় : ইজারা : খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৪৬। হেদায়া, অধ্যায়: ইজারা, ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪১।

৮১৫. Rules For Ready Delivery Contracts, Karachi Stock Exchange, clause. 1 (b) & (c)
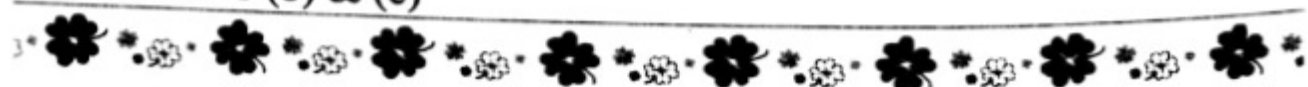
মালিকানাহীন জিনিস বিক্রয় করেছে, আর হস্তান্তরের সময়ও তা মালিকানায় আনতে সক্ষম হয়নি। এ অবস্থায় বিক্রয় বাতিল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ২. বিক্রয়ের সময় শেয়ারের মালিক ছিল, তবে হস্তান্তরের সময় তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়েছে এবং তৃতীয় কারো কাছে বিক্রয় করতে চাচ্ছে। এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে শেয়ার দেয়নি। অন্যথায় তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা এবং অন্যের কাছে বিক্রয়ের ইচ্ছা করার সুযোগ থাকত না। আর ক্রেতা কর্তৃক বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়ের প্রয়োজন হতো না। সুতরাং এসব দিক থেকে স্পষ্ট হয় যে, ক্রেতা শেয়ার কব্জা করলে সেটি হস্তান্তরযোগ্য কব্জা হয় না।

শুধুমাত্র বিক্রয়চুক্তি হলেই ক্রেতা শেয়ারের দায়ভার ও তার অধিকারের মালিক হওয়া সম্পর্কে যে কথা বলা হয়, তা সহিহ নয়। পূর্বে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছি। এ-কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, শেয়ার হস্তান্তরের আগে যদি তার মূল্য কমে যায়, তা হলে ক্রেতা সে ক্ষতির দায়ভার বহন করবে। আর যদি বেড়ে যায়, তা হলে ক্রেতাই তা ভোগ করবে, বিক্রেতা লাভ পাবে না। শুধু এ বিষয়টি শেয়ারের অধিকার ও দায়ভার পরিবর্তন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং সহিহ বিক্রয়ের মাধ্যমে যদি কেউ একটি গাড়ি ক্রয় করে তা কব্জা না-করে এবং কব্জার আগে তার বাজার দর পরিবর্তন হয়, তা হলে এ পরিবর্তনের কারণে উপকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্রেতা, বিক্রেতা নয়। তবে এক্ষেত্রে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, এ ক্ষতি ও উপকৃত হওয়া কব্জার স্থলাভিষিক্ত হবে।

এ আলোচনার সারকথা হলো, স্পট সেলে যারা শেয়ার ক্রয় করবে, শরয়ি দৃষ্টিকোণে নির্দিষ্ট তারিখে বাস্তবিক হস্তান্তরের আগে অন্যের কাছে ওই শেয়ার বিক্রয় করা জায়েয নেই। ধারণা-নির্ভর হয়ে শেয়ার বাজারে সৃষ্ট ফটকার সঙ্গে এটি একটি বড় পার্থক্য। এ ফটকাবাজি সামগ্রিক পরিস্থিতি নষ্ট করে দিয়েছে। والله تعالى أعلم

১৭০. বুফে (Buffet) খাবারের হুকুম

বর্তমান যুগের হোটেল ও রেস্টুরেন্টে বুফে খাবারের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। এ খাবারের নিয়ম হলো, হোটেল কর্তৃপক্ষ একটি বড় পাত্রে বিভিন্ন ধরনের খাবার রেখে নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতাকে সেখান থেকে ইচ্ছেমতো খাওয়ার অনুমতি দেয়। এক্ষেত্রে মূল্য নির্দিষ্ট, তবে পণ্য অনির্দিষ্ট। তার ধরন
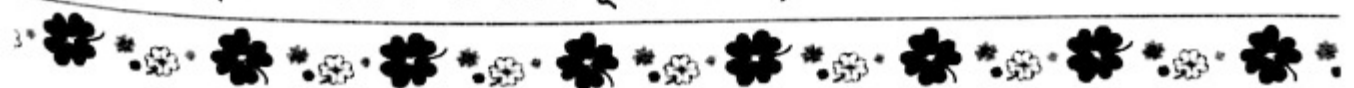
ও পরিমাণ সবই অনির্দিষ্ট। এ পদ্ধতির বিক্রয় জায়েয না-হওয়াই কিয়াসের দাবি। কারণ, চুক্তির সময় পণ্যটি এমন অস্পষ্ট, যা ধোঁকা আবশ্যক করে। তবে জনগণ কোনো ধরনের অভিযোগ ছাড়াই এমন লেনদেন করছে। আর এ ধরনের ধোঁকা ক্ষমাযোগ্য। কেননা, ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সাধারণ ধোঁকা চুক্তিকে ফাসেদ করে না। তাঁরা এভাবে সাধারণ ধোঁকার ব্যাখ্যা করেছেন যে, যার প্রচলন রয়েছে এবং তা বিবাদ আবশ্যক করে না। আল্লামা দুসুকি (রহ.) সাধারণ ধোঁকার সংজ্ঞায় বলেছেন–

هو ما شأن الناس التسامح فيه.

'সাধারণ ধোঁকা হলো, যতটুকু পরিমাণকে মানুষ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে।'[৮১৬]

ইমাম নববি (রহ.) বলেছেন–

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا، جاز البيع وإلا فلا.

'উলামায়ে কেরাম বলেছেন, বাতিল হওয়ার মূলভিত্তি হলো ধোঁকা। আমাদের আলোচনা অনুযায়ী ধোঁকা অবস্থায় চুক্তি সহিহ হওয়ার ক্ষেত্রটি হলো, যদি ধোঁকার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং কষ্ট ছাড়া তা থেকে বাঁচা না-যায় এবং ধোঁকাটি সামান্য হয়, তা হলে বিক্রয় জায়েয, অন্যথায় জায়েয নেই।'[৮১৭]

আমাদের আলোচ্য মাসআলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাসআলা হলো– ভাড়ার বিনিময়ে গণগোসল-খানায় প্রবেশ করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কারণ, চুক্তির সময় এটি জানা যায় না যে, কী পরিমাণ পানি ব্যবহার করবে এবং কত সময় ব্যবহার করবে? আর পানি ব্যবহারে মানুষের অভ্যাসের ভিন্নতা থাকার পরও তার সেচ বিক্রয় করা জায়েয। ইমাম নববি (রহ.) এ মাসআলাগুলো আলোচনা করেছেন।

বুফে খাবারের নিকটতম দৃষ্টান্ত হলো খাবার ও পোশাকের চুক্তিতে স্তন্যদানকারিণী নিয়োগ দেওয়া। আল্লামা জাসসাস (রহ.) বলেছেন–

---

৮১৬. হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা শারহিদ দারদির : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬০।

৮১৭. শারহু সহিহ মুসলিম, পরিচ্ছেদঃ পাথরের বিক্রয় বাতিল হওয়া খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫৬। আল-মাজমু শারহুল মুহায্‌যাব, পরিচ্ছেদঃ ধোঁকা ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বিক্রয়... খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৫৮।
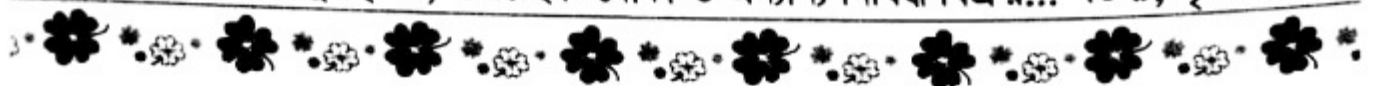
وفي هذه الآية (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) دلالة على جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها لأن ما أوجبه الله تعالى في هذه الآية للمطلقة هما أجرة الرضاع وقد بين ذلك بقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.

"সন্তানের পিতা যথাযথভাবে তাদের খাবার ও পোশাক দেবে" –এ আয়াতের মধ্যে খাবার ও পোশাকের বিনিময়ে দুগ্ধদানকারিণী মহিলা নিয়োগ করা জায়েয হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তালাকপ্রাপ্তার জন্য যে দুটি জিনিস আবশ্যক করেছেন, সে দুটি হচ্ছে দুগ্ধপানের বিনিময়। আল্লাহ তাআলা এ বাণীর মাধ্যমে এটি স্পষ্ট করেছেন, "তারা যদি তোমাদের সন্তানদের দুগ্ধপান করায়, তা হলে তাদের পারিশ্রমিক দাও।"[৮১৮]

ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেছেন, খাবার ও পোশাকের বিনিময়ে ধাত্রী নিয়োগ দেওয়া শাফেয়ি মাযহাব ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতানুযায়ী জায়েয নেই। কারণ, খাবার ও পোশাক অস্পষ্ট বস্তু। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) জায়েয বলেছেন। এরপর ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেছেন–

وأبو حنيفة رحمه الله استدل بقوله تعالى: وَعَلَى الْمَولودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، يعني أجرا على الإرضاع بعد الطلاق ألا ترى أنه قال: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وذلك أجر الرضاع لا نفقة النكاح ولأن الناس تعارفوا بهذا العقد بهذه الصفة وليس في عينه نص يبطله وفي النزوع عن هذه العادة حرج لأنهم لا يعدون الظئر من أهل بيتهم فالظاهر أنهم يستنكفون عن تقدير طعامها وكسوتها كما يستنكفون عن تقدير طعام الزوجات وكسوتهن.

'ইমাম আবু হানিফা (রহ.) "সন্তানের পিতা যথাযথভাবে তাদের খাবার ও পোশাক দেবে"– এ আয়াতের মাধ্যমে দলিল দেন। অর্থাৎ, তালাকের পর দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক হিসাবে। তুমি

---

৮১৮. আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস (রহ.), খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৬।

কি লক্ষ করোনি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ওয়ারিশদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম।' এটি তো দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক, বিয়ের খরচ নয়। আর সাধারণ মানুষ এভাবে লেনদেন করতে অভ্যস্ত। হুবহু এ ব্যাপারে এমন কোনো আয়াত বা হাদিস নেই, যা এটিকে বাতিল করে। সেইসঙ্গে তাদেরকে এ অভ্যাস থেকে সরিয়ে আনা কষ্টসাধ্য। কারণ, ধাত্রীকে তারা পরিবারের সদস্যের মতো মনে করে। সুতরাং স্পষ্ট কথা হলো, ধাত্রীর খাবার ও পোশাকের পরিমাণ নির্ধারণ থেকে বিরত থাকবে, যেমনভাবে স্ত্রীর খাবার ও পোশাক নির্ধারণ থেকে বিরত থাকবে।'[৮১৯]

এ মাসআলার শুরুতে ইমাম সারাখসি (রহ.)-এর আলোচনা হতে জানা গেল যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী খাবার ও পোশাকের বিনিময়ে কাউকে নিয়োগ করা জায়েয হওয়ার বিষয়টি ধাত্রীর সঙ্গেই নির্দিষ্ট। অন্যান্য ইজারার ক্ষেত্রে এমন নিয়োগ দেওয়া জায়েয নেই। তবে মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবে এ পদ্ধতিতে যে কোনো ভাড়ার চুক্তি করা জায়েয। ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন–

اختلفت الرواية عن أحمد فيمن استأجر أجيرا بطعامه وكسوته أو جعل له أجرا وشرط طعامه وكسوته فروي عنه جواز ذلك وهو مذهب مالك وإسحاق وروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم وروي عنه أن ذلك جائز في الظئر دون غيرها اختارها القاضي وهذا مذهب أبي حنيفة لأن ذلك مجهول وإنما جاز في الظئر لقول الله تعالى :وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع ولم يفرق بين المطلقة وغيرها بل في الآية قرينة تدل على طلاقها لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع لأن الله تعالى قال : وعلى الوارث مثل ذلك، والوارث ليس بزوج ولأن المنفعة في الحضانة

৮১৯. আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি (রহ.), পরিচ্ছেদ: ধাত্রী ভাড়া নেওয়া : খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১১৯।

والرضاع غير معلومة فجاز أن يكون عوضها كذلك وروي عنه رواية ثالثة لا يجوز ذلك بحال لا في الظئر ولا في غيرها وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر لأن ذلك يختلف اختلافا كثيرا متباينا فيكون مجهولا والأجر من شرطه أن يكون معلوما.

ولنا ما روى ابن ماجة عن عتبة بن المنذر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ –طس– حتى بلغ قصة موسى قال : إن موسى آجر نفسه ثماني حجج أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدوا بهم إذا ركبوا ولأن من ذكرنا من الصحابة وغيرهم فعلوه فلم يظهر له نكير فكان إجماعا ولأنه قد ثبت في الظئر بالآية فيثبت في غيرها بالقياس عليها ولأنه عوض منفعة فقام العرف فيه مقام التسمية كنفقة الزوجة ولأن للكسوة عرفا وهي كسوة الزوجات وللإطعام عرف وهو الإطعام في الكفارات فجاز إطلاقه، كنقد البلد.

'খাবার ও পোশাকের চুক্তিতে কোনো শ্রমিক নিয়োগ দিলে অথবা তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে তার খাবার ও পোশাকের শর্ত করলে সে ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রহ.) হতে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। জায়েযের পক্ষে তাঁর একটি বর্ণনা রয়েছে। এটি ইমাম মালেক ও ইসহাক (রহ.)-এর মাযহাব। আবু বকর, উমর ও আবু মুসা (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, খাবার ও পোশাকের বিনিময়ে তাঁরা শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ (রহ.) হতে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে যে, শুধু ধাত্রীর ক্ষেত্রে এমন চুক্তি করা জায়েয, অন্যের ক্ষেত্রে জায়েয নেই। আল্লামা কাজি (রহ.)[৮২০] এটি গ্রহণ করেছেন এবং এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর

৮২০. সম্ভবত এখানে আল্লামা কাজি ইয়ায আল-মালেকি (রহ.)-কে বুঝানো হয়েছে।
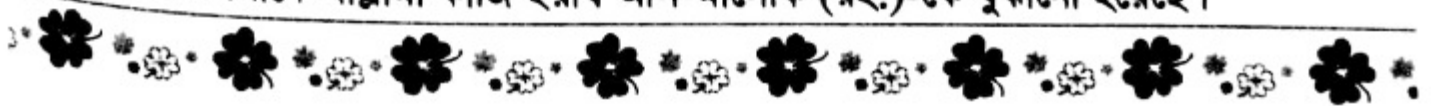
মাযহাব। কারণ, সে দুটি অনির্দিষ্ট। তবে আল্লাহ তাআলার বাণী– 'সন্তানের পিতা যথাযথভাবে তাদের খাবার ও পোশাক দেবে'-এর কারণে তিনি ধাত্রীর ক্ষেত্রে তা জায়েয বলেছেন। সুতরাং দুধ পান করানোর বিনিময় হিসাবে তাদের জন্য খাবার ও পোশাক আবশ্যক করেছেন। তালাকপ্রাপ্তা ও অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি; বরং আয়াতে এমন একটি বিষয় রয়েছে, যা তালাকপ্রাপ্তা হওয়া প্রমাণ করে। কারণ, স্ত্রী দুধ পান না-করালেও তার খরচ ও পোশাক পায়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ওয়ারিশদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম'। আর ওয়ারিশ তো স্বামী নয়। তা ছাড়া দুধ পান ও সন্তান প্রতিপালনের উপকারিতা অনির্দিষ্ট। সুতরাং তার বিনিময়ও অনুরূপ অনির্দিষ্ট হওয়া জায়েয। ইমাম আহমাদ (রহ.) হতে তৃতীয় একটি বর্ণনা রয়েছে যে, কোনো অবস্থায়ই এমন নিয়োগ দেওয়া জায়েয নেই। ধাত্রী বা অন্য কারো ক্ষেত্রেও জায়েয নেই। ইমাম শাফেয়ি, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, আবু সাওর ও ইবনুল মুনযির[৮২১] (রহ.)-ও এই মত দিয়েছেন। কারণ, সেখানে অস্বাভাবিক কম-বেশি হয়, ফলে তা অনির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর পারিশ্রমিকের জন্য শর্ত হলো, তা নির্দিষ্ট হতে হবে। আমাদের পক্ষে দলিল হলো ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) কর্তৃক হযরত উতবাহ বিন মুনযির (রহ.)-এর বর্ণিত হাদিস।[৮২২] তিনি বলেছেন, 'আমরা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে থাকা

---

৮২১. **ইবনুল মুনযির :** মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনুল মুনযির শাইখুল ইসলাম আবু বকর আন-নাইসাবুরি আশ-শাফেয়ি (রহ.)। জন্ম: ২৪২ হিজরি মোতাবেক ৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি মক্কার হারাম শরিফের শাইখ ছিলেন। তাঁর উস্তাদগণ: আর-রাবি' ইবনে সুলাইমান, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম, মুহাম্মাদ ইবনে মাইমুন, আলি ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-সহ ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর ছাত্রদের কাছে তিনি ইলম অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর ছাত্রগণ: আবু বকর ইবনুল মুকরি, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আম্মার আদ-দিমইয়াতি, হাসান ইবনে আলি ইবনে শা'বান, হুসাইন ইবনে আলি ইবনে শা'বান (রহ.) প্রমুখ। ইমাম নববি (রহ.) বলেন, 'ইবনুল মুনযির (রহ.) এমনসব কিতাব লিখেছেন, যার কাছাকাছিও কেউ লিখতে পারেনি।' যেমন: আল-মাবসুত, আল-আওসাত ফিস সুনান ওয়াল ইজমা ওয়াল ইখতিলাফ, ইখতিলাফুল উলামা, তাফসিরুল কুরআন প্রভৃতি। হিজরি ৩১৯ মোতাবেক ৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৪/৪৯০-৪৯২; আল-আ'লাম : ৫/২৯৪) –সম্পাদক

৮২২. আল-মুগনির সংস্করণে রয়েছে– উতবাহ ইবনুল মুনযির। তবে সুনানে ইবনে মাজাহ কিতাবে 'উকবাহ (উতবাহ) ইবনুন নুদ্দার' রয়েছে।

অবস্থায় তিনি সুরা 'ত-সিন' তেলাওয়াত করলেন এবং হযরত মুসা আ.-এর ঘটনা পর্যন্ত পৌছুনোর পর বললেন, মুসা আ. পেটের খাবার ও চরিত্রের পবিত্রতা বজায় রাখার বিনিময়ে আট অথবা দশ বছর শ্রম দিয়েছিলেন।'[৮২৩] আর আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়ত রহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আমাদের শরিয়ত হিসাবে বিবেচ্য। হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমার খাবার ও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের বিনিময়ে আমি গাযওয়ানের মেয়ের শ্রমিক ছিলাম। তারা কোথাও অবস্থান করলে তাদের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতাম এবং বাহনে চললে তাদের বাহন হাঁকাতাম।'[৮২৪] তা ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য যাদের নাম উল্লেখ করেছি, তারা এমন আমল করেছেন কিন্তু সে আমলের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। সুতরাং এর দ্বারা ইজমা হয়ে গেছে। তা ছাড়া ধাত্রীর বিষয়টি আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত, আর অন্যান্যদের হুকুমটি তার ওপর কিয়াসের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। এটি যেহেতু উপকারিতার বিনিময়, তাই এ ব্যাপারে প্রচলনই নির্দিষ্ট করার স্থলাভিষিক্ত হবে। যেমন, স্ত্রীর খরচের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এ ছাড়া পোশাক ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি মশহুর মাসআলা হলো, নির্দিষ্ট মানে স্ত্রীকে পোশাক দেওয়া। আর খাবার ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারেও একটি প্রসিদ্ধ মাসআলা রয়েছে। সেটি হলো,

---

৮২৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: বন্ধক, পরিচ্ছেদ: খাদ্যের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া, হাদিস নং ২৪৪৪। আল্লামা বুসিরি (রহ.) 'যাওয়ায়িদু ইবনি মাজাহ' কিতাবে বলেছেন, ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদিসের মধ্যে এটি ছাড়া উতবাহ বিন নুদ্দার থেকে আর কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি। অন্য পাঁচ কিতাবে তার থেকে আর কোনো হাদিস বর্ণিত নেই। তবে তাঁর এই হাদিসের সনদ বাকিয়্যাহ নামক রাবির তাদলিস করার কারণে যয়িফ। ইমাম আহমাদ (রহ.) তাঁর মুসনাদে উতবাহ বিন নুদ্দার থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযি (রহ.) তাঁর জামিউল মাসানিদ কিতাবেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৮২৪. সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: বন্ধক, পরিচ্ছেদ: খাদ্যের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া, হাদিস নং ২৪৪৫। আল্লামা বুসিরি (রহ.) 'যাওয়ায়িদু ইবনি মাজাহ' কিতাবে বলেছেন, এটি মাওকুফ হিসাবে সহিহ সনদ। সনদের হাইয়ান নামক জনৈক বর্ণনাকারীর পরিচয় হলো, ইবনে বিসতাম বিন মুসলিম বিন নুমায়ের। আল্লামা ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সনদের অন্য বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। ইমাম হাকেম (রহ.) তাঁর মুসতাদরাকে ইবনে মাহদি থেকে আমর বিন মারজুক-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি ইমাম বাইহাকি (রহ.)-ও তাঁর সুনানুল কুবরায় হাকেম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

> কাফফারার খাবার। সুতরাং শর্তহীনভাবেই এটি জায়েয হবে। যেমন– একই শহরে একাধিক মুদ্রার প্রচলন থাকলে সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রাকে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়।'[৮২৫]

এ মাসআলার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য হতে জানা যায়, কোনো কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে সামাজিক প্রচলনের বড় ধরনের ভূমিকা রয়েছে। আর বুফে খাবারের ক্ষেত্রে যে প্রচলন ঘটেছে, তা এ ধরনের হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, জনগণ এগুলোর লেনদেন করছে এবং এ অস্পষ্টতা বিবাদ আবশ্যক করছে না।

তারপরের কথা হচ্ছে, বুফে খাবারের নিয়ম হলো, ক্রেতার ইচ্ছেমতো খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, খাবার নিয়ে যাওয়া বা অন্য কাউকে খাওয়ানোর অনুমতি দেওয়া হয় না। সুতরাং এখানে প্রাথমিক পর্যায় বৈধ এবং শেষ পর্যায় মালিক সাব্যস্ত করার বিষয়টি স্পষ্ট। তবে কেবল খাওয়ার সময়ই মালিকানা পাওয়া যায়। অতএব, কেউ যদি খাওয়ার জন্য খাবার নেওয়ার পর তা না-খায়, তা হলে তার হুকুমটি প্রচলিত নিয়মের ওপর মওকুফ থাকবে। সুতরাং যেখানে প্রচলিত নিয়ম থাকবে যে, ওই খাবার পাত্রে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, সেখানে ক্রেতা মালিক হবে। আর যেখানে পাত্রে ফিরিয়ে দেওয়ার নিয়ম আছে, সেখানে ক্রেতা মালিক হবে না। والله تعالى أعلم

* * *

১৭১. সপ্তম শর্ত : বিক্রয়ের পণ্যটি বিক্রেতার দখলে থাকা

পণ্য সম্পর্কিত শর্তসমূহের সপ্তম শর্ত হলো, বিক্রেতা প্রকৃত অর্থে অথবা হুকুমের দিক থেকে পণ্য কব্জায় রাখবে। এটি বিক্রয় সহিহ হওয়ার শর্ত। সুতরাং বিক্রেতার কব্জায় নেই, এমন জিনিস বিক্রয় করলে সেটি তার মালিকানাধীন হওয়ার পরও শরয়ি দৃষ্টিতে তা ফাসেদ হবে। এ ব্যাপারে দলিল হলো রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস। তিনি বলেছেন–

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

---

৮২৫. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬৮।

'যে ব্যক্তি কোনো খাবার ক্রয় করবে, সে তা পূর্ণরূপে বুঝে পাওয়ার আগে যেন বিক্রয় না-করে।'[৮২৬]

এ মাসআলার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে :

১. হযরত উসমান বাত্তি (রহ.)-এর মত। বিক্রয় সহিহ হওয়ার জন্য পণ্য বিক্রেতার কব্জায় থাকা শর্ত নয়। সুতরাং তাঁর মতানুযায়ী যে কোনো জিনিস কব্জা করার আগে বিক্রয় করা জায়েয। তবে ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) বলেছেন–

هذا القول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام، وأظنه لم يبلغه هذا الحديث، ومثل هذا لا يلتفت إليه.

'হাদিস ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এ মতটি প্রত্যাখ্যাত। আমার ধারণা, তাঁর কাছে এ হাদিসটি পৌছেনি। এ ধরনের মত ভ্রুক্ষেপ করারই যোগ্য নয়।'[৮২৭]

২. ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ও হানাফি মাযহাবের মুহাম্মাদ বিন হাসান (রহ.) বলেছেন, খাদ্য হোক বা অন্য কিছু, স্থানান্তরযোগ্য হোক বা না-হোক, কব্জা করার আগে তা বিক্রয় করা হারাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর কথা থেকে এটি প্রমাণিত হয় এবং এটি 'আল-মুগনি' কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী ইবনে আকিল (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত ইমাম আহমাদ (রহ.)-এরও একটি মত।

৩. ইমাম আহমাদ (রহ.) তাঁর প্রণিধানযোগ্য বর্ণনায় বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা শুধু খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট। সুতরাং কব্জা করার আগে তা বিক্রয় করা জায়েয নেই। অন্যান্য জিনিস কব্জা করার আগে বিক্রয় করা জায়েয। ইবনে কুদামা (রহ.) অনুরূপ তাহকিক করেছেন।

৪. ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, কেবল খাদ্যদ্রব্যের কাইলি ও ওজনি জিনিস কব্জা করার আগে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। মালেকি মাযহাবের ইমাম সাহনুন ও ইবনে হাবিব (রহ.) বলেছেন, কাইলি, ওজনি এবং গণনা করে বিক্রয় করা হয়, এমন জিনিস কব্জা করার আগে বিক্রয় করা

---

৮২৬. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: কব্জা করার আগে খাদ্য বিক্রয় করা, হাদিস নং ২১৩৬।

৮২৭. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২০।

নিষিদ্ধ। এরপর তাদের মতানুযায়ী এই হুকুমটি খাদ্যদ্রব্য কিংবা সুদ হয় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হওয়ার বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। আল্লামা উব্বি (রহ.) সে মত দুটি বর্ণনা করেছেন।

৫. ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.) বলেছেন, সব ধরনের স্থানান্তরযোগ্য জিনিস কব্জা করার আগে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। তবে যেসব জমি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই, কব্জা করার আগে সেগুলো বিক্রয় করা জায়েয। 'ফাতহুল কাদির' কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ আছে।[৮২৮]

হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম নিষেধাজ্ঞাটি খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট হওয়ার পক্ষে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেন। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

'যে ব্যক্তি খাবার ক্রয় করবে, সে বুঝে পাওয়ার আগে যেন বিক্রয় না-করে।'[৮২৯]

কারণ, হাদিসের মধ্যে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদ্যের বিষয়ে বলেছেন। তাঁরা হযরত ইবনে উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমেও দলিল দেন। তিনি বলেছেন–

كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي ﷺ فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة.

'বাকি নামক জায়গায় আমি দিনারের বিনিময়ে উট বিক্রয় করতাম এবং তার পরিবর্তে দিরহাম গ্রহণ করতাম। আর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে তার পরিবর্তে দিনার গ্রহণ করতাম। এরপর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, বাজারদরে নিলে কোনো সমস্যা নেই।'

---

৮২৮. ফাতহুল কাদির, অধ্যায়: বিক্রয় : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৭–১৩৮।

৮২৯. সহিহ মুসলিম, অধ্যায় : বিক্রয়, হাদিস-৩৮১১।

সুনান চতুষ্টয়[৮৩০] ও ইমাম আহমাদ, ইবনে হিব্বান এবং হাকেম (রহ.) হযরত সিমাক বিন হারব হতে সায়িদ বিন জুবায়ের হতে ইবনে উমর (রাযি.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সিমাক বিন হারব ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনাকারী এটিকে 'মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেননি। হাফিযুল হাদিস ইবনে হাজার (রহ.)-এর 'তালখিসুল হাবির'[৮৩১] কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ আছে। ইবনে কুদামা (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এ হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেওয়ার পদ্ধতিটি হলো, সেখানে মূল্য কব্জা করার আগে তাতে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। আর মূল্য হলো দুটি বিনিময়ের একটি। সুতরাং কব্জা করার আগে যদি মূল্য বিক্রয় করা জায়েয হয়, তা হলে পণ্য বিক্রয় করাও জায়েয হবে। তবে কব্জা করার আগে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা যাবে না, কেননা, তার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে।

হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবে এ দলিলটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, মৌলিক দিক থেকে তা বাইয়ে সরফ। আর মূল্য তথা দিনার নির্দিষ্ট না-হওয়ার কারণে তা নষ্ট হলে চুক্তি বাতিল হওয়ার মতো কোনো ধোঁকা নেই। আমাদের আলোচনা হলো, পণ্য বিক্রয়কে কেন্দ্র করে। কারণ, তা নষ্ট হওয়ার মাধ্যমে চুক্তি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাদিসের নিষেধাজ্ঞা ব্যাপক হওয়া সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে– ইনশাআল্লাহ।

ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত 'লাইলাতুল বায়ির'-এর হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেন। কারণ, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার থেকে ক্রয় করার পর কব্জা করার আগে তাকে দান করে দিয়েছিলেন। হাদিসটিতে তাদের পক্ষে কোনো দলিল নেই। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর জন্য তা দলিল। কেননা, তিনি বিক্রয় ও দানের মধ্যে পার্থক্য করে বলেছেন, কব্জা করার আগে ক্রয়কৃত পণ্য দান করা জায়েয। তবে কব্জা করার আগে বিক্রয় করা জায়েয নেই। 'ফাতহুল কাদির' কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ আছে।[৮৩২]

---

৮৩০. সুনান চতুষ্টয় : সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি এবং সুনানে ইবনে মাজাহ-কে একত্রে সুনানে আরবাআ বা সুনান চতুষ্টয় বলা হয়। –সম্পাদক

৮৩১. জামে তিরমিযি, হাদিস-১২৪২। সুনানে আবু দাউদ : হাদিস-৩৩৪৫। সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ৪৫৮৯। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস-২৪৬২। সুনানে দারিমি, হাদিস-২৫৮১। মুসনাদে আহমাদ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৪। তালখিসুল হাবির, পরিচ্ছেদ: কব্জা ও তার হুকুম : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫–২৬, হাদিস-১২০৪।

৮৩২. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৫।
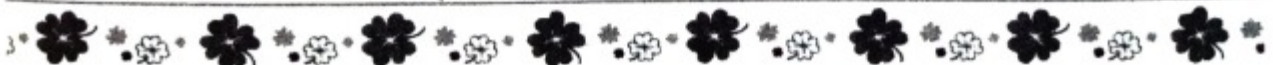
ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতানুযায়ী দান বিক্রয়ের মতো। তাঁদের পক্ষ হতে বায়ির তথা উটের হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূল্যের বিনিময়ে তা কজা করার পর বিক্রেতাকে দান করেছিলেন এবং এমন দান করা জায়েয। কারণ, প্রকৃত অর্থে তা মূল্য দান করা, পণ্য দান করা নয়। আর আমাদের আলোচনা হলো কজা করার আগে বিক্রেতা ছাড়া অন্যকে পণ্য দান করার ব্যাপারে।

ইমাম শাফেয়ি, মুহাম্মাদ বিন আকিল এবং নিষেধাজ্ঞা ব্যাপক হওয়ার পক্ষের উলামায়ে কেরাম নিচের বিষয়গুলোর মাধ্যমে দলিল দেন :

১. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হযরত ইবনে উমর (রাযি.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন–

ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

'আমি বাজার থেকে তেল ক্রয় করি। এরপর যখন আমার পরিচিত একজনের কাছে বিক্রয় করতে চাইলাম, তখন সে আমাকে ভালো লাভ দিতে চাইল। তাই তার (কাছে বিক্রয় করার ইচ্ছায় তার) হাত ধরতে চাইলাম। এমতাবস্থায় আমার পেছন থেকে একজন আমার বাহু ধরে বসল। তাকিয়ে দেখি তিনি হলেন হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাযি.)। তিনি বললেন, তোমার জায়গায় নেওয়ার আগে যেখানে ক্রয় করেছো, সেখানে বিক্রয় করো না। কেননা, ব্যবসায়ীদেরকে ক্রয়কৃত পণ্য নিজেদের দখলে নেওয়ার আগে ক্রয়ের স্থানে তা বিক্রয় করার ব্যাপারে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।'[৮৩৩]

---

৮৩৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৩৫৬। মুস্তাদরাকে হাকেম : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০। ইমাম হাকেম (রহ.) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবি (রহ.) তার সমালোচনা করেননি।

সুতরাং এ হাদিস নিষেধাজ্ঞার হুকুমকে সব পণ্যের জন্য ব্যাপক করেছে এবং শুধু খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট করেনি। তবে হাদিসটির সনদ নিয়ে এভাবে সমালোচনা করা হয় যে, তার বর্ণনাকারীদের তালিকায় মুহাম্মাদ বিন ইসহাক নামক একজন (সমালোচিত) বর্ণনাকারী রয়েছেন। তবে 'আত-তানকিহ' কিতাবের প্রণেতা বলেছেন, হাদিসটির সনদ জায়্যিদ এবং মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহ.) সেখানে 'حدثنا' (হাদ্দাসানা) শব্দে বর্ণনা করেছেন। 'ফাতহুল কাদির' কিতাবে অনুরূপ রয়েছে।[৮৩৪] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁর 'সহিহ'তে এবং হাকেম (রহ.) তাঁর 'মুস্তাদরাকে' হাদিসটি বর্ণনা করে সেটিকে সহিহ বলেছেন। আর আল্লামা যাহাবি (রহ.) সেটিকে সমর্থন করেছেন।

২. হযরত হাকিম বিন হিযাম (রাযি.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেছেন—

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنِّي أَبْتَاعُ هَذِهِ الْبُيُوعَ فَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ علي؟
قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي لاَ تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ

'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এসব লেনদেন করি। সুতরাং তার মধ্যে আমার জন্য কোনটি হালাল, আর কোনটি হারাম? উত্তরে তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! কোনো কিছু কব্জা করার আগে বিক্রয় করবে না।' আর আবান (রহ.)-এর সূত্রে রয়েছে, তিনি তাঁকে বলেছিলেন—

إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

'কোনো কিছু ক্রয় করলে তা কব্জা করার আগে বিক্রয় করবে না।' এটি সুনানে বাইহাকি-এর শব্দ। ইমাম বাইহাকি (রহ.) বলেছেন, 'এটি হাসান ও মুত্তাসিল সনদ'। ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে এবং আহমাদ (রহ.) তাঁর 'মুসনাদে' হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটিতে সব জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যাপক হুকুম দেওয়া হয়েছে। তবে হাদিসটির রাবি আবদুল্লাহ বিন ইসমাহ (রহ.)-এর কারণে এ হাদিসের সমালোচনা করা হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম[৮৩৫] (রহ.) 'তাহযিবুস সুনান' কিতাবে বলেছেন—

---

৮৩৪. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৬।

৮৩৫. **আল্লামা ইবনুল কায়্যিম :** মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন আদ-দিমাশকি (রহ.)। জন্ম : ৬৯১ হিজরিতে দামেশকে। তাঁর বাবা ছিলেন দামেশকের আল-মাদরাসাতুল
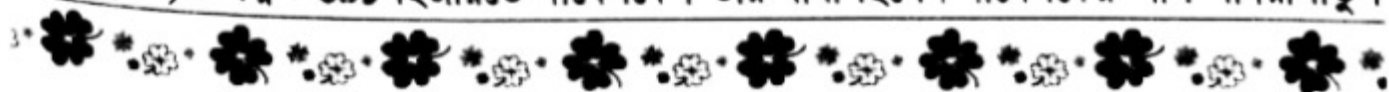
هذا إسناد على شرطهما، سوي عبد الله بن عصمة، وقد وثقه ابن حبان، واحتج به النسائي.

'এ সনদের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন ইসমাহ (রহ.) ছাড়া বাকিরা ইমাম বুখারি ও মুসলিম (রহ.)-এর শর্ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইমাম নাসায়ি (রহ.) তার মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন।'

'আত-তানকিহ' কিতাবের লেখক বলেছেন, 'হাদিসটির সনদে আবদুল্লাহ বিন ইসমাহ নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। তিনি জুশামি ও হিজাযি। ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। আবদুল হক (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করার পর তার হুকুম সম্পর্কে বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন ইসমাহ অত্যন্ত দুর্বল রাবি। ইবনুল কাত্তান (রহ.) আবদুল হক (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন, তবে তারা উভয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাদের কাছে বর্ণিত আবদুল্লাহ বিন ইসমাহ (রহ.)-এর বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাহ নাসিবি অথবা অন্য যাদের নাম আবদুল্লাহ বিন ইসমাহ তাদের সঙ্গে মিলে গেছে। আল্লামা যাইলায়ি[৮৩৬] (রহ.)-এর 'নাসবুর রায়াহ' কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ আছে।[৮৩৭]

জাওযিয়্যাহ-এর 'কায়্যিম' (পরিচালক)। তাই তাঁকে ইবনুল কায়্যিম বা ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ বলা হয়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর খাস শাগরেদ ছিলেন তিনি। এমনকি তাঁর প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণেও তিনি ইবনে তাইমিয়ার হুবহু অনুকরণ করতেন। ইবনে তাইমিয়া যখন কারাগারে বন্দি হন, তিনিও তাঁর সঙ্গে কারারুদ্ধ হন। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি, ইবনে আবদুল হাদি প্রমুখ খ্যাতনামা আলেম তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেছেন। অত্যন্ত সচ্চরিত্রের অধিকারী এই মহান ব্যক্তি জনসাধারণ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। সর্বদা ইলমে দীন ও লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকতেন। প্রচুর গ্রন্থ তিনি রচনা করে গিয়েছেন, যা আজও তাঁকে অমর করে রেখেছে। যেমন, ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন, আত-তুরুকুল হিকামিয়্যাহ ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়্যাহ, যাদুল মাআদ, আহকামু আহলিয যিম্মাহ, তুহফাতুল মাওদুদ বি আহকামিল মাওলুদ, মাদারিজুস সালিকিন, আদ-দা ওয়াদ দাওয়া, তিব্বুল কুলুব, কাশফুল গিতা আন হুকমি সামায়িল গিনা প্রভৃতি। ৭৫১ হিজরিতে দামেশকে তিনি ইন্তেকাল করেন। (আল-আ'লাম : ৬/৫৫-৫৬; জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, মুকাদ্দিমা, পৃ. ২৬) –সম্পাদক

৮৩৬. **আল্লামা যাইলায়ি** : আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মাদ জামালুদ্দিন আয-যাইলায়ি (রহ.)। জন্ম : (আনু.) হিজরি ৭২২ মোতাবেক ১৩২২ খ্রিস্টাব্দে। কোনো-কোনো ইতিহাসবিদ তাঁর নাম বলেছেন: ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ। যেমন: আল-ফাওয়ায়িদুল
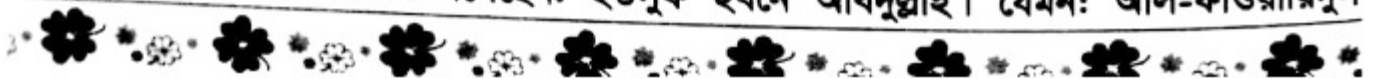
৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে–

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, একসঙ্গে ঋণ ও বিক্রয়, এক বিক্রয়ের মধ্যে দুটি শর্ত, দায়ভার নেওয়া ছাড়া লাভ করা এবং কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রয় করা জায়েয নেই।'

ইমাম তিরমিযি (রহ.) 'কব্জায় নেই এমন জিনিস বিক্রয় মাকরুহ' পরিচ্ছেদে হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন, (هذا حديث حسن صحيح) হাদিসটি হাসান সহিহ।[৮৩৮] হাদিসটিতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দায়ভার নেওয়া ছাড়া লাভ অর্জন করতে নিষেধ করেছেন।[৮৩৯] আর কব্জা করার আগে বিক্রয় করা এ বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, কব্জা করার আগ পর্যন্ত পণ্য ক্রেতার জিম্মাভুক্ত হয় না। সুতরাং কব্জা করার আগে যদি লাভে তা বিক্রয় করে, তা

বাহিয়্যাহ-এর লেখক আল্লামা আবদুল হাই লাখনোবি (রহ.)। তবে প্রথমোক্ত নামটিই গ্রহণযোগ্য বলে কতক গবেষক মতপ্রকাশ করেছেন। ইথিওপিয়ান সমুদ্র তীরবর্তী সোমালিয়ার অন্তর্গত যাইলা নামক অঞ্চলের দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে যাইলায়ি বলা হয়। তিনি ছিলেন হানাফি মাযহাবের খ্যাতনামা ফকিহ ও জাঁদরেল মুহাদ্দিস। আল্লামা যাইনুদ্দিন ইরাকি (রহ.) তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তবে ইরাকি (রহ.) যাইলায়ির তুলনায় দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর উস্তাদগণ: জামালুদ্দিন আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযি (লেখক, তাহযিবুল কামাল, মৃ. ৭৪২ হি.), ফখরুদ্দিন আয-যাইলায়ি (লেখক, তাবয়িনুল হাকায়িক), ইযযুদ্দিন ইবনে জামাআহ, তাজউদ্দিন ইবনুত তুরকুমানি, শামসুদ্দিন আয-যাহাবি (লেখক, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা), আলাউদ্দিন ইবনুত তুরকুমানি (লেখক, আল-জাওহারুন নাকি ফির রাদ্দি আলাল বাইহাকি) প্রমুখ (রহ.)। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে: নাসবুর রায়াহ ফি তাখরিজি আহাদিসিল হেদায়া, তাখরিজু আহাদিসিল কাশশাফ প্রভৃতি। ৭৬২ হিজরি মোতাবেক ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে মিশরের রাজধানী কায়রোয় মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। (আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফা, পৃ. ১৮৬; মুকাদ্দিমা, তাখরিজু আহাদিসিল কাশশাফ : ১/৭৪-৯৫; আল-আ'লাম : ৪/১৪৭; আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, পৃ. ২৮৮) –সম্পাদক

৮৩৭. সুনানে বাইহাকি : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩১৩। ইমাম বাইহাকি (রহ.) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। মুসনাদে আহমাদ : খণ্ড-৩, পৃ.৪০২। তাহযিবুস সুনান : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৩১। নাসবুর রায়াহ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩।

৮৩৮. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ১২৩৪, ১২৩৫। সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৫০৪। সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ৪৬১১, ৪৬১২।

৮৩৯. যেমন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'الخراج بالضمان' 'দায়ভারের বিনিময়ে লাভ পাবে'। সুনানে আবু দাউদ, পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি দাস ক্রয় করে তাকে কাজে লাগানোর পর তাতে ত্রুটি পেল, হাদিস নং ৩৫০৮।
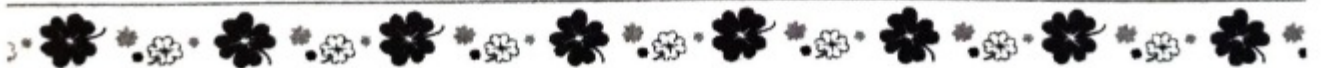
হলে তা দায়ভার নেওয়া ছাড়া বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে এ ইল্লতটি ব্যাপক।

হুবহু এ দলিলসমূহের মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.) দলিল দেন। তবে তাঁরা জমিকে এ ব্যাপক হুকুমের বাইরে রেখেছেন। কারণ, সেখানে নিষেধাজ্ঞার ইল্লতটি নেই। কেননা, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.)-এর বর্ণিত শেষ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, পণ্য কব্জা করার আগে বিক্রয় নিষিদ্ধ করার কারণ হলো, এভাবে বিক্রয় করলে দায়ভার নেওয়া ছাড়া লাভ করা হয়ে যায়। আর যেসব জিনিস নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করা হয়, কেবল সেগুলোর দায়ভার নেওয়া হয়ে থাকে। জমির ক্ষেত্রে তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা একেবারে বিরল। এমনকি কোনো জমি যদি নদীর তীরে থাকে অথবা ওপরের অংশ বিক্রয় করা হয়, তা হলে কব্জা করার আগে তা বিক্রয় করা জায়েয নেই। 'ফাতহুল কাদির' কিতাবে অনুরূপ রয়েছে।[৮৪০] কারণ, তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে বিরল নয়। 'হেদায়া' গ্রন্থের প্রণেতা বলেছেন–

> ولهما (يعني في جواز بيع العقار قبل قبضه) أن ركن البيع صدر من أهله في محله، ولا غرر فيه؛ لأن الهلاك في العقار نادر، بخلاف المنقول، والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد، والحديث معلول به بدلائل الجواز.
>
> 'কব্জা করার আগে জমি বিক্রয় জায়েযের ক্ষেত্রে তাদের সপক্ষে দলিল হলো, বিক্রয়ের রোকন তার যোগ্য ব্যক্তি হতে যথার্থ ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে। সেখানে কোনো ধোঁকা নেই। কারণ, জমি নষ্ট হওয়ার বিষয়টি একেবারে বিরল। তবে স্থানান্তর করা যায় এমন জিনিসের হুকুম ভিন্ন। সেখানে নিষিদ্ধ ধোঁকাটি চুক্তি বাতিল করার মতো ধোঁকা। এটি জায়েয হওয়ার বহু দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে হাদিসটি মা'লুল (দুর্বল) সাব্যস্ত করা হয়েছে।'

আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

> والحديث معلول به أي بغرر الانفساخ، والدليل عليه أن التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ في المبيع قبل القبض وهو العتق والتزوج عليه.

---

৮৪০. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৮।

'হাদিসটি চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায় এমন ধোঁকার কারণে মা'লুল সাব্যস্ত হবে। এ কথার পক্ষে দলিল হলো, যে ধোঁকা চুক্তি বাতিল করে না, তা কব্জা করার আগে বিক্রয় কার্যকর হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। আর সেটি হলো, যার উপর ভিত্তি করে দাস আযাদ করা ও বিয়ে করা হয়।'[৮৪১]

১৭২. কোনটি কব্জা হিসাবে বিবেচিত হবে, আর কোনটি বিবেচিত হবে না

এরপর ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে কব্জার সংজ্ঞা দিয়েছেন। ইবনে জুযাই (রহ.)-এর 'আল-কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যাহ' কিতাবে উল্লেখ আছে–

القبض عبارة عن حيازة الشيء والتمكن منه، سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أولم يكن.

'কব্জা বলা হয় কোনো জিনিসকে আয়ত্তে আনা ও তার কর্তৃত্ব পাওয়া। চাই তা হাতে পাওয়া সম্ভব হোক বা না-হোক।'[৮৪২]

আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন–

معنى القبض هو التمكين، والتخلي، وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة.

'কব্জার উদ্দেশ্য হলো, হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাওয়া, বিক্রেতা কর্তৃক খালি করে দেওয়া এবং প্রচলন ও নিয়ম অনুযায়ী বাস্তবিক অর্থে বাধা দূর হওয়া।'

ইমাম ইযযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম[৮৪৩] (রহ.) বলেছেন–

---

৮৪১. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৮।

৮৪২. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ, ধারাঃ কব্জা করা : খণ্ড-৩২, পৃষ্ঠা-২৫৭।

৮৪৩. **ইমাম ইযযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম** : শাইখুল ইসলাম আবদুল আজিজ ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবুল কাসেম আস-সুলামি আদ-দিমাশ্‌কি ইযযুদ্দিন (রহ.)। তিনি 'সুলতানুল উলামা' উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। জন্ম : ৫৭৭ হিজরি মোতাবেক ১১৮১ খ্রিস্টাব্দে দামেশকে। শাসকের অন্যায্য আচরণের সামনে দ্বিধাহীনচিত্তে সত্যোচ্চারণের এক অমর কিংবদন্তি হয়ে আছেন তিনি। অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আলেম ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে সমকালীন শাসকেরাও হার মানত। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ছিলেনঃ আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনুল মাওয়াযিনি, আল-খুশুয়ি, কাসেম ইবনে আলি ইবনে আসাকির, উমার ইবনে তাবারযাদ, আবুল কাসেম আল-হারাস্তানি (রহ.) প্রমুখ। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেনঃ আল্লামা আবুল ফাতাহ ইবনে দাকিকুল ইদ, আবুল হুসাইন আল-ইউনিনি, আবু আবদুল্লাহ ইবনে বাহরাম আশ-শাফেয়ি এবং মিশরের বহু খ্যাতনামা আলেম (রাহিমাহুমুল্লাহ)। তিনি

قولهم: قبضت الدّار والأرض والعبد والبعير يريدون بذلك الاستيلاء والتّمكّن من التّصرّف.

'বাড়ি, জমি, দাস ও বাহন ইত্যাদি কব্জা করেছি' বলতে মানুষের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কর্তৃত্ব পাওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারা।'[৮৪৪]

একই ধরনের সংজ্ঞার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম একমত হওয়ার পরও বিভিন্ন জিনিসের কব্জার প্রক্রিয়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। যার অনেকগুলোতে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং আমরা কব্জা সম্পর্কিত সেসব বিস্তারিত আলোচনা উল্লেখ করব– ইনশাআল্লাহ।

১৭৩. জমির কব্জা

এ ব্যাপারে চার মাযহাব একমত যে, জমি খালি করার মাধ্যমে তার কব্জা সম্পন্ন হয়।[৮৪৫] যেমন আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন–

ছিলেন ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন শাফেয়ি মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ। পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে হাজার-হাজার তালিবুল ইলম তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করার জন্য আসত। তাঁর হাতে তৈরি হয়েছেন বহু জগদ্বিখ্যাত ইমাম। সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্মের নিষেধ করায় তিনি ছিলেন তৎকালের প্রবাদ-পুরুষ। আল্লাহর বিধান পালনে তিনি ছিলেন নির্ভিক, নিঃশঙ্ক। বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তিনি। সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ আত-তাফসিরুল কাবির, আল-ইলমাম ফি আদিল্লাতিল আহকাম, কাওয়ায়িদুশ শারিয়াহ, আল-ফাওয়ায়িদ, তারগিবু আহলিল ইসলাম ফি সাকানিশ শাম, বিদায়াতুস সুল ফি তাফযিলির রাসুল, মাসাইলুত তরিকত (তাসাওউফ), আল-ফারকু বাইনাল ইমানি ওয়াল ইসলাম প্রভৃতি। সত্যোচ্চারণের কারণে তিনি সরকারি পদের উচ্চাসনে সমাসীন হয়েও পদচ্যুতির সম্মুখীন হয়েছেন বারংবার। তবুও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। জীবনের শেষদিকে তিনি সকল দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছা-অব্যাহতি নেন এবং নিজের গৃহেই ইবাদত-বন্দেগিতে কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন। মিশরের তৎকালীন শাসক আল-মালিক আয-যাহের তাঁকে প্রস্তাব দেন যে, 'আপনি যে-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আপনার সন্তানদের মধ্যে তো সেই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত সন্তান আছে, তাদের কাউকে অনুমতি দিন।' তিনি তাঁর এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। বলেন, 'আমি তাদের কাউকে এর যোগ্য মনে করি না।' হিজরি ৬৬০ সন মোতাবেক ১২৬২ খ্রিস্টাব্দে কায়রো শহরে তিনি ইন্তেকাল করেন। মিশরের বাদশাহ এবং লাখো লোকের বিরাট জমায়েতে তাঁর জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। (রাহিমাহুল্লাহু তাআলা ওয়া নাফাআনা বিউলুমিহি) দ্র. আল-আ'লাম, যিরিকলি : ৪/২১; তারিখুল ইসলাম, যাহাবি : ১৪/৯৩৩। –সম্পাদক

৮৪৪. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ : খণ্ড-৩২, পৃষ্ঠা-২৫৭।

৮৪৫. আল-মাজমু শারহুল মুহায্যাব : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৭৩–২৭৪। আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২০। আদ-দুসুকি আলাশ শারহিল কাবির : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৫। বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৯৮।
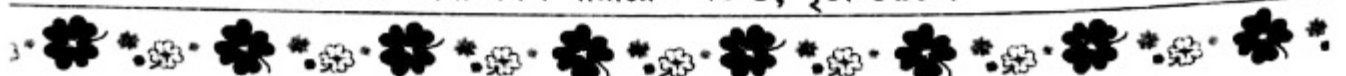
أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلما للمبيع، والمشتري قابضا له.

'পণ্য ও ক্রেতার মধ্যের প্রতিবন্ধক দূর করার মাধ্যমে এমনভাবে খালি করে দেওয়া, যার পর ক্রেতাকে সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে। যেটি বিক্রেতাকে পণ্য হস্তান্তরকারী এবং ক্রেতা তা কব্জাকারী সাব্যস্ত করবে।'

ইমাম নববি (রহ.) 'শারহুল মুহায্যাব' কিতাবে বলেছেন, 'জীবন্ত গাছ ও পাকার আগে বিক্রয়কৃত গাছের ফলও জমির হুকুমে হবে।'

বাড়ি খালি করা সম্পন্ন হবে তার চাবি হস্তান্তরের মাধ্যমে। ক্রেতা সেখানে প্রবেশ না-করলে অথবা ক্রেতা হতে বাড়ি অনেক দূরে থাকলেও তা খালি হিসাবে বিবেচিত হবে। 'ফাতাওয়ায়ে খানিয়া'য় এ শর্তারোপ করা হয়েছে যে, চাবি দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এ কথা বলতে হবে, 'তোমার ও বাড়ির মাঝের প্রতিবন্ধক দূর করেছি, সুতরাং তুমি তা কব্জা করো।' বিক্রেতা যদি এ কথা না-বলে, তা হলে চাবি দেওয়া কব্জা হিসাবে বিবেচিত হবে না।[৮৪৬] 'আল-বাহরুর রায়েক' ও 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া' ও অন্যান্য কিতাবে এমন শর্তারোপ করা হয়নি। এখান থেকে বোঝা যায়, এ শর্তের উদ্দেশ্য হলো, হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে চাবি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। কারণ, অন্য উদ্দেশ্যে চাবি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং বিশেষভাবে এ শব্দের শর্ত করার প্রয়োজন নেই; বরং চাবি দেওয়ার সময় যদি পরিবেশ এটি প্রমাণ করে যে, হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে চাবি দিয়েছে, তা হলে তা যথেষ্ট। এ কারণে অন্যান্য ফকিহ এ শর্তটি উল্লেখ করেননি। والله تعالى أعلم

বিক্রেতা যদি বলে 'তোমার কাছে হস্তান্তর করলাম' এবং বাড়িটি ক্রেতার এত কাছে থাকে যে, তখনই তা খুলতে পারবে, তা হলে বলার সঙ্গে-সঙ্গে তা কব্জা হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে যদি দূরে হয়, তা হলে সে পর্যন্ত পৌঁছতে যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হয়, ওই সময়ের পর কব্জা সম্পন্ন হবে।[৮৪৭]

---

৮৪৬. ফাতাওয়ায়ে খানিয়া, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ার সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৭।

৮৪৭. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ, ধারা নং ২৭০। শারহুল মাজাল্লাহ, আল্লামা খালেদ আতাসি (রহ.), খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৬–২০০।

১৭৪. বিক্রেতা বসবাস করে এমন বাড়ির কব্জা

বাড়ি হস্তান্তর সহিহ হওয়ার জন্য ফুকাহায়ে কেরাম এ শর্ত করেছেন যে, বিক্রেতার আসবাবপত্র থেকে খালি হতে হবে। সুতরাং সেখানে যদি বিক্রেতার আসবাবপত্র থাকে, তা হলে তা সরিয়ে নেওয়ার আগে কব্জা সম্পন্ন হবে না।[৮৪৮] তবে 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া'তে 'ফাতাওয়ায়ে আবুল লাইস' হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে–

> فإن أذن البائع للمشتري بقبض الدار والمتاع صح التسليم لأن المتاع صار وديعة عند المشتري.
>
> 'বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বাড়ি ও আসবাবপত্র কব্জা করার অনুমতি দেয়, তা হলে হস্তান্তর সহিহ হবে। কারণ, আসবাবপত্র ক্রেতার কাছে আমানত হিসাবে থাকবে।'[৮৪৯]

অনুরূপভাবে বিক্রেতার আসবাবপত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত জিনিসের দান কার্যকর হওয়ার জন্য তারা এ বিকল্পের কথা বলেছেন–

> وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له، ثم يسلمه الدار مثلا، فتصح لشغلها بمتاع في يده.
>
> 'অন্য জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত জিনিস দান করার বিকল্প পদ্ধতি হলো, যাকে দান করছে প্রথমে তার কাছে আমানত রাখবে। এরপর বাড়ি হস্তান্তর করবে। সুতরাং এ পদ্ধতিতে তার কাছে থাকা জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে দান সহিহ হয়ে যাবে।'[৮৫০]

---

৮৪৮. আল-মাজমু শারহুল মুহায্যাব : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৭৪।

৮৪৯. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: ৪ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭।

৮৫০. আল-জাওহারাতুন নায়্যিরাহ, অধ্যায়: উপহার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) রাদ্দুল মুহতার কিতাবে এটি বর্ণনা করে তার সমালোচনা করেননি। (রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯৬) তবে আল্লামা কাসানি (রহ.) বলেছেন, এ হিলার ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন রয়েছে। সেটি হলো, অন্তর্গত দিক থেকে যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে তার কব্জাটি আসল মালিকের মতো। সুতরাং পণ্যের ক্ষেত্রে তার কব্জা বহাল থাকায় তা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধক হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৭৮) এভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব যে, সবদিক থেকে যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে তার কব্জাটি আসল মালিকের কব্জার মতো না। আমানত রক্ষকের কাছ থেকে যে কোনো সময় তা ফেরত নেওয়া যায়। ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো, আমানত রক্ষক

আলোচিত মাসআলাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, অনেক সময় পিতা তার আসবাবপত্রসহ বাড়িতে অবস্থান করা সত্ত্বেও তার সন্তানকে বাড়ি দান করে দেয়। সুতরাং পিতা যদি আমানতস্বরূপ সন্তানকে তার আসবাবপত্র কব্জা করার অনুমতি দেয় এবং দান করার পর সন্তানের নামে তা রেজিস্ট্রেশন করে দিয়ে এ কথা বলে যে, এরপরও ধার হিসাবে সন্তানের অনুমতিক্রমে সে ওই বাড়িতে থাকবে, আর সন্তান এ বিষয়গুলো কবুল করে নেয়, তা হলে দান সম্পন্ন হওয়ার জন্য এ কব্জা যথেষ্ট হওয়া উচিত। والله تعالى أعلم

১৭৫. ভাড়া দেওয়া বাড়ি কব্জা করা

যদি কোনো বাড়ি ভাড়া দেওয়া থাকে, তা হলে ভাড়া গ্রহীতার অনুমতিক্রমে মালিকের জন্য ওই বাড়ি বিক্রয় করা জায়েয। তবে ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কব্জা সম্পন্ন হবে না। আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) বলেছেন–

ويدخل في الشغل بحق الغير ما لو كانت الدار مأجورة، فليس للبائع مطالبة المشتري بالثمن لعدم القبض.

'বাড়িটি যদি ভাড়া দেওয়া থাকে, তা হলে তা অন্যের অধিকার সম্পৃক্তের আওতাভুক্ত হবে। সুতরাং কব্জা না-হওয়ার কারণে বিক্রেতা ক্রেতার কাছে মূল্য দাবি করতে পারবে না।'

এ কথার পর 'জামেউল ফুসুলাইন' কিতাব হতে তিনি উদ্ধৃত করেছেন–

باع المستأجر (يعني الدار المؤجرة) ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع، فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم.

আমানতের সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে মালিকের প্রতি অনুগ্রহ করছে। আর অনুগ্রহের বিষয়টি ওই জিনিস নষ্ট হলে অনুগ্রহকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব করে না। সুতরাং আমানত রক্ষকের কাছ থেকে নষ্ট হওয়ার অর্থ হলো মালিকের কাছ থেকে নষ্ট হওয়া। ফুকাহায়ে কেরাম কর্তৃক 'আমানত রক্ষকের কব্জা আসল মালিকের কব্জা' বলার উদ্দেশ্যে এটি। (আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি, অধ্যায়: আমানত) আর উপহারদাতার কব্জা থাকা এ কারণে উপহার সম্পন্ন হওয়ার প্রতিবন্ধক হয় যে, যাকে উপহার দেওয়া হয়েছে তার হস্তক্ষেপে বাধা সৃষ্টি করে। আর উপহারের জিনিসটি যখন যাকে উপহার দেওয়া হয়েছে আমানত হিসাবে তার কব্জায় থাকে, তখন তাতে হস্তক্ষেপে বাধা সৃষ্টি করে না। আর তার জন্য এ সুযোগ রয়েছে যে, ইচ্ছেমতো যে কোনো সময় উপহারদাতার জিনিস ফেরত দেবে।

'ভাড়াদাতা ভাড়া দেওয়া বাড়ি বিক্রয় করল এবং ক্রেতা এ ব্যাপারে রাজি হলো যে, ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বিক্রয়চুক্তি বাতিল করবে না, মেয়াদ শেষ হলে কব্জা করবে, তা হলে ক্রেতার জন্য মেয়াদের আগে হস্তান্তরের দাবি করা এবং বিক্রেতার জন্য পণ্য হস্তান্তর করার আগে মূল্য চাওয়া জায়েয নেই।'[৮৫১]

ভাড়া গ্রহীতা যদি বিক্রেতা থেকে ভাড়াচুক্তি বাতিল করে ক্রেতার সঙ্গে নতুন চুক্তি করে, তা হলে এক্ষেত্রে স্পষ্ট কথা হলো, ক্রেতার সঙ্গে আগের ভাড়া গ্রহীতার নতুন ভাড়া চুক্তি করার মাধ্যমে কব্জা সম্পন্ন হবে। কারণ, এতে ক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্যের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং এ চুক্তিটি কব্জার স্থলাভিষিক্ত হবে। 'শারহুল মাজাল্লাহ' কিতাবে 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' কিতাব হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে–

وإن كانت دارا فأجرها المشتري، إن سلمها إلى المستأجر، صار قابضا، وإلا فلا.

'ক্রয়কৃত পণ্যটি যদি বাড়ি হয় এবং ক্রেতা তা ভাড়া দিয়ে ভাড়া গ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করে, তা হলে সেটি কব্জা হিসাবে সাব্যস্ত হবে, অন্যথায় হবে না।'[৮৫২]

বিক্রেতা যদি বলে, 'এভাবে তোমার কাছে বাড়িটি হস্তান্তর করলাম যে, আজ থেকে তুমি এ বাড়ির ভাড়া পাবে' এবং ভাড়া গ্রহীতা তা কবুল করে, তা হলে কি শুধু এ কথার কারণে ক্রেতার পক্ষ হতে নতুন ভাড়া কার্যকর হবে? এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর হলো, হ্যাঁ। কারণ, ব্যবহৃত জিনিসের ক্ষেত্রে এমন কথাকে কব্জা সাব্যস্ত করার প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রের আইনে রয়েছে, বিক্রেতা যদি তার ভাড়া দেওয়া বাড়ি বিক্রয় করে ক্রেতার নামে রেজিস্ট্রি করে দেয়, তা হলে আইন অনুযায়ী ক্রেতার পক্ষ থেকে ভাড়াচুক্তি হবে। তাই বিক্রেতা হতে ভাড়াচুক্তি বাতিল হয়ে ক্রেতার সঙ্গে সংঘটিত হবে। সামাজিক প্রচলনের দাবি অনুযায়ী এটি নতুন ভাড়াচুক্তি বৈধ হওয়ার দলিল। তা ছাড়া

---

৮৫১. রাদ্দুল মুহতার, পরিচ্ছেদঃ অনুগামী হিসাবে কোন জিনিস বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হবে : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২৩৫, ফিকরাহ নং ২২৫৬৫।

৮৫২. শারহুল মাজাল্লাহ, আল্লামা খালেদ আতাসি (রহ.), ধারা নং ২৭৫ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৭।

‘বাদায়েউস সানায়ে’ কিতাবের ‘শর্তের অধিকারের’ আলোচনাটি এ কথাকে সমর্থন করে—

ولو كان فيها (أي في الدار) ساكن بأجر، فباعها البائع برضا المستأجر، وشرط الخيار للمشتري، فتركه المشتري فيها أو استأوى الغلة، فهو إجازة؛ لأن الأجرة بدل المنفعة، فكان أخذها دلالة قصد تملك المنفعة أو تقرير ملك المنفعة، وذلك قصد تملك الدار أو تقرر ملكه فيها، فكان إجازة.

‘যদি কেউ ভাড়া দিয়ে বাড়িতে বসবাস করে এবং ভাড়া গ্রহীতার সন্তুষ্টিতে মালিক তা বিক্রয় করে এবং ক্রেতার খিয়ার থাকার শর্তারোপ করে, এরপর ক্রেতা ভাড়া গ্রহীতাকে সেখানে বসবাস করতে দেয় অথবা তার ফসল রাখতে দেয়, তা হলে তা ভাড়াচুক্তির অনুমোদন হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ, ভাড়া হলো উপকারিতার বিনিময়। সুতরাং বিনিময় গ্রহণ করার অর্থ হলো তাকে উপকারিতার মালিক বানানো বা উপকারিতার মালিকানায় বহাল রাখা। আর এটি মালিকানা অর্জনের প্রমাণ বা তার মালিকানা স্থিতিশীল করার দলিল। সুতরাং তা ভাড়াচুক্তির অনুমোদন হিসাবে বিবেচিত হবে।’[৮৫৩]

১৭৬. জমি রেজিস্ট্রেশনকে কজা সাব্যস্ত করা হবে কি না

শাইখ মুস্তাফা যারকা (রহ.) জমি কজার একটি ভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

يجب الانتباه اليوم إلى أنه في البلاد التي يوجد فيها سجل ونظام عقاريان بحيث تكون قيود السجل هي المعتبرة في ثبوت الحقوق العقارية وانتقالها كما في بلادنا (أي السورية) يعتبر تسجيل بيع العقار في صحيفته من السجل العقاري في حكم التسليم الكافي، ولو كانت الدار مشغولة بأمتعة البائع أو بحقوق مستأجر. ذلك لأن قيد

৮৫৩. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃ. ৫৩৯।
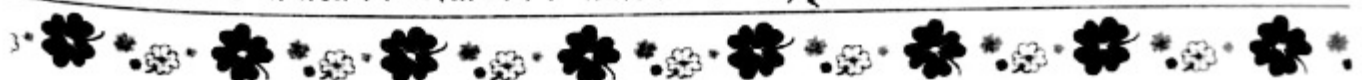
السجل عندئذ يغني عن التسليم الفعلي، ويقطع علاقة البائع بالأرض فيصبح أجنبيا. وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض السورية. وإذا ظل بائع العقار شاغلا له بعد التسجيل وممتنعا عن تفريغه وتسليمه، تنزع يده عنه بقوة القضاء، كما لو شغله غصبا بلا حق بعد التسليم، فيبقى هذا الحكم الفقهي (أي عدم اعتبار القبض إن كان العقار مشغولا بملك البائع) بالنسبة إلى الأموال غير المنقولة مقصورا على الأماكن التي ليس فيها سجل ونطام عقاريان من هذا القبيل.

'বর্তমান সময়ে এটি জানা আবশ্যক যে, যেসব দেশে ভূমি রেজিস্ট্রেশনের এমন আইন রয়েছে যে, ভূমির অধিকার সাব্যস্ত হওয়া ও মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের শর্তসমূহকেই গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়। যেমন, আমাদের দেশে (সিরিয়া) এমন আইন রয়েছে। জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিস্ট্রেশনকে হস্তান্তরের জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত করা হয়। বাড়িটি যদি বিক্রেতার আসবাবপত্র অথবা ভাড়া গ্রহীতার অধিকার-সম্বলিত হয়, তা হলেও এমন হুকুম হবে। কেননা, বর্তমান সময়ের রেজিস্ট্রেশনের শর্তসমূহের কারণে সরাসরি হস্তান্তরের প্রয়োজন হয় না এবং বিক্রেতার সঙ্গে জমির সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে সে অপরিচিতের মতো হয়ে যায়। এটির ওপর সিরিয়ার মালিকানা বাতিলকরণ আইন রয়েছে। রেজিস্ট্রেশন করার পর জমির বিক্রেতা যদি তা দখল করে রাখে এবং তা খালি করে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়, তা হলে বিচারের মাধ্যমে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যেমনভাবে কেউ হস্তান্তরের পর অন্যায়ভাবে তাতে জবরদখল করে রাখলে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং এ ফিকহি হুকুমটি (অর্থাৎ, জমিতে বিক্রেতার আসবাবপত্র থাকলে তাকে কব্জা সাব্যস্ত না-করা) সেসব স্থানান্তর অযোগ্য জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যেগুলোর ক্ষেত্রে এ ধরনের ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইন ও রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি নেই।'[৮৫৪]

৮৫৪. আল-মাদখালুল ফিকহিল আম : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭০৬, (টীকা) দারুল কলম, দামেশক থেকে প্রকাশিত।

আলোচনার অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন—
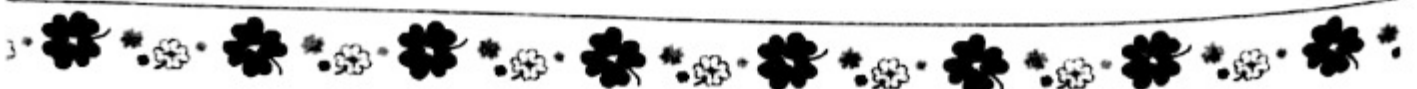
بعد وجود الأحكام القانونية التي تخضع العقود العقارية للتسجيل في السجل العقاري استقر الاجتهاد القضائي أخيرا لدينا على اعتبار التسليم حاصلا بمجرد تسجيل العقد في السجل العقاري، فمن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من عهدة المشتري، لأن تسجيل البيع فيه تمكين للمشتري أكثر مما في التسليم الفعلي، إذ العبرة في الملكية العقارية قانونا لقيود السجل العقاري، لا للأيدي والتصرفات، وبتسجيل البيع لم يبق البائع متمكنا أن يتصرف في العقار المبيع بعقد آخر استنادا إلى وجوده في يده، وجميع الحقوق والدعاوي المتفرعة عن الملكية، كطلب نزع اليد، وطلب الأجرة، غير ذلك تنتقل إلى المشتري بمجرد التسجيل.

'জমি বিক্রয়চুক্তিকে রেজিস্ট্রেশনের আওতাভুক্ত করার মতো ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইন থাকার পর শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে বিষয়টি এমন হয়েছে যে, ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইনে রেজিস্ট্রেশন করলে হস্তান্তরের বিষয়টি পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং রেজিস্ট্রেশনের তারিখ থেকে বিক্রেতা হতে পণ্য ধ্বংসের জামানত ক্রেতার দায়িত্বে চলে যাবে। কারণ, বিক্রয়ের রেজিস্ট্রেশন সরাসরি হস্তান্তর অপেক্ষা ক্রেতাকে বেশি সুযোগ দেয়। কেননা, আইনি দৃষ্টিকোণে জমির মালিকানা রেজিস্ট্রেশনের শর্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত, দখল বা নিয়ন্ত্রণাধিকারের সঙ্গে নয়। আর রেজিস্ট্রেশন করার কারণে বিক্রেতার দখলে ওই পণ্য থাকার পরও সে অন্যের কাছে তা বিক্রয় বা তার মালিকানা-সম্পৃক্ত সব শর্ত ও স্বত্ব কাউকে দিতে পারবে না। যেমন, দখলমুক্ত করা, ভাড়া নেওয়া ও অনুরূপ বিষয়গুলো রেজিস্ট্রেশন করার সঙ্গে-সঙ্গে ক্রেতার কাছে চলে যাবে।'[৮৫৫]

৮৫৫. আল-মাদখালুল ফিকহিল আম, পরিচ্ছেদ: ৯, প্রচলনের দৃষ্টিভঙ্গি : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৫৪।
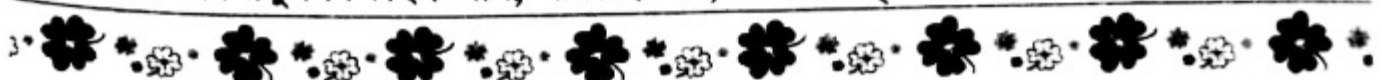
অনেক সময় শাইখ যারকা (রহ.)-এর মতের ওপর এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইনের দৃষ্টিকোণে মালিকানা সাব্যস্তকারী ছাড়া আর কিছুই নেই। আর কব্জা করা মালিকানা অর্জনের তুলনায় একটি ভিন্ন বিষয়। শাইখের বক্তব্যের এ অংশটি– 'মালিকানা-সম্পৃক্ত সব শর্ত ও স্বত্ব কাউকে দিতে পারবে না। যেমন, দখলমুক্ত করা, ভাড়া নেওয়া ও অনুরূপ বিষয়গুলো রেজিস্ট্রেশন করার সঙ্গে-সঙ্গে ক্রেতার কাছে চলে যাবে' –এ কথার স্বীকারোক্তি যে, বিক্রেতার দখলমুক্ত করতে ক্রেতাকে (আদালতে) দাবি উত্থাপন করতে হবে এবং জমিটি বিক্রেতার দখলে থাকবে। এমনকি রেজিস্ট্রেশনের পরও বিক্রেতার কব্জায় থাকবে। শাইখ (রহ.) এভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, ক্রেতার নামে জমি রেজিস্ট্রেশন করার পর বাস্তবে মূল্য পরিশোধ করা ছাড়াই আইনের দৃষ্টিতে ক্রেতা দখলমুক্ত করার দাবি করতে পারবে। আর বিচারিক দিক থেকে এভাবে বিক্রেতাকে দখলমুক্ত করা হবে যে, জমির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ... সুতরাং আইনের দৃষ্টিকোণ হতে রেজিস্ট্রেশন করা যদি পণ্য হস্তান্তর সাব্যস্ত না-করা হতো, তা হলে বিক্রেতার জন্য রেজিস্ট্রেশন করার পর মূল্য পরিশোধ করা পর্যন্ত বিক্রয়কৃত পণ্য আটকে রাখার অধিকার থাকত। অথচ কেউ এমন মত দেয়নি।[৮৫৬]

তবে শাইখ যে মত দিয়েছেন, তা দুভাবে প্রশ্নবিদ্ধ :

১. শরয়ি দৃষ্টিতে বিক্রেতার জিম্মাদারি হতে ক্রেতার জিম্মাদারিতে পণ্যের দায়ভার স্থানান্তর হওয়ার মাধ্যমে কব্জা সম্পন্ন হয়। সুতরাং এখন প্রশ্ন হয়, যদি ক্রেতার নামে কোনো বাড়ি রেজিস্ট্রেশন করা হয়, তবে বিক্রেতা বাস্তবে তা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে এবং তার দখলে রাখার পর বাস্তবে দখলমুক্ত করার আগে তা নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে এক্ষেত্রে কি ক্রেতার মাল নষ্ট হয়েছে বলা যাবে? স্পষ্ট উত্তর হলো, না (এমন বলা যাবে না)। অনুরূপভাবে এ কথার মাধ্যমে শাইখ (রহ.) যে দলিল দিয়েছেন যে, শুধু আইনি রেজিস্ট্রেশন করলেই বন্ধকের হুকুম কার্যকর হবে। যদি জমিটি বন্ধকদাতার দখলে থাকে, তা হলে তাকে কব্জাকৃত বন্ধক সাব্যস্ত করা যাবে না; বরং কব্জাহীন বন্ধক সাব্যস্ত করতে হবে। সুতরাং যদি বন্ধকদাতার দখলে থাকা অবস্থায় তা নষ্ট হয়,

৮৫৬. আকদুল বায়, শাইখ মুস্তাফা যারকা (রহ.), পৃষ্ঠা-১১৯।
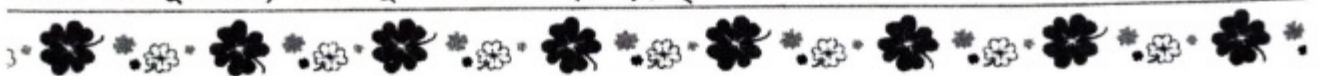
তা হলে তার সম্পদ হতে নষ্ট হয়েছে বলে সাব্যস্ত করতে হবে। কব্জাকৃত জিনিসের দায়ভারের মতো তার ওপর বাজারমূল্য ও ঋণ উভয়ের মধ্যের কমমূল্যের দায়ভার বর্তাবে না। হানাফি মাযহাবে যাকে الرهن الحيازي (সংরক্ষিত বন্ধক) হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়।

২. অনেক দেশে ট্যাক্স ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে মালিক ছাড়া অন্যের নামে জমি রেজিস্ট্রেশনের প্রচলন রয়েছে। 'কৃত্রিম ও বাধ্য হয়ে বিক্রয়ের' আলোচনায় আমরা বলেছি, এমন ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কারণে কৃত্রিম চুক্তি হয়ে থাকে। এমন ক্ষেত্রে আসল মালিকের কাছে শক্তিশালী প্রমাণ থাকলে শরয়ি দৃষ্টিতে মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্য শুধু রেজিস্ট্রেশন যথেষ্ট নয়। কব্জা সাব্যস্ত হওয়ার বিষয় তো আরও দূরের কথা। ইতঃপূর্বে বলেছি, অনেক দেশে কৃত্রিম বিক্রয়ের বিষয়টি আইন-স্বীকৃত। ড. আবদুর রাযযাক সানহুরি (রহ.) বলেছেন–

أما بالنسبة للمتعادين والورثة، فالعقد الصوري لا وجود له، والعقد الحقيقى هو الذي يسري في حقهم بقدر ما تتوافر فيه شروط الصحة، ونحن في هذا إنما نطبق مبدأ سلطان الإرادة، فالمتعاقدان قد أرادا العقد المستتر، لا العقد الظاهر، فيلتزمان بما أراده، لا بما لا يريداه، وهذا يتفق مع ما تقتضي به المادة ١٣٢١ من القانون المدني الفرنسي من أن العقود المستترة لا تنتج أثرها إلا فيما بين المتعاقدين، وقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا على ذلك، كما أن الفقه والقضاء في مصر قد سلما بالمبدأ أيضا دون نص، لاتفاقه مع القواعد العامة.

'তবে চুক্তির উভয় পক্ষ ও ওয়ারিশদের ক্ষেত্রে দেখানো চুক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রকৃত চুক্তি সেটি, বিক্রয়চুক্তি সহিহ হওয়ার শর্ত অনুপাতে যেটি তাদের অধিকারভুক্ত হয়। এ ব্যাপারে আমরা ইচ্ছার কর্তৃত্বের দর্শনকেই কার্যকর হিসাবে গণ্য করছি, যেখানে উভয়পক্ষ গোপন চুক্তিটিকেই মূল চুক্তি সাব্যস্ত করতে চাচ্ছে, বাহ্যিকটিকে না। তাই তাদের পূর্বের ইচ্ছেটি তাদের জন্য আবশ্যক হবে, পরের কথা আবশ্যক হবে না। ফ্রান্সের নাগরিক আইনের ১৩২১ নম্বর ধারার সঙ্গে এ সিদ্ধান্তের মিল রয়েছে। সেখানে আছে, গোপন চুক্তিটি শুধু ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষেত্রে কাজে

> আসবে। ফ্রান্সের বিচার ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এটি অনুসরণ করা হয়েছে। যেমনভাবে মিশরের বিচার ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য উল্লেখ ছাড়াই এ দর্শনকে ঠিক রেখেছে। কারণ, সাধারণ মূলনীতিসমূহের সঙ্গে তার মিল রয়েছে।'[৮৫৭]

এটি থেকে স্পষ্ট হলো, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যকার কৃত্রিম বিক্রয়টি আইন-স্বীকৃত। সুতরাং চুক্তিটি যেমন কৃত্রিম হতে পারে, তেমনি করে রেজিস্ট্রেশনও কৃত্রিম হতে পারে। ব্রিটিশ আইন কৃত্রিম মালিকানাকে (ostensible owner) স্বীকৃতি দিয়েছে। আর তা হলো, একজনের নামে রেজিস্ট্রেশন করা হবে, তবে সে প্রকৃত মালিক (real owner) হবে না। 'মালিকানা পরিবর্তন' আইনের ৪১ নম্বর আইনে অনুরূপ উল্লেখ আছে। (Transfer of Property Act 1882)

সুতরাং আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ফিকহে ইসলামিতে রেজিস্ট্রেশনকে জিম্মাদারি পরিবর্তনকারী কব্জা সাব্যস্ত করার সুযোগ নেই। তবে আমাদের ইতঃপূর্বের আলোচনা অনুযায়ী যদি কব্জা পাওয়া যায়, তা হলে তাকে কব্জা সাব্যস্ত করার সুযোগ আছে। আর সেসব আলোচনার একটি হলো, জমিটি আগে থেকে ভাড়া দেওয়া ছিল এবং ক্রেতা ওই ভাড়া গ্রহীতার সঙ্গে সরাসরি বা কৃত্রিমভাবে ভাড়ার চুক্তি করবে। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। والله تعالى أعلم

---

৮৫৭. নযরিয়াতুল আকদ, ড. আবদুর রাযযাক , পৃষ্ঠা-৮৩৫-৮৩৬, ফিকরাহ নং ৭৫৬।
শাইখ মুস্তাফা যারকা (রহ.) যে আইনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, সেটি ১৯২৬ সনে ১৮৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রকাশিত হয়েছিল। স্বল্প সময়ের জন্য আমি সে আইনের সামাজিক গতি ও জাতীয় অবস্থান প্রত্যক্ষ করেছি। আর সেখান থেকেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আরও অধিক মামলা পর্যালোচনা থেকে বুঝতে পারছি যে, সে আইনের মূল ভূমিকা হলো অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা। 'কাগজে জমি রেজিস্ট্রেশন হস্তান্তরের জন্য যথেষ্ট' এ ধারাকে পুঁজি করেই তারা এমন আইন করেছে। যাতে করে পরে অন্যের কাছে জমির দলিল হস্তান্তর করতে পারে এবং সেও অন্যের কাছে হস্তান্তর করবে। এভাবে চলতে থাকবে। তাদের প্রত্যেকেই ভালো নিয়ত ও দলিলকে মূল পুঁজি বানাবে। তাদের প্রত্যেকেরই উক্ত জমিতে মামলা করা, নতুনভাবে মূল্য দাবি করা বা পূর্বের সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি করার সুযোগ থেকে যায়। এক্ষেত্রে ক্রেতারা তাদের ওয়ারিশদের জন্য বাড়ি ও জমি রাখার পরিবর্তে মামলা ও বিবাদ ছাড়া বেশি কিছু রেখে যেতে পারে না। শাইখ যারকা (রহ.) যদি উক্ত আইনের বিস্তারিত জানতেন এবং তার খারাপ প্রভাব সম্পর্কে অবগত হতেন, তা হলে তিনি এমন মত প্রকাশ করতেন না। বরং লেখকের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতেন।

১৭৭. 'কাইলি'[৮৫৮] ও 'ওজনি' জিনিস কব্জা করা

কাইলি ও ওজনি জিনিস যদি অনুমান করে বিক্রয় করা হয়, তা হলে তার হুকুম হবে স্থানান্তরযোগ্য জিনিস গণনা করে বিক্রয়ের অনুরূপ। সামনে এর হুকুম আলোচনা করা হবে– ইনশাআল্লাহ। তবে যদি কাইল ও ওজন করে বিক্রয় করা হয়, তা হলে তার কব্জা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, কাইলি জিনিস কাইল করা ও ওজনি জিনিস ওজন করা ছাড়া কব্জা সম্পন্ন হবে না।[৮৫৯] মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, এ ধরনের জিনিস কব্জা সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া হলো, ক্রেতার পাত্রে দিয়ে দেওয়া। এমনকি আল্লামা দুসুকি (রহ.) বলেছেন–

وأما إذا هلك حال تفريغه فيها فضمانه من البائع إن كان التفريغ منه

'এমনকি ক্রেতার পাত্রে দেওয়ার সময় যদি পণ্য নষ্ট হয়ে যায় এবং বিক্রেতার পক্ষ হতে পণ্য ঢালা হয়, তা হলে বিক্রেতার ওপরই তার দায়ভার বর্তাবে।'[৮৬০]

হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, শুধু খালি করার মাধ্যমেই কব্জা সম্পন্ন হবে। অর্থাৎ, ক্রেতার কাছে বস্তুর জিম্মাদারি চলে যাবে। তবে তা কাইল বা ওজন করার আগে ক্রেতার জন্য বিক্রয় করা জায়েয নেই। তার কারণ হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন রাসুল (ﷺ) বলেছেন–

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.

'যে ব্যক্তি খাবার ক্রয় করবে, সে যেন তা কাইল করার আগে বিক্রয় না-করে।'[৮৬১]

১৭৮. جريان الصاعين বা দুই 'সা' কার্যকর হওয়ার উদ্দেশ্য

অনুরূপভাবে ক্রেতা যদি বিক্রেতা হতে কাইল বা ওজন হিসাবে ক্রয় করার

---

৮৫৮. কাইলি : পাত্র দিয়ে যে-বস্তু পরিমাপ করে বিক্রি করা হয়, তাকে কাইলি বস্তু বলে। আর দাঁড়িপাল্লা বা ওয়িং স্কেল দিয়ে ওজন মেপে যে-জিনিস বিক্রি করা হয় তাকে ওজনি জিনিস বলে। –সম্পাদক

৮৫৯. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২০।

৮৬০. আদ-দুসুকি আলা শারহি মুখতাসারি খলিল : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৪।

৮৬১. সহিহ মুসলিম, পরিচ্ছেদ : কব্জা করার আগে পণ্য বিক্রয় করা বাতিল, হাদিস নং ৩৮১৪।

পর অন্যের কাছে কাইল বা ওজন হিসাবে বিক্রয় করে, তা হলে দ্বিতীয় ক্রেতার পক্ষ হতে দ্বিতীয়বার কাইল বা ওজন করা ছাড়া তা বিক্রয় বা তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নেই। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিক্রেতার জন্য প্রথম বিক্রেতার কাইল বা ওজন করা যথেষ্ট হবে না। দ্বিতীয় ক্রেতার উপস্থিতিতে আগের মাপ সম্পন্ন হলেও জায়েয হবে না।[৮৬২] কেননা, হযরত জাবের (রাযি.) বর্ণনা করেছেন–

> نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي

> 'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাবারের মধ্যে দুই 'সা' কার্যকর হওয়ার আগে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। বিক্রেতার 'সা' ও ক্রেতার 'সা'।'[৮৬৩]

হাদিসের একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবি লাইলা (রহ.)-এর কারণে হাদিসটিকে ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে সব মুজতাহিদ হাদিসটি কবুল করেছেন।

সঠিক কথা হলো, দুই 'সা' কার্যকর হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, কেউ কিছু ক্রয় করার পর তা মাপা ছাড়া বিক্রয় করতে পারবে না। সুতরাং বিক্রেতা তার কাইলি জিনিস বিক্রয় করলে প্রথমে তার পক্ষ হতে নিজের জন্য কাইল করবে। এরপর ক্রেতা তা বিক্রয় করতে চাইলে ক্রেতার পক্ষ হতে আবারও কাইল করতে হবে। অতএব, দুটি চুক্তির দিক থেকে একাধিক কাইল হলো। হাদিসের উদ্দেশ্য এমন নয় যে, একটি চুক্তির মধ্যে দুইবার কাইল করতে হবে।

ইমাম বাযযার (রহ.) কর্তৃক হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদিসটি এ কথার পক্ষে দলিল। তিনি বলেছেন–

> نَهَى رسُول الله –صلى الله عليه وسلم– عَنْ بَيْعِ الطعامِ حتى يَجرِيَ فيهِ الصَّاعان: صاعُ البائعِ، وصاعُ المشترِي فَيكون لِصَاحِبِهِ الزِيَادَة وَعَلِيهِ النقصانُ.

> 'খাদ্যের মধ্যে দুই 'সা' কার্যকর হওয়ার আগে রাসুল (সাল্লাল্লাহু

---

৮৬২. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, বিক্রয়ের হুকুম : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৯৯।

৮৬৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, ব্যবসায় সম্পর্কে, হাদিস নং ২২২৮।
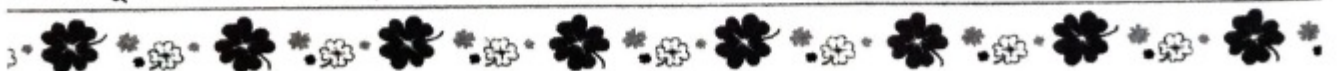
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। একটি বিক্রেতার 'সা' ও অপরটি ক্রেতার 'সা'। তা হলে পণ্যের মালিক পণ্যের বেশি-হওয়া অংশটুকু পাবে, কিন্তু পণ্য কম হয়ে গেলে সেটিও তারই উপর বর্তাবে।'

আল্লামা যাইলায়ি (রহ.) 'নাসবুর রায়াহ' এবং হাফিযুল হাদিস ইবনে হাজার (রহ.) 'আদ-দিরায়াহ' কিতাবে হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন, হাদিসটির সনদ জায়্যিদ।[৮৬৪]

এটি প্রমাণ করে যে, 'দুই 'সা' কার্যকর হওয়ার আগে বিক্রয় করা নিষেধ সম্পর্কিত হাদিসটির মূল কারণ হলো, বিক্রেতার অধিকার থেকে ক্রেতার অধিকার বা ক্রেতার অধিকার থেকে বিক্রেতার অধিকারের মধ্যে পার্থক্য সাধন করা। আর ক্রেতার উপস্থিতিতে যদি একবার 'সা'র মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়, তা হলে এ পার্থক্য সাধন হয়। কেবল একাধিক চুক্তির ক্ষেত্রে একাধিক পরিমাপ করা জরুরি। এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাব, তবে শাফেয়ি মাযহাব এ সিদ্ধান্তের বিপরীত। والله تعالى أعلم[৮৬৫]

তারপর আল্লামা বাবারতি (রহ.) 'আল-ইনায়াহ'[৮৬৬] কিতাবে যে আলোচনা করেছেন তার সারকথা হলো, যেসব ব্যক্তি কাইলি বা ওজনি জিনিস ক্রয় করার পর তা ব্যবহার করার ইচ্ছা করে, এটি চারভাবে হতে পারে :

১. কাইলি হিসাবে ক্রয় করার পর কাইলি হিসাবে বিক্রয় করবে। এক্ষেত্রে সেখানে দুই 'সা' কার্যকর হচ্ছে। প্রথম ক্রেতা নিজের জন্য পরিমাপ করবে এবং দ্বিতীয় ক্রেতাও নিজের জন্য পরিমাপ করবে। কারণ, এখানে এমন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, আগের বিক্রেতা শর্তকৃত

---

৮৬৪. মুসনাদে বাযযার, কাশফ কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত আছে, হাদিস নং ১২৬৫। মাজমাউয যাওয়ায়েদ : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯।

৮৬৫. হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে, বিক্রয়ের পর ক্রেতার উপস্থিতিতে বিক্রেতা কাইল করলে সে ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী বিক্রয়ের জন্য তা যথেষ্ট হবে না, ... সহিহ মত হলো, সেটিই যথেষ্ট হবে। (ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪১) ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.)-এর আল-মুগনি কিতাবে বর্ণিত আছে, বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে তুমি যে কাইল করতে দেখলে সে অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করো। এ কথার পর ক্রেতা তা গ্রহণ করে, তা হলে বিক্রয় সহিহ হবে। কারণ, সে নিজে কাইল করা দেখেছে এবং তার পরিমাণ জেনেছে। সুতরাং দ্বিতীয় কাইল করার কোনো অর্থ থাকে না। তাঁর থেকে না-জায়েয হওয়ার একটি মত বর্ণিত আছে, যেটি শাফেয়ি মাযহাব। (আল-মুগনি : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২২)

৮৬৬. আল-ইনায়াহ, আল্লামা বাবারতি (রহ.), ফাতহুল কাদিরের সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৯।
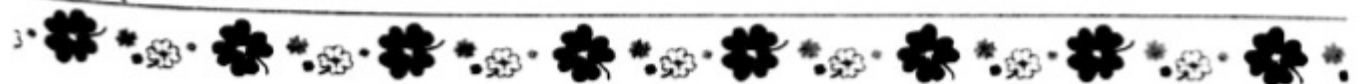
পরিমাণের চেয়ে বেশি দিয়েছে, আর এমন দিয়ে থাকলে তা বিক্রেতার সম্পদ সাব্যস্ত হবে এবং অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ করা হারাম। সুতরাং তা পরিহার করা ওয়াজিব।

২. অনুমান করে ক্রয় করে সেভাবেই বিক্রয় করবে। এক্ষেত্রে কাইলের মাধ্যমে মাপার প্রয়োজন নেই। কারণ, সেখানে পরিমাণ নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

৩. কাইলি পরিমাপে ক্রয় করার পর অনুমান করে বিক্রয় করবে। তখন প্রথম ক্রেতার জন্য মাপতে হবে, দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য মাপতে হবে না।

৪. অনুমান করে ক্রয় করার পর কাইলি পরিমাপে বিক্রয় করবে। তখন প্রথম ক্রেতার জন্য মাপতে হবে না, দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য মাপতে হবে।

এরপর বুঝতে হবে, ইতঃপূর্বে ক্রেতার উপস্থিতিতে বিক্রেতার কাইলি পরিমাপ ক্রেতার জন্য যথেষ্ট হওয়া সম্পর্কে যা বলেছি সেটি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন বিক্রয়ের পর কাইলের মাধ্যমে পরিমাপ করা হবে। আর যদি বিক্রয়ের আগে কাইল করা হয়, তা হলে পূর্বের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেছেন, কারোর উপস্থিতিতে খাদ্য কাইল করার পর ওই মজলিসেই সে ক্রয় করলে নতুন করে কাইল করার আগে অন্যের কাছে কাইল হিসাবে বিক্রয় করা যাবে না। বিক্রয় করলে তা জায়েয হবে না (দ্বিতীয় বিক্রয় সহিহ হবে না)। ক্রেতা প্রথমে কাইল করে নিলেও বিক্রয় জায়েয হবে না। কারণ, সে ক্রয় করার পর যখন কাইল করল না, তখন তা কব্জা হলো না। (অর্থাৎ, ইতঃপূর্বের উল্লিখিত আল্লামা কাসানি রহ.-এর আলোচনা অনুযায়ী বিক্রয় জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে কব্জা হলো না। অন্যথায় দায়ভার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তা কব্জা হয়েছে)। অতএব তার বিক্রয়টি কব্জাহীন জিনিস বিক্রয় করা হলো, তাই তা জায়েয হবে না। বিস্তারিত জানতে 'ফাতহুল কাদির' ও 'ইলাউস সুনান'-এর দুই 'সা' কার্যকর হওয়ার আগে বিক্রয় করতে নিষেধাজ্ঞার পরিচ্ছেদ দেখুন। এ মাসআলা সম্পর্কে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা পাবেন।[৮৬৭]

আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)-এ মত সমর্থন করেছেন যে, ভিন্ন দুটি চুক্তির ক্ষেত্রে দুই সা কার্যকর করা জরুরি নয়। সুতরাং

---

৮৬৭. ফাতহুল কাদির : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৯। ইলাউস সুনান : খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৭৬–১৮২।
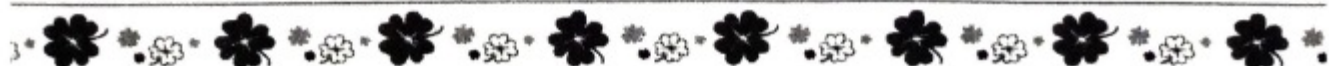
কেউ যদি কাইলি পরিমাপে কোনো খাবার ক্রয় করার পর উক্ত কাইল করা দেখেছে এমন ব্যক্তির কাছে ওই পণ্য বিক্রয় করে, তা হলে তার দেখা দ্বিতীয়বার কাইলি পরিমাপ করার ব্যাপারে যথেষ্ট হবে। কারণ, মূল উদ্দেশ্য হলো, পণ্য নির্দিষ্ট হওয়া এবং তা পাওয়া যাচ্ছে। তবে যদি দ্বিতীয়বার কাইলি পরিমাপ করে, তা হলে ভালো হবে। সুতরাং ভিন্ন দুটি চুক্তিতে একাধিক পরিমাপ করার প্রয়োজন নেই। সম্ভবত শাইখ (রহ.) 'সুনানে ইবনে মাজাহ'-এর হাদিসকে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন।[৮৬৮]

শাইখ (রহ.) যা বলেছেন, তা ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাবের অনুরূপ। ইমাম ইবনে রুশদ (রহ.) বলেছেন—

> اختلف العلماء فيمن أسلم إلى آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما فأخبر البائع أو المسلم إليه المشتري بكيل الطعام، هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله المسلم فيه، وأن يعمل في ذلك على تصديقه؟ فقال مالك : ذلك جائز في السلم، وفي البيع بشرط النقد، وإلا خيف أن يكون من باب الربا، كأنه إنما صدقه في الكيل لمكان أنه أنظره بالثمن.
>
> 'উলামায়ে কেরাম সেক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন, যেখানে কেউ নির্দিষ্ট পরিমাপে অন্যের কাছে বাইয়ে সালাম করল বা খাবার বিক্রয় করার পর বিক্রেতা বা যার সঙ্গে বাইয়ে সালাম করছে সে খাবার পরিমাপের বিষয়টি ক্রেতাকে জানাল। এক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য কি নতুন করে পরিমাপ করা ছাড়া কব্জা করা জায়েয হবে? এক্ষেত্রে কি সে বিক্রেতার কথার ওপর বিশ্বাস করবে? উত্তরে ইমাম মালেক (রহ.) বললেন, বাইয়ে সালাম ও নগদ মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জায়েয। অন্যথায় তা সুদের আওতাভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়ে যায়। সুতরাং সে যেন এ কারণে কাইলের ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস করেছে যে, সে তাকে মূল্যের ক্ষেত্রে সুযোগ দিয়েছে।'[৮৬৯]

এ মতটি সবচেয়ে সহজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

---

৮৬৮. ফয়যুল বারি, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: বিক্রেতা ও ক্রেতার সামনে কাইল করা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২০।

৮৬৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৭।
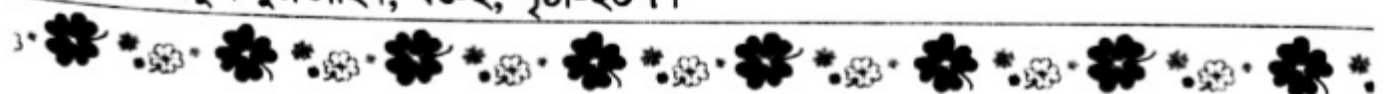
১৭৯. প্যাকেটজাত পণ্য কব্জা করা

বর্তমান যুগে ওজনি জিনিসকে প্যাকেটজাত করে তার ওপর পরিমাণ লিখে বিক্রয়ের প্রচলন হয়েছে। যার অর্থ হলো, বিক্রেতা ওজন করার পর তা প্যাকেটজাত করে প্যাকেটের ওপর পরিমাণ লিখেছে। লিটার হিসাবে পরিমাপযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্যাকেটের ওপর পরিমাণ লিখে বিক্রয় করা হয়। যেমন– দুধ, তেল, পেট্রোল। স্ক্রিনে বিক্রয়ের আলোচনায় এগুলো বিক্রয়ের বৈধতা বলা হয়েছে। কিন্তু জনগণ এগুলো ওজন করা ছাড়াই ক্রয় করে এবং তাদের পক্ষে এগুলো ওজন করাও সম্ভব না। কারণ, তাতে প্যাকেট খোলার প্রয়োজন হয়। যা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যই কষ্টসাধ্য। সুতরাং এ পদ্ধতিতে বিক্রয় করা জায়েয আছে কি না?

ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাব ও শাইখ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)-এর মতানুযায়ী এতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, ক্রেতা যদি বিক্রেতার পরিমাপের ওপর আস্থা রাখে, তা হলে তার জন্য নতুন করে পরিমাপ করা ছাড়া ক্রয়কৃত পণ্য খাওয়া জায়েয। চাই বিক্রেতার পরিমাপটি ক্রেতার উপস্থিতিতে হোক বা অনুপস্থিতিতে হোক। শাইখ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.) বলেছেন–

> أما إذا كانت الصفقة واحدة، فلا حاجة إلى الكيل ثانيا، بل كفاه كيل البائع، إن كان بحضرته عند صاحب الهداية، وعندي مطلقا، إذا اعتمد عليه.
>
> 'যদি একটি চুক্তি হয়, তা হলে দ্বিতীয়বার পরিমাপ করার প্রয়োজন নেই; বরং বিক্রেতার পরিমাপই যথেষ্ট হবে। হেদায়া গ্রন্থ-প্রণেতার মতানুযায়ী ক্রেতার উপস্থিতিতে পরিমাপ করা হলে, তা যথেষ্ট হবে। আর আমার মত হলো, বিক্রেতার পরিমাপের ওপর আস্থাশীল হলে সর্বক্ষেত্রেই যথেষ্ট হবে।'[৮৭০]

এটির এ ব্যাখ্যা করা সম্ভব যে, হাদিসের নিষেধাজ্ঞাটি বিবাদ আবশ্যককারী ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং ক্রেতা যদি বিক্রেতার পরিমাপের ওপর আস্থাশীল হয়, তা হলে ইল্লত থাকল না। তাই হুকুমও থাকবে না।

---

৮৭০. ফয়যুল বারি : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২০।
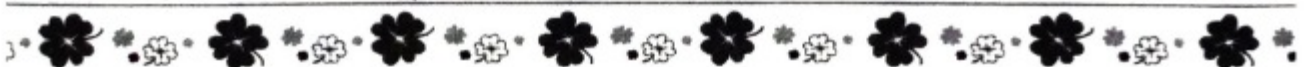
যেসব সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে ক্রেতা নিজে ওজন করা বা বিক্রেতার ওজন করার সময় উপস্থিত থাকার শর্তারোপ করেছেন, তাদের মতানুযায়ী এ ধরনের প্যাকেটজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বলা হবে, প্যাকেটজাত করার পর সেগুলো গণনা-নির্ভর জিনিস হয়ে গেছে। সংখ্যা হিসাবে বিক্রয় করা হবে। আর তার ওপর লেখা ওজনটি তা ওজন হিসাবে বিক্রয়ের জন্য না; বরং ছোট-বড়র মধ্যে পার্থক্য করার জন্য লেখা হয়েছে। এ বিষয়টি মুরগি ও ছাগলের মতো, যেগুলো গণনা নির্ভর প্রাণী হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু তারপরও তা ওজন করে বিক্রয় করা হচ্ছে। এগুলো ওজননির্ভর হওয়ার কারণে ওজন করে বিক্রয় করা হচ্ছে না; বরং মোটা-চিকনের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য ওজন করে বিক্রয় করা হচ্ছে। সুতরাং এগুলো অনুমান করে বিক্রয় করা হচ্ছে বলে সাব্যস্ত করা সম্ভব। আর এ আলোচনা অনুযায়ী গণনানির্ভর জিনিস কব্জার প্রক্রিয়ায় এগুলোর কব্জা সম্পন্ন হবে। والله تعالى أعلم

১৮০. গুদাম হতে পণ্য কব্জা করা

বাজারে গুদামের পণ্য বিক্রয়ের প্রচলন রয়েছে। সেক্ষেত্রে ক্রেতার কাছে একটি প্রমাণপত্র দেওয়া হয়, যা গুদামে থাকা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যে তার মালিকানা প্রমাণ করে। সুতরাং এ-ধরনের প্রমাণপত্র কব্জা করাকে কি পণ্য কব্জা সাব্যস্ত করা যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, বাজারে প্রচলিত পণ্যের প্রমাণপত্র কয়েক ভাগে বিভক্ত। যার মধ্যে একটি হলো, এমন প্রমাণপত্র যার বাহককে নির্দিষ্ট পণ্যের মালিকানার প্রতিনিধিত্বকারী সাব্যস্ত করা হয়। সেটি এভাবে যে, নম্বরযুক্ত কার্টনে প্যাকেটজাত পণ্য এবং কার্টনের ওপর ওই কার্টনের নম্বরযুক্ত একটি কাগজ লাগানো থাকবে। ওই নম্বরযুক্ত কাগজের বাহক ইচ্ছেমতো যে কোনো সময় পণ্য কব্জা করার অধিকার রাখে। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে প্রমাণপত্র কব্জা করাকে পণ্য খালি করা হয়েছে বলে সাব্যস্ত করা হবে।

এমন কিছু প্রমাণপত্র, যা নির্দিষ্ট পণ্যে বাহকের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং তার বাহককে বড় গুদামে থাকা নম্বরহীন অনির্দিষ্ট পণ্য হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য কব্জা করার অধিকার দেয়। আর বাস্তবে কব্জা করা ছাড়া বিক্রয়কৃত পণ্যকে অবিক্রয়কৃত পণ্য হতে ভিন্ন করা হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে ডেলিভারি অর্ডার নামে অভিহিত পণ্যের প্রমাণপত্রকে কব্জা সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ, তা নির্দিষ্ট পণ্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। কেননা, পণ্য যদি নির্দিষ্ট না-হয়, তা হলে শুধু প্রমাণপত্র কব্জা করার কারণে বিক্রেতা হতে ক্রেতার কাছে পণ্যের দায়ভার স্থানান্তরিত হবে না। সুতরাং গুদামে থাকা পণ্যের
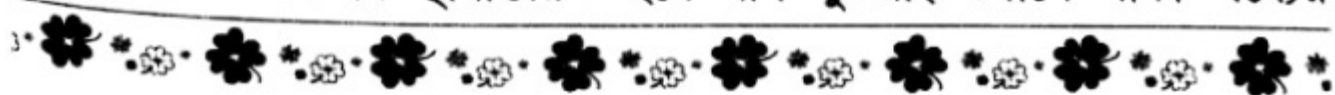
অংশবিশেষ নষ্ট হলে নিশ্চিতভাবে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, নষ্ট হওয়া অংশটি ক্রয়কৃত পণ্য ছিল, না কি অন্য পণ্য ছিল। আর নষ্ট হওয়ার পর বিক্রেতার ওপর আবশ্যক হলো, অবশিষ্ট পণ্য হতে ক্রেতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য দেবে। এ ব্যাপারে ক্রেতার জিম্মাদার না-হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে যে, সে পণ্য কব্জা করেনি। কারণ, কব্জার সঙ্গে জিম্মাদারি সম্পৃক্ত থাকে। সুতরাং ক্রেতা যদি অন্যের কাছে সেটি বিক্রয় করে দেয়, তা হলে তা দায়ভার বহনহীন লাভ অর্জনের আওতাভুক্ত হবে।

মানুষের মাঝে এ পদ্ধতির ব্যাপক লেনদেনের প্রতি লক্ষ করে অনেকে এ পদ্ধতিতে কারবার করা বৈধ মনে করেছে যে, এ প্রমাণপত্র দেওয়ার মাধ্যমে পণ্য ও বিক্রেতার মধ্যকার সম্পর্ক ভারমুক্ত করা হবে। সুতরাং এটিকে কৃত্রিম কব্জা সাব্যস্ত করা যেতে পারে। তবে বাস্তবতা হলো, ভারমুক্ত বা খালি করাকে তখনই কৃত্রিম কব্জা সাব্যস্ত করা হয়, যখন পণ্যটি অন্য পণ্য হতে ভিন্ন থাকে এবং তা নির্দিষ্ট করা যায়। আর নির্দিষ্ট করা ছাড়া খালি করে দেওয়া বাস্তবিক অর্থে খালি করা নয়; বরং নির্দিষ্ট করার পর তা নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়, ফলে এটি কব্জার হুকুমে ধরা হবে না। কারণ, গুদাম থেকে যদি বিক্রয়কৃত পরিমাণ পণ্য নষ্ট হওয়ার পরও বিক্রয়কৃত পরিমাণ পণ্য থাকে, তা হলে বিক্রেতার জন্য ক্রেতাকে বিক্রয়কৃত পরিমাণ পণ্য দেওয়া ওয়াজিব। আল্লামা শিলবি (রহ.) জামে কিতাব হতে বর্ণনা করেছেন–

في بيع قفيز من صبرة إذا كان البائع منه قفيزا بغير حضرة المشتري، فهلك أن البيع قائم يتعين فيما بقي.

'খাদ্যগুদাম হতে এক কফিয পরিমাণ বিক্রয় করার ক্ষেত্রে যদি ক্রেতার অনুপস্থিতিতে পণ্য নষ্ট হয়, তা হলে অবিশিষ্ট পণ্যের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য থাকার কারণে বিক্রয়চুক্তি বহাল থাকবে।'[৮৭১]

ধ্বংস হওয়ার পর যদি গুদামে কিছুই না-থাকে, তা হলে বিক্রয় বাতিল হবে। ক্রেতার সম্পদ হতে নষ্ট হয়েছে এমন বলা যাবে না।

অনেক সময় বলা হয়, বাজারে এ ধরনের প্রমাণপত্রের প্রচলন ঘটেছে এবং আইন তার স্বীকৃতি দিয়েছে। সুতরাং প্রচলন ও আইন অনুযায়ী প্রমাণপত্র কব্জা করাকে তাতে লেখা পণ্য কব্জা হিসাবে সাব্যস্ত করা উচিত।

৮৭১. হাশিয়াতুশ শিলবি আলা তাবয়িনিল হাকায়েক, আল্লামা যাইলায়ি (রহ.), অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: তাওলিয়া, উপপরিচ্ছেদ: কব্জা করার আগে জমি বিক্রয় করা : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮১।

তাদের এ দলিলটি সহিহ নয়। কেননা, আইন ডেলিভারি অর্ডারকে (যেখানে পণ্য নির্দিষ্ট থাকে না) মালিকানা পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট বলেনি। পণ্য বিক্রেতা হতে ক্রেতার কাছে পণ্যের দায়ভার বর্তানো তো দূরের কথা। কারণ, প্রচলিত পণ্য বিক্রয় ব্রিটিশ আইননির্ভর আইনের ১৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, পণ্য নির্দিষ্ট করা ছাড়া ক্রেতার কাছে মালিকানা যাবে না। এ ধারার ব্যাখ্যায় ব্রিটিশ আদালতে সংঘটিত এমন অনেক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে পণ্য নির্দিষ্ট করার আগে মালিকানা পরিবর্তন হয়নি। সে আইনের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো–

"And the mere fact that an order for delivery is given by the seller to the buyer, and is loged by the buyer with a warehouseman, who holds the specified lerger stock out of which the goods sold are to be taken, is not sufficient to transfer the property to the buyer. Thus, where the ascertainment of the goods depends upon there being separated from the bulk by seller or a third party, or the buyer, by their being severed, weighed or measured or some other process, no property can pass until this be done. A *pucca* delivery order may create estoppel between the vendor and the holder of the order, but the title in the goods would not pass till the goods are ascertained and appropriated."

'অর্থাৎ, বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে শুধু কব্জা করার নির্দেশ দেওয়া এবং ক্রেতার পক্ষ থেকে এমন গুদামে তা রেখে দেওয়া, যেখানে অনেক পণ্য থাকে এবং সেখান থেকে ক্রয়কৃত পণ্য বের করা সম্ভব, ক্রেতার কাছে পণ্যের মালিকানা আসার জন্য এটি যথেষ্ট নয়। কেননা, অনেক পণ্য থেকে ক্রয়কৃত পণ্য নির্দিষ্ট করার বিষয়টি বাকি রয়েছে, সেটি হয়তো বিক্রেতা বা ক্রেতা বা তৃতীয় পক্ষ থেকে ওজন করে আলাদা করা বা পরিমাপ করা অথবা অন্য কোনো উপায়ে আলাদা করার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। সুতরাং এমন না-করা পর্যন্ত ক্রেতার মালিকানায় যাবে না। আর গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া বিক্রেতা ও নির্দেশ পত্রের বাহকের মধ্যে বাধা দেওয়ার অধিকার[৮৭২] সাব্যস্ত করে;

৮৭২. বাধা দেওয়ার অধিকারের উদ্দেশ্য হলো, আইনি দৃষ্টিতে বিক্রেতা তৃতীয় কারো কাছে ওই পণ্য বিক্রয় করছে চাইলে কব্জার প্রমাণপত্র বাহকের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

কিন্তু ক্রয়কৃত পণ্য নির্দিষ্ট করার আগে ক্রেতার কাছে পণ্যের মালিকানা যায় না।'[৮৭৩]

এখান থেকে বোঝা গেল, আইন এ প্রমাণপত্রকে কব্জা ও মালিকানা পরিবর্তনকারী হিসাবে সাব্যস্ত করে না। কিন্তু অন্যদিক হতে পুঁজিবাদি আইন মালিকানা ও কব্জা ছাড়া বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ডেলিভারি অর্ডার বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছে। কারণ, তাদের কাছে মালিকানা অর্জন করা ছাড়া তা বিক্রয় করা বৈধ। তবে ইসলামি শরিয়ত মালিকানা অর্জন ছাড়া বা প্রকৃত অথবা কৃত্রিম কব্জা করা ছাড়া তা বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং ইসলামি শরিয়তে এ পদ্ধতির বিক্রয় জায়েয নেই।

ইতঃপূর্বে আমরা শাফেয়ি মাযহাবের মত বর্ণনা করেছি যে, গমের মতো যেসব পণ্যের এককে পরিবর্তন হয় না, এমন পণ্যের স্তূপ হতে এক কফিয পরিমাণ পণ্য ক্রয় করার পর যদি তার অংশবিশেষ নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে স্তূপের অংশবিশেষ পণ্য ক্রয় করা হয়েছে এমন হুকুম দেওয়া হবে। আল্লামা জালালুদ্দিন মাহাল্লি (রহ.) 'শারহুল মিনহাজ' কিতাবে বলেছেন–

> ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها للمتعاقدين، وينزل على الإشاعة، فإذا علما أنها عشرة أصع، فالمبيع عشرها، فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع.

> 'ক্রেতা-বিক্রেতা খাদ্য স্তূপের মোট পরিমাণ জানার পর তা থেকে এক 'সা' বিক্রয় করা সহিহ। বিক্রয়কে অংশবিশেষ হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং তারা যখন জানতে পারবে যে, সেখানে দশ 'সা' রয়েছে, তখন পণ্য হবে দশভাগের একভাগ। অতএব তার অংশবিশেষ নষ্ট হলে পণ্য থেকেও অংশবিশেষ নষ্ট হবে।'[৮৭৪]

এ মতানুযায়ী যদি গুদামের মোট পণ্যের পরিমাণ জানা যায় যে, সেখানে দশ টন খাদ্য রয়েছে এবং সেখান থেকে এক টন নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য বিক্রয় করা হয়েছে, তা হলে প্রমাণপত্রে লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ওই গুদামে থাকা মোট পণ্যের অংশবিশেষ। আর গুদামের খাবারের দশভাগের একভাগকে পণ্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং গুদাম থেকে যদি এক টন পরিমাণ

---

৮৭৩. Pollock and mulla On the Sale of Goods Act 1930, Section 18, p 176.

৮৭৪. শারহুল মিনহাজ, আল্লামা মাহাল্লি (রহ.), কালয়ুবি ও উমাইরাহ -সহ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬১।
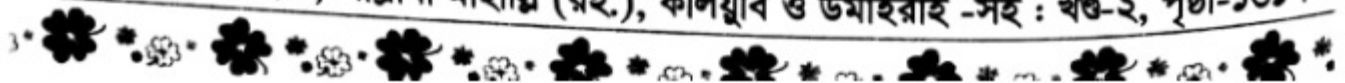
খাদ্য নষ্ট হয়, তা হলে ক্রয়কৃত এক টন হতে ওই অংশবিশেষ নষ্ট হবে, ফলে তার দশ ভাগের একভাগ কমে যাবে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, ক্রেতা-বিক্রেতা মোট খাদ্যের পরিমাণ জানতে হবে এবং ক্রেতা কর্তৃক নষ্ট হওয়া পণ্যের দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। পণ্য বাজারের নিয়ম হলো, ক্রেতা গুদামের মোট খাদ্যের পরিমাণ জানে না এবং অংশবিশেষ নষ্ট হলে ক্রেতাকে তার অংশের দায়ভার বহনকারী সাব্যস্ত করা হয় না। সুতরাং সেক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

আন্তর্জাতিক পণ্য মার্কেট থেকে ক্লিয়ারিং হাউজের[৮৭৫] মাধ্যমে পণ্য ক্রয়েরও এ হুকুম। ক্লিয়ারিং হাউজের অনেক বিক্রয়ে হস্তান্তর করা ও পণ্য বুঝে নেওয়া উদ্দেশ্য থাকে না; বরং মূল্যের ওঠা-নামার মধ্যে দিয়ে ফটকাবাজি করা আসল উদ্দেশ্য থাকে। এ ধরনের লেনদেনটি প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা জুয়ার সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ এবং জুয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।[৮৭৬] তবে কখনো-কখনো প্রকৃত বিক্রয়ের উদ্দেশ্যও করা হয়ে থাকে। তখন বিক্রয়ের সব শর্ত কার্যকর হওয়া একান্ত জরুরি। সেসব শর্তের একটি হলো, আমাদের বর্ণিত পদ্ধতিতে ক্রেতা ওই গুদাম হতে ক্রয়কৃত পণ্য কব্জা করার আগে তা অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারবে না। والله تعالى أعلم

১৮১. গণনাযোগ্য পণ্য কব্জা করা

গণনাযোগ্য পণ্যের হুকুম হলো, শাফেয়ি ও মালেকি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের মতানুযায়ী কাইলি জিনিসের কাইল করার মতো এগুলোর ক্ষেত্রেও কব্জা সম্পন্ন হওয়ার জন্য গণনা করা শর্ত।[৮৭৭] হানাফি মাযহাব অনুযায়ী খালি করলেই তা কব্জার জন্য যথেষ্ট।[৮৭৮] একইভাবে কাইলি ও ওজনি জিনিস অনুমান করে বিক্রয় করলে অনুরূপ হুকুম হবে। এটি ইমাম আহমাদ বিন

---

৮৭৫. ক্লিয়ারিং হাউজকে ইটালি ভাষায়, 'Bourse' ইংরেজিতে 'Exchange' আরবিতে 'المنابة' ও 'الندوة المالية' বলা হয়। এটি হলো দালালদের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। যেখানে পণ্য, শেয়ার, মুদ্রা আর্থিক প্রমাণপত্রের লেনদেন করা হয়। এ পদ্ধতির ইতিহাস জানতে বুসতানির রচিত দাইরাতুল মাআরিফ : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৭৯, দেখুন।

৮৭৬. 'عقود المستقبليات في السلع' নামক আরবি প্রবন্ধে এ ধরনের বেশ কিছু পদ্ধতির আলোচনা করেছি। দেখুন, বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৭।

৮৭৭. আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৭৮। আশ-শারহুল কাবির, আল্লামা দারদির (রহ.), আদ-দুসুকির সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৪।

৮৭৮. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৯৯।
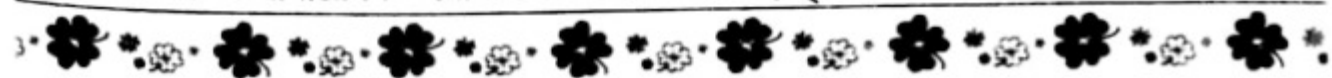
হাম্বল (রহ.)-এর একটি মত। হাম্বলি মাযহাবের ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন, পণ্যকে স্থানান্তরিত করা ছাড়া শুধু খালি করা কব্জা সম্পন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। অনুমান করে বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে।[৮৭৯] তাঁরা তাঁদের মতের সপক্ষে ইমাম মুসলিম (রহ.) কর্তৃক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেন। তিনি বলেছেন–

> كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.
>
> 'আমরা অনুমান করে মুসাফিরদের থেকে খাদ্য ক্রয় করতাম। এরপর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেগুলোকে স্থানান্তর করার আগে বিক্রয় করতে নিষেধ করে দেন।'[৮৮০]

তবে হাম্বলি মাযহাবের পছন্দনীয় মত হলো, শাফেয়ি ও মালেকি মাযহাবের মতো গণনাযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে কেবল গণনার মাধ্যমেই কব্জা সম্পন্ন হবে। সুতরাং আল্লামা বুহুতি (রহ.) বলেছেন, 'তা স্থানান্তর করা শর্ত নয়।'[৮৮১] আর 'শারহু মুনতাহাল ইরাদাত' কিতাবে তিনি বলেছেন, 'পরবর্তী সময়ে তা স্থানান্তরিত করা গ্রহণযোগ্য নয়।'

হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের পছন্দনীয় মতানুযায়ী কব্জা সম্পন্ন হওয়ার জন্য যারা তা স্থানান্তরিত করার শর্তারোপ করেননি, তারা হযরত ইবনে উমর (রাযি.)-এর হাদিসকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সেখানে বর্ণিত স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্য হলো তা কব্জা করা। এ কথার সপক্ষে দলিল হলো, হযরত সালেম (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত ইবনে উমর (রাযি.)-এর হাদিস–

> رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
>
> 'আমি দেখেছি যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর

---

৮৭৯. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২০।

৮৮০. সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: কব্জা করার আগে পণ্য বিক্রয় করা বাতিল, হাদিস নং ৩৮১৯।

৮৮১. কাশশাফুল কিনা : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৩৪। শারহু মুনতাহাল ইরাদাত : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯০।

যুগে যারা অনুমান করে খাদ্য ক্রয় করত, তাদেরকে নিজ আস্তানায় নেওয়ার পর বিক্রয়ের হুকুম দেওয়া হতো।'[৮৮২]

কব্জা সম্পন্ন হওয়ার জন্য কেউ এমন শর্ত করেনি যে, ক্রেতা তা নিজ বাড়িতে নিয়ে যাবে। এ কারণে হাফিযুল হাদিস ইবনে হাজার (রহ.) বলেছেন, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে আস্তানায় নেওয়ার কারণে আস্তানায় নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।'[৮৮৩] আল্লামা আইনি (রহ.) বলেছেন, 'হাদিসে বর্ণিত আস্তানায় নেওয়ার মাধ্যমে কব্জা করা বোঝানো হয়েছে।'[৮৮৪] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দিনার (রহ.)-এর সূত্রে ইবনে উমর (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে–

من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يقبضهُ.

'যে ব্যক্তি কোনো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করবে, সে যেন কব্জা করার আগে তা বিক্রয় না-করে।'

আর হযরত নাফে (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে–

فلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوْفِيَه.

'তা বুঝে পাওয়ার আগে বিক্রয় করবে না।'

সুতরাং বোঝা গেল, আসল উদ্দেশ্য হলো কব্জা করা ও বুঝে পাওয়া। স্থানান্তরিত করা মূল উদ্দেশ্য নয়। স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করার সম্ভাব্য কারণ হলো, প্রাথমিক পর্যায়ে বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করা। যেন গুরুত্বের কারণে প্রকৃত কব্জায় অভ্যস্ত হয়। والله تعالى أعلم

১৮২. নগদ অর্থ কব্জা করা

পূর্বের যুগে রুপার তৈরি দিরহাম ও স্বর্ণের তৈরি দিনারকে ওজনি জিনিস হিসাবে সাব্যস্ত করা হতো। বর্তমান সময়ের প্রচলিত অর্থ, সেটি স্বর্ণ-রুপা ছাড়া অন্য ধাতবমুদ্রা হোক কিংবা কাগজে নোটের রূপে হোক, এগুলো গণনাযোগ্য মুদ্রা হিসাবে বিবেচিত হয়। সুতরাং তা কব্জার ক্ষেত্রে গণনাযোগ্য জিনিস কব্জার হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে তার বিশেষ কিছু বিধি-বিধান

---

৮৮২. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: বিক্রয়, পরিচ্ছেদ: খাদ্য বিক্রয় সম্পর্কে, হাদিস নং ২১৩১। বর্ণিত হাদিসটি বুখারি শরিফের হাদিস। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৮২২।

৮৮৩. ফাতহুল বারি : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫০।

৮৮৪. উমদাতুল কারি : খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৫৬।
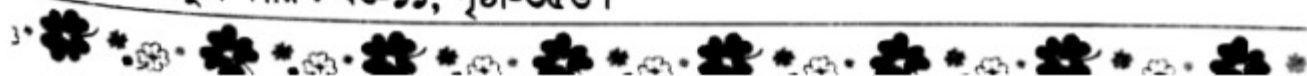
রয়েছে। বিশেষ করে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের প্রচলনের ব্যাপকতা সৃষ্টি হওয়ার পর এই বিশেষ হুকুম সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ নেওয়া-দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। মূল্যের বিধান এবং তা পরিশোধের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক দিন।

১৮৩. পূর্ব থেকে পণ্য কব্জায় থাকা যথেষ্ট কি না

ইতঃপূর্বে উল্লিখিত কব্জা সম্পর্কিত বিধানসমূহ সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পণ্যটি যখন বিক্রেতার হাতে থাকবে। অনেক সময় ক্রয়ের আগে ক্রেতার কাছে পণ্য থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে মালিক থেকে ক্রয় করার পর নতুন করে কব্জা করা জরুরি কি না? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, পূর্বের কব্জা যথেষ্ট হবে, নতুন করে কব্জা করতে হবে না। যদিও পূর্বের কব্জাটি আমানত বা জামানতের কব্জা হোক না-কেন। কারণ, আগ থেকে তার কব্জায় রয়েছে। অতএব, নতুন করে কব্জা করার কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং পূর্বের কব্জাটি যদি জামানতের কব্জা হয়– উদাহরণস্বরূপ, কব্জাকারী মালিক হতে ছিনতাই করার পর তার কাছ থেকে ক্রয় করে নেয় –তা হলে হুকুমে কোনো পরিবর্তন আসবে না। কারণ, আগ থেকেই জিনিসটি তার দায়ভারে ছিল। তবে আগের কব্জাটি আমানতের কব্জা হলে সেক্ষেত্রে হুকুম পরিবর্তন হবে। উদারণস্বরূপ, গচ্ছিত সম্পদ যাতে আগের কব্জাটি আমানতের কব্জা ছিল এবং বিক্রয়ের পর তা জামানতের কব্জা হবে। এ পরিবর্তনের কারণে নতুন কব্জা করার প্রয়োজন হবে না। কেননা, পূর্বের কব্জা বহাল রেখে হুকুম পরিবর্তন করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, ক্রেতার কাছে যদি কব্জাটি আমানতের কব্জা হয়, জামানতের না-হয়। এরপর আমানত রক্ষক তা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করলে সে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করল, তা হলে সেটি তার ওপর জামানত হয়ে যাবে এবং নতুন কব্জা করা ছাড়া হুকুম পরিবর্তন হবে।[৮৮৫]

এ মাসআলা সম্পর্কে শাফেয়ি মাযহাবে একাধিক মত রয়েছে। ইমাম নববি (রহ.) মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের মতো মত বর্ণনা করেছেন যে, শুধু বিক্রয়

---

৮৮৫. আল-মুগনি, ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭২। মালেকি মাযহাবও অনুরূপ। বিস্তারিত জানতে দেখুন :মাইয়ারাতুল ফাসি আলা তুহফাতিল হুক্কাম : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬।

করলেই পণ্যকে কব্জা হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে। এরপর বলেছেন–

ولا يحتاج إلى إذن في القبض وهل يشترط مضي زمان يتأتى فيه القبض إذا كان المبيع غائبا عن مجلس العقد؟ فيه وجهان.

'কব্জার ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজন হবে না। যদি চুক্তির মজলিস হতে পণ্য দূরে থাকে, তা হলে কব্জা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কব্জা করা যায় এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়াকে শর্ত করতে হবে কি না? এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে।'[৮৮৬]

তবে শাফেয়ি মাযহাবের মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, পণ্যটি যদি চুক্তির মজলিস হতে দূরে থাকে, তা হলে কব্জা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ক্রেতা কব্জা করতে পারে, এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হতে হবে। কিন্তু তার জন্য নতুন কব্জা করতে হবে না। কারণ, বাস্তবে তার কব্জায় রয়েছে।[৮৮৭]

হানাফি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, বিক্রয়ের আগে পণ্যটি যদি ক্রেতার নিজের পক্ষ হতে জামানতের কব্জায় রাখে, উদাহরণস্বরূপ, সে ছিনতাই করেছে, তা হলে চুক্তি করামাত্র ক্রেতা তার কব্জাকারী সাব্যস্ত হবে, নতুন করে কব্জা করার প্রয়োজন হবে না। কারণ, ছিনতাইকৃত জিনিস নিজ থেকেই তার জিম্মাদারিতে রয়েছে এবং কব্জা করার পরও পণ্য জিম্মাদারিভুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং এক জাতীয় দুটি কব্জা একত্রিত হওয়ার কারণে একটি অন্যটির স্থলাভিষিক্ত হবে। কেননা, এক জাতীয় হওয়া সদৃশ্যতার দাবি রাখে এবং সদৃশ জিনিস একটি অন্যটির স্থলাভিষিক্ত হয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করে দেয়, চাই পণ্যটি উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত। কেননা, উভয়ক্ষেত্রে ছিনতাইকারীর কব্জা জামানতের কব্জা থাকে।

তবে যদি অন্য কারণে জামানতের কব্জায় থাকে, উদাহরণস্বরূপ, বন্ধকের কব্জা, সেটি এভাবে যে, বন্ধকদাতা গ্রহীতার কাছে বন্ধকের জিনিসটি বিক্রয় করল। এক্ষেত্রে বন্ধকের জিনিস উপস্থিত থাকা অথবা তার কাছে গিয়ে কব্জা করতে পারে এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়া ছাড়া তা কব্জা হিসাবে সাব্যস্ত হবে না। কারণ, বন্ধকের জিনিস নিজে দায়বদ্ধ না; বরং অন্য কারণে

---

৮৮৬. আল-মাজমু শারহুল মুহায্যাব : খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৮১।

৮৮৭. মুগনিল মুহতাজ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১২৮। ফাতহুল আজিজ, আল্লামা রাফেয়ি (রহ.), আল-মাজমু-এর সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণ : খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৬৫ ও খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৭১।

দায়বদ্ধ। আর সেটি হলো, ঋণ। আর পণ্য নিজেই দায়বদ্ধ। সুতরাং এক জাতীয় দুই কব্জা না-হওয়ায় একটি অন্যটির স্থলাভিষিক্ত হবে না।

অনুরূপভাবে ক্রেতার কাছে থাকা কব্জাটি যদি আমানতের কব্জা হয়, উদাহরণস্বরূপ, আমানত বা ধার নেওয়ার মাধ্যমে তা কব্জায় রাখা হয়েছে, তা হলে পণ্য উপস্থিত থাকা অথবা এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়া ছাড়া কব্জা সাব্যস্ত হবে না, যে সময়ে খালি করার পর তা কব্জা করা সম্ভব। কারণ, আমানতের কব্জা জামানতের কব্জা নয়। তাই তার একটি অন্যটির স্থলাভিষিক্ত হবে না।[৮৮৮]

এই আলোচনা হতে জানা গেল যে, হানাফি মাযহাবে আমানতের কব্জার ক্ষেত্রে তখনই নতুন কব্জার শর্তারোপ করা হয়, যখন পণ্যটি চুক্তির মজলিসে উপস্থিত থাকে না। আর চুক্তির সময় যদি পণ্য উপস্থিত থাকে, তা হলে চুক্তি করামাত্র কব্জা সম্পন্ন হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) হতে ইমাম বুখারি (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি এ মতকে সমর্থন করে। তিনি বলেছেন–

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ بِعْنِيهِ قَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِعْنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ.

‘রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে আমরা একটি সফরে ছিলাম। আমি উমর (রাযি.)-এর একটি উটের ওপর ছিলাম। সেটি আমার নিয়ন্ত্রণ মানছিল না, ফলে সবার আগে চলে যাচ্ছিল এবং উমর (রাযি.) তাকে টেনে ফিরিয়ে আনছিলেন। এরপর আবারও সামনে চলে যাচ্ছিল এবং উমর (রাযি.) তাকে টেনে ফিরিয়ে আনছিলেন। তারপর নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, উমর! এটিকে আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। উত্তরে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! তা আপনাকে দিয়ে দিলাম। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার কাছে বিক্রয় করো।

---

৮৮৮. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫০৪।
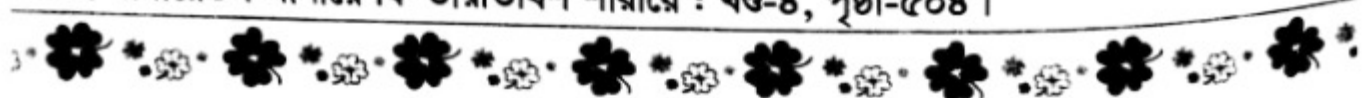
> এরপর তিনি নবি করিম (ﷺ)-এর কাছে বিক্রয় করলেন। তারপর রাসুল (ﷺ) বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর, এটি তোমাকে দিয়ে দিলাম! তোমার ইচ্ছেমতো কাজে লাগাও।'[৮৮৯]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)-এর কাছে উটটি আমানতের কব্জা ছিল। কারণ, তিনি তাঁর পিতা হতে সেটি ধার নিয়েছিলেন। এরপর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাকে দান করে দিলেন, তখন আমানতের কব্জাটি মালিকানা হিসাবে জামানতের কব্জা হয়ে গেল। নতুন করে কব্জা করা ছাড়া উভয় অবস্থায় তিনি ওই উটের ওপর আরোহী ছিলেন। কারণ, সেখানে জামানত ও আমানতের কব্জার মধ্যে পার্থক্য সাধনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

আর পণ্যটি যদি অনুপস্থিত থাকে, তা হলে হানাফি মাযহাব অনুযায়ী নতুন করে কব্জা করা শর্ত। সেটি এভাবে যে, চুক্তির মজলিসে পণ্য উপস্থিত করতে হবে অথবা উভয় পক্ষ পণ্যের কাছে গিয়ে ক্রেতার কাছে পণ্য খালি করে দেবে। তবে মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এমন শর্তারোপ করেননি। শাফেয়ি মাযহাবের একটি মতানুযায়ী কব্জা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হতে হবে, যার মধ্যে নতুন করে কব্জা করা সম্ভব। পণ্যটি যদি চুক্তির মজলিসে অনুপস্থিত থাকে এবং ক্রেতার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সীমালঙ্ঘন ছাড়া চুক্তির মজলিসে উপস্থিত করার আগে অথবা ক্রেতা-বিক্রেতা পণ্যের কাছে যাওয়ার আগে তা নষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে মতানৈক্যের ফল প্রকাশিত হবে। সুতরাং মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের মতানুযায়ী চুক্তি করামাত্র যেহেতু কব্জা সম্পন্ন হয়ে যায়, তাই ক্রেতার সম্পদ হতে তা নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। আর হানাফি মাযহাবের মতানুযায়ী বিক্রেতার সম্পদ নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। কারণ, ক্রেতার কব্জাটি আমানতের কব্জা ছিল এবং এমন কোনো নতুন কব্জা সম্পন্ন হয়নি, যার মাধ্যমে ক্রেতার কাছে দায়ভার চলে যাবে। শাফেয়ি মাযহাব অনুযায়ী যদি এ পরিমাণ সময় অতীত হয়, যার মধ্যে ক্রেতা নতুন কব্জা করতে সক্ষম, তা হলে ক্রেতার সম্পদ হতে নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। অন্যথায় বিক্রেতার সম্পদ হতে নষ্ট হবে।

আলোচনা হতে জানা যায়, হানাফিদের উদ্দেশ্য হলো আমানত ও জামানতের

---

৮৮৯. সহিহ বুখারি, অধ্যায়: বিক্রয়, হাদিস নং ২০০৯।

কব্জার মধ্যে পার্থক্য করা এবং এমন বিষয় স্পষ্ট হতে হবে, যার মাধ্যমে বিক্রেতার দায়ভারটি ক্রেতার কাছে চলে যাবে। সুতরাং নতুন কব্জা করার আগে যদি পণ্য নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে তার কারণে এভাবে বিবাদের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় যে, ক্রেতা দাবি করবে বিক্রেতার সম্পদ হতে নষ্ট হয়েছে। কারণ, আমানত হিসাবে সেটি আমার কব্জায় ছিল এবং বিক্রয়ের পর এখনো তা কব্জা করিনি। আর বিক্রেতা দাবি করবে, ক্রেতার সম্পদ হতে নষ্ট হয়েছে। কারণ, বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আর বন্ধকের ক্ষেত্রে নতুন কব্জার শর্ত করার উদ্দেশ্য হলো, দুই ধরনের জামানতের মধ্যে পার্থক্য সাধন করা এবং এমন একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া, যার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হবে। সুতরাং বন্ধক গ্রহীতার কাছে বন্ধকের জিনিসটি বাজার দর ও ঋণের মধ্যে কম মূল্যের সঙ্গে দায়বদ্ধ হয়। অর্থাৎ, বন্ধক গ্রহীতার কাছে থাকা অবস্থায় যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে তার মূল্যের সমপরিমাণ ঋণ মওকুফ হয়ে যাবে। তবে যদি বন্ধকি জিনিসটির মূল্য ঋণ অপেক্ষা বেশি হয়, তা হলে বন্ধক গ্রহীতা বেশি মূল্যের জামানত দিতে বাধ্য থাকবে না। সুতরাং বন্ধকি জিনিসের জামানতটি পরিপূর্ণ জামানত নয়। কিন্তু কব্জা করার পর পণ্যের জামানতটি পরিপূর্ণ জামানত। অতএব ক্রেতা কব্জা করার পর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে সে-ই সম্পূর্ণ ক্ষতি বহন করবে। কাজেই এমন বিষয় পাওয়া যাওয়া আবশ্যক, যার কারণে পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণ জামানতের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব। কেননা, নতুন কব্জার আগে পণ্য নষ্ট হলে উভয় জামানতের মধ্যে বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। সেটি কি নিজে জামানত না কি ঋণের কারণে জামানতে পরিণত হয়েছে, ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

এখান থেকে বোঝা গেল, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো খালি করার মাধ্যমে দায়ভার পরিবর্তন হওয়ার মূল বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া। এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, 'এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হতে হবে, যার মধ্যে খালি করার মাধ্যমে কব্জা করা সম্ভব।' সুতরাং বর্তমান সময়ের আন্তর্জাতিক ব্যবসার পরিস্থিতির মতো ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যেসব বিক্রয় সম্পন্ন হয় এবং সেখানে বাস্তবিকভাবে কব্জা করা কঠিন এমন ক্ষেত্রে চুক্তির মধ্যে জামানত পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি এভাবে স্পষ্ট করার মাধ্যমে আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয় যে, ওই বিষয়টি পাওয়ামাত্র ক্রেতাকে কব্জাকারী সাব্যস্ত করা হবে। والله تعالى أعلم

* * *